আত্মকথা

আমি সরদার বলছি

সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সরদার বলছি • সরদার ফজলুল করিম

অন্বেষা

ISBN 978 984 8991 00 8
9 789848 991008

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

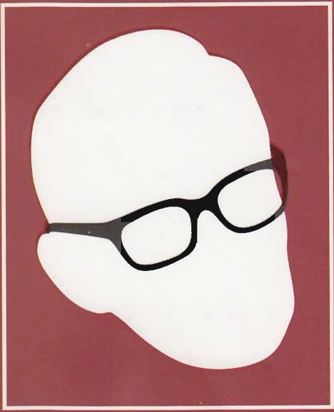

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সরদার ফজলুল করিম বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের অন্যতম পৃথিকৃত। জ্ঞান-পিপাসু এই বিপ্লবী মানুষটি নানা অর্থেই এক অসামান্য চরিত্র। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই বৈচিত্রে ভরপুর। বৈপ্লবিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে চাকরি ছেড়েছেন, জীবনের সকল চাওয়া পাওয়াকে তুচ্ছ করে আজীবন জড়িয়ে থেকেছেন আন্দোলন-সংগ্রামে। চারবার কারাবন্দী হয়ে ১১টি বছর বন্দী অবস্থায় ছিলেন। দীর্ঘদিন লড়াকুজীবন কাটিয়ে লেখালেখিকে নিলেন লড়াই-সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে। দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন প্রচুর। এই দেশকে আপন করে নেয়ার অমৃতকথা আমরা তাঁর রচনায় পাই। *আমি সরদার বলছি* সরদার ফজলুল করিমের আত্মজীবনীমূলক একটি গ্রন্থ। এতে ওঠে এসেছে তাঁর শৈশব-কৈশোর, যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা, বরিশাল থেকে রাজধানী ঢাকায় আগমণ, দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর নানা স্মৃতি, আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির কথা, আন্দোলন-সংগ্রাম, বন্দীজীবনসহ বৈচিত্র-বৈভবে পরিপূর্ণ একটি জীবনের নানা কথা।

গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় এতই বৈচিত্রে ভরা, পাঠকের মনে হবে, যেন কোনো মহাজীবন-ভিত্তিক কাহিনী পাঠ করছেন। সেই কাহিনী থেকে পাঠক সমৃদ্ধ হবেন, আহরণ করতে পারবেন জীবন, জীবন-উপভোগের, জীবনের আদর্শের নানা সূত্র। পাঠক বুঝতে পারবেন, সরদার ফজলুল করিম জীবনকে কীভাবে দেখেছেন। পাবেন মানুষের জন্য উপভোগ্য একটি জীবনের সন্ধান।

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

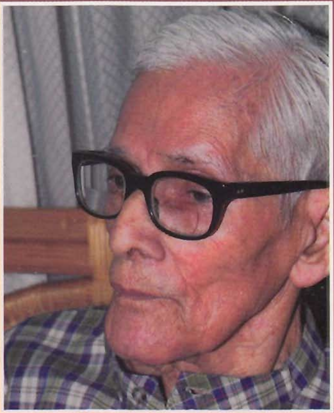

সরদার ফজলুল করিম জন্ম ১৯২৫ সালের পহেলা মে বরিশালের আটিপাড়া গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। বাবা খবিরউদ্দিন সরদার। মা সফুরা বেগম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৪৫ সনে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স ও ১৯৪৬ সনে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সরদার ফজলুল করিম ছাত্রজীবন থেকেই শোষণমুক্ত মানবতাবাদী একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জীবনের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে একের পর এক লড়াই করেছেন। রাজবন্দি হিসেবে দীর্ঘ ১১ বছর তিনি কারাভোগ করেন। ১৯৫৪ সালে জেলে থাকাকালে সরদার সাহেব পাকিস্তান সংবিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৩-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষের পদে কাজ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সরদার ফজলুল করিম ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *প্লেটোর সংলাপ*, *প্লেটোর রিপাবলিক*, *অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স*, *এ্যাঙ্গেলসের অ্যান্টি ডুরিং*, *রুশোর সোস্যাল কন্ট্রাক্ট*, *নানা কথার পরের কথা*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক*, *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, *নূহের কিশতি*, *রুমীর আম্মা*, *দর্শনকোষ*, *শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্মারকগ্রন্থ* ও *সেই সে কাল*। সৃজনশীল লেখক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পদকে ভূষিত হন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সরদার ফজলুল করিমকে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ২০০০' প্রদান করা হয়। Now he is a national proffesore in our country.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সরদার বলছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সরদার বলছি

সরদার ফজলুল করিম

অন্বেষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আফসানা করিম স্বাতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সরদার ফজলুল করিম। এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের অন্যতম পৃথিকৃত। জ্ঞান-পিপাসু বিপবী এই শিক্ষাবিদ নানা অর্থেই এক অসামান্য চরিত্র। তাঁর জীবনের প্রতিটা অধ্যায়ই বৈচিত্রে ভরপুর। যখন যা মনে হয়েছে তখন তিনি সেভাবেই চলেছেন। মনে লালিত আদর্শকে কখনো বিসর্জন দেননি বরং প্রতিনিয়ত তাকে আরো দৃঢ় করেছেন। বৈপবিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে চাকরি ছেড়েছেন, জীবনের সকল চাওয়া পাওয়াকে তুচ্ছ করে আজীবন জড়িয়ে থেকেছেন আন্দোলন-সংগ্রামে। মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে, সমাজ থেকে উঁচু-নিচু বৈষম্য দূর করতে এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন করতে রাজপথে লড়েছেন। চারবার কারাবন্দী হয়ে ১১টি বছর বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এ দেশের সকল প্রতিকূল অবস্থায় দেশের হাল ধরেছেন।

সরদার ফজলুল করিম একধারে বাংলা একডেমীতে চাকরি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এরপর কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি ছেড়ে আন্ডার-গ্রাউন্ডে কাজ শুরু করেন। সে এক বিপুল বৈচিত্রে ভরা জীবন। তাঁর চিন্তা আর জীবনযাপন ছিল একই সুতোয় গাঁথা। বিলাসবিবর্জিত একটি সুন্দর জীবন, নানা সমস্যাসংকুল অবস্থায় কাটিয়েছেন তিনি। তবুও জীবন নিয়ে তাঁর কোনো আক্ষেপ বা অপ্রাপ্তি নেই। বরং মনে করেন, তাঁর জীবনের পুরোটাই লাভ। সরদারের জীবনের খতিয়ান থেকেই বুঝে নিতে পারা যায় তিনি কোন পক্ষের মানুষ। নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিকে পণ্যময় করে তোলার প্রচেষ্টা থেকে সবসময়ই বিরত থেকেছেন। কারণ তিনি যে-দর্শনে বিশ্বাসী তা শুধু 'উন্মাদের ভবিষ্যদ্বাণী বা দুর্বলচিত্তের আত্মসান্ত্বনা' নয়। তিনি সত্যি-সত্যিই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, 'জীবন মাত্র একটা : লড়াইয়ের হোক সে জীবন'! দীর্ঘদিন লড়াকু জীবন কাটিয়ে শরীরে যখন ভাটা পড়ল তখন লেখালেখিকে নিলেন লড়াই-সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে। এ দেশের সংবাদিকতা এবং লেখালেখিতে একটি বিশাল জায়গা দখল করে আছেন তিনি। দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন প্রচুর। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশের মানুষকে আপন করে নেয়ার অমৃতকথা আমরা তাঁর রচনায় বারবার দেখতে পাই। তাঁর রচনায় শুধু নয়, ব্যক্তিগত জীবন-যাপনের মধ্যেও এ-ব্যাপারটি কত বিচিত্রভাবেই না সত্যি হয়ে উঠেছে!

আমি সরদার বলছি সরদার ফজলুল করিমের আত্মজীবনীমূলক একটি গ্রন্থ। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে গত দুই বছর ধরে অন্বেষা প্রকাশন বইটি প্রকাশের ব্যাপারে কাজ করছে। আমাদের ইচ্ছে ছিল গত বছর বইটি প্রকাশ করার, কিন্তু তাঁর 'প্রবন্ধ সমগ্র' প্রকাশ করতে গিয়ে এবং আরো কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে হয়ে ওঠেনি।

উক্ত গ্রন্থ সরদার ফজলুল করিমের স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনমূলক তিনটি গ্রন্থের সংকলন। *সেই সে কাল কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, *বরিশালের পোলার ঢাকা আগমন*, *জীবন জয়ী হবে*—এই তিনটি গ্রন্থ নিয়ে 'আমি সরদার বলছি'। এতে উঠে এসেছে তাঁর শৈশব-কৈশোর, যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা, বরিশাল থেকে রাজধানী ঢাকায় আগমণ, দেশবরেণ্য ব্যাক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর নানা স্মৃতি, আন্ডার-গ্রাউন্ড রাজনীতির কথা, আন্দোলন-সংগ্রাম, বন্দীজীবনসহ বৈচিত্র-বৈভবে পরিপূর্ণ একটি জীবনের নানা কথা। বলা যেতে পারে, এটি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের আখ্যান। গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় এতই বৈচিত্রে ভরা, পাঠকের মনে হবে, যেন কোনো মহাজীবন-ভিত্তিক কাহিনী পাঠ করছেন। সেই কাহিনী থেকে পাঠক সমৃদ্ধ হবেন, আহরণ করতে পারবেন জীবন, জীবন-উপভোগের, জীবনের আদর্শের নানা সূত্র। পাঠক বুঝতে পারবেন, সরদার ফজলুল করিম জীবনকে কীভাবে দেখেছেন। পাবেন মানুষের জন্য উপভোগ্য একটি জীবনের সন্ধান।

এ অসামান্য গ্রন্থটি *অন্বেষা প্রকাশন* থেকে প্রকাশের অনুমতি দেয়ায় আমরা সরদার ফজলুল করিমের কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। মনীষী সরদার ফজলুল করিম তাঁর এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে দিয়ে যে আদর্শিক মহাজীবনের কথা বলেছেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবন ধাবিত হোক সেদিকে।

শাহাদাত হোসেন
প্রকাশক
অন্বেষা প্রকাশন
জানুয়ারি, ২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সে কাল কিছু স্মৃতি কিছু কথা ১১

বরিশালের 'পোলা'র ঢাকা আগমন ১১১

জীবন জয়ী হবে ২৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সে কাল
কিছু স্মৃতি কিছু কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বোধন :
আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আরিফা রহমান এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ ।

স্নেহভাজন অনুজাপ্রতিম নাজমা জেসমিন চৌধুরীর আজকের এই স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে যোগদানে আমার মানসিক অনুভূতিটি আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশের অতীত ।

আমি সাধারণ । আমি দুর্বল, অযোগ্য এবং দরিদ্র ।

আমি জানি, মৃত্যুর মধ্যে আমাদের বাস । তবু আমি মৃত্যুকে স্বীকার করিনে । 'শহীদ' কথাটি আমার কাছে পবিত্র । আমার স্বপ্নের মনুষ্য সমাজ তৈরির সংগ্রামে জীবনদানকারী সৈনিককে আমি বলি শহীদ । আমাদের নাজমা সেই সংগ্রামের এক মহৎ সৈনিক । জীবনদানকারী সৈনিক । মহৎ জীবন তৈরির সংগ্রামে জীবনদানকারী নাজমাকে আমি শহীদ বলে গণ্য করি । জীবনসংগ্রামের সব শহীদকে আমি জানিনে । আমার জানা-অজানা সকল শহীদের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত বোধ করি । নাজমা আমার অনুজাপ্রতিম । কিন্তু নাজমা আমার চাইতে অনেক বড় । নাজমাকে আমার জানতে হবে । নাজমা স্মৃতি সংসদের আজকের আহ্বানে আমার সকল অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি তাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যোগ দিতে এসেছি এক দায়িত্ব পালনের বোধ থেকে ।

আপনারা নাজমার উপর একটি স্মারকগ্রন্থ তৈরি করেছেন । এমন মহৎ স্মারকগ্রন্থও আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি । এটি পাঠ করতে গিয়ে আমার গলা ধরে এসেছে । চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে । আনন্দে, গর্বে ও গৌরবে । তখন আর নিজেকে অশক্ত এবং দরিদ্র বলে মনে হয়নি । মনে হয় না । এ গ্রন্থখানিকে কি আমাদের সকলের জন্য অবশ্যপাঠ্য করা যায় না? এ কথা আমি আজ যেমন বলছি, আগামীতেও তেমনি বলব ।

প্রীতিভাজন সিরাজ বলেছেন : আপনি এবার কিছু বলুন । নাজমা বলেছেন : স্যার, আপনি কিছু বলুন । নাজমার এমন সম্বোধন তাঁর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বোধন ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার নিজের সঙ্কোচ কাটিয়ে আমি তাকে তুমি বলে সম্বোধন করেছি। বলেছি : আমি কি বলব? আমি তোমাকে কি দেব? তোমার দানেই আমি ধন্য। আমরা ধন্য।

আপনি আপনার জীবনের কথা বলুন। আপনার অনুভূতির কথা।

এ প্রায় তার হুকুম। এমন সুন্দর করে সে হুকুম করতে পারে! এ দৃশ্য ভাবতে আমি আবেগে আপ্লুত হই। যারা জীবন দিয়ে আমাদের জীবিত রাখছে তাদের কাছে আমাদের ঋণের শেষ কোথায়? আমার দরিদ্র জীবনে আজ যেভাবে নাজমাকে পেলাম, এমন প্রাপ্তি আমার কাছে অকল্পনীয় ছিল। এই প্রাপ্তিতে আজ আমি নিজেকে শক্তিমান মনে করছি। সমস্ত রকম হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে, জীবনের অপরাজেয়তার স্বপ্নে এবং বিশ্বাসে আমি উজ্জীবিত বোধ করছি। এই বোধটুকুর জন্য আমি অনুজা নাজমার কাছে ঋণী।

নাজমাকে প্রত্যক্ষ রেখে যে কথা কয়টি আমি বলার চেষ্টা করছি তা এই : এ কোনো আত্মজীবনী নয়। 'আত্মজীবনী' কথার মধ্যে হয়তো কিছু অহংবোধের ব্যাপার থাকে। তাই আত্মজীবনী বলার আমার সাহস নেই। কিন্তু জীবন তো, যে জীবন পাঁচটা মানুষকে দেখেছে, পাঁচটা কালকে দেখেছে, তার কথা বলার দায়িত্ব তো সে অস্বীকার করতে পারে না।

১৯২৫ থেকে আজকের এই ২০০০ পেরিয়ে প্রায় ২০০১ এর সামনে দাঁড়িয়ে। আমার দরিদ্র পিতা-মাতার দান করা জীবন দিয়ে যে নতুন মানুষের স্বপ্ন দেখতে দেখতে এই পথটুকু আমি হেঁটে এসেছি, সেই নতুন মানুষের কল্পনাতীত এক প্রতীক আমাদের নাজমা। তার যে এমন করে সাক্ষাৎ পেলাম, সেজন্য আমি আমার জনক-জননীর কাছে অসীমভাবে কৃতজ্ঞ : কৃতজ্ঞ আমাকে জীবন দেওয়ার জন্যে। তাদের কাছে তাই আমার ঋণের শেষ নেই। এর কোনো পরিশোধ নেই। কিন্তু একে অস্বীকার করার সাধ্য নেই। পাপ বলে যদি কিছু থাকে তবে সেটাই হবে আমার পাপ। জনক-জননীর দান করা জীবনের ঋণকে অস্বীকার করার পাপ।

তাই এ পথ চলতে চলতে ডাইনে-বাঁয়ে যা আমি দেখেছি, জীবন-পথের অপেক্ষমান সারিতে নাজমাকে সে কথা বলার দায়ে আমি দায়বদ্ধ।

* * *

একদিন জীবনের মিছিলে যোগ দিয়েছি, আওয়াজ তুলেছি, পথের সাথী, পথের সংগ্রামী কমরেডদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুলেছি : 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বিপ্লব জিন্দাবাদ'।

বিপ্লব কি আসবে? সব প্রতিকূলতা এবং দানবীয় শক্তিকে পরাজিত করে বিপ্লব কি আসবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ বিপ্লব আসবে। আমার বোধ : বিপ্লব এসেছে। বিপ্লবের মধ্যে আমরা বাস করছি।

প্রতিকূলতায় হতাশ হওয়া নয়। দানবীয় শক্তির প্রকাশে শঙ্কির হওয়া নয়। দানবীয় শক্তি, তথা মৃত্যুর মুখের ব্যাদান : জীবনের শক্তির বিকাশে আতঙ্কিত প্রতিকূলতার প্রকাশ : এই প্রত্যয়ে আত্মপ্রত্যয়ী আমাদের হতে হবে। এই বোধ তো আমরা আহরণ করেছি যেমন নাজমার কাছ থেকে, তেমনি সংখ্যাহীন আমাদের সংগ্রামী সাথীদের জীবন থেকে। নির্যাতিত মানুষের এমন সংগ্রামী ঐতিহ্যের বোধ হচ্ছে আমাদের শক্তির উৎস।

আদি থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত যুগের সংগ্রামী মানুষের মহৎ ঐতিহ্যের আমরা একমাত্র উত্তরাধিকারী : আজকের পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষ। নির্যাতিত সংগ্রামী মানুষ। যে নির্যাতনকারী, সে কোনো মহৎ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। সকল মহৎ সংগ্রামের মহৎ ঐতিহ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছে নির্যাতিত, নিপীড়িত সংগ্রামী মানুষ।

তাই নিকটভাবে আমাদের দেশ ও মাতৃভূমিতে, সংখ্যাহীন ঘটনার মধ্য দিয়ে এই বৈপ্লবিক শক্তির প্রকাশকে যেমন আমরা দেখতে পাই, তেমনি বিশ্বব্যাপী তার প্রকাশও আমাদের কাছে আর অদৃশ্য এবং অ-দৃষ্ট নয়।

ওরা বলে : আমাদের স্বপ্ন, তথা একটা নতুন মনুষ্য সমাজের স্বপ্ন আমাদের মিথ্যা এবং মৃত।

আমার বোধ: তাহলে তোমরা এত আতঙ্কিত কেন? একদিন যদি মার্কস-এঙ্গেলস্ বলেছিলেন : The Spectre of Communism is haunting Europe. তা হলে আমরা আজ প্রত্যক্ষভাবে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি : the Spectre তথা the ghost of dead Communism is haunting the exploiting classes of the entire world.

স্নেহভাজন নাজমা, আমি পারি তোমাকে আমার এই অতিক্রান্ত পথের দু-একটি মজার কাহিনীর কথা বলতে। তোমার অসহনীয় কষ্টের কথা স্মরণ করে আমার চোখের পাতা কেঁপে উঠছে। তোমার কষ্টের উপশমের জন্যে দেখো সহস্র বার কেমন উদ্বেগে অস্থির হচ্ছি। কিন্তু তুমি সত্যি জেনো, আমাদের বহমান জীবন এবং সমগ্র পৃথিবীতে এমন সব সংখ্যাহীন ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, নতুন মানুষের নতুন কাহিনী তৈরি হচ্ছে, তোমার কষ্টকে লাঘব করার জন্য। তুমি আমার বলা এই কাহিনীর কথা শুনে নিজের মনে মজা পাবে, তুমি নিজের কষ্টকে ভুলে যাবে, যেমন তুমি যথার্থই তোমার নিজের কষ্টকে হাসিমুখে বিস্মৃত হয়ে তোমার নিকট-দূরের সব সাথীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছ। তোমার মতো এমন জীবনের সাক্ষাৎ আমি খুব কমই পেয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*　　　　*　　　　*

আমি তোমাকে কয়েকটা গল্প কিংবা বলতে পারো গল্পের অংশ বলছি। গল্পের আগে পরে ভেবে তো লাভ নেই। গল্প গল্পই। আগেরটাও গল্প। পরেরটাও গল্প। যেমন ধরো আমার এক রাতে 'পথের দাবী' পড়ার গল্প।

'পথের দাবী' : শরৎবাবুর পথের দাবী। নিষিদ্ধ 'পথের দাবী'। শরৎবাবু কখন লিখেছিলেন এ উপন্যাস আমি এ মুহূর্তে বলতে পারব না। কিন্তু আমি যখন পড়ি তখন আমি কিশোর : ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্র। বরিশাল জেলা স্কুলে। সে ১৯৩৮-৩৯ সালের কথা। নাজমা, বিস্ময়ের ব্যাপার। তুমি জীবনে এসেছিলে : ১৯৪০ সালে। ১৯৪০ সালে আমি সেকালের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছিলাম। কিন্তু সে কথা বড় কথা নয়। এখন দেখছি বড় কথা : তুমি ১৯৪০ সালে জন্মেছিলে। আর আজ আমি তোমাকে সম্বোধন করে কথা বলছি। কী বিস্ময়কর আমাদের জীবন! কী বিস্ময়কর মানুষের জীবন!

'পথের দাবী' দিয়েছিল আমাকে আমার সহপাঠী অন্তরঙ্গ কিশোর বন্ধু মোজাম্মেল হক। [পরবর্তীকালে সে নিহত হয়েছে, ১৯৬৪ কি ৬৫ সালে মিশরের মরুভূমিতে পিআইএ বিমানের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়] মোজাম্মেল আমার কাছে স্মরণীয়। কেবল আমার কৈশোরের বন্ধু বলে নয়। সমাজগত পশ্চাৎপদতা-অগ্রগামীতার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের একটি কিশোর ছাত্র বলে, যে সেই ১৯৩৯-৪০ এ ছিল সারা ভারত বিপ্লবী দল RSPI এর সক্রিয় এক রাজনীতিক কর্মী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিসমূহের একটির মাঝে নিজেকে একাত্ম করা এক কর্মী হিসেবে সে আমাকে বিপ্লবের লাল-নীল ইস্তেহার দিত। আমাকে ভালো পড়ুয়া ছাত্র বলে ব্যঙ্গ করত। অথচ নিজে বৃত্তিধারী মেধাবী ছাত্র ছিল। আমাকে 'পথের দাবী' দিয়ে এক রাতের মধ্যে গোপনে তা পাঠ করার হুকুম দিয়ে বলেছিল : খবরদার! এই বইয়ের কথা কেউ যেন জানতে না পারে। তা হলেই তোমাকে জেলে যেতে হবে।

সে এক রোমান্টিক আর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বরিশাল শহরের একটি বাসাবাড়ি। এ শহরে ইলেকট্রিক লাইট তখনো আসেনি। রাস্তায় রাতে ঝুলানো গ্যাসের বাতি জ্বলে। একটি কিশোর, মুরব্বীর ভয়ে হ্যারিকেনের দুদিকে কাগজের ঢাকনা দিয়ে পড়ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের রোমাঞ্চকর এক কাহিনী। ভারতী, অপূর্ব, সব্যসাচীর কাহিনী। ঘটনাস্থল সুদূর বার্মার রেঙ্গুন শহরের অন্ধকার কাঠের ঘর, গাছপালাঘেরা শহরতলীর নদী। নায়িকা ভারতীয় বরিশালের মেয়ে। কেমন করে এলো সুদূর রেঙ্গুনে সেটি বড় কথা নয়। একটি গুপ্ত দল। যে দল স্বাধীনতার কথা বলে, ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে, স্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে চায় ভারতকে। ব্রিটিশ সরকারের চর অনুচর সর্বত্র, কলকাতা, রেঙ্গুন, সুমাত্রায়। নিষিদ্ধ এই গুপ্ত সমিতির আসল নায়ক সব্যসাচী। তার পিস্তল চলে দুই হাতে। তার যাতায়াত রহস্যজনক। পুলিশ ও তাদের অনুচরেরা শত চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারে না।

কিন্তু সে কাহিনীর বিস্তারিত থাক। কিন্তু এ কথা তো ঠিক যে, এ কাহিনী এই কিশোরের দেহমনকে সে রাত্রিতে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল। তার চোখেও স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়েছিল। 'পথের দাবী'র প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরের কোণা কায়দা করে কাটা। এই কোণাতেই মুদ্রিত ছিল 'পথের দাবী' দুটি শব্দ। ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা, সর্বত্র এই বই নিষিদ্ধ। এই বই কতখানি উপন্যাস হয়েছিল কিংবা হয়েছিল না তা নিয়ে তর্ক ছিল কবিগুরু ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে। কিন্তু আমার মনে শিহরণ বাদে কোনো সন্দেহ ছিল না। কোনো তর্ক ছিল না। সেজন্য আজো সেই কিশোর তার বার্ধক্যে লজ্জা বোধ করে না। কারণ একালেও তার সাথী রয়েছে। বৃদ্ধ জ্যোতিবাবুর পরিচিতি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন অশীতিপর এই বিপ্লবী। ঢাকায় এসে তিনিও তাঁর কৈশোরের স্মৃতিচারণ করে বললেন : আমি স্বদেশী রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলাম 'পথের দাবী' পাঠ করে।

কেবল যে রোমাঞ্চকর নিষিদ্ধ বিপ্লবী বই-এর পাঠ তাই নয়। কিশোরের জীবন-নদী দিয়ে জীবনতরী এগিয়ে চলে। আহা সেকালটি ছিল সোনার কাল। স্বপ্নের কাল। বরিশালের বিশাল কীর্তনখোলায় কত বড় বড় জাহাজ : নাগা, গারো, ফ্লোরিকান, অস্ট্রিচ। ঢাকা-বরিশাল, বরিশাল-খুলনা যাতায়াত করে R.S.N.I.G.N. কোম্পানির স্টিমার : মেইল এ্যান্ড এক্সপ্রেস। স্টিমার নয়, যথার্থই জাহাজ। প্রত্যেকটির দুই পাশে তাদের কি বিরাটাকার চাকা। সেই চাকা পেডালের টানে থরথর করে জাহাজ চলে নদীর বুকে বিরাট আকারের ঢেউ তুলে। সে ঢেউ-এর আঘাতে ইলিশধরার ডিঙ্গিগুলো উথালপাথাল হাবুডুবু খায়। সেই জাহাজে চড়ে কিশোর আসে অজানা এক শহরে। নাম তার ঢাকা।...

এ কাহিনী এই কিশোরের যৌবন পেরিয়ে প্রবীণ বয়সেও কলমের কালিতে অবর্ণনীয়।

১৯৪১, '৪২, '৪৩, '৪৫ এর কথা। ২০০০ সাল থেকে ৬০ বছর আগের কথা। গরিবের বাচ্চা হলে কি হবে। বিড়ালের জান বটে। তাই মরেও মরে না। মরল না ৭৫ বছরে এসেও। ঠ্যাং ভাঙলো, তবু মরলো না তো। মরলে পরে এই বাংলাদেশের কিছু আসত যেত না। যা যেত এবং যার যেত সে এই 'বিড়াল' তপস্বীর। সে না পেত এ কালের নাজমার দেখা। না পেত নাজমার অনিরুদ্ধ আহ্বানে হাজির হয়েছে যে দীপবাহকেরা : তাদের সাক্ষাৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহা! যদি ফিরে যাওয়া যেত সেই জীবনে : জীবনের এই অভিজ্ঞতা এবং ভালবাসা নিয়ে, তা হলে আবার সে ভর্তি হত বরিশালের সেই জেলা স্কুলে : ক্লাস নাইনে, আবার পরীক্ষা দিত ম্যাট্রিকে : শশধর স্যারকে পেয়ে অঙ্কে ভীত কিশোর সলজ্জভাবে প্রশ্ন করত : স্যার একেবারেই পাস করবো না? স্যার মিষ্টি হেসে পিঠে হাত বুলিয়ে বলতেন : তোর খাতা এক বার দেখে দিয়েছি। ৪৯ কি ৫০ তুই পেয়ে যাবি।

তাতেই সে খুশি। একেবারে ফেল তো নয়।

আসলে এ এক অদ্ভুত ছেলে। জীবনে এ্যাম্বিশন কাকে বলে তা সে জানাল না। সেকালের বরিশাল : নজরুল নাকি বলেছিলেন : বাংলার ভেনিস। ঘাটে ভেড়া জাহাজ। ছবির মতো সুন্দর টিকেটঘর। দক্ষিণে সাগরদাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে দুই পাশে ঝাউ আর দেবদারুর মাথায় পাতার বহর নিয়ে, সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাসের ঢেউএ আন্দোলিত পাতার শা শা শব্দ তুলে।

না, ফিরে যাওয়া যায় না। কিন্তু তাকানো তো যায়। আর তাকালেই সে দেখতে পায়, অতিক্রান্ত পথের এপাশ ওপাশ থেকে কত পত্রপুষ্প সে তুলে তুলে তার জীবনের কাঁধের থলেকে ভর্তি করেছে। এর যা কিছু মূল্য সে কেবল তার নিজের কাছে। তাতেই সে সার্থকবোধ করে। এবং সেই সার্থকতার পরিশেষের চিহ্ন আজকে এই মুহূর্তে এই কাহিনী বলতে পারার সৌভাগ্য। এতে কোনো অহংকার নেই, সঙ্কোচ ব্যতীত। কোনো দম্ভ কিংবা আত্মম্ভরিতা নয়।

আদৌ আমি মুখ খুলতে চাইনি। যদি নাজমা এসে ডাক দিয়ে না বলত : স্যার আপনি কিছু বলুন।

: আমি কি বলব?

: আপনার জীবনের কথা বলুন। আপনার অনুভূতির কথা।

সেই হুকুমেই বলার এই ব্যর্থ চেষ্টা। নাজমার হুকুমকে অমান্য করার শক্তি আমার নেই। তেমন করলে আমার জীবনের অপদার্থতা এবং অসার্থকতার আর শেষ থাকবে না।...

তবু এই এখন, পেছনের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছি। স্মৃতির পটে ছবির টুকরা এই ভেসে ওঠে তো, এই ডুবে যায়।

কিন্তু পাকা ডুবুরী বলব প্রীতিভাজন অধ্যাপক মনসুর মুসাকে, তার সহকর্মী এবং আমার স্নেহভাজন শিশির ভট্টাচার্য্যকে, আমার বন্ধু অধ্যাপক আবদুল হাইকে। তারা নাজমার দোহাই দিয়ে আমাকে তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে ডেকে এনেছেন। আমার যথার্থই শূন্য কুম্ভ বাজিয়ে তার ভেতর থেকে শব্দ আহরণ করেছেন : শব্দগ্রাহক যন্ত্রে আমার অর্ধোচ্চারিত শব্দকে ধারণ করেছেন, আবার সেই শব্দ বাজিয়ে আমার সঙ্গে আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। তারা যথার্থই আমাকে আমার চেয়ে অধিক জানেন। তাদের দেওয়া পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যেন নিজেকে আবার একটু একটু করে চিনতে পারছি। এবং এজন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। নিভন্ত দীপের সলতে যেন একটু জ্বলে উঠছে। সাথীরা বলছেন : এটুকুই যথেষ্ট। তোমার দীপ থেকে আমাদের হাতের শিখাকে জ্বালিয়ে নিতে দাও।

আহা, এমন মিনতির কি কোনো কিছুর সাথে তুলনা হয়! দীপ বলে : একটু ত্বরা করো। না হলে যে নিভে যাবে। তেমন হলে তো আমার সব জীবনটাই ব্যর্থ বলে বোধ হবে। নিঃশেষিতপ্রায় তেলটুকুতে সলতে যদি জ্বলে আরো একটি মুহূর্ত, তবে তা থেকে জ্বালিয়ে নাও তোমাদের জীবনের আলো এবং সেই আলোর নিশান হাতে এগিয়ে যাও জীবনের পথে, সমুখের পানে : নতুন মনুষ্যসমাজ তৈরির নূতনতর স্বপ্ন নিয়ে। মা ভৈ! চরৈবেতি। এগিয়ে চলো।

নাজমা, তোমার কাছে আমার আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ : নিভে যাবার মুহূর্তটিতে তোমার দেওয়া স্বপ্নের সার্থকতার এই বোধের জন্য...

* * *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. মানুষের জন্ম কবে?

আমি বলি, মানুষের মৃত্যুদিন হচ্ছে তার সত্যিকার জন্মদিন। একটু উলটাপালটা কথা বলে মনে হতে পারে। শেখ মুজিবের জন্ম হচ্ছে শেখ মুজিবের মৃত্যুর দিনে। মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তির পুরো পোর্ট্রেটটা আমার সামনে আসে। যেভাবেই মরুক না কেন একজন ব্যক্তি, অসুখেবিসুখে কিংবা কোনো আন্দোলনে বা কোনো যুদ্ধে। মরার পর জন্ম থেকে শুরু হওয়া সার্কিটটা তখন কমপ্লিট হয়। কাজেই আমরা যে জন্মদিবস পালন করি কেউ পঞ্চাশে, কেউ চল্লিশে বা ষাটে—এটা খুব একটা যথার্থ নয়। তখনো পর্যন্ত পুরো পোর্ট্রেটটা আমার সামনে নেই।

আমার সার্কিটও কমপ্লিট হয়নি এখনো, তবে এখন এই পঁচাত্তর বছর বয়সে আমি পেছন দিকে একবার তাকাতে পারি। লুক ব্যাক। স্মৃতি আমার বেশ ভালোই আছে যদিও ঘটনাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার মনে নেই।

বর্তমান বাংলাদেশে জিজ্ঞাসু যে প্রজন্ম তাকে আমি কী দিতে পারি? আমি বড় পণ্ডিত নই, বড় প্রফেসরও নই, বড় গবেষক নই। তাঁরা বড় বড় সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন জীবনে গতি, জীবনের পরিবর্তন, পরিবর্তনের ধারা, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে। এসব আমি তেমন কিছুই জানি না। এমন আমি, কী দিতে পারি আমার পরবর্তী প্রজন্মকে? আমি দিতে পারি আমার জীবনটাকে। শিশুকাল থেকে যেসব অসাধারণ মানুষ আমি দেখেছি তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি নতুন প্রজন্মকে।

টীকা :

আলোচনার এই অংশটির বর্তমান রূপে উপস্থাপনার প্রধান কৃতিত্ব ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মনসুর মুসা এবং তাঁর সহযোগী শিক্ষক শিশির ভট্টাচার্য্যের। তাঁরা দুজনে আমার অনীহা ও অক্ষমতার মোকাবেলায় একটি শব্দগ্রহক যন্ত্রে বেশ কয়েকদিন যাবৎ আমার মুখের এলোমেলো, গুরুচণ্ডালী কথাকে একটি গ্রাহ্য তথা ভদ্ররূপ দেবার চেষ্টা করেন। এমন কাজের যেমন অবর্ণনীয় পরিশ্রম, তেমনি এর নানা সীমাবদ্ধতা। কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতার কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া আমার উপায় থাকেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. শৈশব ও স্কুলজীবন

আমার জন্ম ১৯২৫ সালে বরিশালের আঁটিপাড়া গ্রামে। ভাইবোনদের মধ্যে আমি চতুর্থ। কৃষক পরিবারের ছেলে আমি। আমাদের পরিবারকে মধ্যবিত্ত পরিবার বলা চলে না। নিম্ন-মধ্যবিত্ত বললে ঠিক হয়। বছরের খোরাক হয় কিংবা কিছু কম পড়ে। বাজারে গিয়ে তরিতরকারি বিক্রি করেছি ছোটবেলায়। বাবা কৃষিকাজ করতেন। মনে আছে বাবা বলছেন, 'তুই লাঙলটা ধর বা মইয়ে একটু ওঠ, আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।' আমি যে কৃষিকাজ তেমনভাবে করেছি তা বলবো না। কিন্তু কৃষিকাজে বাবাকে সাহায্য করেছি। বাবা আমাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন। মেঝ ভাইকে তিনি সঙ্গে পাননি। মেঝ ভাই একটু আউট অব লাইন হয়ে যান স্কুলজীবন থেকেই। কিন্তু আমি ছিলাম অনুগত সঙ্গী, বড় ভাইয়ের যেমন, তেমনি বাবার। খুব বাধ্য ছেলে ছিলাম আমি। ছোটবেলায় খুব নামাজ পড়তাম, আযান দিতাম।

মা প্রতিদিন রান্নার বরাদ্দ চাল থেকে এক মুঠো চাল একটা ভাণ্ডে উঠিয়ে রাখতেন। এ চালটা থেকে ফকির-মিসকিনদের দান করা হত। দানের জন্যে এই এক মুঠি চাল উঠিয়ে রাখা আমাদের দেশের অনেক পুরোনো রীতি। আমার মা-বাবা নিরক্ষর এবং একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন। তাঁদের মতো লোকের কথা ছিল না আমাকে স্কুলে পাঠানোর। কিন্তু তারা আমাকে স্কুলে পাঠিয়েছেন। সেজন্য আমি এই মাটির মানুষগুলোর কাছে ঋণী এবং এই দেশের মাটির প্রতি আমার মনের মধ্যে একটা ভক্তি জেগে আছে।

আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এলাকারই লোক ছিলেন। তখন আজকালকার মতো এক জায়গার শিক্ষক অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হওয়ার ব্যাপারটা ছিল না। শিক্ষকেরা একদিকে যেমন স্কুলে শিক্ষাদান করতেন, তেমনি তারা মাঠে কৃষিকাজেও নিযুক্ত থাকতেন। একটা কথা মনে পড়ে যে, শিক্ষকেরা খুব যত্ন করে পড়াতেন আমাদের। পাঠশালায় একজন শিক্ষকের কথা বিস্মৃত হতে পারি না কিছুতেই। তাঁর নাম লেহাজ উদ্দিন আহমেদ। তিনি একজন পঙ্গু মানুষ। তিনি আমাদের দূর-সম্পর্কে আত্মীয়ও ছিলেন। আমার মামা। অনেক দূর থেকে এসে পড়াতেন তিনি আমাদের। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি কলম দিয়ে এই মামা হাতে ধরে আমাদের বর্ণমালা লিখতে শেখাতেন তালপাতায়। কাঠকয়লা গুঁড়ো করে পানিতে মিশিয়ে তৈরি হত কালি। সেই কালিতে কঞ্চির কলম ডুবিয়ে সিদ্ধ করা তালপাতার উপর বড় বড় করে অ, আ, ই ইত্যাদি অক্ষর লিখে দিতেন আর আমাদের সেই সব অক্ষরের উপর লিখে লিখে হাত মকশো করতে হত। এই ছিল তখনকার দিনে লিখতে শেখার সিস্টেম। এখন আর এসব পাওয়া যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেহাজ মামার স্মৃতিটা মনের মধ্যে গেঁথে আছে এই জন্যে যে, একজন সাধারণ মানুষ সৎভাবে বাঁচার জন্যে কীভাবে সংগ্রামী হয় অর্থাৎ সৎভাবে জীবনযাপন করা যে একটা সংগ্রাম—এটা আমি শিখি লেহাজ মামাকে দেখে। তাঁকে দেখে আমি প্রথম অনুপ্রাণিত হই। বড় ভাই পরে চাকরিবাকরি পেয়ে এই মামাকে খুব সাহায্য করেছেন।

আটিপাড়া গ্রামে একটা 'বোর্ড স্কুল' ছিল। সেই স্কুলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে থাকব হয়তো। যখন আমি পড়তে শিখলাম তখন সবাইকে বই পড়ে শুনাতাম। মনে পড়ে, মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' পড়ে শুনিয়েছি বাড়ির লোকদের। শুনে বাড়ির লোকজন বেশ প্রশংসা করত।

১৯২৯ সালে বড় ভাই বা আমার মিয়াভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম. এ. পড়তে আসেন ঢাকায়। বাবা মা তাঁর নাম রেখেছিলেন মউজে আলী। ওটা তিনি বোধ হয় পরে একটু সংস্কার করে নিজের নাম রেখেছিলেন মঞ্জে আলী। তিনি বরিশাল বি এম কলেজের ছাত্র ছিলেন। বড় ভাই ধার্মিক ছিলেন, দাড়ি রাখতেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহার এত ভালো ছিল, এত সামাজিক ছিলেন তিনি যে হিন্দু সমাজের লোকজনও খুব ভালবাসত তাঁকে, বিশেষত বরিশালের দত্ত পরিবার, অশ্বিনী কুমার দত্তের পরিবার তাঁকে খুবই স্নেহ করত। মুসলমানরা তখন চাকরিতে অগ্রাধিকার পেত। সুতরাং বড় ভাই এম. এ. প্রথম পর্ব শেষ করেই সাবরেজিস্ট্রারের চাকরি নিলেন। এম. এ.'র পড়াটা তিনি কমপ্লিট করেননি। বড় ভাই অনেক সামাজিক কাজ করতেন। যেখানেই যেতেন স্কুল, মসজিদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতেন। খুব জনপ্রিয় ও সৎলোক ছিলেন তিনি।

বড় ভাই বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং পেয়েছেন যেমন, নাজিরপুর, রহমতপুর, নলছিটি। নিজের সংসার তৈরি করার আগে তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর কর্মস্থলে গিয়েছেন। এসব জায়গায় যাওয়ার অনেক স্মৃতি রয়েছে আমার। আমি তখন এত ছোট যে হেঁটে সব জায়গায় যাওয়ার শক্তি আমার ছিল না। তিনি আমাকে কোনো কর্মচারীর কাঁধে তুলে দিয়েছেন, হয়তোবা তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। সেসব জায়গায় ভালো নদী ছিল তখন। বড় বড় জাহাজ চলত সেসব নদীতে। নিজের গ্রামের সঙ্গে আমি সম্পর্কহীন নই। গ্রামের সাথে সম্পর্ক ছিল আমার কিন্তু দূরত্ব সৃষ্টি হয় ১৯৩৪/৩৫ সালে যখন বড় ভাই চাকরি পেলেন। চাকরি পেয়ে তিনি এলেন নাজিরপুরে*। সাথে করে তিনি আমাকেও নিয়ে এলেন। উনি আমাকে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন

---

* ওফাজ উদ্দীন আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য আমার কান্নাকাটিতেই। মা বা অন্যরা খুব একটা রাজি ছিল না আমাকে আসতে দিতে।

এর কিছুদিন পর বড় ভাই গলাচিপায় পোস্টিং পেলেন। সেখানে গলাচিপা স্কুলে আমি সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করি। স্কুলটা বড় ভাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরে স্কুলটাকে তিনি উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত করেন। গলাচিপা থেকে বড় ভাই ট্রান্সফার হন ভোলা মহকুমার দক্ষিণে বোরহানউদ্দিনে। এ সময়ে তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বরিশালে। বরিশাল এ কে স্কুলে আমার বড় ভগ্নিপতি* শিক্ষকতা করতেন। তিনি আমাকে নিজের স্কুলে না নিয়ে ভর্তি করতে চাইলেন বরিশাল জেলা স্কুলে। বরিশালে অনেকগুলো স্কুল ছিল তখন। আমি জেলা স্কুলে ভর্তি-পরীক্ষা দিলাম। প্রশংসাই পেলাম পরীক্ষায়। হেডমাস্টার সাহেব* বললেন : 'না, ইংরেজি বাক্য তো শুদ্ধ করে লিখতে পারে।' আমি ভাইদের মধ্যে লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম। ব্রিলিয়ান্ট বলা চলে না আমাকে, মোটামুটি ভালো।

বরিশাল জেলা স্কুলে আমি ভর্তি হলাম ক্লাস নাইনে। এখানে আমি বন্ধু হিসেবে পেলাম মোজাম্মেল হককে। পরবর্তীকালে কায়রোতে পাকিস্তান এয়ার লাইন্সের বিমান দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। অনেকে মারা গিয়েছিল এই দুর্ঘটনায়, মোনায়েম খানের ছেলেও নিহতদের মধ্যে ছিল। এই মোজাম্মেল হকই আমাকে 'পলিটিক্যাল' বা রাজনীতি-সচেতন করেছে। মোজাম্মেল ছিল বরিশালের রিভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া বা আর এস পি আই এর সদস্য। বরিশালের রাজনৈতিক জীবন বেশ সমৃদ্ধ ছিল। সেখানে নলিনী দাশের মতো বড় বড় নেতারা ছিলেন। নলিনী দাশ আন্দামান সেলুলার জেলে রাজবন্দি ছিলেন। আমাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। আমাদের বাড়িতেও গেছেন তিনি। এই নলিনী দাশকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় গ্রামের লোকজন জবাই করতে চেয়েছিল। তিনি গ্রামের লোকজনকে বললেন, 'আমাকে জবাই করে তোমাদের কি লাভ? এর চেয়ে আমাকে বরং পুলিশে দিয়ে দাও। তোমরা পুরস্কার পাবে।' গ্রামের লোক ভাবল, 'সত্যি কথাই তো! জবাই করার চাইতে পুলিশে দিয়ে দেওয়া যাক'। এভাবে তাঁর জীবন রক্ষা পায়।

R.S.P.I নানা ইস্তেহার বের করত। মোজাম্মেল একদিন আমাকে একটি বই দিয়ে বলল, 'এই বইটি তুমি নেবে। এটি এক রাতের মধ্যে পড়ে শেষ করতে হবে। কেউ যেন না দেখে।' সাধারণত বইয়ের নাম উপরে লেখা

---

* মজে আলী সরদার (১৯১০-১৯৯১)
* সিরাজ উদ্দিন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। এই বইটি র উপরে নামের জায়গাটুকু কাটা ছিল। বইটি হচ্ছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবী। সাংঘাতিক বই। কবিগুরু নাকি বলেছিলেন, 'এটা কি একটা উপন্যাস হল?' শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন, 'যা হয়েছে তাতো হয়েছে।' কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাংলাদেশে এসে বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতিতে এসেছি পথের দাবী পড়ে।' পথের দাবী পড়ে রাজনীতিতে আমার হাতেখড়ি হয়। যারা পলিটিক্যাল লোক তাদের এখনো বইটি ভালো লাগার কথা। পথের দাবীর যে নায়িকা, ভারতী তার নাম, সে হচ্ছে বরিশালের ভারতী। শরৎ বাবুর রেঙ্গুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল। পথের দাবীর নায়িকা ভারতীকে তিনি রেঙ্গুন নিয়ে গেছেন। সেখানে হাবাগোবা একটি বাঙালি কেরানি ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়। রেঙ্গুনে একটি বিপ্লবী সংগঠন আছে। সংগঠনটি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে। আরেকটি চরিত্র আছে সব্যসাচী। সে দুই হাতে পিস্তল ছুঁড়তে পারে। পুলিশ তাকে ধরার জন্যে খুঁজছে। কিন্তু পাচ্ছে না। একদিন পুলিশ খবর পেল যে আজ সব্যসাচী জাহাজে আসবে। পুলিশ ঘিরে ফেলল জাহাজ ঘাট। এমন একজনকে পাওয়া গেল যার পকেটে আছে গাঁজার কলকে। পুলিশ তখন তাকে জিগ্যেস করে, 'তুমি কি গাঁজা খাও?' সব্যসাচী উত্তর দেয়, 'না আমি খাই না, তবে কলকেটা সাথে রাখি, যদি কেউ খায়!' সংলাপগুলো খুব চমৎকার। এই পথের দাবী পড়ে আমার রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়।

বরিশাল জেলা স্কুল থেকে আমি ১৯৪০ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করি। জেলাভিত্তিক স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। ম্যাট্রিকে পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি উচ্চতর ক্লাসের বন্ধুদের বইটই পড়তাম। আমি ঐ সময়েই সিভিকস ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই ১৯৪০ সালেই লাহোর প্রস্তাব পাশ হয়। অবশ্য লাহোর প্রস্তাব পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিরাট কোনো আলোড়ন উঠেছিল এমন নয়।

বরিশালে হিন্দু ছাত্ররাই ছিল বেশি সক্রিয়। তারাই মেধাবী। মাঝে মাঝে যে ধর্মঘট হয় তাতে হিন্দু ছাত্ররাই যোগ দেয়, পুলিশের অত্যাচার তাদের উপরই বেশি হয়। মুসলমান ছাত্ররা খুব একটা সক্রিয় ছিল না। তার মধ্যে মোজাম্মেল হক ছিল ব্যতিক্রম। আমি আর এস পি'র সদস্য ছিলাম না। তবে আমি মোজাম্মেলের বন্ধু ছিলাম।

ম্যাট্রিক পাশ করার প র বড় ভাই আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কলকাতায়ও অবশ্য আমি পড়তে যেতে পারতাম। সে সময় অনেক জাহাজ ছিল যেগুলো বরিশাল থেকে কলকাতায় যাতায়াত করত। দুটি ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্ভিস ছিল জাহাজের। ঐসব জাহাজের দুই-একটি এখনো আছে : অস্ট্রিচ, লেপচা। অনেক জাহাজের নাম মুখস্থ আছে আমার : ফ্লোরিকান, নাগা, গারো ইত্যাদি। এসব জাহাজের দুই পাশে দুটি প্যাডেলের মতো ছিল। মাঝখানে বড় একটা মেশিনঘর। একপাশে কয়লা রাখা থাকত। ফায়ারম্যান কয়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত মেশিনে। জাহাজের এই ফায়ারম্যান নিয়ে আমি একটি গল্প লিখেছিলাম। 'ফায়ারম্যান' গল্পটি কলকাতার 'মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়েছিল।

৪. ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ

ঢাকায় এসে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হলাম আইএতে। তখন ভর্তির ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি ছিল না। থাকলেও আমি তো ছাত্র মোটামুটি ভালো ছিলাম। সুতরাং ভর্তি হতে বেগ পেতে হত না। মেডিকেল কলেজের মূল বিল্ডিং যেটি এখন, সেটি তখন দোতলা ছিল। তখন এটি ছিল এ্যাডমিনিসট্রেটিভ বিল্ডিং। পরে এটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়। কার্জন হলও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ ছিল। কার্জন হলের বিপরীত দিকের বিল্ডিংটি ছিল তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ে এটি তৈরি হয়। সেখানে শুধু আই এ, আই এস সি এবং আই কম পড়ানো হত।

ঢাকায় তখন তিনটি মাত্র কলেজ ছিল : জগন্নাথ কলেজ, গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট কলেজ আর সলিমুল্লাহ কলেজ। জগন্নাথ কলেজে হিন্দু ছেলেদের সংখ্যা ছিল বেশি। ভালো ফল তারাই করত। যেটা এখন ফজলুল হক হল, সেটা ছিল ইন্টারমিডিয়েট কলেজের হোস্টেল। আমি এখানে থাকতাম। এর একদিকে হিন্দু ছেলেরা থাকত, অন্যদিকে মুসলিম ছেলেরা। কখনো মারামারি হয়নি তাদের মধ্যে। দায়িত্বে নিয়োজিত সুপারিন্টেডেন্ট শিক্ষক দুজনেই খুব ভালো ছিলেন।

ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন সময়ে আমার পেছনে একটি গ্রুপ দাঁড়িয়ে যায়। যাকে বলা যায় 'জাতীয়তাবাদী' অর্থাৎ নন-মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের সাথে আমাদের কোনো প্রকার হৃদ্যতা ছিল না। এ সময়ে আমি পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' উপন্যাসটি পড়ি এক রাতে। এরও একটা অবদান আছে আমার চরিত্র গঠনে। এ সময়ে মোজাম্মেল হকের সাথে আমার যোগাযোগ কমে যায়। সে থাকে বরিশালে, আমি ঢাকায়। তবে তাদের সংগঠন ঢাকায়ও ছিল। মোজাম্মেল ঢাকায় এলে আমার সাথে দেখা করত।

আমি কোনো ছাত্র আন্দোলন করিনি, তথাপি আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম এর সাথে। কমিউনিস্টরা চেষ্টা করত মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে ঢোকার। ঢাকায় আসার পরপরই ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট যে গ্রুপটা, তারা আমাকে পিক আপ করল। আমি একা নই, সৈয়দ নুরুদ্দীন, সানাউল হক এরাও ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সঙ্গে। ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে আরো ছিলেন নাজমুল করিমের ছোটভাই লুৎফুল করিম, মো. আবুল কাসেম। যিনি ভূগোল আর ইংরেজি উভয় বিষয়ে এম. এ.। এখন তেজগাঁ কলেজের অধ্যাপক। এবং হিসামুদ্দিন—তিনি অবশ্য একটু সিনিয়র আমাদের চেয়ে। সম্প্রতি প্রয়াত।

ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় আমি যতটা না কমিউনিস্ট, তার চেয়ে বেশি জাতীয়তাবাদী ছিলাম। আমি আর আমার গ্রুপের বন্ধুরা মিলে তখন হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছি। আমি হলে কিংবা হোস্টেলে গিয়ে নিজে ব্যক্তিগত লাইব্রেরি দাঁড় করিয়েছি। আমি ভেবেছি আমার বন্ধুরা কেমন করে তাদের অবসর সময় কাটাবে। তারা এসে আমার ঘর থেকে নিজেরা বই নিয়ে গেছে। নাম লিখে রেখে গেছে—'আমি বই নিলাম'। আবার সেই বই ফেরত দিয়ে গেছে পড়া হয়ে গেলে। সারারাত জেগে আমরা তখন পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' পড়েছি বা পড়েছি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী।'

উভয় বাংলার সব কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে ছিল। কিন্তু ঢাকা শহরের কলেজগুলো ছিল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এন্ড ইন্টারমিডিয়েট এ্যাডুকেশনের আন্ডারে। ঢাকা বোর্ড ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিডার অর্থাৎ এখান থেকে ছাত্ররা বের হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। ঢাকা বোর্ডে ইন্টারমিডিয়েটে আমি দ্বিতীয় হয়েছিলাম। কোনো মুসলমান ছাত্র এ রকম রেজাল্ট করেনি এর আগে। সাধারণত জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররাই তখন প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করত। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের এসব স্থানে দেখা যেত না। মুসলমান ছাত্রদের তো নয়ই। আমি অবশ্য প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়ার জন্যে লেখাপড়া করতাম না কখনো। ভালো ছাত্রদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। আমার সম্পর্ক ছিল ব্যাকবেঞ্চারদের সাথে। পেছন থেকে এসে তারা আমাকে টেনে নিয়ে যেত তাদের কাছে। বলত, 'তোর জায়গা তো এখানে না। এখানে বসবে সৈয়দ আলী আশরাফ (সৈয়দ আলী আহসানের ভাই)। ওরা তো গুড বয়। তুই তো গুড বয় না। তুই ব্যাড বয়। তুই আমাদের সাথে থাকবি। আর আমাদের পড়াবি তুই'। ক্লাসের এ মাথা থেকে ও মাথা সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। আমি কোনো ছুটিতে আমার নিজের বাড়িতে যেতাম না। বন্ধুদের বাড়িতে যেতাম। নাসিরুদ্দীনের সাথে চলে যেতাম তার বাবার কাছে চাঁদপুরে। তিনি তখন ওখানকার এস ডি ও। নাসিরুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন আর রশিদুদ্দীন এরা তিন ভাই ছিল। রশিদুদ্দীন এখন ঢাকার একজন বড় সার্জন। জহুরা মার্কেটে বসেন। তাদের ছোট বোন ফরিদা বানু বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। কিংবা যেতাম নূরুল ইসলাম চৌধুরীর বাড়ি রাজশাহীতে। বাড়ির ওপর কোনো টান ছিল না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার। বাড়ির লোকরা অবশ্য খবর পেত যে তাদের 'করিম' খুব পরিচিত, তাকে সবাই খুব ভালবাসে।

ইন্টারমিডিয়েটে দ্বিতীয় হওয়ার পর আমার ইংরেজির অধ্যাপক আমাকে সাথে করে ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। সবাইকে বলেছিলেন, 'দেখো, একে কিন্তু আমি আবিষ্কার করেছি'। আমার এক শিক্ষক ছিলেন পি সি চক্রবর্তী। তিনি দাঙ্গায় মারা গিয়েছিলেন। তাঁকে স্মরণে পড়ে। কী সুন্দর লোক! গলাবন্ধ কোট পরতেন, ময়মনসিংহের টানা-টানা ভাষায় কথা বলতেন। আমি একদিন গিয়ে রসিকতা করে বললাম, 'স্যার আমি এত কম নম্বর পাইছি কেন? অজিত (অজিত দে, এইচ এল দে'র ছেলে) এত বেশি নম্বর পাইল কেন?' উনি তখন আমাকে বললেন, 'তুমি কি মুখস্থ কর?' আমি বললাম, 'না স্যার আমি মুখস্থ করতে পারি না।' উনি উত্তর দিলেন, 'মুখস্থ কর। মুখস্থ না করিলে ভালো নম্বর পাইবা না।' ভালো ভালো বই মুখস্থ করলে ঐ সব বাক্য লেখার সময় মাথায় আসে—এটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি ইন্টারমিডিয়েটে আমাদের ইতিহাস পড়াতেন। ৪২ এর দিকে দাঙ্গায় তিনি নিহত হন। দাঙ্গা মানে ছুরি মারামারি আরকি। প্রায়ই হত এ রকম ঢাকা শহরে। লোকজন দলে দলে লাঠিসোটা নিয়ে বের হয়ে দাঙ্গা শুরু করত, তা কিন্তু নয়।

AMARBOI.COM

৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

যুদ্ধের খবর আমরা নিয়মিতই পেতাম। তখনো রেডিও তেমনভাবে চালু হয়নি, মাত্র চালু হয়েছে। ছাত্ররা দাবি করছে হোস্টেলে একটি করে রেডিও পাবার জন্যে। পত্রিকাগুলো যেমন, আনন্দবাজার, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, এ্যাডভান্স (ইত্তেহাদ বোধ হয় আর একটু পরে হয়েছে) ইত্যাদি কলকাতা থেকে সকাল বেলায় রওয়ানা হত। কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত ট্রেন সার্ভিস। গোয়ালন্দ থেকে কানেকটিং স্টিমার সার্ভিস ছিল নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত। বিকেল চারটা-পাঁচটার মধ্যে পত্রিকা নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে যেত। তারপর নারায়ণগঞ্জ থেকে আবার ট্রেনে করে ঢাকায় আসত। সুতরাং যুদ্ধের প্রায় তাজা খবরই আমরা পেতাম।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ঢাকা আন্তর্জাতিক নগরীতে পরিণত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। এই ব্যাপারটা আমার মনে করতে ভালো লাগে। ঢাকায় যখন আমি তরুণদের সঙ্গে কথা বলি তখন আমি এ সময়টার কথা বলি তাদের। বলি এ জন্যে যে, মুসলমান সমাজের মধ্যে এসব কথা বলার মতো পুরোনো লোক আর নেই। হিন্দু যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহত হয়েছেন বা ওপারে চলে গিয়েছেন। সেজন্যে বর্তমান প্রজন্মকে আমি এটা জানানোর চেষ্টা করি যে আমাদের একটা সুন্দর সময় ছিল। আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো মনে করে যে, আমাদের সময়ে শুধু দাঙ্গাই হয়েছে। না, আমাদের সময়ে শুধু দাঙ্গাই হয়নি। দাঙ্গা অবশ্যই এখানে হয়েছে, কিন্তু এর বাইরে অন্য অনেক কিছুই করেছি আমরা।

ঢাকা ছিল যুদ্ধের সময়ে একটি পশ্চাৎ ঘাঁটি। এখন যেখানে ক্যান্টনমেন্ট সেখানে পুরো জায়গাটায় সৈন্যরা ছড়িয়ে ছিল। ধরা যাক, কোনো সৈন্য ফ্রন্টে গেল। সেখানে যুদ্ধে আহত হওয়ার পর এসব সৈন্যকে চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হত ঢাকায়। এখন যেটা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল তখন সে বিল্ডিংটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সে বিল্ডিং-এর পুরোটা এবং সলিমুল্লাহ হল মিলিটারিরা দখল করে নেয়। শুধু ফজলুল হক হলটা তারা দখল করেনি।

এই সব সৈন্যদের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ক্যাডাররা ছিলেন। অনেকের নাম এখনো মনে করতে পারি। এক মিলিটারি অফিসারের নাম ছিল রাপাপোর্ট। আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। নামকরা অধ্যাপক। কিন্তু তখন যুদ্ধে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক বলে তাঁকেও যুদ্ধ করতে আসতে হয়েছে এশিয়ায়। স্প্রিঙ্গার নামে একজন যুব কমিউনিস্ট ক্যাডার ছিলেন। আরেক জন ব্রিটিশ কমিউনিস্টের নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। হয়তো বা ক্লাইভ ব্র্যানসন। বার্মা ফ্রন্টে তিনি মারা গেছেন। তিনি কবি ছিলেন। তাঁর লেখা কবিতা আছে, কবিতা অনুবাদও করা হয়েছে।

সাধারণ সৈন্যরা ঢাকায় এসেই নিষিদ্ধ পল্লীর খোঁজ করত। ইসলামপুর বা আশপাশের এলাকায় মিলিটারি এ্যাডমিনিসট্রেশন 'আউট অব বাউন্ড' লেখা বোর্ড টাঙিয়ে দিত। আউট অব বাউন্ড ফর দি আর্মি। আর্মি পারসনেরা এখানে যেতে পারত না। তবুও যেত অবশ্য অনেকেই। যেত এবং ধরাও পড়ত। কিন্তু স্প্রিঙ্গার, রাপাপোর্টের মতো সৈন্যরা, মানে কমিউনিস্টরা খুঁজত, ভালো মানুষ কোথায় আছে। ভালো মানুষ পাবার একটি জায়গা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন হল বা হোস্টেল থেকে তাঁরা লোকজন খুঁজে খুঁজে বের করত। কমিউনিস্টদের একটি সিম্বল তো ছিলই : মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত। এটা একটা আন্তর্জাতিক সিম্বল ছিল তখন। এর মানে আমিও একজন। আমি 'তোমাদেরই লোক'।

এ সময়টার খুব সুন্দর সুন্দর স্মৃতি আছে আমার। ফজলুল হক হল আর ঢাকা হলের মাঝখানে যে পুকুরটা এবং তার যে বাঁধানো সিঁড়ি, ওখানে আমরা আড্ডা মারতাম সৈন্যদের সাথে। আড্ডাটা আমাদের অজান্তেই 'ইন্টারন্যাশনাল' হয়ে যেত। চীনে তখন যুদ্ধ চলছে কুওমিনটাং এর সঙ্গে কমিউনিস্টদের। চুং কিং ছিল তখন চীন সরকারের হেড কোয়ার্টার। একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমান-সেনা হয়তো সকালে বিমানে করে উড়ে গিয়ে যুদ্ধ করে এসেছে চীনে। সেই সৈন্যই হয়তো বিকাল বেলা চা খেতে খেতে আমাদের সঙ্গে গল্প করছে সেই পুকুরঘাটে : 'ডু ইউ নো আই ফ্লিউ টুডে টু চুং কিং?' সে চুং কিং এয়ারপোর্টে নেমেছে, সেখানেও কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক করার চেষ্টা করেছে। মাও সে তুং বা অন্যদের নাম উচ্চারণ করেছে। ওখানকার কমিউনিস্টরা হয়তো তখন তাকে বলেছে, 'ডোন্ট টক, ডেঞ্জারাস!' এভাবেই আমাদের কিছুটা আন্তর্জাতিকীকরণ হয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধ চলছে তখন। ১৯৪২ সালের কথা। আমরা তখন ফজলুল হক হলে থাকি। ফজলুল হক হলের করিডোরের সিঁড়িঘরে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল আলোচনা হত। সানাউল হক, সৈয়দ নুরুদ্দীন এঁরা সে আলোচনায় আমার সঙ্গী ছিলেন। পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন আলোচনা করতাম আমরা। এখন যেটা গুলিস্তান সিনেমা হল তখন সেটার নাম ছিল গুলিস্তান বিল্ডিং। এই গুলিস্তান বিল্ডিং-এ ডি এন ফা বলে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। ডি এন ফার বিপরীতে একটি সিনেমা হল ছিল। হলটির নাম ছিল ব্রিটানিকা। সে যুগে ঢাকার একমাত্র ইংলিশ সিনেমা হল। সৈন্যরা আমাদের নিয়ে যেত সেই রেস্টুরেন্টে। শত শত সৈন্য নয়, কিছু কিছু আরকি! বেশি বেশি খাবারের অর্ডার দিত। অত খাবার খাওয়া যেত না। বাকি খাবার সৈন্যরা আমাদের পকেটে ঢুকিয়ে দিত। আমরা রাজি হতাম না। কিন্তু তারা বলত, 'ইউ নিড ইট, ইউ নিড ইট'।

এই সখ্য থেকে একবার একটা ঘটনা ঘটল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সামনে এখন যে ওভার ব্রিজটা আছে তার পাশে জি ঘোষের লেন বলে একটা লেন আছে। সেখানে একটি বাসায় থাকত কয়েকজন কমিউনিস্ট। বাসাটির নাম দিয়েছিল তারা 'কমিউন'। কমিউন হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে সবাই একসাথে থাকে, এক সাথে খায়। আলাদা কোনো ব্যাপার নেই। আমেরিকান সৈন্যরা একবার দেখতে চাইল, আমরা কীভাবে পাঁচ আঙুল ব্যবহার করে খাই। সৈন্যরা বলল তারাও চামচ ব্যবহার না করে হাত দিয়ে খাবে। কমিউনে দাওয়াত করা হল সেই সব সৈন্যদের। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন চলছে যখন, তখন হঠাৎ কোথা থেকে মিলিটারি পুলিশ এসে ঐ সৈন্যদের ধরে নিয়ে গেল। তাদের শাস্তি কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছিল। মিলিটারি কর্তৃপক্ষ পছন্দ করত না সৈন্যরা সাধারণ লোকজনের সাথে, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সাথে মিশুক। তবুও সখ্যটা তো ছিলই। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে পরিচয় দেওয়া, বিদায় নেওয়া, স্যালুট দেওয়া, একে অপরকে কমরেড বলা, এসব এখন আর দেখা যায় না, কিন্তু তখন বেশ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার অধ্যাপক রাপাপোর্ট এসে আমাদের বললেন, 'হোয়েয়ার ইজ ইয়োর বোস?' বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের নাম তিনি শুনেছেন। কতখানি শুনেছেন আমি জানি না। কিন্তু তিনি এসে অধ্যাপক বোসের খোঁজ করলেন এবং জানালেন যে বোসের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। আমরা তাঁকে নিয়ে গেলাম অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে। তিনি তখন বসতেন কার্জন হলের পশ্চিম সাইডের একটা ঘরে। ঘরটা এখন আছে। সত্যেন বোস একটা রোমান্টিক ক্যারেক্টার। চেহারাটাই রোমান্টিক ছিল তাঁর। দিন দুনিয়া বোঝেন না তিনি। সাম্প্রদায়িক কোনো ভাব তাঁর মনে ছিল না। মুসলমান ছেলেদের কাছে আসতে তিনি কোনো দ্বিধা করতেন না। ছেলেরা বলত, অন্য কেউ কম্যুনাল হতে পারে, সত্যেন বোস কিছুতেই কম্যুনাল হতে পারেন না। কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন, তাঁর লেখা পড়ে সত্যেন বোস সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, 'দেখো দেখো, আমার ছেলে এ রকম বাংলা লিখেছে। তোমরা কেউ কি এ রকম বাংলা লিখতে পারো?' তখন তিনি কলকাতায় খয়রা প্রফেসর।

সত্যেন বোস সব সময় কাজে ডুবে থাকতেন। কেউ গিয়ে না ডাকলে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরি থেকে বাসায় খেতে আসতেন না। খাওয়ার কথা মনেই থাকত না তাঁর অনেক গল্প আছে তাঁর সম্পর্কে। সত্যেন বোস একবার মেয়েকে নিয়ে মুকুল সিনেমায় গেছেন ছবি দেখতে। টিকেট কিনতে গিয়ে দেখলেন যে মানিব্যাগটা তাঁর পকেটে নেই। মানিব্যাগ ফেলে গিয়েছেন তিনি বাড়িতে। তিনি মেয়েকে বললেন, 'মা তুই এখানে বোস। আমি বাড়ি থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে আসি।' এখন যেখানে খন্দকার মোকররম হোসেন লাইব্রেরিটা, সেখানে একটা চাইনিজ প্যাটার্নের বাড়িতে তিনি থাকতেন। তখন যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছিল ঘোড়ার গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে করে বাড়ি ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে নিজের মানিব্যাগটা নিতে যাবেন, এমন সময় টেবিলের উপরে পড়ে থাকা একটি আনসলভড প্রব্লেমের দিকে নজর গেল তাঁর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল সেটা সমাধান করতে। মেয়েকে যে সিনেমা হলে বসিয়ে রেখে এসেছেন তা তিনি ভুলেই গিয়েছেন। অনেকক্ষণ পর গাড়োয়ান সাহস করে বলল, 'হুজুর, আপনি যাবেন না? আপনার মেয়েকে আপনি সিনেমা হলে বসিয়ে রেখে এসেছেন।' তখন তাঁর খেয়াল হল। 'ও, তাই তো! মেয়েকে সিনেমা হলে রেখে এসেছি, চলো চলো।' সিনেমা হলের কর্মচারীরা অবশ্য তাঁর মেয়েকে আগেই সিটে বসিয়ে দিয়েছিল। সত্যেন বোস যাবার পর তারা বলল, 'সিনেমা তো এখনি শেষ হয়ে যাবে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।' এ রকম মনভোলা লোক ছিলেন সত্যেন বোস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. কমিউনিস্ট পার্টির নীতি পরিবর্তন

১৯৪১ সালের আগে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ-ভারতে বেআইনি ছিল। ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আক্রান্ত হল তখন কমিউনিস্ট পার্টি আইনসঙ্গত হল। আগে কমিউনিস্টদের নীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। কিন্তু হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করল তখন তারা নীতি পাল্টাতে বাধ্য হল। কমিউনিস্টরা দেখল, যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিই পালটে গেছে তখন। ফ্রান্স ততদিনে দখল হয়ে গেছে। যে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড সোভিয়েত রাশিয়াকে তার জন্মকালে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে, এক সময় দখল করারও চেষ্টা করেছে, তারা এখন রাশিয়ার মিত্রশক্তি। সুতরাং আগে যেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখন সেটা হয়ে গেছে পিপলস্ ওয়ার। কমিউনিস্টরা ভাবল, পিপলের যেটা আসল দুর্গ সেই সোভিয়েত ইউনিয়নই যদি হিটলারের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে আমরাও ধ্বংস হয়ে যাবো। সুতরাং তারা তখনকার মতো ব্রিটিশদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত রইল, কারণ আমেরিকান আর ব্রিটিশরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগী শক্তি বা এ্যালাইড ফোর্স। আন্তর্জাতিকভাবেই কমিউনিস্টেরা ঘোষণা করল যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা আপাতত স্থগিত থাকবে। তাদের বর্তমান রাজনীতি হবে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী। ভারতবর্ষে জেলখানাতেই কমিউনিস্টরা তাদের নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল।

এ অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী অংশ মনে করল, কমিউনিস্টরা হচ্ছে ব্রিটিশের দালাল। তারা ভাবছে, ব্রিটিশদের এখনি তাড়াতে হবে। যারা তা করবে না তারা সবাই ব্রিটিশদের দালাল। পি সি যোশী সে সময়ের একজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা। পি সি যোশীর মতো বড় বড় কমিউনিস্ট নেতারা শুধু যে সংগ্রামের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন সে সময় তা নয়, তাঁরা মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান আন্দোলন'কে একেবারে খারিজ করে দিলেন না।

সোমেন চন্দ*

কমিউনিস্টদের সঙ্গে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড, E.S.P.I ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী দলগুলোর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘাতের পরিণতিতে ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ সোমেন চন্দ খুন হয়। সোমেন চন্দ একটা সম্ভাবনাময় তরুণ সাহিত্যিক। তখন তার বয়স মাত্র ২০ বছর। সে মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের

---

* সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ভারতের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেনের স্মৃতিকথা : পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র ছিল আবার সাথে সাথে ফুলবাড়িয়া স্টেশনের ওয়ার্কশপের শ্রমিক কর্মীও ছিল। কর্মী শুধু নয়, সবার অত্যন্ত প্রিয় কর্মী ছিল সে।

সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে একটি এ্যান্টিফ্যাসিস্ট কনফারেন্স হচ্ছিল ঢাকার এক্রামপুরে। এই কনফারেন্সে বঙ্কিম মুখার্জী ও অন্যান্য সমস্ত নেতা কলকাতা থেকে এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সোমেন তার সঙ্গী বন্ধুদের নিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল সেই কনফারেন্সের দিকে। এর আগে নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল হয়েছে ঐ কনফারেন্সের মঞ্চে; বিরুদ্ধপক্ষ মঞ্চ দখল করার চেষ্টা করে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তারা ফিরে গিয়ে সোমেনের মিছিলকে আক্রমণ করল। মিছিলের অন্য সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সোমেনকে তুলে একটা গলির ভিতর নিয়ে যায় তারা এবং সেখানে ছুরি মেরে ওর চোখ-টোখ উপড়ে ফেলে। কে সোমেনকে খুন করেছে তা জানা যায়নি। আর এসপি স্বীকার করতে চায়নি। কিন্তু অন্যেরা মানে কমিউনিস্টরা বলে, তাকে ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি এই সমস্ত অর্থাৎ কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের কর্মীরা সোমেন চন্দকে খুন করেছিল। ফরোয়ার্ড ব্লক তখন কংগ্রেসের অন্তর্গত অন্য সব পার্টির মতোই ছিল।

এটা খুব সাংঘাতিক একটা ঘটনা সে সময়ের। গোপাল হালদার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এরা সবাই অর্থাৎ এমন কেউ ছিল না যে এ ঘটনায় মর্মাহত না হয়েছিল। আমার তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলছে। এই ঘটনাটি আমি সরাসরি দেখিনি, তবে পরে যখন শুনেছি সোমেনের এই আত্মাহুতির কথা তখন খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করেছি। পরবর্তীকালে যখন প্রগতি লেখক সঙ্ঘে যাতায়াত করেছি, যখন সোমেন চন্দ দিবস পালন করেছি, তখন এ সমস্ত কাহিনী এসেছে। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সোমেন চন্দের একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেছিল। অশোক মিত্র আই সি এস সোমেন চন্দের একটি গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এর মধ্যে একটি গল্পের নাম 'ইঁদুর' (mice)। এই 'ইঁদুর' গল্পে এক মধ্যবিত্ত যুবক তার পারিবারিক কাহিনী বলছে। এই কাহিনীর মধ্যেও এসে যাচ্ছে জীবনের বিভিন্ন দিক এবং দাঙ্গা। সোমেন কিংবা তার গল্পের নায়ক রাস্তা পার হতে গিয়ে দেখছে রাস্তার উপর রক্তের স্তূপ জমে আছে। কোনো নিরীহ ব্যক্তিকে কে বা কারা মেরে ফেলেছে। ছেলেটি ভাবছে, এই রক্ত কবে নিঃশেষ হবে!

৭. মুসলিম ছাত্রদের মেরুকরণ

গঙ্গাধর অধিকারী জি অধিকারী এ সময়ে একটি পুস্তিকা লেখেন : 'পাকিস্তান এন্ড দি কোশ্চেন অব সেল্ফ ডিটারমিনিশেন অব দি মাইনরিটিস'। অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানেরাই একমাত্র মাইনরিটি নয়, আরো মাইনরিটি আছে ভারতে। ভারতবর্ষে একটা পাকিস্তান নয়, দৃশটা পাকিস্তান দরকার। পাকিস্তানপন্থীরা তখন আবুল কালাম আজাদ, হুমায়ুন কবির প্রমুখ জাতীয়তাবাদীদের গালাগালি করছে মুসলিম কমিউনিটির বিদ্রোহী হিসেবে। হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সটারনাল পরীক্ষক হিসেবে আসতেন, দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্যের বাসায় থাকতেন। সেখান থেকে তিনি পরীক্ষা নিতেন।

মুসলিম লীগের আবুল হাশেম সাহেব এসেছিলেন একটি জাতীয়তাবাদী পরিবার থেকে। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের একটা বিশেষ ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। তাঁর ব্যাখ্যাটা কিছু পরিমাণে সোসালিস্ট। সুতরাং মুসলিম লীগের মধ্যে দুটি উপবিভাগ দাঁড়িয়ে গেল। একটি দল ডানপন্থী আর একটি দল প্রগতিবাদী। মুসলিমদের মধ্যে যারা প্রগতিবাদী, কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের পক্ষ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। পার্টি থেকে সদস্যদের কাছে গোপন নির্দেশ আসত, 'অমুক প্রগতিবাদী, তুমি ওর কাছাকাছি থেকো। যদি কোনো ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসো।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু যোগাযোগ হয়। হিসাম উদ্দীন আহমদ যিনি পরবর্তীকালে বগুড়া কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন, এখন তো তিনি আমার চেয়ে বেশি বয়স হয়ে গেছে, ওঁরও এ ধরনের স্মৃতি থাকবে। রবি গুহেরও আছে এসব স্মৃতি। রবি গুহ তার লেখায় নাজমুল করিমের খুব প্রশংসা করেছেন। রবি গুহের সপ্রশংস সব চিঠি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত **নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থে** পাওয়া যাবে। এ সব সূত্র একটির সাথে অন্যটি জোড়া দিলে আপনারা একটি ডেভেলপমেন্ট পাবেন তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির। তখন আপনারা দেখবেন, মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র মুসলিম দল হিসেবে ডেভেলপ করেনি। আবুল হাশেমও খাঁটি মুসলিম লীগার ছিলেন না। ছাত্র ফেডারেশন ছিল কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন।

ঢাকা কলেজ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থানগত দূরত্ব বেশি ছিল না। তেমন আলাদাও ছিল না এ দুটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে আমাদের পরিচয় ছিল। যাতায়াতটাও ছিল। একই রাস্তা তো। আমার বন্ধুবান্ধব, যেমন নাজমুল করিমের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। নাজমুল করিমের এক বন্ধু রবি গুহ। রবি গুহ, নাজমুল করিম আর আমি খুবই মার্কড ছিলাম। মুসলিম লীগ যখন থেকে সংগঠিত হতে শুরু করল তখন থেকেই আমরা তিনজন হয়ে দাঁড়ালাম তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ পাকিস্তানি পক্ষের আক্রমণের লক্ষ্য। মুসলিম লীগের মধ্যে খুব গোঁড়া যাঁরা যেমন, শাহ আজিজুর রহমান কিংবা সালেক বলে একজন ছিল, 'দে মেইড আস দেয়ার টার্গেট অব এ্যাটাক।' আমাদের তারা বলত 'হকপন্থী' অর্থাৎ আমরা শেরেবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের সমর্থক।

এ সময়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল। যে সময়ের কথা বলছি তখন ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাথে মিলিত হয়ে একটা সরকার গঠন করেছেন। এই সরকারের পেছনে ঢাকার নবাব বাড়ির সমর্থন ছিল। নবাব সলিমুল্লাহ এবং ঢাকার সরদাররা ছিল শ্যামা-হক সরকারের সমর্থক। ফজলুল হক সাহেব একবার ঠিক করলেন যে তিনি ঢাকায় আসবেন। এটা শুনে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট হোস্টেল, ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল : ইত্যাদিতে যেসব মুসলিম লীগের ছেলেরা থাকত তারা ঠিক করল হক সাহেবকে তারা বিরূপ সংবর্ধনা দেবে। ফুলবাড়িয়া স্টেশনে ওরা ঐভাবে অরগানাইজড হল। আর এদিকে নবাব হাবিবুল্লাহ এবং তাঁর অনুগামীরাও অর্থাৎ ঢাকা সিটির যত সরদার, যত স্থানীয় লোক ছিল সবাই একজোট হল। আমরা যারা নিরীহ, মানে আমি সরদার ফজলুল করিম, মোহাম্মদ কাসেম যে এখন তেজগাঁও কলেজের অধ্যাপক, নাজমুল করিমের ছোটভাই লুৎফুল করিম অর্থাৎ আমরা প্রগতিবাদীরা এই দ্বিতীয় গ্রুপটির সঙ্গে থাকব বলে স্থির করলাম।

আমি আমার গ্রুপের মুখপাত্রের মতো ছিলাম, একটু লিডারগিরি করতাম। লিডারশিপ অবশ্য শুরু হয় আরো অনেক আগে থেকে। একবার আমার গ্রুপের সব ছেলে মিলে সারারাত মুকুল সিনেমায় গিয়ে সিনেমা দেখেছি, ভালো ভালো সব সিনেমা—মুক্তি, দেশের মাটি ইত্যাদি। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট এর জন্যে আমাদের শাস্তি দিয়েছেন। ছেলেদের যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমাদের বলেছে যে তোমাদের পারমিশন আছে সিনেমা দেখার?' ছেলেরা তখন উত্তর দিয়েছে, 'সরদার বলেছে'। আমাকেই সরদার বানিয়েছে তারা। এই সরদারিটা আমি ভালোই এনজয় করেছি। সাময়িক পত্রিকা, হাতে লেখা ম্যাগাজিন এসব বের করেছি। আমাদের গ্রুপটা ছিল জাতীয়তাবাদী এবং হকপন্থী। একবার আমাদের গ্রুপের কিছু ছেলেকে সুপারিনটেনডেন্ট হল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। তখন হক সাহেবের মন্ত্রীসভা ক্ষমতায়। আমরা হক সাহেবের কাছে পিটিশান পাঠিয়ে দিলাম এই মর্মে যে, আমরা হক-পন্থী বলে অর্থাৎ আমরা আপনাকে সাপোর্ট করি বলে আমাদের এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ রকম সব ব্যাপার-স্যাপার ছিল তখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট কলেজের হোস্টেলে বসে কথা বলছি তখন মুসলিম লীগের গ্রুপটা এসে আমাদের বলল, 'অমুক তারিখে আমরা ফুলবাড়িয়া স্টেশনে ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে ডেমনেস্ট্রেশন দিতে যাবো। তোমরা সেদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে।' আমি আমাদের গ্রুপের মুখপাত্র হিসেবে তাদের বললাম, 'আমরা যাব কি যাব না, তার সিদ্ধান্ত আমরা নেবো। তোমাদের মতামত আমরা শুনলাম, ঠিক আছে।' এটা শুনে ওরা খুব ক্ষেপে গেল আমাদের উপর।

হক সাহেব আসেননি সেবার, নবাব হাবিবুল্লাহ এসেছিলেন কলকাতা থেকে। একটা মারামারি হয়েছিল সেদিন দুই পক্ষের মধ্যে ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুমের সামনে, যেখানে এসে রেলগাড়ির কম্পার্টমেন্টগুলো দাঁড়াত সেখানে। ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট হোস্টেলের মুসলিম লীগপন্থী ছেলেরা সবাই ফুলবাড়িয়া স্টেশনে লুকিয়ে ছিল এই ভেবে যে হক সাহেব বা নবাব হাবিবুল্লাহ যেই ট্রেনে করে এসে প্ল্যাটফর্মে নামবে অমনি তারা তাদের উপর হামলা করবে। কিন্তু মুসলিম লীগারদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি সেদিন। নবাববাড়ির পক্ষের লোকেরা অর্থাৎ সব সরদার আর স্থানীয় লোকেরা মিলে বেদম পিটালো মুসলিম লীগপন্থীদের। পিটুনি খেয়ে ওরা নিজ নিজ হলে ফিরে গিয়ে ওরা আবার সেখানে যাদের যাদের হকপন্থী বলে মনে করত তাদের উপর হামলা করল। নাজমুল করিমের বিছানাপত্র সব উপর থেকে নিচে ফেলে দিল, ডাইনিং হলে আমার খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিল। যদি আমি ডাইনিং-এ খেতে আসি তবে আমাকে চোখা বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে মারবেটারবে বলে হুমকি দিল। আমার কলেজে যাওয়াও বোধ হয় বন্ধ করে দেয় তারা। আমার তখন ফাইনাল পরীক্ষা। আমি হোস্টেল ছেড়ে আমার বড় ভাইয়ের কাছে চলে গেলাম।

আমার বড় ভাই মঞ্জে আলী তখন ঝালকাঠির কাছে নলছিটির সাবরেজিস্ট্রার। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক মনোভাবের ছিলেন। হুমায়ুন কবীরের প্রশংসা তিনি কখনো করেননি। তিনি বরং জিন্না সাহেবের প্রশংসা করতেন। তবুও বড় ভাই যখন ঢাকায় আসতেন তখন তিনি এটা দেখে মোহিত হতেন যে, ছেলেপিলেরা তাঁর ভাইয়ের বেশ প্রশংসা করে। ওরা বলত, 'ও! আপনি সরদারের ভাই!' বলে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করত। এটা তাঁর খুব ভালো লাগত। কিন্তু ইতোমধ্যে ঢাকার ঘটনাটা তাঁর কানে গেছে এবং আমার সম্পর্কে তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা শুরু করেছেন। আমাকে দেখে বড় ভাই একটু এ্যাগ্রেসিভ টোনে বললেন, 'তুমি দুই কলম ইংরেজি শিইখ্যা খুব মাতব্বর অইয়া গেছো, হুমায়ুন কবিরের দলে যোগ দিছো!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন কবির তখন বিখ্যাত। বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন তিনি, হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছেন, শ্রমিক আন্দোলনের হুমায়ুন কবিরের বিরোধী পক্ষ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

১৯৪১-৪২ সালে মুসলিম লীগ ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে। পাকিস্তান আন্দোলন দানা বাঁধছে। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মুসলিম লীগ খুব জোরদার হয়ে গেল এমন নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. মজহারুল হক আর ফজলুর রহমান—এই দুজনে 'পাকিস্তান' নামে একটি বাংলা পত্রিকা বের করতেন এ সময়। ফজলুর রহমান সাহেবের সাথে আমি ৫৫/৫৬ সালে পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির সদস্য ছিলাম। সেটা অবশ্য আরো পরের কথা।

যেখানে কংগ্রেসের শ্লোগান ছিল 'কুইট ইন্ডিয়া', সেখানে মুসলিম লীগ ধ্বনি তুলল ডিভাইড এ্যন্ড কুইট। ১৯৪২-এ কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন জঙ্গি রূপ নিল। ব্রিটিশ সরকার সবাইকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইত্যাদি সব বড় বড় কংগ্রেস নেতাকে হায়দ্রাবাদের একটা প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখল। এদিকে বঙ্গদেশে মেদিনীপুর, তমলুক ইত্যাদি জায়গায় স্বাধীন সরকার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। জনগণ টেলিগ্রাফের খুঁটি ইত্যাদি উপড়ে ফেলছে। মহিলা নেতা মাতঙ্গিনী হাজরার কথা পাবেন আপনারা ইতিহাসে। আন্দোলন সাংঘাতিক জঙ্গি হয়ে উঠেছে। 'উত্তাল চল্লিশ' বলে একটা বইয়ে এসব আন্দোলনের কথা লেখা আছে।

AMARBOI.COM

৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪২ সালে ভর্তি হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, কেন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম? প্রধানত আমার মুরুব্বী ছিলেন আমার বড় ভাই। বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে মাস্টার্স পার্ট ওয়ান করেছেন। আগেই বলেছি, কৃষক পরিবারের ছেলে ছিলাম। অভিভাবকেরা ভাবলেন, কলকাতায় খরচ চালানো কঠিন হবে। বড় ভাইয়ের শিক্ষকেরা সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেমন ধরুন, এস এন রায়। বড় ভাই তাঁদের কাছে চিঠি লিখে দিতেন—'স্যার, আমি আমার ছোট ভাইকে পাঠালাম। আপনি একটু দেখবেন।' এই প্যাট্রোনাইজেশনটা তিনি নিজে এখানে যোগাড় করতে পারতেন। সুতরাং আমার ঢাকা আসাই স্থির হল। কলকাতায় কোন রকম ইনস্টিটিউশনাল পরিচয় আমাদের ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে প্রথমে কিছুদিন ইংরেজি বিভাগে ছিলাম। বক্তৃতা শুনলাম কিছুদিন। দেখলাম, কোন্ টিচার কী রকম বক্তৃতা দেন। এখন যেটা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল সেখানে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস হত। সব ক্লাসের পাশ দিয়ে ঘুরতাম। করিডোর দিয়ে গেলে এপাশে-ওপাশে বিভিন্ন ক্লাস দেখতে পেতাম। দর্শনের হরিদাস ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতা শুনে খুব ভালো লাগল। সাংঘাতিক বক্তৃতা। সত্য কী, মিথ্যা কী—এসব নিয়ে তিনি সেদিন আলোচনা করছিলেন। হরিদাস বাবুর কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার আমি দর্শনে ভর্তি হবো।' চলে এলাম দর্শনে। এতে অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কমল না, বরং বাড়ল।

কবি জসীম উদ্‌দীন সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। আমি দর্শনের বাইরে অন্য ক্লাসও করতাম। দেখতাম, জসীম উদ্‌দীন স্যারকে ছেলেরা টালাইতেছে। 'টালাইতেছে' মানে ছেলেরা তাঁকে একটু tease করছে বা তার সাথে পরিহাস করছে। জসীম উদ্‌দীন স্যার ভালো ইংরেজি বলতে পারতেন না। মাহমুদ হাসান সাহেব তখন সম্ভবত ভি সি। তিনি একদিন করিডোর দিয়ে যেতে যেতে জসীম উদ্‌দীন স্যারের বক্তৃতা শুনে থমকে দাঁড়ালেন এবং ক্লাসে ঢুকে স্যারকে বললেন, 'মি. জসীম উদ্‌দীন, ইউ বেটার নট গিভ লেকচার ইন ইংলিশ। স্পিক র‍্যাদার বেঙ্গলি!'

তখনকার কিছু ছেলে একটু ইয়ার্কিবাজ ছিল। পলিটিক্যাল সায়েন্সের এক তরুণ পাশ করা শিক্ষক হয়তো ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ক্লাসে ছেলেরা সেই স্যারকে বলছে, 'স্যার আপনি বরং বাংলাতেই বলেন।' সেই স্যার যখন বাংলায় বলা শুরু করলেন তখন একটু পরে তারা আবার আব্দার করা শুরু করল, 'না স্যার ইংরেজিই ভালো।' স্যার এবার ইংরেজিতে বলতে লাগলেন। পরে এক সময় ছাত্ররা আবার বলল, 'স্যার আপনি এবার সংস্কৃতে বলুন।' কোনো কোনো স্যার সোজা মানুষ ছিলেন বলেই ছেলেরা তাঁদের এ রকম টালাইতে পারত। কথাটা বললাম এ কারণে যে হরিদাস ভট্টাচার্য্য বা এস.এন. রায়ের মতো অধ্যাপকের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করা সম্ভব ছিল না। এ সব বড় বড় অধ্যাপকদের বাগ্মীতার কাছে ছেলেরা দাঁড়াতেই পারত না।

হাদী সাহেব ছিলেন দর্শনের শিক্ষক। তিনি হাউস টিউটর ছিলেন। তাঁর ইংরেজি বক্তৃতা আমি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছি রেডিওতে পড়ার জন্যে। তিনি আমাকে তাঁর বক্তৃতার ইংরেজি কপি দিয়ে বলতেন, ফজলুল করিম, আপনি দেখেন তো কিছু করতে পারেন কিনা। স্যার আমার লেখা পড়ে খুব প্রশংসা করলেন। আমাকে বললেন : 'আপনি লিখেছেন তো ভালো। কিন্তু আমি পড়লে কেউ কি বলবে যে ওটা আমার লেখা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষকরা তখন ছাত্রদের খুব দেখাশোনা করতেন। তখন ছাত্র তো খুবই কম। আমাদের দর্শন বিভাগে ছাত্র ছিল পাঁচ কি ছয় জন। তখন অনার্স ছিল তিন বছরের, এম. এ. এক বছরের। ১৯৪৫ এ আমি অনার্স শেষ করি। ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শেষ হল। ঐ যে টি এইচ খান এখনো যার নাম পাওয়া যায় বিএনপির লগে সেই টি এইচ খান আমার ক্লাসফ্রেন্ড। মিসেস আখতার ইমামও আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিলেন। উনি আমার কথা খুব মনে করেন। উনি আমাকে বলেন, 'আপনি আমাকে লেখাপড়ার ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছেন।'

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই সে সময়ে, অর্থাৎ ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দাঙ্গা হয়। সেদিনকার দাঙ্গার কারণটা ছিল এ রকম : কার্জন হলে হিন্দু ছাত্ররা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছিল। সব ছেলেমেয়েরাই গেছে সেখানে, হিন্দু ছাত্ররা যেমন গেছে, মুসলমান ছাত্ররাও গেছে। বোধ হয় মুসলমান ছেলেদের মধ্যে কেউ ইয়ার্কি করার জন্যে কিছু ফুল বা পাতা বা এ রকমের কিছু দোতলার ব্যালকনি থেকে হিন্দু মেয়েদের গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ঐ এরিয়াটা ছিল হিন্দু ছেলেদের। পাশেই ঢাকা হল। হিন্দু ছেলেরা এতে অফেন্স নেয় এবং মুসলমান ছেলেদের মধ্যে কয়েকজনকে মারধর করে। পরদিন যখন ক্লাস শুরু হয়, তখন মুসলমান ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। সেই সময় একটা মারামারি হয়। মারামারির মধ্যে নাজির আহমদ নামে একজন ছাত্র ছুরিকাহত হয়। নাজির আহমদের নামে একটি লাইব্রেরি আছে কোথাও। তখন মিডফোর্ড ছিল একমাত্র হাসপাতাল। নাজির আহমদকে মিটফোর্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। রক্তও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাকে আর বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি হয়তো আমার ভাইয়ের কাছে চলে যাই। এটা একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো হয়েছিল। সব মুসলমান ছাত্রই যে এতে অংশ নিয়েছিল তা নয় তবুও মনে পড়ে ঢাকা হলের ছেলেরা ধেয়ে আসছে আর্টস বিল্ডি-এর দিকে, আর্টস বিল্ডি-এর ছেলেরা পিছিয়ে যাচ্ছে। এ রকম ছোটখাটো দাঙ্গা বা ছুরি মারামারি প্রায়ই হত ঢাকা শহরে। তবে লোকজন যে দলে দলে লাঠিসোটা নিয়ে বের হয়ে দাঙ্গা শুরু করত তা কিন্তু নয়।

৯. '৪৩-এর মন্বন্তর

১৯৪৩ সালটি মনে রাখা দরকার। ১৯৪৩ মানেই হচ্ছে বাংলা ১৩৫০। ১৩৫০ সালে হয়েছিল সেই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ যার নাম ৪৩-এর মন্বন্তর। এই দুর্ভিক্ষটা আমাদের প্রভাবিত করে। এতে যত না কংগ্রেস কর্মী, ফরওয়ার্ড ব্লক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

R.S.P.I এরা বেরিয়ে আসে, তার চেয়ে বেশি বের হয়ে আসে কমিউনিস্ট কর্মী। যেমন পি সি যোশী, একজন দক্ষ কমিউনিস্ট নেতা। তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপরে বই লিখেছিলেন 'হু লিভস্ ইফ বেঙ্গল ডাইস?'।

আমি তখন সক্রেটিস, প্লেটো, হেগেল—এ সমস্ত নিয়ে পড়াশুনো করছি। একদিন আমার কমরেড এসে বলছে, 'তুমি কী এত লেখাপড়া করো? হেগেল তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার মা-বোনেরা যেখানে মারা যাচ্ছে সেখানে তুমি হেগেল পড়ে কী করবে?' আমি নিজেও নিজেকে প্রশ্ন করেছি, এই পাঠ দিয়ে আমি কোথায় যাব? আমাকে ওরা বলছে, 'তুমি নয়াবাজারে গিয়ে লঙ্গরখানায় ডিউটি দাও। সেখানে গিয়ে দেখ তোমার মা-বোনেরা এসে হাজির হয়েছে। তাদের তুমি খাবার বিতরণ করে দাও। তুমি সেখানে থাকলে অন্যায়-অত্যাচার কম হবে। ঐ দেখ একটা মেয়েকে ধরে পিটাচ্ছে।' সুতরাং আমি আমার হেগেলের কাছে থাকতে পারলাম না। পরদিন আমাকে যেতে হল নয়াবাজারে সিরাজদৌল্লা পার্কে। ৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় আমি বন্ধুদের সঙ্গে গ্রামেও গিয়েছি রিলিফের কাজে।

এক ঝাণ্ডায় তিন পতাকা

AMARBOI.COM

কমিউনিস্টরা লঙ্গরখানা খোলে এবং আরো বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্যে। দুর্ভিক্ষে ভূমিকা রাখার কারণে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের প্রধান তিনটি পার্টির একটিতে পরিণত হয়। ১৯৪৫-৪৬-এ নৌবাহিনীর সৈন্যরা যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন তাদের জাহাজের মাস্তুলের উপর তারা তিনটি ঝাণ্ডা বা পতাকা টাঙিয়ে দেয়। একটি হচ্ছে কংগ্রেসের পতাকা, একটি মুসলিম লীগের পতাকা, একটি কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা। কলকাতা শহরে আশি দিনব্যাপী একটি ট্রাম ধর্মঘট হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। মোহাম্মদ ইসমাইল এই ট্রাম ধর্মঘটের একজন নেতা। এই ধর্মঘট ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজের বিরুদ্ধে। পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর কোম্পানি। পুরো ট্রাম ব্যবস্থাকে আশি দিন পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হয়। অবশেষে ট্রাম কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছিল। কিছু দাবি তো অবশ্যই মেনেছিল। ট্রাম আবার চালু করার আগে দুই-তিন দিন ধরে লাইন পরিষ্কার করতে হয়েছিল; মরচে ধরে গিয়েছিল ট্রাম লাইনে। গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে বই লিখেছেন। তারাশঙ্করও লিখেছেন এ বিষয়ে। এভাবে কমিউনিস্ট পার্টি একটা পিপলস পার্টি হিসেবে গড়ে ওঠে।

ফজলুল হক হল থেকে কলাপী নামে একটি পত্রিকা বের করতাম আমরা। নূরুল ইসলাম চৌধুরী, যিনি পরে রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাগাজিনের সম্পা ক। ঐ 'কলাপী'-তে ১৩৫০ নামে আমার একটা লেখা আছে। লেখাটা অ নকটা মাসিক ডায়েরির মতো। ১৩৫০ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাসে দুর্ভিক্ষের ডেভেলপমেন্টটা এতে পাওয়া যায়।

১০. প্রগতিবাদী মুসলিম গ্রুপ

আমাকে দেখতে হবে 'এ্যাজ এ সেপারেট এ্যান্ড আইসোলেটেড এলিমেন্ট ফ্রম দি মেইন-মুসলিম কারেন্ট'। ৪৬-এর নির্বাচনে, এমনকি সিলেটের উপর যখন গণভোট হয় তখন মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন এরা সবাই অংশগ্রহণ করেছে। আমি বা আমার গ্রুপের কেউ কিন্তু তা করেনি। ঢাকাতে আমরা ছিলাম আবুল হাশেম সাহেবের কমিউনিস্ট গ্রুপের অনুগামী বা সমর্থক। এই আবুল হাশেম সাহেব বদরুদ্দীন উমরের বাবা। শামসুদ্দীন ছিল কমিউনিস্ট, একেবারে কমিউনিস্ট পার্টির লোক। তখন মুনীর চৌধুরীও আমাদের পাশে এসে গেছে।

মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী আলিগড়ের ছাত্র ছিলেন।* ১৯৪৬ এ ঢাকায় এসে ইংরেজি বিভাগে ঢুকলেন। তাঁর বাবাও ছিলেন ইংরেজির লোক। আলিগড় যাওয়ার কারণে একাডেমিক্যালি সে হয়তো একটু জুনিয়র হয়ে গেছে আমার তুলনায়। আমি যখন এম. এ. দিচ্ছি সে হয়তো তখন অনার্স দিচ্ছে। মুনীর চৌধুরী সাহিত্যিক ছিলেন। ঢাকায় কারা কারা সাহিত্যিক তা খুঁজে বের করাই ছিল আমেরিকান সৈন্যদের একটা কাজ। মুনীরকে তারা খুব পছন্দ করত। রণেশ দাশগুপ্ত বা সত্যেন সেন কীভাবে সাহিত্যিক হয়ে উঠল তা বলা মুস্কিল। তবে তাঁরা সাহিত্যিক হয়ে গেলেন এটা হচ্ছে আসল কথা। মুনীর পরবর্তীকালে জেলেও গিয়েছিল। রণেশ দাশগুপ্ত তাকে 'কবর' নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সেটা অবশ্য ভাষা আন্দোলনের পরের ঘটনা।

মুনীরের একটা পরিষ্কার পোর্ট্রেট আমাদের সামনে থাকা দরকার। মুনীর ছিল একটা সাংঘাতিক হিউমারিস্ট। আমাদের সঙ্গে যেমন, তেমনি নিজের পরিবারের মধ্যেও। খুব রসিক লোক ছিল সে। আমাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলত বাপ-মা'র সাথেও ঠিক সেভাবে মজা করে কথা বলত। মুনীর ছিল

* প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেছেন : মুনীর আসলে ১৯৪৩ সালেই ঢাকায় এসে ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস্টার স্পিকার, মাস্টার ডিবেটার। ফজলুল হক হল, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং সলিমুল্লাহ হল—এই চারটি হলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে মুনীর জড়িত থাকত। যে কোনো সাহিত্যিক ডিবেটে মুনীর একেবারে মাস্টার। ওর একটা সাইকেল ছিল। যদি একই দিনে তিনটা হলে ডিবেট থাকত তবে একটা হলে ডিবেট উইন করে আর একটা হলে যেত। আমরা সচেতনভাবে ভালবাসতাম তাকে। মুনীরের একটা বাক্য আছে তার আত্মজীবনীতে 'আমি যদি সরদারদের না চিনতাম তা হলে আমার জীবন কি হত আমি জানি না।'

আমি ব্যক্তিগতভাবে মুনীরের নাম দিয়েছিলাম king of words অর্থাৎ 'শব্দের রাজা'। গোঁড়া মুসলিম ছাত্ররা ওকে কমিউনিস্ট বলে মনে করত। কিন্তু মুনীর ওদের সঙ্গে খুব মজা করত। যদি কখনো কোনো জঙ্গিবাদী মুসলিম ছাত্র ওকে একটা কথা বলত, মুনীর অমনি ঠাট্টা করে তাকে উত্তর দিত, 'আপনারা যা কইছেন তার উপরে আর কথা হয়?' তখন ছেলেরা তার কথা বুঝতে না পেরে একে অপরকে জিজ্ঞেস করত, 'মুনীর কি আমাদের পক্ষে কইল, না বিপক্ষে কইল?' হি ওয়াজ সো কিউট। কাউকে সে ভয় পেত না।

মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে মোজাম্মেলের মতো ছেলেরা ব্যতিক্রম। মোজাম্মেল হক, আবদুল খালেক, নাজমুল করিম, সরদার ফজলুল করিম এরা সবাই ব্যতিক্রম। আবুল হাশেম সাহেব পরবর্তীকালে এভাবে স্মৃতিচারণ করেছেন : কমরেড সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী এরা সবাই আমাদের মোগলটুলীর মুসলিম লীগ অফিসে এসে আমাকে একেবারে আক্রমণই করে বসলেন এই বলে, যে আপনাকে এই কথাটার ব্যাখ্যা দিতে হবে। আমি যখন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলাম তখন সরদার ফজলুল করিম বললেন : আপনি উপমা দিবেন না। অর্থাৎ আমি যে মেসেল দিয়ে কথা বলতাম এটা তারা পছন্দ করতেন না। আমার সামনে তারা দাঁড়াতে পারতেন না।' এসব কথা তাজউদ্দীনের ডায়েরির মধ্যেই পাওয়া যাবে।

যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি, আর্মি তখনো ছিল। আর্মিতে অনেক ভালো এলিমেন্ট ছিল। ওরা প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টদেরকে বাছাই করে ব্রিটিশ যে খারাপ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যে যুক্তিযুক্ত—এ কথা নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ডিবেট করত। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ওরা আমাদের নিয়ে যেত। ডিবেট হত সেখানে, কোনো মারামারির কোনো ব্যাপার নয়, একদল থাকত ব্রিটিশের পক্ষে, আর এক দল ইন্ডিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে। ডিবেট হত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিটন হলেও। লিটন হলে ছোট্ট একটি অডিটোরিয়াম ছিল। এসবের বেশ সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো স্মৃতি আমার আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১. প্রগতি লেখক সংঘ

ঢাকা শহরে প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। এর সাথে আমার সম্পর্ক বাড়তে থাকে। প্রগতি লেখক সংঘের একজন অরগানাইজারও ছিলাম আমি। লেখক তেমনভাবে ছিলাম না অবশ্য, কিন্তু আমি এর ভলান্টিয়ার, অনুগত ছিলাম। প্রগতি লেখক সংঘের 'ক্রান্তি' নামে একটি পত্রিকা ছিল। সোমেন চন্দের ওপর একটি সংখ্যা বের করে 'ক্রান্তি' পত্রিকা। এতে আমার একটি লেখা ছিল ১৯৪৫-এর তারিখ দেওয়া। কলকাতার 'সোমেন চন্দ রচনাসমগ্র' সঙ্কলনের সম্পাদক একটি নোট দেন আমার লেখাটির নিচে : এই লেখা থেকে প্রমাণ হয় সোমেন চন্দ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অপরিচিত ছিলেন না, বিচ্ছিন্ন ছিলেন না তাদের কাছ থেকে।

এ ছাড়া যুদ্ধের সময় সোভিয়েত সাহিত্য যা আসত তার অনুবাদ করা আমার একটা হবি হয়ে দাঁড়ায়। সুন্দর সুন্দর সব গল্প। আমি নিকোলাই তিখনভের একটি গল্প অনুবাদ করেছিলাম। গল্পটির নাম 'একটি শিশুর জন্ম'। যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে গল্প। যুদ্ধ চলছে, বোমা এসে পড়ছে। এমনি সময়ে একজন মা মারা যেতে যেতে সন্তান প্রসব করছে রাস্তায়। জীবন ও মৃত্যু যে একসঙ্গে চলে এবং সোভিয়েতরা যে জীবন দিয়ে লড়াই করছে—এটা সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় এই গল্পটিতে।

আমার পার্সোনাল দৃষ্টিটা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা রুদ্ধ হতে পারেনি। জওহর লাল নেহেরুর 'গ্লিম্পসেস অব দি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' বইটা আমি বহুবার পড়েছি। আমি ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করি এখনো, 'আচ্ছা নেহেরু যদি প্রধানমন্ত্রী না হতেন, তা হলেও কি তার নাম থাকতো?' মুসলমান ছেলেরা তো নেহেরুকে চিনেই না। যারা চিনে তারা বলে, 'হ্যাঁ থাকতো, তার 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' ইত্যাদি বই তাঁকে একইভাবে বিখ্যাত করে রাখতো।' আমি বলি, আর একটি বই আছে নেহেরুর : 'কন্যার কাছে পিতার পত্র'। জেল থেকে কন্যা ইন্দিরাকে যেসব পত্র লিখেছেন নেহেরু সেগুলো সঙ্কলিত হয়েছে এই বইয়ে। পত্রের মাধ্যমে ইন্দিরাকে রাজনীতিবিদ করে তুলছেন নেহেরু। বইটি যে আমি কতবার কিনেছি আর কতবার হারিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, অমৃত দত্ত, সরলানন্দ সেন (মাও সে তুঙের জীবনী-লেখক) ও অন্যান্যেরা নিয়মিত একটা পাক্ষিক সভায় মিলিত হতেন ঢাকা কোর্টের কাছে একটি বিল্ডিং-এ। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল আবার অচ্যুত গোস্বামীর বাসাও ছিল। সেখানে আমরা মাঝে মাঝে যেতাম। আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে সৈয়দ নুরুদ্দীন, মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক, আবদুল মতিন এদের মিটিং-এ নিয়ে যাওয়া। সবাই আমার খুব প্রশংসা করত এই বলে যে আমি খুব বাধ্য ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৪-৪৫ সালে ক্রমান্বয়ে আমি প্রগতি লেখক সঙ্ঘের একজন স্বেচ্ছাসেবকে পরিণত হলাম। প্রগতি লেখক সংঘ থেকেই অজিত গুহের সাথে আমার আলাপ। ওয়ারীতে তিনি থাকতেন হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির উলটোদিকের একটা বাড়িতে। বাড়িটার নাম ছিল টয়। নীল রঙের সিরামিক দিয়ে লেখা ছিল বাড়ির নামটা। কিছুদিন আগে ভেঙে ফেলা হয়েছে। অজিত গুহ জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর ছিলেন। কামরুল ভাই অজিত গুহের বাড়িতে পড়ে থাকতেন। আমাদের খুব খাওয়াতেন তিনি। এই যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, আমি তো মনে করি নূরুল হুদা ইজ এ ক্রিয়েশান অব অজিত গুহ। তিনি কতখানি অজিত দা'র কথা স্মৃতিতে রেখেছেন জানি না। এই যে আলতাফ মাহমুদ, আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী সারা মাহমুদ বা তার শালা, ওর নামটা ভুলে গেছি—এদের সবাইকে অজিত গুহ পালন করতেন নিজের সন্তানের মতো।

১৯৪৫ সালের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি তখন ফজলুল হক হলের ছাত্র। ছাত্ররা ঠিক করল তারা নির্বাচন করবে। হলের স্টুডেন্ট ইলেকশান। প্রত্যেক হলে হয়। আমি ছিলাম একটু গুডি গুডি টাইপের। কর্মচারীদের মধ্যে আমি আর রবি গুহের খুব জনপ্রিয়তা ছিল। তাদের ছেলেমেয়েদের সন্ধ্যায় পড়াতাম আমরা। কর্মচারীরা আমাদের খুবই ভক্তি করত, সালাম দিত। শিক্ষকরা ঠাট্টা করে বলতেন, 'কর্মচারীরা দেখি আমাদের চেয়ে তোমাদেরই সালাম বেশি দেয়, কী ব্যাপার!' পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেয়ারার্স ইউনিয়ন হয়েছিল। পরবর্তী কালে শেখ মুজিবুর রহমানও এর সাথে জড়িত হয়েছিলেন।

১৯৪৫ বা ৪৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল বের হয়েছিল বাংলায়। আগে পত্রিকাটি ছিল বাই-লিঙ্গুয়াল, আমরাই প্রথম বাংলা চালু করি। বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় আমার। প্রবন্ধটার নাম ছিল : সাহিত্যের সমস্যাটা কি? প্রবন্ধটির কথা অনেকে বলেন, বিশেষ করে মুস্তাফা নূরুল ইসলাম এই প্রবন্ধটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মুনীরও বলত। প্রবন্ধের বিষয় ছিল : সাহিত্যের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক থাকবে কি থাকবে না। সেখানে এই আইডিয়াটি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, রাজনীতি যদি মানুষের জন্যে হয়, তবে রাজনীতিকে অবশ্যই সাহিত্যের জন্যে হতে হবে। লেখাটি কলকাতায় আহসান হাবীব সাহেবের চোখে পড়ে। তিনি তখন 'সওগাত' পত্রিকায় কাজ করেন। আহসান হাবীব সাহেব তখন আমাকে চেনেনও না। তিনি সওগাতে রিপ্রিন্ট করেন লেখাটি। আমার 'নানা কথা' বইয়ে প্রবন্ধটি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে কিছু প্রগতিবাদী উপাদান দানা বেঁধে উঠছিল। পুরোপুরি তারা কমিউনিস্ট—এ কথা বলা যাবে না। তারা প্রো-কমিউনিস্ট। যেমন, এ কে এম আহসান একজন প্রো-কমিউনিস্ট। এমনকি কবির চৌধুরীকেও পুরোপুরি কমিউনিস্ট বলা যাবে না। তিনি লিখেছেন, একবার জ্যোতি বসু এসেছেন বক্তৃতা দিতে। ইচ্ছে হচ্ছে, জ্যোতি বসুর বক্তৃতা শুনতে যেতে কিন্তু তখন তিনি সরকারি চাকরি করেন, সম্ভবত ফুড ডিপার্টমেন্টে। সুতরাং কেমন করে যাবেন? অবশেষে মাথায় ঘোমটা দিয়ে, মানে মাথা ঢেকে বক্তৃতা শুনে এলেন।

১২. এ্যামবিশন কাকে বলে?

১৯৪৫ বা ৪৬-এ একটি অফার আসে আমার কাছে বিলাত যাবার জন্যে। একটা স্কলারশিপ ছিল 'রিজার্ভড ফর মুসলিমস'। আমাকে বলা হল কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ এসে তুমি ইন্টারভিউতে এ্যাটেন্ড কর।

ইন্টারভিউ কার্ড নিয়ে আমি কলকাতায় যাই। কলকাতায় গিয়ে আমি রাইটার্স বিল্ডিং-এ না গিয়ে প্রথমে গেলাম কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে। ৮নং ডেকার্স লেনে, এটাই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির হেড কোয়ার্টার। সেখানে মুজাফ্ফর আহমেদ (যাকে আমরা কাকাবাবু বলতাম), নৃপেন চক্রবর্তী (যিনি পরে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, আমার খুব প্রিয় লোক আর কি!)। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি তো বিলেত যাচ্ছি'। আমি ফিলসফিতে এম.এ. ও অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়েছি, আমি মুসলিম। স্কলারশিপটা ফিলসফির জন্যে রিজার্ভড এবং মুসলমানদের জন্যে রিজার্ভড। সুতরাং স্কলারশিপটা আমারই ছিল।

আমার আশ্চর্য লাগে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকটা আমার মধ্যে একেবারে খালি রয়ে গেছে। বিলেত যাব, পাস করে আসব—এসব নিয়ে ভাবতাম না। আমি যেই বললাম, 'আমি বিলেত যাবো', ওঁরা শুনে হাসতে হাসতে ঠাট্টার ছলে বললেন, 'আপনি বিলেত যাবেন আমরা আর এখানে বসে ভেরেণ্ডা ভাজবো?' আমি বললাম, 'আমাকে কি করতে হবে?' ওঁরা বললেন, কাঁথা-কম্বল নিয়ে পার্টি অফিসে চলে আসেন। কি করতে হবে বুঝেন না?' তো কাঁথা-কম্বল নিয়ে পরদিন আমি পার্টি অফিসে যাইনি কিন্তু ইন্টারভিউ কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

ইতিহাসের অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেন সাহেব (সম্ভবত তখন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট) ছিলেন ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যতম সদস্য। তিনি আমার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন। কলকাতা থেকে ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সরদার কেন আপনি গেলেন না? হোয়াই ডিড ইউ নট গো?' আমি বললাম, 'না স্যার আমি দেশ ছেড়ে যেতে আগ্রহী নই।' এটা একটা ঘটনা। মাহমুদ হোসেন সাহেব আশ্চর্য হয়েছিলেন। নিশ্চিত স্কলারশিপ পেয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলাত যেতে চায় না—এ কেমন ছেলে! বলে রাখা ভালো যে, এই ড. মাহমুদ হোসেন ভারতের এক সময়ের রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের ছোট ভাই।

১৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের কোর্স ছিল তিন বৎসরের আর এম.এ. কোর্স ছিল এক বৎসরের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু এ দুটি কোর্স দুই বৎসরের ছিল। সিলেবাস থেকে শুরু করে সব দিকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বতন্ত্র ছিল। অনেকটা প্রাচীনকালের তপোবনের আদলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে স্বর্ণযুগের কথা এখনকার শিক্ষকেরা জানেন না বা জানলেও স্মরণ করতে চান না। আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' সঙ্কলনে আপনারা সেসব গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কিছুটা আভাস পাবেন।

১৯৪৬-এ আমি এম. এ. পাস করি। আমি অনার্স ও এম. এ. তে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলাম। হরিদাস ভট্টাচার্য্য তখন অবসর নিয়েছেন। তারপর এস এন রায়ের ভাই বিনয় রায় বিভাগীয় প্রধান। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমিকাল থেকে ক্লাস নেবে।' আমি পরদিন থেকে ক্লাস নিতে শুরু করলাম দর্শন বিভাগে। প্রথম দিনের ক্লাসের কথা তেমন মনে নেই তবে তখনো আই ওয়াজ মোর এ স্টুডেন্ট দ্যান এ টিচার। ছাত্ররা সেভাবেই আমাকে গ্রহণ করেছিল।

দর্শন বিভাগের প্রথম দিকের ছাত্রদের কথা আমার মনে নেই তবে ছাত্রীদের একজনের নাম মনে আছে। তাঁর নাম ছিল ঊষা পৈত। পরবর্তী কালে আমাকে সংসারী করলেন আমাদের শফিকের (সাপ্তাহিক যায় যায় দিন পত্রিকার সম্পাদক শফিক রেহমান) বাবা প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান সাহেব। জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি। সাইদুর রহমান সাহেব সোজা আমাকে ইন্টারভিউতে নিয়ে গেলেন আমার ভাবী শ্বশুর পরিবারে। তিনি যখন হবু কনেকে জিগ্যেস করলেন, 'কি মেয়ে, একে চিন?' তখন কনে জবাব দিল, 'ইনি তো আমাদের স্যার ছিলেন।' দ্যাট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং!

১৪. মুসলিম লীগের জঙ্গি গ্রুপ

এদিকে মুসলিম লীগ ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে শাহ আজিজুর রহমান, এস এম সুলতানের নেতৃত্বে মুসলিম ডানপন্থীরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ডানপন্থীরা তখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, ছাত্রদের মধ্যে বাম মনোভাবাপন্ন কারা আছে। মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, নাজমুল করিম, তার ভাই লুৎফুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিম, আবুল কাসেম, আবদুল মতিন (যিনি পরবর্তীতে 'জেনেভায় বঙ্গবন্ধু' লিখেছেন) কে তারা প্রথমত পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করে। মুসলিম লীগের মধ্যে যারা একটু জঙ্গি মনোভাবাপন্ন তারা একটা কাউন্সিল দাঁড় করিয়েছিল। এই কাউন্সিলটা পরিচিত ছিল ফ্যাসিস্ট কাউন্সিল হিসেবে। ১৯৪৫-৪৬ সালে এরা আমাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করে। তখন আমি ফজলুল হক হলে থাকি টিচার হিসেবে।

১৯৪৫-৪৬ সালে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে স্পষ্টত দুটি গ্রুপ দাঁড়িয়ে গেল। একটা গ্রুপকে কমিউনিস্ট বলা হচ্ছে। তারা কিন্তু নিজেদের বলছে, 'জাতীয়তাবাদী বা হক-পন্থী। হক-পন্থী হিসেবে আমি আক্রান্ত হয়েছি। আমি একাই যে আক্রান্ত হয়েছি তা নয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের বড় ছেলে সফিয়্যুল্লাহ তখন কমিউনিস্ট। শহীদুল্লাহ সাহেব একজন ডেমোক্রাট। পরিবারের ভিতরেও তিনি ডেমোক্রাট। সফিয়্যুল্লাহ তখন আন্ডার গ্রাউন্ডে কাজ করছে। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকার, মানে তখনকার সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ—এরা সবাই শহীদুল্লাহ সাহেবকে গিয়ে বলেছে, 'কনট্রোল ইয়োর সান'। শুনে শহীদুল্লাহ সাহেব তার স্বভাব-সুলভ নাকী সুরে উত্তর দিয়েছেন, 'অ্যাঁ হাউ কেন আই ডু ইট? সে এখন বড় হয়েছে, তার ডিসিশন সে নেবে।'

শহীদুল্লাহ সাহেব ছেলেকে ভর্ৎসনা করেননি। যখন পুলিশ কিংবা ব্রিটিশ সরকার তাঁর ছেলেকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছে তখন তিনি এই ভাবটাই দেখিয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব থাকতেন এখনকার সাইন্স এ্যানেক্সের পাশে চাইনিজ ধরনের একটি বাড়িতে। এটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটি হলের প্রভোস্টের কোয়ার্টার। সফিয়্যুল্লাহ কমিউনিস্ট পার্টি করত বলে মুসলিম লীগাররা শহীদুল্লাহ সাহেবের কোয়ার্টারে গিয়ে তাঁকেও অপমান করেছিল।

সেই সুন্দর মুখ : মতি

ফ্যাসিস্ট গ্রুপটা একবার জঙ্গিভাবে আক্রমণ করল মুনীরকে। তাকে তার রুম থেকে বার করে দিল। মুনীর চৌধুরীর বিছানাপত্র তারা পুড়িয়ে দিল, বইপত্র তছনছ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুনীরের এক খালাতো ভাই ছিল রফিকুল ইসলাম। তার ডাক নাম মতি। সে জগন্নাথ কলেজে বিজ্ঞান পড়ত। এখন আর নাই সে, কিছুদিন আগে সে মারা গেছে। এই রফিকুল ইসলাম আমাদের পরিচিত অর্থনীতির টিচার এম এম আকাশের বাবা। মুনীরের ঘরটায় যেদিন ভাংচুর করা হয় তার পরদিন দেখা গেল উল্টাপালটা সব বিছানাপত্র আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইয়ের স্তূপের মধ্যে বসে মতি একটা বই পড়ছে। বিরোধী পক্ষ তো ঘরটার উপর নজর রাখছিল, কারা সে ঘরে আসে তারা দেখবে। তারা যখন দেখল মুনীরের ঘর খোলা এবং মতি বইয়ের স্তূপের উপর বসে মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি করছেন এখানে?'

মতি ছেলেটা খুব হাসিখুশি আর বুদ্ধিমান ছিল। সে উত্তর দিল 'আমি একটা বই পড়ছিলাম'। 'কি বই'—প্রশ্ন করাতে মতি জানাল, 'রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভলগা থেকে গঙ্গা।' জঙ্গি গ্রুপের ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'এই বই আপনি আগে পড়েন নাই?' মতি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ আগেও পড়েছি'। 'তবে আজ আবার কি পড়ছেন?' 'আজ বর্বর যুগটা একটু ভালোভাবে পড়ে দেখছিলাম।' এত সুন্দরভাবে স্মার্টলি উত্তরটা দিল মতি।

এতে বোঝা যায়, ছাত্রদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট গ্রুপটা বা ডানপন্থীরাই একমাত্র গ্রুপ ছিল না। এর কালচারাল রিফলেকশানটা আপনারা ঐ সময়কার বিভিন্ন ম্যাগাজিনে পাবেন। টিচারদের কাছে আমি, মুনীর এরাই ছিলাম সাংঘাতিকভাবে ফেভারিট। তখন ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন এ. জি. স্টক। আগে ছিলেন ইহুদি একজন, এ্যান্ডারসন না কি যেন নাম ছিল তাঁর। এরা সবাই পছন্দ করতেন আমাদের।

নাজমুল করিম আর রবি গুহ পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র। তারা আবদুর রাজ্জাক সাহেবকে পিক আপ করেন জ্ঞানী লোক হিসেবে। রাজ্জাক সাহেব ক্লাসের মধ্যে যা আলোচনা করেন, তার অধিক আলোচনা করেন ক্লাসের বাইরে। বাড়িতে গেলে তিনি ছাত্রদের খাওয়ান। আমাদের তিন জনেরই প্রধান আকর্ষণ ছিল ছুটির দিনে রাজ্জাক স্যারের বাসায় যাওয়া, নানান কথা বলা, নানান বই নিয়ে আলোচনা করা। সেই হিসেবে ১৯৪৪-৪৫ সালেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়।

১৫. কমিউনিস্ট পার্টি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারতবিভাগ

কমিউনিস্ট পার্টিকে আমি একটি পরিবারের মতো দেখতাম। মেম্বাররা ছিল ভাইয়ের মতো। যেমন, রবি গুহ কিছুই আমাকে ছাড়া খেতো না; পূজার প্রসাদও আমাকে দিয়ে, তারপর খেতো। কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার কেউ হতে চাইত না। ভাবতো, আমি মেম্বার হওয়ার উপযুক্ত নই। পার্টি মেম্বার করতে চায় কিন্তু কর্মীরা মেম্বার হতে চায় না—এ রকম ছিল অবস্থা। উচ্চ ধারণা ছিল সবার কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে। সমাজ বদলাতে চাই আমরা, সে জন্য কষ্ট করতে হবে, যদি না পারি তা করতে, তবে মেম্বার হবো কি করে? আমি নিজেকে পার্টির মেম্বার হিসেবে কোনোদিন দেখিনি। আমি মেম্বারশিপ ফি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলাম, তারা আমার কাছ থেকে ফি নিল—এটা কখনো হয়নি। আমি ছিলাম ঘরের ছেলে। আমার সম্পর্কে তেমন কোনো প্রশ্নও কখনো ওঠেনি।

এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি। একবার শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে একজন কমরেডকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের পর কমরেডের এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করে, এখন কি করবি? বহিস্কৃত কমরেড উত্তর দেয়, 'কি আর করবো, বাইরে থেকেই কাজ করবো।' অর্থাৎ এরা এ্যান্টি কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কিছু করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। আদর্শ, অঙ্গীকার, স্বপ্ন এসব কিছু মিলিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনটা একটা ফ্যামিলি জাতীয় ব্যাপার ছিল। কীভাবে, কোথা থেকে ফান্ড আসত তা আমরা জানতাম না। কিন্তু পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা' আমরা বিক্রি করতাম। আমি বিক্রি করেছি, মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী বিক্রি করেছেন। চার পয়সা দাম ছিল এর চার পৃষ্ঠার পত্রিকা। হিন্দু, মুসলিমসহ সবার মধ্যে একটি একটি ইউনিটি গড়ার স্বপ্ন দেখত কমিউনিস্ট পার্টি। তারা ভাবত, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ছাড়া তো আমরা কিছুই করতে পারব না। কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশী, শ্রী রাজা গোপালচারী, গান্ধীজি আর জিন্নার মধ্যে দেখা করার ব্যবস্থা করেন। এভাবে কমিউনিস্ট পার্টি পিপলস্ পার্টি হিসেবে পরিচিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটি পার্টি যেটি জনগণের কাছাকাছি থাকে।

'৪৭ সাল এগিয়ে আসছে। ৪৫-৪৬ এ ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। জিন্না সাহেব আর গান্ধীজির মধ্যে টানাপড়েন চলছে। আবুল হাশেম সাহেবের গ্রুপ আর সুভাষ বোসের ভাই শরৎ বসু মিলে একটু চেষ্টাও করছে যেন ডিভিশনটা বন্ধ করা যায়, কেননা হাশেম সাহেব হচ্ছেন বর্ধমানের বিখ্যাত একটি জাতীয়তাবাদী পরিবারের লোক।

ঢাকার কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, ঢাকা তো বরাবরই তৎকালীন ইতিহাসে দাঙ্গার শহর হিসেবে অপখ্যাত ছিল। দাঙ্গার আবহাওয়া শুরু হয়ে গেছে তখন। সব সময় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আতঙ্কে আমরা আতঙ্কিত থাকতাম। দাঙ্গার সময় কমিউনিস্ট এলিমেন্টদের কাজ ছিল শান্তির দিকে খেয়াল রাখা, শান্তিমিছিল বের করা। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে যারা প্রগতিশীল ছিল তারা এতে যোগ দিত। ফরিদ আহমেদ, শাহ আজিজুর রহমানও শান্তি মিছিলে যেত বলে মনে পড়ছে।

তখন জঙ্গি গ্রুপটা নানা এ্যাকশানে যাচ্ছিল। রায় সাহেবের বাজার আর নবাবপুর-এর মাঝখানে ছিল একটা খাল। সেই খালের উপর ছিল নবাবপুর ব্রিজ। নবাবপুর ব্রিজের কাছে নবাবপুর মসজিদটা এখনো আছে কিন্তু নবাবপুর ব্রিজটা এখন আর নেই। এই ব্রিজের দুই পাশে ছিল হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো ব্যাপার। নবাবপুর সাইডটা হচ্ছে হিন্দুস্তান আর রায় সাহেবের বাজারটা হচ্ছে পাকিস্তান। ওটা একটা সাংঘাতিক পয়েন্ট ছিল। আর্মড ফোর্স যখন আসত তখন একটা সাইড দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়াত আর একটা সাইড উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াত।

১৯৪৭ এ ব্রিটিশরা চলে গেল। ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়ে গেল। ঠিক হল, পাকিস্তান আর ইন্ডিয়া কমনওয়েলথের মধ্যে থাকবে। রানী কমনওয়েলথের প্রধান। এ ছাড়া রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন। ১৪ আগস্টে মিছিল একটা নিশ্চয়ই বের হয়েছিল। তাতে কংগ্রেসও জয়েন করেছিল। কিন্তু তাদের তেমন উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না। আমরাও যে খুব উৎসাহের সঙ্গে এতে যোগ দিয়েছি তা নয়। তবে আমরা সব সময় লক্ষ রেখেছি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যাতে না শুরু হয়। নবাববাড়িতে মিটিং হয়েছে। নবাববাড়ি যেহেতু প্রো-হক ছিল সেহেতু ওরা আমাদের সাহায্য করেছে।

পাকিস্তান হবার পর বেশিরভাগ হিন্দু টিচার ক্রমান্বয়ে চলে যাচ্ছেন ঢাকা থেকে। আবহাওয়াটা খারাপ হয়ে উঠছে। অপশন দেওয়া হচ্ছে। কোথায় থাকবেন? এখানে না ওখানে? ওখানকার মুসলমান কর্মচারীদেরও অপশন দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশটা সাংঘাতিকভাবে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অনেক হিন্দু টিচার চলে গেলেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশিরভাগ বিখ্যাত হিন্দু শিক্ষক যেমন ডি এন ব্যানার্জী, অমিয় চক্রবর্তী, এঁরা প্রায় সবাই কমিউনিস্ট-মনোভাবাপন্ন ছিলেন। দেশভাগ হওয়ার পর এঁরা খুব ফ্রাইটেন্ড হলেন। একটা অপশান দেওয়ার ব্যাপার দাঁড়াল : আপনারা এখানে থাকবেন, নাকি ওখানে? অনেকে চলে গেলেন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের একটা সঙ্কট দেখা দেয়। রাজ্জাক সাহেবের স্মৃতিকথার মধ্যে এ ব্যাপারটি আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব যখন শিক্ষক সংগ্রহের জন্যে বিলাত যান তখন রাজ্জাক সাহেব বিলাতে। রাজ্জাক সাহেব তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে টিচার দিচ্ছি'। রাজ্জাক সাহেব তখন লাস্কির সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। লাস্কির তিনি ছাত্র এবং সহকর্মী ছিলেন। লাস্কি* তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন।

১৬. আমাদের সভা আক্রান্ত হল

৪৭-এর শেষে বা ৪৮ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। তখন পাকিস্তান হয়ে গেছে। সদর ঘাটের বাঁধটা যেখানে, তার পূর্ব দিকে একটা পার্ক ছিল।

---

* হ্যারল্ড লাস্কি : দ্রষ্টব্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা : ২য় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০২; পৃ.৮৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্কটার নাম ছিল লেডিজ পার্ক। ঐ লেডিজ পার্ক ছিল একটা মিটিং প্লেস। মাঝে মাঝে সভা হত ওখানে। ওখানে ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় অবস্থার উপরে আলোচনা করার জন্যে একদিন একটি মিটিং আহ্বান করে। ঐ সভায় সরদার ফজলুল করিম ওয়াজ টু প্রিসাইড ওভার দি মিটিং এ্যান্ড মুনীর চৌধুরী ওয়াজ টু স্পিক। অন্য কমিউনিস্ট নেতা যারাই থাকুন না কেন—এই দুই জনই ছিল প্রধান।

আমরা মিটিং শুরু করতে যাবো, তখন দি মিটিং ওয়াজ এ্যাটাকড বাই শাহ আজিজুর রহমান গ্রুপ। সুলতান হোসেন খানও আক্রমণকারী গ্রুপের ছিলেন। এই জঙ্গি গ্রুপটা আমাদের মিটিং ভেঙে দিল। লাঠিপেটা করল আমাদের। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমাদের দৌড়ে পালিয়ে আসতে হল। পালিয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম এখন যেটা বার লাইব্রেরি তার উত্তর দিকের একটা দোতলা বিল্ডিং-এ। এটা ছিল ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অফিস। আমি আর মুনীর ওখানে আশ্রয় নিলাম। শাহ আজিজেরা ওখানে গিয়েও কিছু ইট-পাটকেল ছুঁড়ল আমাদের দিকে। তারপর তারা চলে গেল।

আর একটা ঘটনা ঘটেছিল এ সময় রথখোলায়। নবাবপুরের মাঝামাঝি জায়গায় রথখোলা নামে একটা জায়গা ছিল। এখন ট্রাফিক পুলিশ যেখানে দাঁড়ায় সে জায়গাটা। সেখানে কলকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সির একটা শাখা খোলা হয়েছিল। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি কমিউনিস্ট প্রকাশনা বিক্রি করত। কাকাবাবু মানে মুজাফ্ফর আহমেদ এই ঢাকা শাখাটির উদ্বোধন করেন। এই সময়ে এই শাখাটার উপরেও হামলা হয়। বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় রাস্তায়। এটাও একটা ঘটনা।

১৭. অধ্যাপনায় ইস্তফা

১৯৪৭ পর্যন্ত কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন অন্যরা। বড় বড় নেতারা ছিলেন অনেকে যাদের নাম আপনাদের কাছে বলে লাভ নেই কিছু। আপনারা চিনবেন না, মনেও রাখতে পারবেন না। পুলিশের চোখ ছিল তাদের দিকে। আমি তো কেউই ছিলাম না। আমি খাইদাই, সংস্কৃতি করে বেড়াই। মিছিলে প্রসেশানে যাই। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল এটা জানা যে, মুসলমানদের মধ্যে কারা কারা কমিউনিস্ট। কারণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন তো সাধারণ মুসলমানেরা করবে না। সুতরাং খুঁজে বের করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী কারা। বেশিরভাগ হিন্দু কর্মী ভারতে চলে গেছে, অনেকেই চলে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কারা কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করে বা কারা কারা কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচিত তা জানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে! মুসলমান অফিসারেরা তো চেনে না মুসলমানদের মধ্যে কারা কারা কমিউনিস্ট। তাই গভর্ণমেন্টে হিন্দু অফিসারদের অনুরোধ করে বলল, 'তোমরা আরো কটা দিন থেকে যাও পাকিস্তানে। তোমরা ভারতে যাবার আগে আমাদের চিনিয়ে দিয়ে যাও, মুসলমানদের মধ্যে কারা কারা কমিউনিস্ট।' এভাবেই আমাদের নাম প্রথম পুলিশের খাতায় আসে।

তখন পার্টি একদিন আমাকে বলে, 'তুমি তো চাকরি করে কাজ করতে পারবে না। পুলিশ তোমাকে খোঁজ করছে। চাকরি ছেড়ে দাও।' আমি তো বাধ্য কর্মী। একদিন বিভাগীয় প্রধানের কাছে একটি দরখাস্ত দিলাম। দরখাস্ত খুলে তিনি অবাক হলেন। ওটা ছিল আমার পদত্যাগপত্র। উনি বললেন, 'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইট?' আমি বললাম, 'স্যার একটা ডিসিশন হয়ে গেছে। এটা আর বদলানো যাবে না।' আমি যেমন সহজে শিক্ষক হয়েছিলাম তেমনি সহজে শিক্ষকতার কাজ ছেড়েও দিয়েছিলাম। অন্যান্য শিক্ষকেরা তাতে অবাকই হয়েছিলেন একটু। হরিদাস বাবু বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ্ নেভার সিন এ বয় লাইক হিম'। মানে এ ছেলে একটু অন্য পথে হাঁটে।

আমি ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়ে পার্টির কাজে চলে এলাম। আমি একটা গোবেচারি ছেলে, কমিউনিস্ট নেতারা আমার মতন একটা মুসলমান ক্যাডার পেয়েছে এটা তাদের জন্যে আনন্দের ব্যাপার। ইউনিভার্সিটির হিন্দু প্রফেসর যারা তাদের তো একটা পারিবারিক ট্র্যাডিশন আছে আন্ডার গ্রাউন্ডে যাওয়ার। কিন্তু একটা মুসলমান ছেলে এ রকমভাবে হাতের চাকরি ছেড়ে দিল এটা অমুসলমান টিচারদের যতটা টাচ করেছে মুসলমান টিচারদের ততটা করে নাই। বলা যায় যে, ব্যাপারটা মুসলমান টিচারদের আদৌ টাচ করে নাই, কিন্তু হিন্দু টিচারদের সাংঘাতিকভাবে টাচ করেছে।

আমার রেজিগনেশন দেওয়ার এই খবরটা যে গভর্ণমেন্টের কাছে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ আছে। আমার যে পার্সোনাল ফাইল তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো আছে। সেখানে আমি দেখেছি যে তৎকালীন গভর্নমেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে এক্সপ্ল্যানেশান চেয়েছে : হোয়াই সরদার ফজলুল করিম হ্যাজ রিজাইনড? তার ঠিকানা এখন কোথায়, তোমরা আমাদের জানাও।

জীবিকার সমস্যা কখনোই ছিল না আমার। ছাত্রাবস্থায় স্কলারশিপ পেতাম। তা দিয়ে চলতাম। মাস্টার যতদিন ছিলাম ততদিন মাইনে পেতাম। বোনের বাড়িতে থাকতাম, খেতাম। যা লাগবে বড় ভাই-ই দিতেন। পরীক্ষার আগে তিনি আমাকে দোয়া করে যাবার জন্যে ঢাকায় আসতেন। কখনো জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমার কিছু লাগবে না?' আমি রসিকতা করে জবাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতাম, 'যা লাগবে তা তো তৈরি করছি। পড়াশুনো করছি, আর কি করব?' জামাকাপড়ের খুব একটা চাহিদা আমার কখনো ছিল না।

চাকরি ছাড়ার খবরটা বড় ভাই পরিবারের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। আমার চাকরি ছেড়ে দেবার খবর শুনে বাবা আর বড় ভাই ঢাকায় এলেন আমাকে খুঁজতে। বাবা তখন বুড়ো হয়েছেন। বড় ভাইয়ের চাকরি আছে, তবুও তিনি এসেছেন। বড় ভাই আমার হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট বিনয় বাবুর কাছে গিয়ে বললেন, 'দেখেন তো আমার ভাইটা কেমন হয়ে গেল!' ও কি করছে না করছে, আপনি ওর সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, একটু বলেন ওকে।' তখন বিনয় বাবু উত্তর দিলেন, 'দেখেন, ও আমার ছেলের চাইতে বেশি। ওর রেজিগনেশন লেটার, ওটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু আপনারা তো ওকে ফিরাতে পারবেন না।'

বাবা আর বড় ভাই সিদ্ধেশ্বরী এলাকার এক বাসায় পেল আমাকে। যেখানে এখন মৌচাক মার্কেট, সে জায়গাটা তখন জঙ্গলের মতো ছিল। ওখানে আমার এক ছোট ভগ্নিপতি থাকত। ফরেস্ট অফিসে কাজ করত সে। ও আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। বনজঙ্গলের মতো ছিল বলে জায়গাটা সেফ ছিল, ওখান থেকে আমি আমার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতাম। বাবা তখন বৃদ্ধ মানুষ। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুই একটা পাগল। তুই এগুলো কি আরম্ভ করেছিস? তোকে আজ আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। বাড়ি যেতে হবে।'

আমি ধরা পড়ে গেলাম। বড় ভাই আর বাবার হাতে আমি ধরা পড়ে গেলাম। আমার তখন মনে একটাই প্রশ্ন, 'এই বন্ধন থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাবো? আমার বাবা আর বড় ভাইয়ের হাত থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাবো? আমি তখন অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন মাগরেবের নামায শুরু হবে এবং বাবা আর বড় ভাই কখন নামায পড়তে যাবেন। আমি ঠিক করলাম, সেই সময়টাতেই আমি পালাব।

আমি জানতাম, তাঁরা যদি আমাকে জোর করে বাদামতলীর ঘাটে স্টিমারে নিয়ে ওঠায়ও, তবুও তো ওঁরা আমাকে বরিশালে নিয়ে যেতে পারবেন না। স্টিমারঘাটে ইন্টেলিজেন্স আছে, পুলিশ আছে। তারা আমাকে ফলো করছে। যে মুহূর্তে ওরা আমাকে জাহাজে ওঠাবে সঙ্গে সঙ্গে তো জাহাজ ছেড়ে দেবে না। জাহাজে এজেন্ট আছে, আই বি আছে, ওয়াচার আছে। তারা তো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পয়েন্ট আউট করবে : এই যে, সেই লোক যাচ্ছে। সরদার ফজলুল করিম যাচ্ছে। এখন জাহাজে আছে। ওরা আমাকে ধরে ফেলবে। যে স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে আমার বাবা আর ভাই আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে বড় রকমের আঘাত আসবে। এটা সম্ভব হবে না। আর পুলিশ এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের পক্ষ থেকে আমাকে ফলো করার এত সব ব্যাপার বাবা আর বড় ভাই চিন্তাও করতে পারতেন না। ওঁরা ভাবছিলেন, ও পাগল হয়ে গেছে, চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। পাগলটাকে আমরা নিয়ে যাই। বাবা সেই প্রথম ঢাকায় এসেছেন। বাবাকে বড় ভাই নিয়ে এসেছেন শুধু আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন বলে। আমি আমার শেল্টার থেকে পালালাম, কোথায় গিয়েছিলাম, আজ এতদিন পরে আর বলতে পারছি না, হয়তো কোনো বন্ধুর বাসায় হবে। আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে, আমি সেদিন ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। যদি আমি সেদিন না পালাতাম তবে নট ইন ১৯৪৯, আই উড হ্যাভ বিন এ্যারেস্টেড ইন ১৯৪৮।

আপনাদের কাছে মনে হবে, মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি ছেলে কমিউনিস্ট হয়ে গেল! আমি ব্যাপারটিকে দেখি এভাবে : একটি জীবন নানান উপাদানের সমন্বয়ে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমার গ্রামের প্রাশেই ছিল হিন্দুপাড়া। হিন্দুপাড়াগুলো যেন কেমন-কেমন ছিল, আলাদা একেবারে। টাউনের মতো মনে হত সেখানে গেলে। সেখানে আমার হিন্দু বন্ধুবান্ধব ছিল। সেখানে আমি বন্ধুদের সাথে একসাথে খেয়েছি। মা দুই থালায় আমাদের ভাত দিয়েছে। একই জায়গায় একই আসনে।

AMARBOI.COM

১৮. হিন্দু মায়ের মুসলমান ছেলে

একটা ঘটনার কথা বলি। আমার বড় ভাই মঞ্জে আলী তখন রহমতপুরে সাবরেজিস্ট্রার। সাবরেজিস্ট্রার একজন বড় অফিসার। তা ছাড়া বড় ভাই খুব সামাজিক লোক ছিলেন। সবার বাড়িতে যেতেন। এক হিন্দু জমিদার ছিলেন রহমতপুরে। সেই জমিদারের প্রাপ্তবয়স্ক বড় ছেলে অকালে মারা গিয়েছিল। আমার বড় ভাইয়ের যাতায়াত ছিল সেই বাড়িতে। বড় ভাই একদিন সে বাড়িতে গেলে পরে সেই জমিদারের বৃদ্ধা স্ত্রী কেঁদে ফেলেন। বড় ভাইকে দেখে তাঁর নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে যায়। তখন বড় ভাই তাঁকে প্রবোধ দেন এই বলে, 'আপনি কাঁদেন কেন! আমিই তো আপনার বড় ছেলে।' শুনে ভদ্রমহিলা শোক ভুলে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুই-ই আমার ছেলে।' এটা একটা ঘটনা। একজন মুসলমান বলছে এক হিন্দু মহিলাকে : 'মা, আমি আপনার ছেলে।' বড় ভাই তখন দাড়ি রাখেন।

একদিন বড় ভাই আর আমি মাগরিবের নামাযের সময় গেছি সে বাড়িতে। সময়টা হিন্দুদের সন্ধ্যাহ্নিকেরও সময়। আমার বড় ভাই মহিলাকে বললেন, 'মা, আপনার ধোয়া কাপড়টা দিন তো। কাপড়খানা বিছিয়ে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামাযটা পড়ে নিই।' এক ঘরে সন্ধ্যাহ্নিকের কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে আর তার পাশের ঘরে বড় ভাই নামায পড়ছেন! আমি বলতে চাই, এটা বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা উপাদান, এই যে সমন্বয়—বন্ধুত্ব কিংবা আত্মীয়তা। তিনি মুসলমান হয়ে এক হিন্দু মহিলার কাপড়ের উপর নামায পড়ছেন, পাশে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে।

এ ঘটনার কথা আমি যখন লিখি ১৯৭২ সালের দিকে তখন লেখাটা বড় ভাইয়ের* নজরে পড়ে। হয়তো কেউ লেখাটার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'করিম তুমি কী সব লেখো, আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো না?'। তিনি না পারেন স্বীকার করতে, না পারেন অস্বীকার করতে। তিনি বিব্রত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তো আর পলিটিশিয়ান না যে ঘটনাটা বেমালুম অস্বীকার করবেন। তাঁর অনেক হিন্দু শিক্ষক ছিলেন, অনেক ভালো হিন্দু শিক্ষক, তাদের তিনি পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেন। আমাকে তিনি গৌরবের সঙ্গে তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আমাকে তিনি ভালবাসতেন এই জন্যে যে ভাইদের মধ্যে অন্তত একটাকে পাওয়া গেছে।

AMARBOI.COM

১৯. ভাষা আন্দোলন

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাক্ট অনুসারে ভারত ও পাকিস্তানে একটি করে কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি গঠন করা হয়েছিল। ইন্ডিয়াতে বছর এক-দুইয়ের মধ্যে কনস্টিটিউশান তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু পাকিস্তানে তখনো আলোচনা চলছে। পাকিস্তান তো একটা পাকিস্তান না। লাহোর রিজলিউশানে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। মূল প্রস্তাবটা ছিল এ রকম : হোয়েয়ার মুসলিমস আর মেজরিটি দোজ প্রভিন্সেস উইল বি কনস্টিটিউটেড এ্যাজ অটোনোমাস এ্যান্ড সোভারিন স্টেটস। কিন্তু ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান হওয়ার পর জিন্নাহ সাহেব বললেন, 'লাহোর রিজলিউশানে একটা ভুল আছে। স্টেটস কথাটা টাইপের ভুল, কথাটা আসলে হবে স্টেট। সুতরাং ডিসেম্বর মাসেই এটা এ্যামেন্ড করে ফেলা হয় : 'স্টেটস' এর বদলে 'স্টেট'। হাশেম সাহেব তখন এর বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়।

---

* বড় ভাই : মণ্ডে আলী সরদার : জীবনকালে উচ্চপদে সরকারি কর্মচারী ছিলেন : জন্ম আনু : ১৯০৬, মৃত্যু : ১৯৯১। এই বড় ভাই-এর একটি যুবক সন্তান হুমায়ুন ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করে। কেবল আমার বড় ভাই-এর ছেলে নয়, আমার মেজ-বোনের একটি ছেলেও নিহত হয়েছে ২৫ মার্চের পরে বোধ হয় এপ্রিল মাসে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পথে লঞ্চে, পাকিস্তান বাহিনীর বিমান আক্রমণে, ওর নাম ছিল জাহাঙ্গীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রকম ঘটনা তখন অনেক ঘটছিল। ভাষার ব্যাপারে বারবার উর্দুর উপর জোর দিয়ে বলা হচ্ছিল : উর্দু শ্যাল বি দি লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা অব পাকিস্তান, স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান। করাচীতে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছিল। তখন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে করাচীতে বৈঠক হচ্ছে। মূলনীতি কমিটির বৈঠক হচ্ছে। ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস্ ফর দি কনস্টিটিউশান কি কি হবে সেসব নিয়ে আলোচনা চলছে। এ্যাসেমব্লি সদস্যরা কোন্ কোন্ ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারবে তা এ্যাসেমব্লির রুলস এ্যান্ড রেগুলেশনের মধ্যে লেখা থাকে। সেখানে লেখা ছিল, মেম্বারস মে স্পিক ইন উর্দু এ্যান্ড ইন ইংলিশ।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে তখন নেতৃস্থানীয় ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এরা সব। এ্যাসেমব্লির এক সভায় **ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত** প্রথম বাংলা ভাষার প্রশ্নটি তুলেছিলেন। ধীরেন দত্ত কুমিল্লা কোর্টের এক জন বড় উকিল ছিলেন। তিনি এ্যাসেমব্লির প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ করে বললেন, 'স্যার আই হ্যাভ এন হাম্বল সাবমিশন। পাকিস্তানের মানি অর্ডার ফর্মে যদি শুধু উর্দু আর ইংরেজি ব্যবহার করা হয় তবে ইস্ট বেঙ্গলের কৃষকেরা কীভাবে এই ফর্ম ব্যবহার করবে? ধরা যাক, কৃষকের ছেলে স্কুলে পড়ে। সেই ছেলে বাবার কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছে। বাবা তাকে মানি অর্ডার করবে। এই কৃষক ফাদার কীভাবে মানি অর্ডার ফর্মটা ব্যবহার করতে পারবে?' এসব কথা অবশ্য সবই ইংরেজিতেই হচ্ছিল। মানিঅর্ডারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে তিনি বললেন, আই হাম্বলি সাবমিট, ইন দি রিজলিউশান, দি মেম্বারর্স মে স্পিক আইদার উর্দু অর ইংলিশ অর বেঙ্গলি।' দ্যাট ওয়াজ দি সাবমিশন অব ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইন ১৯৪৮। কিন্তু তাঁর সেই বিনীত দাবিটাকে দমন করা হল। লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে* ভয় দেখাল এই বলে যে 'তুমি প্রভিন্সিয়ালিজম প্রিচ করছো, এটা চলবে না'। এসব কথা ইতিহাসে আছে।

'৪৮ এর মার্চ মাসেই মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এলেন এবং রেসকোর্সে বক্তৃতা দিলেন। গরমের দিন ছিল তখন। পশ্চিম দিকে যেখানে এখন টিএসসি, সেখানে রেসকোর্সে ঢোকার একটা গেট আছে। ঐখানে মঞ্চ তৈরি করা হয়। পাশেই ছিল কালীমন্দির, রমনা কালীমন্দির যেটা পাকবাহিনী '৭১ সালে ভেঙে ফেলে। পাশে মা আনন্দময়ীর আশ্রমও ছিল। আমরা নিজেরা ভিজিট করেছি

---

* ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ১৯৭১, ২৫ মার্চের পরবর্তীতে কুমিল্লার নিজ বাড়ি থেকে পাকিস্তান বাহিনীর দ্বারা গ্রেপ্তার হয়ে সেনানিবাসে নির্মমভাবে নিহত হন। তাই ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ : এ কথা ইতিহাসগতভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে আশ্রম, বসেছি সেখানে। এ আশ্রমটা অবশ্য আগে থেকেই উঠে গিয়েছিল। হতে পারে মা আনন্দময়ী ঢাকা থেকে চলে গিয়েছেন বলে। কালীমন্দিরটা কিন্তু তখন ছিল।

সে সময় আমি ঢাকাতে দুইটা মিটিং-এ এ্যাটেন্ড করি। এর মধ্যে একটা হচ্ছে রেসকোর্সের সেই মিটিংটা। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে : 'চুপ করো, বৈঠ যাও, খামস্ সে সুনো।' খুব বড় মিটিং ছিল সেটা এবং খুবই অরগানাইজড। তখনকার দিনের মুসলিম পপুলেশন বা ছাত্রদের মধ্যে 'কায়েদে আজম' খুবই পপুলার টার্ম। ইট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট ভিজিট ইন ঢাকা। দেশ তখন মুসলিম লীগের আমেজে আচ্ছন্ন। ছাত্ররা তখন ইনসপায়ারড বাই পার্টিশান এ্যান্ড ইনটেলিজেন্স অব জিন্নাহ। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে মোকাবিলা করার কারিশমা ইত্যাদি ব্যাপারের জন্যে জিন্নাহ তাদের কাছে তখনো 'মহান নেতা'। কাজেই পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তি বা ডিসইল্যুশনমেন্ট, যাকে আমরা বলি, সেটা তখনো শুরু হয়নি। সেদিন সম্ভবত ১৬ মার্চ, ১৯৪৮। কিন্তু আমার *মনে আছে জিন্নাহ সাহেবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করে ১১ মার্চে—এটা আমার মনে আছে। তা হলে জিন্নাহ সাহেব সম্ভবত ৮ মার্চ তারিখে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

জিন্নাহ সাহেবের সব কথা তো আমার মনে নাই। রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 'উর্দু এ্যান্ড উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে, একে বাঁচাতে হবে, রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে। এ্যান্ড আই ওয়ার্ন ইউ দ্যাট দেয়ার আর ফিফথ কলামিস্ট এমাংস্ট ইউ। কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না' ইত্যাদি। যে কথাটা এখনো কানে বাজছে সেটা হচ্ছে, এ্যাজ ফার এ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কনসার্নড 'উর্দু এ্যান্ড উর্দু এলোন শ্যাল বিদি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান।'

কমিউনিস্টদের ব্যাপারটা ওখানে উপস্থিত হাজার হাজার ছাত্রদের যতটা না উত্তেজিত করেছে তার চাইতে দশ গুণ বেশি উত্তেজিত করেছে 'কায়েদে আজম' এর ভাষাসংক্রান্ত ঐ মন্তব্যটা। ছাত্রদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক। জিন্নাহ সাহেবকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যে ছাত্ররা ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল... এ সমস্ত জায়গাতে গেট বানিয়েছিল। কিন্তু রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে সেই সব গেট তারা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে ফেলল।

---

* স্মৃতির কথা ঠিক না হতে পারে, অনেক সুহৃদ বলেছেন জিন্নাহ সাহেব এসেছিলেন ১১ মার্চের পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০. 'নো, নো, নো'!

এর একদিন পর কার্জন হলে স্পেশাল কনভোকেশনের আয়োজন করা হয়। সেই কনভোকেশনে জিন্নাহ সাহেব নিজ হাতে ডিগ্রির সার্টিফিকেট দেবেন—এমন কথা ছিল। সেই ডিগ্রির সার্টিফিকেট তিনি ডিস্ট্রিবিউট করেন তাঁর বক্তৃতার আগে কিংবা পরে। আমি তখনো পর্যন্ত আমার সার্টিফিকেট নিইনি। কার্জন হলের অনুষ্ঠানে প্রথমে ছিল শিক্ষকদের বসার জায়গা, তার পেছনে ছিল ছাত্ররা। আমি ইচ্ছে করলে শিক্ষকদের সঙ্গে বসতে পারতাম। শিক্ষকেরা তাদের জায়গা থেকেই ডিগ্রি আনতে স্টেজে যাবে। আমি সেখানে বসিনি। তা ছাড়া ডিগ্রি নিতে হলে আগে থেকে রেজিস্ট্রারের সাথে যোগাযোগ করে ফর্ম পূরণ করতে হত। সেসব কিছুই আমি করিনি।

জিন্নাহ সাহেব তাঁর স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে ইংরেজিতে ভাষণ দিলেন। রেসকোর্সেও ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে যখন শব্দ হয়েছে বা গণ্ডগোল হয়েছে, তখন উর্দুতে দুই-একটা কথা বলেছেন। কার্জন হলে তিনি উর্দুতে কিছুই বলেননি, তার প্রয়োজনও হয়নি। জিন্নাহ সাহেব যখন রাষ্ট্রভাষার কথায় এলেন তখন তিনি রেসকোর্সের কথাটাই রিপিট করলেন : 'আই টেল ইউ, এ্যাজ ফার এ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কনসার্নড 'উর্দু এ্যান্ড উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান।' এ সময়ে ছাত্ররা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে তিনটা আওয়াজ বের হয়েছিল। 'নো, নো, নো'। জাস্ট তিনটা শব্দ। কোনো গোলমাল নয়, হৈচৈ নয়। এই তিনটা শব্দই শুধু ছাত্ররা উচ্চারণ করেছিল পিছনের সারি থেকে। এই তিনটা আওয়াজ সে সময়কার রেডিও রেকর্ডিং-এ নিশ্চয়ই ছিল। পরে হয়তো মুছে ফেলা হয়েছিল। জিন্নাহ সাহেব হেজিটেড ফর এ সেকেন্ড এ্যান্ড স্টপড, বাট দেন হি কনটিনিউড হিজ ওউন স্পিচ এজ হি ওয়ান্টেড টু।

জিন্নাহ সাহেবকে এস্কর্ট করে কার্জন হলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কারা কারা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল, তা এতদিন পরে আর মনে নেই। তবে একটা কথা মনে আছে, জিন্নাহ সাহেবকে যখন এস্কর্ট করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কার্জন হলের পিছন দিকের গেটটা ব্যবহার করা হয়েছিল। সামনের গেট দিয়ে তাঁকে বের করা হয়নি।

জিন্নাহ সাহেব ১১ই মার্চের আগেই চলে গেছেন কিনা আমি জানি না কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ১১ মার্চ তারিখে যে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল তা ইতিহাসে আছে। আমি নিজেও পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলাম। কেননা পুলিশ তখনো পর্যন্ত আমার পিছনে লাগে নাই। আমি তখন শিক্ষকতা ছেড়ে এসেছি। বিভিন্ন সভা সমিতিতে যাচ্ছি। নিজেকে ওপেন রেখেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান হওয়ার পর ইডেন কলেজের বিল্ডিংটা সরকার দখল করেছে। সেটাই তখন সেক্রেটারিয়েট। মিনিস্টাররা সেখানে অফিস করা শুরু করেছিল। ইডেন কলেজটা তখন চলে গেছে ওয়াইজ ঘাটে এখন যেখানে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী সেখানে। মনে পড়ছে, কার্জন হলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা একেবারে সেক্রেটারিয়েটে চলে গেছে, আমরা ছাত্ররা সব মিছিল করে সে রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। তোহাও পিকেটিং-এ পার্টিসিপেট করেছিল। ১১ মার্চের পিকেটিং-এর সময় তোহাকে সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে নির্মমভাবে পেটানো হয়েছিল।*

একটা ঘটনা আমার মনে আছে যে, ছাত্ররা সেক্রেটারিয়েট থেকে একজন মিনিস্টারকে বের করে এনেছিল। তিনি এডুকেশন মিনিস্টার বা অন্য কোনো মিনিস্টার হবেন। কোন মিনিস্টার তিনি ছিলেন তা মনে নেই তবে এটা মনে আছে যে তার বাড়ি ছিল পিরোজপুরে। ছাত্ররা তাকে ধরে এনে একটা বাক্সের উপর উঠিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আপনি এখন বলেন।' তখন ঐ লোক ভয় পেয়ে বলেছে, 'বাবারা তোমরা শোনো। বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দি বেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি বাংলা ভাষাকে সাপোর্ট করি।' ছেলেরা তখন সেই মিনিস্টারের কাছে দাবি জানিয়েছিল : আপনাদের রিজলিউশন নিতে হবে, বাংলাকে পাকিস্তানের ওয়ান অব দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজেস অব পাকিস্তান ঘোষণা করতে হবে।

এখনো মনে পড়ছে, পিকেটিং করার সময় আমি তাজউদ্দীন আহমদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি মেইন পোস্ট অফিসের সামনে। মেইন পোস্ট অফিসটা ছিল এখন যেখানে টি এন্ড টি অফিস সেখানে। তখন তো আর এলাকাটা এখনকার মতো ছিল না, আরো ছোট ছিল। পশ্চিম পাশে যে এক্সটেনশন সেটাই ছিল মেইন বিল্ডিং। পাশে একদিকে ছিল খেলার মাঠ। এখন আপনারা আর রিকলেক্ট করতে পারবেন না, অন্তত আমি যেভাবে পারি সেভাবে পারবেন না। এর একপাশে ছিল ব্রিটানিকা সিনেমা যেখানে ইংরেজি ছবি দেখানো হত, আর এক সাইডে ছিল নবাবদের একটা বড় রেস্টুরেন্ট : ডিয়েনফা।

এ সময় থেকে মুসলমান ছাত্রদের মোহমুক্তি শুরু হল। সবার অবশ্য হল না মোহমুক্তি। ছাত্রলীগ গ্রুপিং ছিল, শাহ আজীজ গ্রুপ ছিল, তোয়াহাদের গ্রুপ ছিল। আমি মুসলিম লীগের কেউ ছিলাম না। কিন্তু তোয়াহা ওয়াজ প্রমিনেন্ট মুসলিম লীগ লীডার। তাজউদ্দীন ওয়াজ প্রমিনেন্ট মুসলিম লীগ লীডার অব ইস্ট বেঙ্গল। কামরুদ্দীন আহমদ ছিলেন। তিনি অবশ্য স্টুডেন্ট ছিলেন না।

---

* স্মৃতি বলছে পুরোনো জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং-এ তাজউদ্দীন আহমদের পাশে তোহা এবং আমি : আমরা দুজনেই ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তার স্টুডেন্ট সাপোর্টাররা ছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের মার্চ—এই কয়েক মাসেই পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তি হয়ে গেল ছাত্রদের। এই মোহমুক্তিটা একটা এ্যাগ্রেসিভ রূপ নিল ১৯৫২ সালে। এটা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ সময় নানান জনে নানান কথা বলছেন। মুসলিম লীগের মিনিস্টার ফজলুর রহমান সাহেব এ্যাডভোকেটেড : বেঙ্গলি শুড বি রিটেন ইন অ্যারাবিক হরফ, ইন এ্যারাবিক লেটার্স। ১৯৪৮-এর মোহমুক্তিটাই ম্যাচিউর করল ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে।

আমরা সাধারণত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করি। তা কিন্তু নয়। ভাষা আন্দোলনের শুরু হয়েছিল আরো আগে, ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের আগে। ভাষা নিয়ে যখন প্রাদেশিক পরিষদে আলাপ আলোচনা শুরু হয় তখন এই মোহমুক্তির ঘটনা কিছুটা ঘটতে শুরু করে। আগেই বলেছি, পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লিতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব দিয়েই ভাষা আন্দোলনের শুরু। সে জন্যে আমি মনে করি এবং অনেকেই এটা বলেছেন যে, ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ বা সৈনিক যদি আমরা কাউকে বলতে চাই তবে বলা উচিত, তিনি হচ্ছেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের প্রথম উপস্থাপক। '৭১ সালে তিনি যেভাবে নির্মমভাবে নিহত হলেন পাক আর্মীর দ্বারা, তাতে তিনি তাঁর জীবনের যে আদর্শ ছিল সে আদর্শের জন্যে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে গেলেন—এটা বলতে গিয়ে আমি আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি।

AMARBOI.COM

২১. আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন

'৪৮-এর মাঝামাঝি থেকেই আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে। আন্ডারগ্রাউন্ডের প্রথম দিকে আমি শহরেই ছিলাম। আন্ডারগ্রাউন্ড মানে কারো সঙ্গে গোপনে কনটাক্ট করা, কোনো কমরেডের সঙ্গে দেখা করা, সন্দেহকারীকে ধোঁকা দেওয়া কিংবা তারা আমার সঙ্গে কনটাক্ট করে বলল : অমুক জায়গায় অমুককে পাওয়া যাবে।

তখনো হলে আমার সিট ছিল টিচার হিসেবে। আমি নিজেকে টিচার বা লিডার বলে মনে করতাম না। আমি এখনো স্টুডেন্ট—এই চিন্তাই আমার মাথায় ছিল। এ সময় ফজলুল হক হলে আমার একটা সিট ছিল। মুজাফফর আহমদ চৌধুরী সাহেবও তখন ফজলুল হক হলে থাকতেন। ফজলুল হক হলের ইস্ট উইঙের একেবারে সাউদার্ন ব্লকে ছিল তাঁর সিট। সুতরাং হলে আমি একা নই : কিন্তু মুজাফফর আহমদ চৌধুরীকে কেউ এ্যাটাক করছে না। জঙ্গি গ্রুপটা মনে করছে, সরদার ফজলুল করিম কমিউনিজমের বীজ ছড়াচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম লীগের ছেলেরা এসে আমাকে হল থেকে বের করে দিল। তোয়াহা সাহেবের এক চাচা খয়ের ছিল ঐ জঙ্গি গ্রুপের একজন লিডার। খয়েরের নাম এখনো পাওয়া যেতে পারে ইতিহাস ঘাঁটলে। ওরা ঠিক করল : আমরা সরদারকে বের করে দেবো। জঙ্গি ছাত্রদের বলা হয়েছিল, 'তোরা কেউ সরদারের সাথে আর্গুমেন্ট করবি না। কেন থাকতে পারবেন না ইত্যাদি কোনো কথাই বলবি না। ওরে ধরবি আর টাইনা বার করে দিবি। তার সাথে আগুর্মেন্টে গেলে পারবি না।' ওদেরও ধারণা, সরদার ফজলুল করিম কোনো খারাপ লোক না। মারামারির লোক না। এ্যান্টি-হক মুভমেন্টের সময় আমাকে হেক্‌ল করা হয়েছিল। এ্যান্টি-হক মুভমেন্ট হয়েছিল আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়।

ওরা এসে আমাকে বলল, 'আপনি হলে থাকতে পারবেন না।' তখন আমি, ইন মাই ওন ন্যাচারাল ওয়ে, বলেছি, 'না, আমি থাকবো না। হলের একটি ছেলেও যদি অবজেক্ট করে, যদি অবজেকশান দেয় যে আমি হলে থাকতে পারবো না, তবে আমি হলে থাকবো না।' এ উত্তর শুনে তারা খুশি হল। আমার উপর কোনো হাতটাত না উঠিয়ে 'নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর' শ্লোগান দিয়ে 'চল চল' বলে চলে গেল।

এবার আমাকে পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হল। আগে যা-ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে পারতাম, খেতে পারতাম এর ওর বাসায়, এখন তাও বন্ধ হল। আমাকে বলা হল, 'তুমি এভাবে ঘুরতে পারবে না। আজ তুমি গ্রেপ্তার হচ্ছো না বলে যে কালও হবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি তখন পার্টিকে বললাম, 'আমাকে শেল্টার দাও'। পার্টি তো একটা ছোট অরগানাইজেশন, মিলিট্যান্ট বটে কিন্তু প্রধানত একটা থিওরেটিক্যাল পার্টি। তার একটা থিওরি আছে, একটা প্রগ্রেসিভ আউটলুক আছে। এই প্রগ্রেসিভ আউটলুক দিয়েই তারা বিভিন্ন ছেলেদের যোগাড় করার চেষ্টা করে। তখন ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বা সেক্রেটারিয়েটের সভা ডাকা হল। তাদের তো আরো নানান ইস্যু আছে। সেইসব ইস্যুর মধ্যে এটাও একটা ইস্যু যে সরদার তো রিজাইন দিয়েছে। এখন তাকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তার আত্মীয়ের বাসায় তো সে থাকতে পারে না। কোথায় তাকে রাখা যায়? কমিউনিস্ট পার্টির যে খুব একটা বড় বেইজ ছিল, খুব স্ট্রং, তাতো না। পারিবারিক কারণে অনেক হিন্দু কমরেড তখন ভারতে চলে যাচ্ছেন। পার্টিতে খুব সাংঘাতিক একটা কর্মী ও নেতা-সঙ্কট চলছে।

পার্টি আমাকে রাখতে পারছে না ঢাকায়। কোনো সেফ জায়গা নেই। কোথায় রাখবে? আমাকে তখন বলা হল, তুমি বরং কলকাতায় চলে যাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে গিয়ে তুমি অমুক ঠিকানায় রিপোর্ট কর। সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। তখনো পাসপোর্ট হয়নি। কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা সতর্কতা ততদিনে ডেভেলপ করেছে যে, কোনো ইউজুয়াল পথ আমার ব্যবহার করা চলবে না। তখন কলকাতা যাবার ইউজুয়াল পথটা ছিল এরকম : ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে শিয়ালদা। আমি একটু ডাইভার্স রুট নিলাম। আমি ঢাকা থেকে ট্রেনে গেলাম পাবনা ঈশ্বরদী। ঈশ্বরদী থেকে পাবর্তীপুর। এভাবে নর্থ বেঙ্গল হয়ে আমি কলকাতায় রিচ করলাম। তাতে করে আমার মনে একটা সেন্স এসেছিল যে, আই অ্যাম সেফ, কেন না এত ঘুরেটুরে এসেছি। পথে তো কেউ বাধা দেয়নি, কেউ জিজ্ঞেসও করেনি।

ঢাকা থেকে কলকাতায় গিয়ে যারা রিফিউজি হয়েছিলেন, তারা আমাকে আশ্রয় দিলেন। আমি দেখলাম যে তাদের অবস্থাও বড় খারাপ। তখন হঠাৎ একদিন আহসান হাবীব সাহেবের সঙ্গে দেখা হল আমার 'দৈনিক ইত্তেহাদ' অফিসে। কবি আহসান হাবীব। তিনি আমার পারিবারিক ভাই ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেছেন একেবারে কিড অবস্থায়, আমি যখন ক্লাস এইট নাইনে পড়তাম।

দৈনিক আজাদ হয়তো তখন ঢাকায় এসেছে, কিন্তু দৈনিক ইত্তেহাদ আসেনি তখনো। আহসান হাবীব ইত্তেহাদের সাহিত্য সম্পাদক। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন ইত্তেহাদের এডিটর। রোকনুজ্জামান তখনো কলকাতায়। পার্ক সার্কাসে যে বাড়িটাতে আহসান হাবীব সাহেব থাকতেন সেই একই বাড়িতে রোকনুজ্জামানও থাকতেন।

আমি কলকাতায় গিয়ে নিজেকে খুব ফ্রি বোধ করলাম। চৌরঙ্গীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি ট্রাফিক দেখছি, ট্রামে চড়ছি। আমি ভাবছি, এখানে আমাকে কে চেনে? চিনবে কে? হাবীব ভাইকে একদিন বললাম, আমার তো থাকার জায়গার খুব অসুবিধা। রিফিউজিরা খুবই কষ্টেসৃষ্টে আছেন, কেউ চৌকির উপরে, কেউ নিচে—এভাবে থাকছেন। আমি যে এই সমস্ত রাস্তায় গেছি তা হাবীব ভাই খুব একটা জানতেন না। তিনি বললেন, আমি তোমার বড় ভাই। তুমি কলকাতায় এসেছো, তুমি আমার বাসায় থাকো।' এটা বলাতে আমি আমার সামান্য বিছানাপত্র যা ছিল তা নিয়ে পার্ক সার্কাসে আহসান হাবীব সাহেবের বাসায় গিয়ে উঠলাম।

কদিন ওখানে ছিলাম বলতে পারবো না। একদিন শেষরাতের দিকে তিনি পত্রিকা অফিস থেকে ফিরেছেন কাজটাজ করে। তখন তিনি বিয়েও বোধ হয় করেছেন। আমাকে যে ঘরে তিনি শুতে দিয়েছিলেন তার পাশের ঘরে ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোকনুজ্জামান, পরে সে আমাকে বলেছে। সেই ঘরে নকিং হচ্ছে। হাবীব ভাই যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?' তখন উত্তর এল, 'আমরা পুলিশের লোক। দরজা খুলুন।' তখন হাবীব ভাই আর কি করবেন, উনি জীবনে তো পুলিশ দেখেননি। দরজা খুলে দিলেন। তখন কয়েকটা লোক, সাদা কাপড়ে বোধ হয়, অর্থাৎ ইউনিফর্মে না, অর্থাৎ আই বি ডিপার্টমেন্টের লোক, তারা হাবীব ভাইকে বলল যে, স্যার আমাদের খবর আছে, আপনার এখানে একজন ইস্ট বেঙ্গলের পলিটিক্যাল এ্যাবসকন্ডার আছে। তখন এটা সাংঘাতিক টার্ম : 'পলিটিক্যাল এ্যাবসকন্ডার'। এ ধরনের লোককে যে রাখে তার অবস্থা কিন্তু নিরাপদ না। হাবীব ভাই বললেন, 'আমার এখানে পলিটিক্যাল এ্যাবসকন্ডার কেন থাকবে?' তখন পুলিশ বলল, 'আপনার এখানে কে কে আছে?' তিনি প্রথমে নিজের ফ্যামিলি মেম্বারদের কথা বললেন। তারপর বললেন যে তাঁর বাড়িতে একজন রিলেটিভ আছেন। পুলিশ এবার বলল, 'কই আপনার সেই রিলেটিভ কোথায়? তাকে ডাকুন। আমরা তাকে একটু দেখবো।'

হাবীব ভাই আমাকে ভিতরের ঘরে ডেকে নিলেন। আমাকে বললেন, 'করিম ('করিম' বলে ডাকতেন তিনি আমাকে) কি করবো? ওরা তোমাকে দেখতে চায়!' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমি যাবো।' খুব স্মার্টলি বললাম কথাটা। আমি তো অত চিন্তাভাবনা করে কথা বলতাম না, যখন যা দরকার হয় বলার তা বলতাম। যখন যা দরকার হয় করার তা করতাম। আমি যে মাস্টারি শুরু করেছিলাম, তাও অত চিন্তাভাবনা করে করিনি। টিচার ক্রাইসিস হয়েছিল বলেই মাস্টারি করতে রাজি হয়েছিলাম। স্যার বলেছেন, 'তুই কালকে থেকে ক্লাস নে, আমি নিতে শুরু করলাম।' আমাকে পার্টি বলেছে, 'তুমি এ্যারেস্টেড হয়ে যাবে। তুমি চাকরি করতে পারবে না। তুমি রিজাইন দাও।' আমি রিজাইন দিলাম। পার্টিকে বলেছি, 'আমাকে রাখার ব্যবস্থা করো।' পার্টি বলেছে, 'তোমাকে কোথায় রাখবো?' এর পর তারা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি চলে গেছি কলকাতায়। তারাই বলেছে, এই পথ দিয়ে যাও, সোজা গোয়ালন্দের পথ দিয়ে যেও না। ন্যাচারালি, নিশ্চয়ই তারা আমাকে এ্যাডভাইস করেছে।

ঢাকাতে আমি কোনো সাংঘাতিক কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল লিডার ছিলাম না। ঢাকায় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পুরোনো সব আই বি অফিসার তারা ইস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে সাহায্য করেছে বাই গিভিং লিস্ট অব দি মুসলিম স্টুডেন্টস এন্ড আদার্স হু আর কমিউনিস্ট মাইন্ডেড। এই লিস্টিটা তারা দিয়ে গেছে। এই লিস্টি অনুযায়ী তারা সবাইকে ফলো করছে। কারণ এ্যারেস্ট তো এমনি করা যায় না। অ্যাকশনের উপর তো এ্যারেস্ট করবে। বিনা এ্যাকশনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো এ্যারেস্ট করা যায় না। তখনো তো কমিউনিস্ট পার্টি ইললিগাল না। একজন যদি কমিউনিস্ট থাকেও তবুও তাকে এ্যারেস্ট করার যে ফর্মালিটি সেটা তো আনা যায় না। ওয়াচ করার ব্যাপারটা আছে। ওয়াচিংটাও কিছুদিন পর্যন্ত এ্যাভয়েড করা গেছে। আমি তো গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতায় যাইনি, আমি গিয়েছি পার্বতীপুর হয়ে। কলকাতায় গিয়ে আমি খুব ফ্রি ফিল করছি। সেই ফ্রিনেসটা ধাক্কা খেলো একদিন শেষরাতে যে কথা আগেই বলেছি।

ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখলাম, গোটা পাঁচ-ছয় লোক। ওরা আমাকে অবজার্ভ করল, আগা সে মাথা, মানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এরপর তারা আমাকে প্রশ্ন করল, 'আপনার নাম কি?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমার নাম ফজলুল করিম।' 'সরদার' শব্দটা আমি বাদ দিলাম। তেমন কিছু ভেবে নয়, এমনিই স্পন্টেনাসলি। 'আপনি কি করেন?' আমি বললাম যে আমি কলেজে পড়ি। 'কী পড়েন?' 'কোথায় পড়েন?' আমি বললাম যে আমি চাখার কলেজে পড়ি। কি কি বলেছিলাম, আমার সব মনে আছে। আমি এইভাবেই জবাব দিয়েছিলাম। 'কী পড়েন?' আমি বললাম 'আমি বি এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম গত বছর। আমি পাস করতে পারি নাই। এ বছর আবার দেবো।' বাড়ি কোথায়? বলেছি : 'বরিশালে'। 'কেন এসেছেন?' 'আমি এখানে বেড়াতে এসেছি'। পুলিশের লোকজন তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল, 'নো, নো, নট দিজ ওয়ান। সাম বিগ গাই। সাম বিগ সরদার ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল।' এ কথাটাও আমার মনে আছে। ওরা আমাকে পছন্দ করছে না। যখন ইস্ট বেঙ্গল পুলিশ আমাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছে তখন তারা আমার নাম বলেছে, 'সরদার ফজলুল করিম, কমিউনিস্ট লিডার ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল'।

সন্দেহ হলেই কাউকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গ্রেপ্তার করে না। পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তির পেছনে স্পাই লাগায়। সেই স্পাই কখনো সামনে থাকে না, সব সময় পিছনে থাকে। পিছন থেকে ওয়াচ করে, দেখিয়ে দেয়—ঐ যাচ্ছে। একসাথে যায় না, দশগজ পেছনে থেকে ফলো করে এবং তারপর রিপোর্ট করে। ওদের তো চাকরিই ওটা। আমাকে যে কলকাতাও ফলো করা হচ্ছে এটা আমার মাথার মধ্যে ছিল না। আমি যখন চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকছি, ট্রাম দেখছি, ট্রামে উঠছি কিংবা ইত্তেহাদ অফিসে যাচ্ছি, আহসান হাবীব সাহেবের সাথে কথা বলছি, তখন তো আমার মাথার মধ্যে নাই যে আমার পেছনে একটা শ্যাডো আছে। আমি হাঁটছি, সেও হাঁটছে। আমি থামলে সেও থামছে। আমি যদি এই ব্যাপারটা খেয়াল করতাম তা হলে আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তা আসত যে, আই এ্যাম বিয়িং ফলোড। আই শুড বি মোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কশাস। এই কথাটা কিন্তু ঐ রাত্রের হামলার আগ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে আসে নাই। তখন আমার বন্ধু মোহাম্মদ আবুল কাসেম কলকাতায় আছে। অন্যান্য বন্ধুরা আছে, তাদের বাসায় যাচ্ছি।

পরদিনই আমি আহসান হাবীব সাহেবের বাসা ছেড়ে চলে আসি। দ্যাট ওয়াজ এ রোমান্টিক এসকেপ। সেখান থেকে আমি কোথায় গেলাম মনে নেই। কিছু দিন পরে আমি ইস্ট বেঙ্গলে ফিরে এলাম। কতদিন পরে ফিরে এলাম, কোন রুট দিয়ে এলাম তা এতদিন পরে আর খেয়াল নেই। এটা ৪৮-এর শেষ বা ৪৯-এর প্রথম দিকে হবে। ঢাকায় এসে আমি যেখানে রিপোর্ট করার দরকার সেখানে রিপোর্ট করলাম। কিন্তু কলকাতাতেও যে পুলিশী হামলা হয়েছিল সেটা অবশ্য তাদের জানালাম না।

আমি আর কি করবো? পার্টির কথায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে নিয়ে পার্টি করবে কি? আমাকে দিয়ে কি তারা ধান ভানাবে? আন্ডারগ্রাউন্ড থাকাটাই হচ্ছে এখন কাজ যতদিন পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে জীবন রক্ষা করা যায়। পার্টিকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি এখন কি করবো? পার্টির যারা অরগানাইজার অর্থাৎ সেক্রেটারিয়েটের সদস্য তারা আমাকে ছোট ছোট স্লিপ পাঠাত। এইসব স্লিপে লেখা থাকত আমাকে কী করতে হবে। এসব স্লিপ অবশ্য রোজ তারা পাঠাত না আমাকে। তখন কমিউনিস্ট পার্টির অফিস বলে কিছু নেই। শাহ আজিজেরা আক্রমণ করার আগে একটা অফিস ছিল, সেখানে আলোচনা সভা বসত।

AMARBOI.COM

২২. 'আন্ডারগ্রাউন্ড' : মাটির তলে

পার্টি আমাকে একদিন একজন কুরিয়ার মারফত স্লিপ পাঠাল আমার কাছে। মেসেঞ্জারকে পার্টির ভাষায় বলা হত 'কুরিয়ার'। স্লিপে বলা হল, কুরিয়ার যাচ্ছে তোমার কাছে। তুমি এর সাথে চলে যাও। কোথায় যাবো সেটা জানতাম না। গিয়ে দেখলাম জায়গাটা নরসিংদীতে, মনোহরদির চালাকচরে। সুন্দর সাজানো জায়গা। আমার খুব ভালো লাগল।

কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াজ নট এ উইক পার্টি ইন ইস্ট বেঙ্গল। কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াজ এ্যান অরগানাইজড পার্টি। আবুল হাশেম সাহেবের মুসলিম লীগের সঙ্গে তাদের একটা লিয়াজোঁ ছিল। আবুল হাশেম সাহেবের যে পার্সোনাল সেক্রেটারি, সে একজন কমিউনিস্ট ছিল। বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির বেইজ ছিল। আমি ঢাকার কথা বলতে পারি। অন্যান্য জায়গার কথা তেমন বলতে পারি না। নলিনী দাশ, মুকুল সেন এঁরা ছিলেন বরিশালের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালাকচরে কমিউনিস্টদের একটা সিমপ্যাথেটিক বেইজ ছিল প্রধানত প্রাইমারি স্কুল টিচারদের মধ্যে* এবং তার চাইতেও বেশি বারুইদের মধ্যে। বারুই হচ্ছে পানচাষী—অর্থাৎ যারা পানের বরজ করে। চালাকচরের কাছেই শরীফপুর নামে একটা এলাকা ছিল। সেখানেও বারুইদের একটা কমিউনিটি ছিল। এই চালাকচরে আবুল হাশেম সাহেব পাবলিক মিটিং করেছিলেন এবং নবাববাড়ির গ্রুপ এই মিটিংটা এ্যাটাক করেছিল।

আমার প্রকৃত পরিচয়টা পার্টি চালাকচরের লোকজনকে জানায়নি। পার্টি হয়তো বলে পাঠিয়েছে, 'মজিদ সাহেবকে পাঠালাম।' যখন কোনো হিন্দু বাড়িতে থাকতে হয়েছে, তখন আমি নতুন একটা নাম নিয়েছি, যেমন ধরুন, অশোক। মুসলিম হিসেবে আমাকে তো হিন্দুরা তাদের খাবারঘরে নিয়ে যাবে না। হিন্দু বাড়িতে খাওয়ার কিছু কাস্টম আছে, যেমন খাবার সময় ডান হাত দিয়ে গ্লাস ধরতে হবে। কাসার থালা বাটিতে খেতে হবে। আমি এসবে বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েরা আমাকে ছোটভাই বলে ডাকত। কেউ হয়তো আমার কমরেডের ওয়াইফ, তাকে বউদি বলে ডাকতাম। কোয়ায়েট হোমলি ওয়েতে ছিলাম।

এই এরিয়ার বড় নেতা যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল অন্নদা পাল। তিনি একজন বিখ্যাত আন্দামান ফেরত স্বাধীনতা সংগ্রামী। আন্দামান সেলুলার জেলে তিনি দীর্ঘদিন রাজবন্দি ছিলেন। অন্নদা পালকে পরবর্তীকালে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে হয় পারিবারিক কারণে। তিনি মারা গেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গলেই, এখানে না। এই আন্দামান সেলুলার জেল ইন্ডিয়ান সোসালিস্ট মুভমেন্টে বেশ বড় একটা অবদান রেখেছে।

আমার এক বন্ধু অনিল মুখার্জীও আন্দামানে রাজবন্দি ছিলেন। তিনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক নেতা। অনিল মুখার্জী একজন ভালো লেখক ছিলেন। তিনি একজন এমিয়েবল এবং সাউন্ড থিওরেটিশিয়ান ছিলেন। তার 'সাম্যবাদের ভূমিকা' এবং 'শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি' নামে দুটি বই আছে। তিনি কাজ করতেন নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের মধ্যে। কমিউনিস্ট পার্টি যখন ভালো ভালো মুসলিম ছাত্রদের সংগ্রহ করছে, তখনই তার সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি সে সময়েই আমাকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে গেছেন, মিটিং-এ বক্তৃতা দিইয়েছেন আমাকে দিয়ে।

---

* চালাকচরের প্রাথমিক শিক্ষক আখতারুজ্জামান খুবই গুরুত্বপূর্ণ কমরেড ছিলেন। তিনি আজ নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিলদা'র কাছ থেকে আমি আন্দামানের জেল সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছিলাম। কোনো কয়েদির যদি দশ বছরের বেশি কারাদণ্ড হয়ে যেত কোনো অপরাধে বা কোনো রাজনৈতিক কারণে তবে তাকে কলকাতা থেকে জাহাজে করে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হত। আন্দামানের নাম ছিল কালাপানি। লোকে ভাবত, ওখানে যাকে পাঠানো হয় সে আর ফেরত আসে না, আসতে পারে না। সেলুলার জেলে যে শুধু আন্দোলনের বড় বড় নেতাদেরকেই পাঠানো হয়েছে তা না, সাধারণ কয়েদিদেরও সেখানে পাঠানো হয়েছে। আন্দামান মানুষের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে উঠেছে প্রধানত আন্দামান জেলের কয়েদিদের দ্বারা। ওখানে যাওয়ার পর সাধারণ বন্দিরা বাইরে ঘোরাফেরা করত, কাজকর্ম করত, জেলের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করত, চাষ করত।

আন্দামানের সাধারণ কয়েদিদের কয়েক বছর পর ছেড়ে দেওয়া হত। জেল থেকে বের হয়ে তারা ওখানকার মেয়েদের বিয়ে-সাদি করত। কিন্তু পলিটিক্যাল প্রিজনার যারা তাদের বের হতে দিত না সেলুলার জেল থেকে। অনিলদা বলেছিলেন, আন্দামান সেলুলার জেলে তাঁরা কেমন করে কাজ করেছেন। কেমন করে আন্দামান সেলুলার জেলে অনশন ধর্মঘট করে তারা সেখানকার নিয়মকানুনে পরিবর্তন আনেন এবং কেমন করে আন্দামান সেলুলার জেল ওয়াজ চ্যাইঞ্জড ইন টু এ মার্কসিস্ট ইউনিভার্সিটি।

কংগ্রেস নেতা, কোয়াইট এ নাম্বার, ছিলেন সেলুলার জেলে। কংগ্রেসের মধ্যে যে সেকশানটা কমিউনিস্ট মাইন্ডেড হয়ে যায় এই আন্দামানেই তারা চেঞ্জ হয়ে যায় থ্রু রিডিং কমিউনিস্ট লিটারেচার। এই লিটারেচার তারা নানাভাবে সংগ্রহ করত। আন্দামান সেলুলার জেলের যিনি সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন তিনি ছিলেন একজন আইরিশ। ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তার একটা সফট কর্নার ছিল। যত সব কমিউনিস্ট লিটারেচার তা সে রাজবন্দিদের এনে দিত পড়ার জন্যে। কমিউনিস্টেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে করে এই লিটারেচারগুলো পড়ত। এসব পড়েই অগ্নিযুগের বেশ কিছু বিপ্লবী, সবাই না অবশ্য, বেশ কিছু কমিউনিস্টে পরিণত হয়। তারা তো এক-দুই বছর না, বহু বছর সেখানে কাটিয়েছেন।

আমি যে সরদার ফজলুল করিম তা চালাকচরের সবাই জানত না। মনে করুন, আমাকে একটা মুসলিম বাড়িতে রেখেছে। সেখানে ছাত্র আছে। কোনো ছাত্রের সাথে আমি হয়তো গল্প করছি। পড়াচ্ছি তাকে, কিছু একটা করে দিন কাটানো আরকি। বাড়ির যে মুরুব্বী সে অবশ্য জানে আমি কে এবং আমার সমস্ত তদবীর তদারক তিনিই করছেন। রাত্রে সাধারণত আমি কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোন প্রেসে থাকতাম না। এই যেমন ধরুন, কোনো একটা গরুর ঘর, তার মধ্যে বিছানাপত্র বিছিয়ে আমি থাকতাম। গরিব এলাকা ছিল। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তেমন কোনো চাহিদা ছিল না আমার। হয়তো কোনোদিন একটি পুঁটিমাছ দিয়ে বা কোনোদিন পাটকাঠি দিয়ে শুঁটকি মাছ পুড়িয়ে তা দিয়ে কিছু ভাত খেলাম। সে এলাকায় সাধারণ মানুষ সব সময় ভাত খেতে পেত না। একটা সময়ে তাদের কম খেতে হত। ওটা আবার কাঁঠালের এরিয়া ছিল। কাঁঠালের সিজনে, সকাল বেলা কিছু কাঁঠাল দিত, সেই কাঁঠালের কোষ খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি রোমান্টিক লাইফ ফর মি।

'৪৯-এর প্রথম দিক থেকে শুরু হয় আমার এ জীবন। কেমন করে দিন কাটত আমার? একদিন এক কমরেড হয়তো বলল, 'চলেন মজিদ সাহেব আজ অমুক জায়গায় একটা আলোচনা আছে।' সেখানে গেলাম তার সাথে। সেই আলোচনা সভায় আমার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে এই সমাজ, তার মানুষ এবং তার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে কিছু বললাম। দৈনন্দিন আন্দোলন সম্পর্কে তেমন কিছু অবশ্য বলা হত না। এর মধ্যে যারা একেবারে কমিউনিস্ট নেতা যিনি, তিনি জানেন আমি সরদার ফজলুল করিম। অন্যরা জানে, মজিদ মিয়া হিসেবে কিংবা বারুই কমিউনিটির মধ্যে অশোক হিসেবে।

সে সময়ের দু'একটি গল্প করা যায়। একদিন ক্লাস এইট না নাইনে পড়ে এমন একটি কমিউনিস্ট ক্যাডার ছেলে আমাকে বলছে, 'মজিদ সাহেব, আপনি ঢাকা শহরটহর চেনেন? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কিছু চিনি।' তখন ছেলেটা বলল, 'সেখানে আমাদের একজন বড় নেতা আছে, আপনি জানেন?' আমি বললাম, আমি তো জানি না। তখন ছেলেটি বলল, 'তার নাম হচ্ছে সরদার ফজলুল করিম।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি নাম শুনেছি কিন্তু দেখি নাই।' ছেলেটি তখন বলে, 'আমি তার কাছে যাবো, তার সঙ্গে দেখা করবো।' আমি হয়তো তাকে তখন বলেছি, 'যাওয়ার আগে আমার একটা চিঠি নিয়ে যেও।' এখনো ঐ এলাকার লোক আমাকে নিতে চায় ওখানে। কিন্তু আমার তো খুব একটা মুভমেন্ট নাই ইদানীং। তাদের মনে সাংঘাতিক রোমান্টিক সব আইডিয়া ছিল এ্যাবাউট সরদার ফজলুল করিম। তারা এই ভেবে গর্ব বোধ করে যে, 'সরদার ফজলুল করিম আমাদের এখানে থাকতো।' ছেলেটি বলেছিল যে সরদার ফজলুল করিম ওদের নেতা। মুসলমানদের মধ্যে কোনো কমিউনিস্ট নেতা আছে এটা সে যুগে তাদের জন্যে একটা গর্বের ব্যাপার ছিল।

তখন প্রাইভেট লাইফেও, কৃষকদের মধ্যে, গ্রামে, ঘড়িটা ছিল আনইউজুয়াল। কোনো মানুষ ঘড়ি পরতে পারে এটা তাদের ধারণার বাইরে ছিল। আমার একটা রিস্টওয়াচ তখন ছিল, পুরোনো টাইপের, আমি কেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতাম যে রাস্তাঘাটে যখন আমি হাঁটি তখন যেন হাতে ঘড়ি না পরি। গ্রামে আপনি তো একা হাঁটবেন না। আপনার পাশে আরো লোক যাবে। গ্রামের লোক, দে উইল পিক আপ ডায়ালগ উইথ ইউ, 'আরে ভাই আপনি কই যাবেন?' 'আমি অমুক জায়গায় যাবো।' 'আপনি কী করেন?' 'আমি মেট্রিক পড়ি, স্কুলে পড়ি।' ডেইলি লাইফটা ছিল ওখানে এ রকম। গোপন লাইফটা ছিল সাধারণত একই জায়গাতে না থাকা। না থাকা মানে আমি যে থাকতাম না তা নয়, ওরাই আমাকে রাখত না। যারা রেখেছে তারা তো বোঝে, বিপদ কতটা! এর আগে অলরেডি কমিউনিস্টদের উপর হামলা আরম্ভ হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গাতে এ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে তারা। সুতরাং এরা আমাকে বিভিন্ন পিকুইলিয়ার জায়গায় রাখত। পুলিশ যদি রাত্রে হামলা করে, তাদের ঘরের উপর হামলা করলেও গোশালায় তো আর হামলা করবে না! সে গরুর ঘর ইজ সেইফার। আমার তো কোনো অসুবিধা ছিল না।

কয়েক মাস আমি চালাকচরে ছিলাম। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে আমার কাছে একটা গোপন মেসেজ যায়। মেসেজটা হচ্ছে এই যে, ঢাকাতে অত তারিখে তুমি আসো। এখানে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিটির একটা মিটিং হবে। তখন ছিল ডিসেম্বর মাস। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হল। নারায়ণগঞ্জ থেকে রায়পুরা যেতে যে লোহার ব্রিজটা আছে ঘোড়াশালের মহোহরদী এলাকায় সেটা পার হতে হয়েছিল এটা মনে আছে। মনোহরদী, হাতিরদিয়া—এসব জায়গা আমার পরিচিত। এই হাতিরদিয়া কিন্তু আমাদের আসাদের বাড়ি। আমি আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থাতেও ঢাকা থেকে ওখানে যাতায়াত করেছি। এস্কর্ট (মানে বাহক) হয়তো একজন ছিল। কিন্তু আমি মোটামুটি রাস্তাটা চিনে গিয়েছি : টঙ্গী থেকে ট্রেনে করে ঘোড়াশাল গিয়ে ওখানে স্টেশনে নেমে তারপর পায়ে হেঁটে গেছি অনেক বার।

গ্রাম থেকে নিয়ে এসে অর্গানাইজেশন আমাকে একটা বাসায় উঠাল। এই বাসাটা হচ্ছে সন্তোষ গুপ্তের বাসা। সন্তোষ গুপ্ত নিজেও তখন কমিউনিস্ট। ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মিটিং চলছিল সেই বাসাতে। কারণ ইতোমধ্যে অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। অনেক লিডার গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। এখন ডিস্ট্রিক্ট কমিটির অবস্থাই বড় কাহিল। এখন এমন একজন কাউকে দরকার যে কিছুটা গাইড করতে পারবে। কাকে দেওয়া হবে এই দায়িত্ব এই প্রশ্ন যখন করা হল তখন সরদার ফজলুল করিমের নাম এল। সরদার ফজলুল করিমকে রাখার ব্যবস্থা করা হোক। হি উইল বি দি সেক্রেটারি অব দি ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি।

১৯৪৯-এর ২৫ ডিসেম্বর সন্তোষ গুপ্তের বাড়িতে এই সমস্ত আলোচনা করে যখন আমরা দুপুরে খাওয়ার পরে বিশ্রাম নিচ্ছি তখনি দরজায় ঘা পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সংগঠন এই গোপন আশ্রয়কে যতখানি গোপন ভেবেছিল আশ্রয়টা ততখানি গোপন ছিল না। এই বাসার আশপাশেই কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন সময়টা ছিল এমন যে, যদিও কমিউনিস্ট পার্টিকে ফর্মালি বেআইনি করা হয়নি তবুও এ্যাডমিনিস্ট্রেশান কমিউনিস্টদের টার্গেট করছে। একের পর এক কমিউনিস্ট কর্মীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে। সুকুমার চক্রবর্তী নামে একজন অঙ্কবিদ, মানে খুব ভালো শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণে। ফনি গুহ নামে একজন বড় নেতা ছিলেন আমাদের, তিনিও এ্যারেস্টেড হয়ে গিয়েছিলেন। এ্যারেস্টেড না হয়ে তো উপায় ছিল না।

সন্তোষের এই বাড়িটা ওয়াজ আন্ডার ওয়াচ। এই কথাটা সন্তোষ গুপ্ত নিজেও জানত না, যদিও সন্তোষ ছিল আই জি অব প্রিজনসের কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক। ওর একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হামলা করা হল। আমাদের মধ্যে দুজন মহিলা ছিলেন। একজন হচ্ছেন সন্তোষের বিধবা মা। আর একজন হচ্ছেন অজিত চ্যাটার্জী নামে একজন কৃষক নেতার ওয়াইফ। এরা সন্তোষের বাড়িটাকে বাসাবাড়ি বানিয়ে একটা ক্যামুফ্লেজের মতো ব্যবহার করত। আমরা গোপনে রাত্রে আসতাম সে বাসায়। কিন্তু এর মধ্যে অনেক কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিলেন। কোন্ রাস্তায় কোন পুলিশ কীভাবে পাহারা দেয় তা জানা যেত না তো কিছু। এই ক্যামুফ্লেজের ব্যাপারে যে পুলিশ জেনে গেছে, তা আমরা জানতাম না।

AMARBOI.COM

২৩. গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম

দুপুরের পরে যখন হামলা হল, দরজা ভাঙল, তখন পুলিশ বলছে, 'এই বাড়িটা, এই বাড়িটা।' আমরা তখন এসকেপ করার চেষ্টা করছি, দেয়াল ক্রস করে এখন যেখানে কোতোয়ালী থানা ঐ এলাকায় যাবার চেষ্টা করছি আর আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন পুলিশকে দেখিয়ে দিচ্ছে : ঐ যায়, ঐ যায়! কেননা পাবলিকের ধারণা হচ্ছে আমরা ডাকাতের দল। আমরা দুই একটা বাড়ি ক্রস করেছি, হয়তো বাথরুম বা কোথাও আশ্রয় নিয়েছি, কিন্তু উই ওয়েয়ার কট। আমাকে তখন পুলিশ লাঠি দিয়ে বাড়িটাড়ি মেরেছে, সন্তোষকেও মেরেছে। এলাকার লোকজন আমাদের গায়ে হাত তুলেনি, তোলেছে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এবং পুলিশ। পুরো ব্যাপারটার আসল অরগানাইজার হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এবং পুলিশকে তারা নিয়ে যায়, এভাবেই ব্যাপারটা ঘটে।

সেদিন ঐ বাসায় যেসব কমিউনিস্ট ছিলেন তারা সবাই গ্রেপ্তার হন। মহিলা দুজনও গ্রেপ্তার হলেন। আরো কিছু লোক ছিলেন যাদের নাম বলাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক হবে না। জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন আমাদের সাথে। মনু মিয়া বলে একজন দিনমজুর কমরেডও ছিলেন। ১৯৪৯ সালের দিকে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ছিল এ রকম যে, পিপলের মধ্য থেকে ক্যাডার বার করতে হবে। শ্রমিকদের মধ্য থেকে ক্যাডার বার করতে হবে। দে উইল বি অরগানাইজার্স, নট দি মিড্‌ল ক্লাস। মিড্‌ল ক্লাসের দুর্বলতা আছে। ওয়ার্কার্স, কৃষক, দিনমজুর এদেরকে ট্রেইনড করতে হবে। এই মনু মিয়া ওয়াজ লাইক দ্যাট। এই রকমই আর এক জন লোক ছিলেন সিরাজুল হক সাহেব। তিনি তাঁর এলাকার বড় নেতা হয়েছিলেন, ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন।

এই হচ্ছে আমার প্রথম এ্যারেস্ট হওয়ার কাহিনী। এ্যারেস্ট করে প্রথমে আমাদের কোতোয়ালী থানায় নিয়ে গেল। থানায় প্রথমে কিছুটা ইন্টারভিউয়ের মতো হল। পিটানোও কিছু হল। সন্তোষকে পিটাল। আমাকেও থাপ্পড়টাপ্পড় মারল। পরে রাত্রিতে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল। মহিলাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল মহিলা ওয়ার্ডে। আসামি জেলে পাঠানোতে সময় লাগে, ওয়ারেন্ট ইত্যাদি তৈরি করতে হয়। আমাদের জেলে পাঠাতে পাঠাতে রাত এগারোটা-বারোটা বেজে গিয়েছিল। সেখানে আগে থেকেই সরদার ফজলুল করিম একটি বড় নাম। যত আই বি শুনল, সরদার ফজলুল করিম ধরা পড়েছে, তারা সবাই দৌড়ে দেখতে এল। এসে তো দেখল ছোটখাটো একটা মানুষ আমি। সেদিন থেকেই শুরু হল আমার ডিটেনশান জীবন।

জেলে আসামি নেওয়ার পর প্রথমে তাকে সুপারিনটেনডেন্টের কাছে হাজির করা হত। তখন আইজি অব প্রিজনস্ ছিলেন আমির হোসেন। তিনিও ইন্সপেকশনে এসেছেন। এই আইজি অব প্রিজনস্-এর পার্সোনাল কনফিডেন্সিয়েল ক্লার্ক হচ্ছেন সন্তোষ গুপ্ত। সন্তোষকে আমাদের মধ্যে দেখে আমির হোসেন সাহেবের চোখ ছানাবড়া। তিনি খুব অবাক হয়ে বললেন, 'সন্তোষ, তুমিও এর মধ্যে আছো?' এ অনেকটা বাঘের ঘরে গোগের বাসার মতো আরকি!

২৪. জেলজীবন

পাকিস্তান আমলে আমরা যারা বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের গ্রেপ্তার করেছিল। বিভিন্ন জেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনেক বার জেলখানার গেটে আমাদেরকে রিলিজ করার ভান করা হয়েছে, কিন্তু রিলিজ করার পরপরই আবার নিরাপত্তা আইনে জেলে ঢুকানো হয়েছে। একবার দেখানো হচ্ছে যে আমাকে জেলখানা থেকে রিলিজ দেওয়া হয়েছে আবার পরপরই হচ্ছে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নতুনভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে আবার অনির্দিষ্টকালের জন্যে জেলে রাখা যাবে।

আমরা যারা কমিউনিস্ট কর্মী, আমাদের যখন পুলিশ ধরত তখন তারা আমাদের ঠাট্টা করে বলত, 'যান, যান, আপনারা জেলখানায় গিয়ে পার্টি করেন। বাইরে কেন এত কষ্ট করেন?' কিংবা নাজির জমাদার, যাকে আমরা সিকিউরিটি জমাদার বলতাম অর্থাৎ সিকিউরিটি প্রিজনারদের দায়িত্বে যারা থাকত তাদের বিভিন্ন র‍্যাঙ্ক ছিল। জমাদার একটা খুব বড় র‍্যাঙ্ক। আমি জানি না নাজির জমাদার এখনো বেঁচে আছেন কি না। আমাদের যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল এবং যখন আমাদের সিকিউরিটি জেলে ঢুকানো হল তখন সে তার বিহারিভঙ্গি মেশানো বাংলায় আমাদের বলল, 'যাইয়ে যাইয়ে, অন্দরমে যাইয়ে। এখান থেকে আর বেরুতে হবে না।' কথাটা সত্যি। ১৯৪৮ সাল থেকে সব কমিউনিস্ট কর্মীদের মুসলিম লীগ সরকার গ্রেপ্তার করতে শুরু করেছে। মুসলিম লীগ প্রশাসন জানত এই কমিউনিস্টরাই হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধান শত্রু। কারণ তখন পর্যন্ত পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তিটা মুসলিম কর্মীদের মধ্যে শুরু হয়নি। সেটা আওয়ামী লীগের কথাই বলি বা মুসলিম লীগের কথাই বলি।

২৫. কখন গেলেন, কখন এলেন ? : এটাই কি সব?

লোকজন আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করে, আপনি কখন জেলে গেলেন? আমি উত্তর দিই আমি প্রথম ১৯৪৯ সালে জেলে গেলাম। এরপর তারা জিজ্ঞেস করে আপনি কবে জেল থেকে বের হলেন? আমি বলি ১৯৫৫ সালে। মাঝখানে আমি আমার জেল জীবনের দীর্ঘ ৬/৭ টি বছর কেমন করে কাটালাম—এটা তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে না। বাইরে যারা থাকে তাদের মনে এই প্রশ্নটা আসে না। তারা মনে করে জেল ইজ জেল। সেখানে লোকে যায় আর বেরিয়ে আসে। কিন্তু একটা লোক যদি রাজনৈতিকভাবে জেলে যায় এবং যদি রাজনৈতিকভাবেই বের হয়ে আসতে পারে তবে সেটা সোজা কথা নয়। এটা একটা বড় কথা। তুমি কেমন করে তোমার রাজনৈতিক নীতি-আদর্শ বা মরাল রক্ষা করে জেল থেকে জীবন্ত বের হয়ে আসতে পারলে! এই ইতিহাস বাংলাদেশে এখনো অজানা। জেলের ভেতরকার ইতিহাস যারা জানতে চায় তাদের এটা জানা উচিত।

গোয়েন্দা বিভাগ সিদ্ধান্ত নিত কোন্ সিকিউরিটি প্রিজনারকে কোন জেলে রাখা হবে। জেলখানার ভেতরেও ম্যাপ দেখে তারা বলতে পারত কে কোন্খানে আছে বা কার কোন্খানে থাকা উচিত, তার সমস্ত চার্ট ওরা করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের নির্দেশেই জেল প্রশাসন পলিটিক্যাল প্রিয়জনারদের ডিল করত। ওদের নিয়ম ছিল এক জেলে কোনো প্রিয়জনারকে একসঙ্গে বেশিদিন রাখা যাবে না এবং প্রিয়জনারকে তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে যত দূরে রাখা যায় তত ভালো। জেলখানার মধ্যেও পলিটিক্যাল প্রিয়জনারদের সাধারণ কয়েদি থেকে আলাদা ভাবে রাখতে হবে।

জেলখানায় কিছু সেল থাকে। সেল হচ্ছে দশ হাত বাই পাঁচ হাতের খুপরির মতো এক একটা ঘর যাতে একটি দরজা থাকে। এই সেলের মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে একজন বন্দিকে সারা দিনরাত তালা দিয়ে রাখতে পারত। দিনের বেলায় যদি কখনো রাজবন্দিকে বার করত তবুও ঐ সেলের সামনে যে উঁচু দেয়াল আছে তার সামনেই তারা কিছুক্ষণ পদচারণা করতে পারত। রাতে সেলের মধ্যে একটা টুকরি রাখা থাকত। সেই টুকরির মধ্যেই রাজবন্দিকে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হত। সকাল বেলা হয়তো সেল খুলে দিত। বন্দিকে কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়ে আবার সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হত।

জেলে বইপত্র যা ছিল তা তারা পড়তে পারত। আত্মীয়স্বজনেরা যদি কোনো বইপত্র বন্দির নামে জমা দিত তবে জেল কর্তৃপক্ষ এইসব বইপত্র আইবি অফিসে পাঠিয়ে দিত। আইবি অফিস এইসব বইপত্র চেক করে যে বইয়ের উপর ওরা 'সেন্সরড এন্ড পাসড' মেরে দিত সে বইগুলো আবার জেলখানায় আসত। তখন প্রিজনারেরা সেগুলো পড়তে পারত। জেলে অনেকেই লেখাপড়া বা গবেষণামূলক কাজ করতে পেরেছেন। সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অনিল মুখার্জী এঁরা সবাই জেলে বসে ভালো কাজ করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত যেসব রাজবন্দি তারা জেলখানায় গিয়ে চিন্তা করতেন, জেলখানার সময়টা তাঁরা কীভাবে ব্যবহার করবেন লেখাপড়ার কাজে। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান রাজবন্দি আমাদের লেখাপড়ার কোনো ট্র্যাডিশন তেমন ছিল না। আমরা মুসলমানেরা জেলখানায় গিয়েই ভেঙে পড়তাম। আমাদের মধ্যে ভেঙে পড়ার যে প্রবণতা এটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল।

জেলখানায় 'সেল' কথাটির একটি প্রতিশব্দ আছে। প্রতিশব্দটি হচ্ছে 'ডিগ্রি'। 'ইসকো ডিগ্রিমে লে যাও। আট ডিগ্রিমে।'—অফিস থেকে এ রকম অর্ডার হল। আট ডিগ্রি বা আট নাম্বার সেলটি হচ্ছে ফাঁসির সেল। ফাঁসি দেবার আগে আসামিকে এইসব সেলে রাখা হয়। আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে এমন। যদিও আমি তেমন কোনো নেতা নই। তবুও গোয়েন্দা বিভাগ থেকে হুকুম পাঠিয়েছে—সরদার ফজলুল করিমকে অন্য প্রিজনার থেকে আলাদা করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কতদিন সেলে রাখবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ঠিক নেই কিছু। আমাকে ওখানে খাওয়াদাওয়া দেওয়া হত। সেলে কারো সাথে কোনো আলাপ করতে পারি না। বই-পত্র দেওয়া হয় না। হাঁটাচলারও উপায় নেই।

পূর্ব পাকিস্তানের জেলখানায় কৃষক আসছে, শ্রমিক আসছে, ক্ষেতমজুর আসছে, শিক্ষক আসছে, তরুণ ছাত্র আসছে, কত বিচিত্র ধরনের লোকজন! এটা সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। পূর্ববঙ্গে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত জেলখানায় যারা ছিল তাদের উপর বিস্তারিত গবেষণা হওয়ার দরকার। জেলখানার ফাইল দেখে তাদের জেল জীবনের ইতিহাস তৈরি করা একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজ। কোনো সিরিয়াস গবেষক সরকারের কাছে আবেদন করে পুরোনো ফাইলপত্র উদ্ধার করে তার মধ্য থেকে সেই সময়ের রাজবন্দিদের একটা পোর্ট্রেট দাঁড় করাতে পারে। কথাটা এ কারণে বলছি যে, আমাদের এখানে কিছুই আর থাকছে না। সব মুছে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে আমি মুছে যাবো। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের যেসব বন্ধুরা আজ আমাকে দিয়ে কথা বলাচ্ছেন—এটা তাদের একটা আন্তরিক চেষ্টা। ওঁরা বলছেন, 'না, আমরা কিছুটা ধরে রাখার চেষ্টা করবো, সব মুছে যেতে দেবো না।'

AMARBOI.COM

২৬. অনশন ধর্মঘট

আমি যখন ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে ঢাকা জেলে ঢুকলাম তখন আমি জানতে পারলাম যে জেলখানায় একটা অনশন ধর্মঘট চলছে। এই অনশন ধর্মঘটের একটি ইতিহাস আছে। ব্রিটিশ আমলে রাজবন্দিদেরকে সম্মানের সাথে রাখা হত। কখনো কখনো তাদের জেলখানা থেকে বের করে থানা ডিটেনশানে রাখা হতো কোনো ওসি'র দায়িত্বে। তারা ঐ এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারত না। সেখানে তাদের জন্য কিছু খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা হত। তারপর বছর দুই-তিনেক পরে তাদের পুরোপুরি রিলিজ দিয়ে দেওয়া হত। তাদের হাত খরচা ছিল ও পোশাকআশাক ছিল। হাতখরচা কত ছিল তা আমি জানি না। বিভিন্ন গ্রেড ছিল নিশ্চয়ই রাজবন্দির। হাতখরচার টাকাটা তাদের পরিবার পেতে পারত।

পাকিস্তান হওয়ার পর যখন মুসলিম লীগ সরকার যে আইনের বলে পলিটিক্যাল কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল সেটার নাম দিল তারা 'আন্ডার সিকিউরিটি এ্যাক্ট' বা 'নিরাপত্তা আইন'। এই আইনে বন্দিদের যতদিন খুশি জেলে রাখা যেতে পারে, কোনো বিচার-আচার ছাড়াই। এইসব বন্দিদের কোনো প্রকার ভাতা দেওয়া হত না। ব্রিটিশ আমলে যেসব সুযোগ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিধা দেওয়া হত রাজবন্দিদের, সমস্ত সুযোগসুবিধা বাতিল করা হল। তাদের মোটামুটিভাবে জেলখানার মেঝেতে মানে ফ্লোরে নামিয়ে দেওয়া হল।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের মানবেতর পরিবেশের প্রতিবাদে সিকিউরিটি প্রিজনাররা অনশন করছেন। অনশন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রথম ছয়দিন কর্তৃপক্ষ অনশনকারীদের সামনে খাবার রাখত, অনশনকারীরা তা স্পর্শ করত না, কর্তৃপক্ষ খাবার তুলে নিত। এই প্রক্রিয়াটা ছয় দিন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ চলতে দিত। ছয় দিনের পর থেকে জেলের ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, তাদের সহকারীরা মানে সাধারণ কয়েদিরা দল বেঁধে এসে অনশনকারীদের বাধা দিত কিন্তু এমন কিছু স্যুইসাইডাল বাধা নয়; কারণ তারা তো জেলে মরতে আসেনি। তারা বেঁচে থাকতে এসেছিল যাতে তাদের আদর্শের বাস্তবায়ন তারা করতে পারে ভবিষ্যতে—এই ছিল তাদের মনের ইচ্ছা ও চেষ্টা।

অনশনের সেদিন ছিল ২০তম দিন। ২০তম দিনে কুষ্টিয়ার এক শ্রমিক নেতা শিবেন রায় মারা যান। সেদিন কর্তৃপক্ষ একদল জঙ্গি কয়েদি নিয়ে এসেছিল তাকে ফোর্সড্ ফিডিং করাতে। তাদের সাথে ছিল একটা রাবারের নল। এই নলটা নাকের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। নলের একদিকে ঢোকানো হত পানি মিশ্রিত দুধ। জেলের ডাক্তার-কম্পাউন্ডারেরা মনে করত, এই তরলটা পেটে গেলে প্রিজনার অনশনজনিত কারণে মারা যাবে না। এটা অনেকটা জোর করে অনশন ভঙ্গ করানো। স্বাভাবিক কারণেই প্রিজনাররা এটা করতে দিতে চাইত না।

মানুষের শরীরের শ্বাসনালী আর খাদ্যনালী পাশাপাশি। আমাদের নাক থেকে দুটো পথের একটি খাদ্যনালী হয়ে গেছে পাকস্থলীতে আর অন্যটি শ্বাসনালী হয়ে গেছে ফুসফুসে। কয়েদিরা যখন জোর করে কমরেড শিবেন রায়ের নাক দিয়ে নলটা ঢুকিয়েছে সে নলটা খাদ্যনালীতে না গিয়ে শ্বাসনালীতে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। শিবেন রায় তার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে চিৎকার করেছে, কিন্তু কয়েদিরা তার কথা শোনেনি। তারা ঐভাবেই দুধ ঢেলে শিবেন রায়কে সেলে তালা মেরে চলে গেছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। রাতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অনশনের ২০তম দিবসে শিবেন রায় মারা যান। এটা খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার। সাধারণত পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে জেলের ভিতরে চিৎকার করত, শ্লোগান দিত : রাজবন্দিদের মুক্তি চাই, ইত্যাদি। সেদিনও তারা শ্লোগান দিয়েছে। কিন্তু তাতে কারো কিছু এসে যায়নি। জেলখানার চার দেয়াল পার হয়ে বন্দিদের এসব প্রতিবাদ বা চিৎকার কখনোই বাইরে পৌঁছাত না। বাইরের কর্মীরা অবশ্য চেষ্টা করছিল পোস্টার লাগিয়ে জনগণকে এই অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে অবহিত করতে। সুতরাং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের লোকেরা এ সম্পর্কে কিছুটা জানত, তবে সাধারণ মানুষ তেমন একটা জানত না।

শিবেন রায় যেদিন মারা যান সেদিনই রাতে আমাকে ঢাকা জেলে ঢোকানো হয়। জেলে ঢোকার পর আমরা ঠিক করলাম যে আমরাও এই অনশনে যোগ দেব। পরদিন সকালে যখন সিপাহীরা আমাদের সামনে খাবার রেখে গেল, খিচুড়ি বা ভাত, আমরা তাদের খাবারটা রাখতে দিলাম কিন্তু খাবারটা আমরা স্পর্শ করলাম না। দ্বিতীয় দিনও খাবার প্রত্যাখ্যান করলাম। আমার সেলে কলসিভরা পানি থাকত। পাশে থাকত লবণ। গ্লাসে কিংবা বাটিতে লবণ মিশিয়ে জল খেতে লাগলাম। তখন সিপাহী এবং হাবিলদারেরা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট দিল যে নতুন যারা এসেছে তারাও অনশন ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে।

বাই দিস টাইম দি হোল জেল ওয়াজ ফুল অব কমিউনিস্ট। জেল প্রশাসনের নীতি ছিল এ রকম যে, সাধারণ কয়েদিকে পলিটিক্যাল প্রিজনার্সদের সাথে মিশতে দেওয়া যাবে না। মিশতে দিলে তারা সাধারণ কয়েদিদেরকে পলিটিকাললাইজ করবে। সাধারণ কয়েদিদের বলা হল এদের সাথে তোমরা মিশবে না। এরা হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু! সাধারণ কয়েদিরা সবাই পাকিস্তানের বন্ধু হয়ে গেল এবং তাদের দিয়ে মাঝে মাঝেই রাজবন্দিদের পেটানোর ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হল। পুরোপুরি একটা অমানবিক ব্যাপার।

রাজবন্দিরা তো একে অপরের সঙ্গে মিশতে পারছে না। কিন্তু সিপাহীদের মধ্যে ভালো কিছু লোক ছিল। তাদেরকে দিয়ে এক রাজবন্দি অন্য রাজবন্দির কাছে খবর পাঠাত বা একটা চিঠি সিপাহীর হাতে দিয়ে হয়তো কেউ বলত, 'এই চিঠিটা আপনি তাঁতীবাজারে অমুক ঠিকানায় একটু পৌছে দেবেন।' যোগাযোগের আর একটা উপায় বের করল মুসলমান প্রিজনারেরা। তারা দাবি করল শুক্রবারে তাদের জুম্মার নামায পড়তে দিতে হবে। তারা যে বাইরে খুব একটা নামায রোযা ইত্যাদি পালন করত তা কিন্তু নয়। যেহেতু ধর্মীয়ভাবে দাবিটা করা হচ্ছে, সেহেতু জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষে এ দাবি পুরোপুরি নাকচ করে দেওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং সিপাহীদের তত্ত্বাবধানে তাদের শুক্রবারে একটা জায়গায় নিয়ে হাজির করা হত। রাজবন্দিরা যখন মোনাজাত করত তখন দুই হাত তুলে মোনাজাত করার সময় প্রথম কথাটা তারা জিজ্ঞেস করত, 'তোমরা কেমন আছো? অবস্থা কি? আমাদের তো জেলখানায় বেঁচে থাকতে হবে। জেলখানায় কিইবা আমরা করতে পারি। একমাত্র পথ যে খাবার দিচ্ছে জেলখানায় তা প্রত্যাখ্যান করা।' খাবারও এমন কিছু ভালো ছিল না। যাচ্ছেতাই একেবারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলখানায় যদি কোনো প্রিজনার খাবার প্রত্যাখ্যান করে তবে তা হয় একটা এ্যাডিশনাল ক্রাইম। জেলখানায় ফাইল করা বলে একটা কথা আছে। সবাইকে লাইন ধরে বসতে হবে এবং আই জি পি অর্থাৎ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস্ যখন সামনে দিয়ে যাবে তাকে হাত তুলে সালাম করতে হবে। এসব ব্যাপারে রাজবন্দিরা বিভিন্ন সময়ে আপত্তি জানিয়েছে। প্রতিটি প্রিজনারের টিকেট ছিল একটা। সেই টিকেটে তার নাম ধাম, ঠিকানা এবং অপরাধের বিবরণ লেখা থাকত। জেলের ভিতরে একটা জেল কোর্ট বসে। সেই কোর্টে জমাদার বা হাবিলদারেরা তাদের আসামিদের হাজির করত এবং প্রিজনারেরা জেলের অভ্যন্তরে তার অপরাধের জন্যে শাস্তি পেত। শাস্তি হতে পারে এ রকম : আসামিকে এক সপ্তাহ সেলে রাখা হোক। প্রিজনার যদি একটা বড় ওয়ার্ডে আর পাঁচজন বন্ধুদের সঙ্গে থেকে থাকে, তবে সেখান থেকে তাকে আলাদা করে একটা সেলে নিয়ে যাওয়া হোক। সাতদিন সেখানে সে একা থাকবে। সাতদিন পর তাকে আবার ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হোক। অথবা তাকে পেনাল ডায়েট দেওয়া হোক, তাকে সাতদিন ধরে শুধু ফেনভাত দেওয়া হোক। এই রকম বিভিন্ন ধরনের শাস্তি জেলে দেওয়া হত।

অনশনের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই শরীর দুর্বল হতে থাকে। আমি খেয়াল করে দেখেছি, এ রকম অবস্থায় শরীর কি করে। শরীর তখন স্বপ্ন দেখে। কিসের স্বপ্ন? খাবারদাবারের স্বপ্ন। শরীর তার চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে নিজের মতো করে। আমি হয়তো স্বপ্ন দেখলাম, আমি নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে মরণচাঁদের মিষ্টির দোকানে ঢুকে গেছি এবং মিষ্টি খাচ্ছি। এই যে ইচ্ছাপূরণ এই ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার কিন্তু সবারই থাকত। যারা ধূমপানে আসক্ত ছিলেন তাদের খুব অসুবিধা হত। অনশন ধর্মঘট না থাকলে কনসোলিডেশন বিড়ির ব্যবস্থা করত। কিন্তু অনশন ধর্মঘট তো একটা পীড়নমূলক ব্যাপার। সুতরাং তখন বিড়ির ব্যবস্থা করতে পারত না এবং ধূমপায়ী ব্যক্তিদের খুবই কষ্ট হত। তাদের মনে তখন একটা প্রশ্ন জাগত—'আর কতদিন?' প্রত্যেকটি ব্যক্তির মনেই কারাবাসের নির্দিষ্ট একটা সময়ে গিয়ে এই প্রশ্নটি জাগত। রাজবন্দিদের মধ্যে যারা একটু অগ্রসর তাদের কাউকে যখন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হত তখন তিনি পাশের বেড়ে শুয়ে থাকা প্রিজনারদের উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, 'আমাদের আন্দামানের কাহিনী আছে যেখানে তারা ৬০ দিন অনশন ধর্মঘট করেছে। তাদের অনেককে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কি করা? আমাদের তো একটা আদর্শ নিয়ে থাকতে হবে।' এভাবে তাঁরা অন্যদের রাজনৈতিকভাবে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করতেন যাতে তারা মানসিকভাবে ভেঙে না পড়েন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও আমি ২০তম দিবসে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছি তবুও আমার শরীর তো দুই-এক দিন পরেই অনশন ভাঙতে চায়। আমার মন তা চায় না কিন্তু শরীর তা চায়। আমি তখন নিজের মনকে বলতাম, 'আমার তো ভাঙার দিন এখনো আসেনি। আমার সাথীরা ইতোমধ্যে ২০ দিন অনশন করেছে। আমি যখন ২০ দিন পার করতে পারব এবং তারা ২১ দিন অনশন করবে তখন আমি নিজেকে বলতে পারব যে আমি এখন আর থাকতে পারছি না। এই যে একটা মনোবল যে, আমার সাথীরা অতদিন পার করেছে, আমিও ততদিন পার হয়ে নিই তারপর দেখা যাবে। এভাবে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছে।

আমাদের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আল-মুতী শরফুদ্দীন এই অনশনের সাথে যুক্ত ছিলেন। আল-মুতী যখন তাঁর স্মৃতিচারণ করেন তখন তিনি এই অনশনের উল্লেখ করেন না। আমরা কিন্তু করি। আল-মুতী বড় লেখক ছিলেন। সহজ ভাষায় লিখতেন। আমার খুব বন্ধু মানুষ। তাকে বলা যেতে পারে পূর্ববঙ্গের রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি অনশন চালিয়ে গেছেন। অনেক ভুগেছেন তিনি। অনশন ধর্মঘটের পরে তাঁর বাবা তাঁকে রিলিজ করে নিয়ে যান। রিলিজ করে নিয়ে যাওয়াতেই তিনি ফিজিক্সে তাঁর এমএসসিটা শেষ করতে পারেন।

জেলখানায় মানবেতর পরিবেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা অনশন ধর্মঘটকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন যথাসাধ্য। সব সময়, সব জায়গায় তারা তা করতে পারেননি। অত্যাচার হয়েছে তাদের উপর। যেমন সিলেট জেলে আমি শুনেছি, সেখানে বয়স্ক সব প্রিজনারদের লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে পিঠে দাগ করে দিয়েছে। আর একটা মেথড ছিল। প্রিজনারেরা বলেছে, আমরা আর কিছু খাব না, শুধু জল খাব। জলের সাথে লবণ মিশিয়ে তারা খেত। এতে করে শরীরে অনশনের প্রতিক্রিয়াটা যে পরিমাণ হওয়ার কথা সে পরিমাণ হত না, একটু কম হত। এটা রাজবন্দিরা শিখেছিল আন্দামান ফেরত বন্দিদের কাছ থেকে। কিন্তু সিলেট জেলে কর্তৃপক্ষ জলের কলসও সরিয়ে নিয়েছিল। জলও খেতে দেয়নি। সাথী প্রিজনারেরা আমাকে বলেছে, 'ছয়দিন পর আমার সারা শরীর গরম হয়ে গেছে, আমি আমার কাপড়-জামা খুলে ফেলেছি, যন্ত্রণায় আমি মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়েছি। আমার জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। জিহ্বা থেকে আমার রক্ত বের হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।' এ অবস্থায় প্রিজনারদের সারেন্ডার করতে হয়। বা জেলপ্রশাসনও এগিয়ে আসে অনশন ভাঙাতে। এভাবেই অনশন ধর্মঘটগুলো শেষ হয়। তবে ঢাকা জেলের অনশন ধর্মঘটটা অনশনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এ ধর্মঘটটা দীর্ঘ ৫৮ দিন চলেছিল। অনশন হচ্ছে জেলখানায় প্রিজনারদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবাদ করার একমাত্র উপায়। উপায়টি স্যুইসাইডাল ছিল অবশ্যই, কিন্তু এ ছাড়া তাদের হাতে আর কোনো উপায় ছিল না।

২৭. কনসোলিডেশন

জেলখানায় আমাদের জীবনটা সহজ ছিল না। বেশ কঠিন এই জীবন। জেল প্রশাসন অবশেষে একদিন জানতে চাইল, আমাদের নেতা কে? আপনাদেরও জানতে ইচ্ছে হতে পারে, প্রিজনারেরা তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করত কীভাবে? পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করেছিল। ধরা যাক, একটা ঘরের মধ্যে ত্রিশজন সিকিউরিটি প্রিজনার আছে। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটা কমিটি তৈরি করত। এর নাম ছিল 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন'। কনসোলিডেশনের একজন মুখপাত্র নির্বাচন করা হত। কনসোলিডেশনের কাজ ছিল অর্গানাইজ করা।

আমাদের দাবিগুলো কী কী? আমরা বলতাম, আমরা এই চাই। আমাদের বিছানা দিতে হবে। আমাদের অন্তত জামাকাপড় দিতে হবে। আমাদের খাবারের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আমাদের কমিটি দাবি করত, আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আমরাই করব। আমাদের একটি রান্নাঘর দেওয়া হোক এবং সাধারণ কয়েদিদের কয়েকজনকে আমাদের হেল্পার হিসেবে দেওয়া হোক। রেশন গুদাম থেকে আমাদের জন্যে বরাদ্দকৃত রেশন আমরাই নিয়ে আসবো। রেশন আমরা কীভাবে ব্যবহার করব তা আমাদের ব্যাপার। এ রকম একটি দাবিনামা প্রশাসন নিয়ে যেত প্রিজনারদের মুখপাত্রের কাছ থেকে। প্রশাসন বলত, আমরা তো এটা করতে পারি না। আমরা এটা হোম মিনিসট্রিতে পাঠিয়ে দেবো। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন এ ব্যাপারে। আমরা সে অনুসারে সিদ্ধান্ত নেব।

অবশেষে জেল প্রশাসন বলল, ঠিক আছে, এই বরং ভালো। প্রিজনাররা খাওয়াদাওয়া নিয়ে হাঙ্গামা করার চাইতে নিজেদের খাবার যদি নিজেরা তৈরি করে নেয়, মন্দ কি? কমিটি একজনকে মুখপাত্র নির্বাচন করত। মুখপাত্র যিনি হতেন প্রশাসন তাকে মেনে নিত। তার সঙ্গেই তারা কথাবার্তা চালাত। আমাদের পার্সোনাল ক্যাশ অফিসে জমা থাকত। তার থেকে আমরা অল্পস্বল্প খরচ করতে পারতাম। ধরা যাক, একটা খাতা কিনলাম। তার আবার হিসাব থাকত।

এভাবে জেলখানার মধ্যেই কমিউনিস্টদের একটা অর্গানাইজেশন বা জার্ম অব অর্গানাইজেশন দাঁড় করানোর চেষ্টা হত। মুখপাত্র খেয়াল রাখতেন যে, তার যে অন্য কমরেডরা আছেন, তাদের কারো মনোবল যেন ভেঙে না পড়ে। ধরুন, একজন ক্ষেতমজুর, একজন দিনাজপুরের এক সাঁওতাল, একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবিত্ত—এদের সবার মনোবল অটুট রাখা কনসোলিডেশনের দায়িত্ব। এমনও হয়েছে জেলের ভিতর থেকে একটা চিঠি লিখে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই চিঠি বাইরে থেকে পোস্ট করা হয়েছে কমরেডের নামে। চিঠি পড়ে কমরেডের মনোবল ফিরে এসেছে।

যদি কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিত, তবে সপ্তাহে একদিন এক জায়গায় বসে পত্রিকা পাঠ করা, পাঠ করে অন্যদের শোনানো ইত্যাদির আয়োজন করা হত। এক কমরেডকে দায়িত্ব দেওয়া হত যে, আপনি একদিন সন্ধ্যায় আমাদের লক আপে বন্ধ করার আগে গত পনেরো দিনে কী কী ঘটলো তা আমাদের জানাবেন এবং এরপর আমরা সবাই একসাথে আলোচনা করব। এসব করা হত যাতে পলিটিক্যাল প্রিজনারদের ইন্টেলেকচুয়াল ফুডটা দেওয়া যায়, যাতে মানসিকভাবে তারা ভেঙে না পড়ে। এ রকম এক একটা মেথড পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা বের করত যাতে পলিটিক্যালি তারা বেঁচে থাকতে পারে।

আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী ছিলেন তখন মন্ত্রী। তিনি মাঝে মাঝে জেল পরিদর্শন করতে যেতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু এক সময় মুখপাত্র প্রশাসনের ইতিবাচক জবাব নিয়ে এল। সব দাবি তো আর প্রশাসন মানবে না। ধরুন, ডায়েটের বাজেটটা তারা দেড় টাকার জায়গায় দু টাকা করবে। ছয় মাস অন্তর একটা হাফ শার্ট আর একটা লুঙ্গি দেবে। বিছানা হিসেবে একটা লোহার খাট আর তার উপরে একটা ছোবড়ার গদি ওরা দিতে রাজি আছে। একটা চাদরও পাওয়া যাবে। কনসোলিডেশনের মিটিং-এ অনশনকারীদের বলা হত—এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা। এর বাইরে আমরা কিছু পেতে পারব না। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে : আমরা অনশন ভাঙব, কি ভাঙব না। তখন নানান জনে নানান কথা বলল। কেউ হয়তো বলল, 'না এতে চলবে না। মরে গেলে মরে যাবো। জেলখানায় যখন এসেছি, আমরা কি আর জীবনের মায়া করি?' কিন্তু অন্য কেউ হয়তো মন্তব্য করল, 'তাই বলে তো আমরা আত্মহত্যা করার জন্যে এখানে আসিনি।'

এই দুইটা সাইডই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। তখন একটা পর্যায়ে কনসোলিডেশন স্থির করে যে, আমাদের আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই মেসেজটা যখন জেল-প্রশাসনকে দেওয়া হয় তখন তারা সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটা মেনে নিলে ৫৮ দিনের অনশনের অবসান হয়। কিন্তু প্রিজনাররা বলে যে এভাবে তো হবে না। আমাদের একদিন একত্রিত হতে দিতে হবে। সেদিন মিলিতভাবে আমরা এই বিজয়টা সেলিব্রেট করব। সেদিন আমাদের একটু ভালো খাবারদাবার দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশাসন মেনে নিল এই দাবি। সবাইকে একদিন একত্রিত হতে দিল। ভালো খাবার মানে খিচুড়ির ব্যবস্থা হল। এই দীর্ঘ অনশনকালে অনেক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। অনশন করতে করতে অনেকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। একটা সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। একজন প্রিজনার হয়তো অন্য পাঁচজনের সামনে বিবস্ত্র হয়ে যাচ্ছিল। সে যে বিবস্ত্র হয়ে যাচ্ছে—এটাও সে খেয়াল করতে পারছে না। চট্টগ্রামের কমরেড আব্দুস সাত্তারের কথা মনে পড়ছে আমাদের। কৃষক নেতা ছিলেন তিনি। তাকে আমি এ রকম অবস্থায় দেখেছি। কিংবা হয়তো কোনো কমরেড বলছেন, 'আমি ওসব ব্রেক-ট্রেক বুঝি না। কিছু খাবো না আমি'। আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি এই বলে : 'এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আমরা অনশন ভঙ্গ করবো। আপনি এই সরবতটা খান'। তিনি তখন জবাব দিলেন, 'দালালদের কথা আমি শুনবো না'। ফণি গুহ নামে ঢাকা জেলার একজন নের্তৃস্থানীয় কমিউনিস্টকে অনশন ধর্মঘটের পরে ময়মনসিংহ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি মারা যান। অনশনের ধকল তিনি সহ্য করতে পারেননি। অনশনের ফলে শরীরে অনেক ধরনের বিকার শুরু হয়ে যায়। এসব বিকার সবাই সহ্য করতে পারেন না। ৫৮তম দিবসে আমিও অনশন ভঙ্গ করেছিলাম। আমার শরীরের ক্ষতি যা হবার তা তো ইতোমধ্যে হয়েই গিয়েছে।

AMARBOI.COM

২৮. জেল থেকে জেলান্তর

জেল জগতটা একটা ভিন্ন জগৎ। আমাদের পৃথিবীটা যেমন গোল, জেলটাও গোল। জেলের এক জায়গা থেকে যদি আপনি শুরু করেন তবে ঘুরতে ঘুরতে সেই জায়গাতেই আপনি শেষ করবেন। জেলের মধ্যেও জেল আছে, অসংখ্য জেল আছে। বিভিন্ন রকম সেগ্রিগেশন আছে জেলে। নানান রকমের টর্চার আছে। হ্যান্ড ক্যাফ দেওয়া, সলিটারি সেলে রাখা, প্রত্যেকদিন কোর্ট বসানো। জেলের প্রত্যেক প্রিজনারের নামে একটা টিকেট আছে। এই টিকেটের মধ্যে প্রিজনারের ইতিহাস লেখা থাকে। শাস্তি শেষে প্রিজনারের টিকেট জেলারের সামনে হাজির করা হয়। পলিটিক্যাল প্রিজনারদের বদলি করা হয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। পলিটিক্যাল প্রিজনারদের সব সময়ই একটা টেনশানে থাকতে হয়, কখন তার ডাক আসে, কখন জমাদার এসে বলে 'চলিয়ে!' কতবার যে আমি শুনেছি এই ডাক, 'চলিয়ে সরদার সাহাব'। শুনে চলে যেতে হয়েছে অন্য জায়গায়। কি আর করবো, যাওয়া ছাড়া!

অনশন ধর্মঘটের পরে জেল-প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিল ঢাকা জেলে যারা অনশন করেছে তাদের আর ঢাকা জেলে রাখা যাবে না। তাদের খুলনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর ইত্যাদি বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল পরিবার থেকে আমাদের যত দূরে রাখা যায়। গোয়েন্দা বিভাগ এ ব্যাপারে জেল প্রশাসনকে পরিচালনা করত। যে জমাদার সিকিউরিটি প্রিজনারদের ইনচার্জ ছিল সে একদিন হয়তো এসে বলল, 'কই, সরদার সাহাব কাঁহা?' আমি যখন সামনে এগিয়ে গেলাম তখন আমাকে বলল, 'চলিয়ে। আপকা বিছানাপত্র গুটাইয়ে।' আমি বিছানাপত্র গুটিয়ে নিলাম।

কয়েদি নেওয়ার দিন আগে থেকে পুলিশ বুক করা থাকে। সিলেট গেলে তো ট্রেনে যেতে হবে। ট্রেনে ওরা আগে থেকে বন্দোবস্ত করে। পুলিশ কর্ডন দিয়ে স্টেশনে নিয়ে যায়। ট্রেনে সেন্ট্রি বসে থাকে সাথে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নেবার সময় প্রিজনারদের ওরা হ্যান্ডক্যাফ পরিয়ে রাখে যাতে তারা পালাতে না পারে। যে জায়গায় যেতে হবে সেখানে নেমে নতুন জেলে নিয়ে গিয়ে প্রিজনারকে জেলারের হাতে সোপর্দ করে 'প্রিজনার বুঝে পেলাম।'—এই মর্মে একটা রিলিজ অর্ডার নিয়ে নেয়। এর পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা যেখানে আছে সেখানে।

পরদিন আমাকে নিয়ে গেল অফিসে। আমাকে জানানো হল যে সিলেট জেলে বদলি করা হয়েছে আমাকে। আমার সঙ্গে আরো একজন পলিটিক্যাল প্রিজনার ছিল বোধ হয়। তার নাম সুফি, সামসুদ্দীনের ভাই। এখন সে সাংবাদিক। আমাদের দুজনকে সিলেট জেলে পাঠিয়ে দিল। ঢাকা জেল থেকে সিলেট জেলে গিয়েছি ১৯৫১ সালে। সিলেটে বেশ কয়েক মাস ছিলাম। সেখানে বিখ্যাত নানকার নেতা অজয় ভট্টাচার্যের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। খুব দক্ষ লোক এবং সাহিত্যিক। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। আমার খুব শ্রদ্ধেয় একজন লোক। এ রকম লোক আরো আছে। সত্যব্রত নামে একজন তরুণ ছাত্র এবং ওর বড় ভাই মঞ্জুব্রত দাশ তখন ছিল সিলেট জেলে। সত্যব্রত পরে মণি সিং-এর আত্মীয় হয়। সত্যব্রত দাশ, অজয় ভট্টাচার্যদের উপর কী রকম অত্যাচার করা হয়েছিল সে কাহিনীটা আমি সিলেট জেলে গিয়ে পাই।

সিলেটে আমাদের ওয়ার্ডে লোহার শিক ছিল না। তার বদলে দেশী বাঁশ ব্যবহার করা হত। অন্য জেলে বিছানা হত লোহার। সিলেট জেলে বিছানা ছিল স্লোপিং সিমেন্টের। মাথাটা উপরের দিকে, পা-টা নিচের দিকে। এক একটা কায়দা, মন্দ না। খরচও বেশি নয়। আমরা মোটামুটি একটা বড় এলাকায় ছিলাম, মিশতে দিত, খেলতে দিত। বিভিন্ন দিবস আমরা পালন করতাম। জেল-প্রশাসন বাধা দিত না।

সিলেটে গিয়ে আমি শুনলাম যে ঢাকা জেলের কাহিনী শুনে সিলেট জেলের প্রিজনাররাও অনশন করেছিল। তখন তাদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় সেটাকে সীমারের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে। কোনো প্রিজনার হয়তো শরীরের কাপড়চোপড় খুলে মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে শরীর ঠাণ্ডা করার জন্যে। এদের কাছ থেকে জলের কলসিটাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে তারা জল পান করতে না পারে।

এরপর আমাকে কয়েক মাস পরে রাজশাহী জেলে নিয়ে আসা হয়। রাজশাহী খুব গরম জায়গা। সেখানে কিছুদিন আমি ওয়ার্ডে ছিলাম। কখনো শাস্তি হিসেবে আমাকে সেলেও রাখা হয়েছে। আমাকেই শুধু নয়, আরো অনেককেই আটকে রাখা হয়েছিল। রাজশাহীতে বসেই আমি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাটা শুনি। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমি জেলে। ২১ তারিখে অবশ্য খবরটা আমরা জানতে পারিনি। সে সময় ঢাকার কাগজ এক দিনেই রাজশাহী পৌঁছাত না। ২৩ তারিখ যখন খবরের কাগজ গেল তখন আমরা তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কিন্তু খবর কাগজে দেখলাম প্রায় সবটাই কাটা। সব কেটে বিশাল জানালা বানানো হয়েছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবর থাকলে প্রশাসন সেটা কেটে রেখে তারপর আমাদের পত্রিকাটা পড়তে দিত। এ থেকে আমরা বুঝতে পারতাম সাংঘাতিক কোনো খবর আছে। সে খবর আমাদের জানতে দেওয়া হবে না। আমরা চিৎকার করে উঠলাম, 'এই আসো, আসো, দ্যাখো, কী বিরাট জানালা বানিয়েছে। এর ভিতর দিয়ে আমরা নিজেরাই তো এপার থেকে ওপারে যেতে পারি।' আমরা তাই করলাম, এপার থেকে ওপারে গেলাম, একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা যেন নূতন জীবন পেলাম।

রাজশাহী জেলে একদিন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটি কমিশনার হিসেবে জেল পরিদর্শনে এলেন শামসুর রহমান যাকে আমরা ড. জনসন বলতাম। আমাদের সম্পর্ক তো 'তুমি'র সম্পর্ক। আমি তাকে তখন কীভাবে এ্যাড্রেস করি—এ নিয়ে ভাবনায় পড়লাম। শামসুর রহমান হলো আতাউর রহমান খানের ছোট ভাই। ওদুদুর রহমান, শামসুর রহমান আর আতাউর রহমান তিন ভাই। আজকাল ওকে খুব একটা দেখা যায় না। খুব একটা সামাজিক জীবনযাপন করে না। ব্যবসাপাতি করে। খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। অধ্যাপক রাজ্জাকের স্মৃতিচারণে ওর কথা এসেছে।

রাজশাহীতে আমার স্ত্রী আমার সাথে দেখা করতে যেতেন। শামসুর রহমান থাকা অবস্থাতেই গিয়েছেন কয়েকবার। তাদের কাছ থেকে কিছুটা আপ্যায়িতও হয়েছেন। এরপর ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পারমিশন নিয়ে অফিসারের সামনে বসে আমার সাথে কিছুটা কথাবার্তা তিনি বলে আসতে পেরেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেল প্রশাসন সিকিউরিটি প্রিজনারদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিল : এ-ডিভিশন আর বি-ডিভিশন। যেমন ধরুন, অনিল মুখার্জী আর অরুণ মুখার্জী দুই ভাই। অনিল মুখার্জী ছিলেন বি-ডিভিশনে। বি-ডিভিশন মানে লোয়ার ডিভিশন। আমি ছিলাম বি-ডিভিশনে। সুতরাং অনিল মুখার্জীর সাহচর্য আমি পেয়েছি। সত্যেন সেনও ছিলেন বি-ডিভিশনে। কখনো হয়তো তাকে কুমিল্লা জেলে বদলি করা হয়েছে। আমাকেও পাঠানো হয়েছে কুমিল্লা সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পলিটিক্যাল প্রিজনার কম। সাত কি আটজন হবে। আমরা একসঙ্গে থাকছি। সত্যেন সেনের জীবনাচরণ দেখছি। সত্যেন সেন আমাদের সঙ্গে গল্প করছেন। আমরা কেউ হয়তো রান্নাবাড়ার কাজ করছি, কেউ তরকারি কোটার কাজ করছি—এ রকম একটা এ্যাসোসিয়েশন মোটামুটিভাবে পাওয়া গিয়েছিল।

২৯. খাপড়ার সেই হত্যাকাণ্ড

রাজশাহী জেলে অন্যান্য বন্ধুদের কাছে আমি খাপড়া ওয়ার্ডের কাহিনী শুনেছি। রাজশাহী জেলে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে যে হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হয় তাকে আমরা বলি 'খাপড়া হত্যাকাণ্ড'। রাজশাহী জেলের সাধারণ কয়েদিরা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিল। পলিটিক্যাল প্রিজনারদের রাখা হয়েছিল খাপড়া ওয়ার্ডে। খাপড়া ওয়ার্ডটা ছিল একটা বাংলো বাড়ির মতো এবং এ বাড়িটার চারিদিকে অনেকগুলো জানালা ছিল। পলিটিক্যাল প্রিজনাররা এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে সাধারণ কয়েদিদের সমর্থনে আমাদের কিছু করা উচিত। সাধারণ কয়েদিরা যদি অনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তবে আমরাও অনশন করব।

সে সময় রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তার নাম ছিল মি. বিল। ও অর্ডার দেয় যে, কয়েদিদের মধ্যে যারা নেতা আছে তাদের আলাদা কর। আলাদা করার দিনটিতে মি. বিল যখন তার দলবল অর্থাৎ ডেপুটি জেলার ও অন্যদের নিয়ে খাপড়া ওয়ার্ডের ভিতরে অর্থাৎ সেই বাংলো বাড়িতে ঢুকে তখন পলিটিক্যাল প্রিজনাররা বাংলোর দরজাটি বন্ধ করে দেয় যাতে জেলাররা সেখান থেকে বের হতে না পারে। আগে থেকে নিশ্চয়ই এ রকম একটা প্ল্যান করা ছিল। সুতরাং সেখানে একটা ক্ল্যাশ-ট্যাশ হয়। তখন যা সাধারণত হয়ে থাকে, আটকা পড়া জেলাররা বাঁশি বাজিয়ে দিল। বাঁশিতে ফুঁ দিলে সিগনাল হয়ে যায়। পাগলা ঘণ্টি বাজতে আরম্ভ করে। আর্মড সিপাহীরা খাপড়া জেলের দিকে ছুটে আসে। জেলাররা তখনো ভিতরে আটকা পড়ে আছে। পলিটিক্যাল প্রিজনাররা খাটটাট এসব জানালার সামনে রেখে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সিপাহীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে জানালায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করতে শুরু করে। *সাতজন পলিটিক্যাল প্রিজনার নিহত হয়। আহত হয় অনেকে। আবদুশ শহীদের বইয়ে নাম আছে, কারা কারা নিহত ও আহত হয়েছিল। জেল হত্যার ইতিহাসে এটা একটা বড় ঘটনা। জেল কিলিং অন্যত্র হয়েছে, প্রেসিডেন্সি জেলেও হয়েছে, এ রকম হয়।

খাপড়া ওয়ার্ডে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার নেতা ছিলেন যশোরের কমরেড আবদুল হক। উনি খুব জঙ্গি নেতা ছিলেন। উনি খুবই উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা দিতে পারতেন। কলকাতার অনেক কমরেড তখনো ছিল। মনসুর হাবিবও একজন বড় এবং দক্ষ নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন বর্ধমানের আবুল হাশেম সাহেবের পরিবারের লোক। আবুল হাশেম সাহেবের পরিবার বর্ধমানের একটি জাতীয়তাবাদী মুসলিম পরিবার। অনেক শিক্ষিত ভালো ভালো ছেলে বের হয়ে এসেছে ঐ পরিবার থেকে। বইপত্রও লিখেছে অনেকে। সবার নাম বলতে পারছি না। বদরুদ্দীন উমর ভালো বলতে পারবেন।

'খাপড়া হত্যাকাণ্ড' সম্পর্কে আমাদের কমরেড আবদুশ শহীদের 'খাপড়া-স্মৃতি' বলে একটা বই রয়েছে। আবদুশ শহীদ নিজে খাপড়া জেলে ছিল এবং আহত হয়েছিল। আবদুশ শহীদ গ্রাজুয়েট ছিল। একটা স্কুলে শিক্ষকতা করত। একটা ধার্মিক পরিবারের ছেলে ছিল। সে কৃষক আন্দোলনে এসে গেল। কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজশাহী জেলে আমি তাকে পেয়েছিলাম। সে আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত।

যারা সিকিউরিটি প্রিজনারদের ইনচার্জ থাকত তারা সবাই যে খারাপ লোক ছিল তা নয়। ডেপুটি জেলার কেউ খারাপ ছিল, কেউ আবার ভালোও ছিল। সবাই আমাদের দেশের লোক। জেলার এবং সাধারণ কয়েদি সবাই সিকিউরিটি প্রিজনার্সদের খুব শ্রদ্ধা করত। এক সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে সিকিউরিটি প্রিজনারদের চার্জে ছিলেন ডেপুটি জেলার কাজী আবদুল আউয়াল*। তিনি এম. এ. পাস ছিলেন। নাজমুল করিম, সাজেদুল করিম,

---

* বিভিন্ন সূত্র থেকে খাপড়ার ২৪ এপ্রিলের শহীদদের নাম সংগ্রহ করে উল্লেখ করা আবশ্যক : কম্পরাম সিং, আনোয়ার হোসেন, হানিফ সেখ, দেলোয়ার হোসেন, সুধীন ধর, বিজন সেন, সুখেন ভট্টাচার্য। বি.দ্র. খাপড়া হত্যাকাণ্ডের বিবরণ কিছুটা বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় বদরুদ্দীন উমরের : ভাষা আন্দোলন ১ম খণ্ডে : পৃ ৩০৯-৩১১। হামদি শেখ, আনোয়ার হোসেন, সুখেন ভট্টাচার্য, দেলওয়ার, সুধীন ধর, কম্পরাম সিং এবং বিজন সেন।

* কাজী আবদুর আওয়াল যে একজন দেশপ্রেমিক মহৎ মানুষ ছিলেন তার এক পরিচয় এই যে, ১৯৭৫-এর ৩রা নভেম্বরে ঢাকা জেলে মোশতাকের নির্দেশে সামরিক সন্ত্রাসীরা ঢাকা জেলে ঢুকে পড়ায় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সেই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে তিনি নিজ উদ্যোগে সাহসিকতার সাথে ঘটনার পরবর্তীতে থানায় এই হত্যাকারীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজলুল করিম—এই সমস্ত লোকদের পরিবারের তিনি পরিচিত লোক ছিলেন। অত্যন্ত মানবতাবাদী ও হৃদয়বান এই ভদ্রলোক পলিটিক্যাল প্রিজনারদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং সাহিত্যিকদের খুব প্রশংসা করতেন। বিশেষ করে সত্যেন সেন যে সমস্ত চিঠি লিখতেন সেসব চিঠি তিনি প্রথমে পাঠ করতেন। এরপর সেসব চিঠি তিনি পাঠিয়ে দিতেন আই বি ডিপার্টমেন্টে। এই চিঠিগুলোর যে সব অংশ আই বি'র পছন্দ হত না সেগুলো তারা মুছে দিত অমোচনীয় কালি দিয়ে। তারপর এসব চিঠি আবার তারা জেলে ফেরত পাঠাত। এই সুন্দর সুন্দর সব চিঠির ভিত্তিতে সত্যেন সেনের বইও তৈরি হয়েছে : রুদ্ধ দ্বার, মুক্ত প্রাণ।

কাজী আবদুল আউয়াল পরে ডিআইজিও হয়েছেন। জেলে যখন তাজউদ্দীনসহ চার জাতীয় নেতাকে খুন করা হয় তখন বোধহয় কাজী আবদুল আউয়ালই ঢাকা জেলের ডিআইজি ছিলেন। তিনিই ব্যাপারটা ফেস করেছেন। যখন সশস্ত্র লোকজন গেটে দাঁড়িয়ে আছে এবং জেলের ভিতরে ঢুকতে চাইছে তখন তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফোন করে জানালেন যে এ রকম কিছু লোক এসেছে। জেলে ঢুকতে চাইছে। তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বা বঙ্গভবন থেকে বলা হচ্ছে : 'তারা যা করতে চায় করতে দাও।'

৩০. যুক্তফ্রন্ট ও কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলি

১৯৫৪ তে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় এসে গেল। আমি মনে করি যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের একটা ভূমিকা ছিল। ততদিনে বেশ কিছু মুসলমান যুবক কমিউনিস্ট আদর্শকে গ্রহণ করে কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে। যেমন একজনের নাম আবদুস সামাদ, সাহিত্যিক লায়লা সামাদের স্বামী। এরা খুব বড় রকমের সংগঠক ছিলেন। ১৯৫৪ সালের কথা বলছি। তখনো মুসলিম লীগের শাসন চলছে। নুরুল আমীন ক্ষমতায়। মুসলিম লীগের ব্যাপারে ছাত্রসমাজের মোহমুক্তি অবশ্য শুরু হয়ে গেছে। মুসলিম লীগের একটা ক্রেডিট এই যে, তারা নানা রকম চাপের মুখে একটা সাধারণ নির্বাচন দিতে রাজি হয়েছে। তখন আওয়ামী লীগ, হক সাহেবের কৃষক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম এর সাথে যুক্ত হল। এর মানে বিভিন্ন

বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং তাঁর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার ২৫ বছরের অধিককাল পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালে উচ্চ আদালতে হত্যাকারীদের বিচার কার্য শুরু হলে অবসরপ্রাপ্ত ৮০ বছরের বৃদ্ধ কাজী আবদুল আওয়াল আদালতে হাজির হয়ে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষীর বিবরণ প্রদান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেমন, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানী এবং নেজামে ইসলামের আতাহার আলী একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট দাঁড় করালো সরকারের বিরুদ্ধে।

এটা সহজ কোনো কাজ ছিল না। আমি মনে করি, এর পেছনে সাংগঠনিক দায়িত্বটা পালন করেছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা। এদের মধ্যে প্রফেসার মুজাফফর আহমেদ এখনো সক্রিয় আছেন। তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়ছে চট্টগ্রামের চৌধুরী হারুনুর রশীদ, সাহিত্যিক-সাংবাদিক সৈয়দ আলতাফ হোসেন যিনি এখন মারা গেছেন, সিলেটের পীর মুহম্মদ হাবিবুর রহমান এবং বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ—ইনিও কমিউনিস্ট সংগঠনের একজন অত্যন্ত কাছের লোক। আরো অনেকে ছিলেন যাদের নাম আমি তাৎক্ষণিকভাবে মনে করতে পারছি না। আমি মনে করি যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বটা পালন করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। সাধারণভাবে আমাদের দেশের নির্বাচনে যা হয়, নেতাদের পক্ষ থেকে 'আমি এটা চাই, আমি এই সিট ছাড়বো না, আচ্ছা এই সিটে কাকে দেওয়া যায়' ইত্যাদি ধরনের দাবি ওঠে। সেখানে আমি শুনেছি কোনো কোনো কমিউনিস্ট প্রার্থী তার নিজের সিট ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, অমুক আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে সিটটা দেওয়া হোক। এই এ্যাকোমোডেশনের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছাড়া যুক্তফ্রন্ট দাঁড়াতে পারত না।

যুক্তফ্রন্টের সময় আমি জেলে। যুক্তফ্রন্ট হয়ে গেল। নির্বাচন হয়ে গেল। আবুল কাসেম ফজলুল হক সাহেবের মতো নেতারা আবার সামনে চলে এলেন। আবু হোসেন সরকার সাহেবের নেতৃত্বে হক সাহেবের সরকার পূর্ববঙ্গে তৈরি হল। পূর্ববঙ্গের সাধারণ দাবি ছিল 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই'। রাজবন্দিদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন কমিউনিস্ট কর্মীরা। দুটি সাধারণ শ্লোগান ছিল তখনকার দিনে : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এবং 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই'। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবু হোসেন সরকার সাহেব তাঁর সুনাম রক্ষার জন্যে কিস্তিতে কিস্তিতে রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে শুরু করলেন : কোনো জেল থেকে দশ জনকে, কোনো জেল থেকে পাঁচ জনকে—এভাবে।

এই পর্যায়েই আমাকে ১৯৫৫ সালের মার্চ, এপ্রিল বা মে মাসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অফিসে ডেকে বলা হল—আজ কয়েকজন সিকিউরিটি প্রিজনার রিলিজড হবেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ফজলুল করিম। ঐ জেলে ফজলুল করিম নামে দ্বিতীয় কোনো লোক ছিল না। ফজলুল করিম সরদার অধ্যাপক হিসেবেও জেলের অফিসারদের কাছে পরিচিত। বিকেলে মুক্তি দেবার জন্যে ফজলুল করিমকে নিয়ে আসা হল। ফজলুল করিম তার দস্তখত-টস্তখত দিয়ে জেল থেকে রিলিজড্ হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিলিজ করার ব্যাপারে একটা ঝামেলা ছিল। ফজলুল করিম সরদার নামে নাকি রাজশাহী জেলেও একজন সিকিউরিটি প্রিজনার ছিল। তবে এই সরদার ফজলুল করিমই ছিল বেশি পরিচিত। সরদার ফজলুল করিম যে শুধু পাকিস্তান ও করাচীতেই পরিচিত ছিল তা নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরাও তার নাম জানত। ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরা যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কথা ইতোমধ্যে জেনেছে। পাকিস্তানে যে 'গভর্নমেন্ট ইন পাওয়ার' হ্যাজ বিন ডিফিটেড লাইক এনিথিং—এটা ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকরা জানতেন। তাঁরা মনে করতেন, কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক ক্ষতার কারণেই এটা ঘটেছে এবং ইস্ট বেঙ্গল হ্যাজ গন রেড।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির ফরমালিটিজগুলো হয়েছে আমি জেলে থাকার সময়েই। মোজাফফর জেলে গিয়ে আমার সম্মতিসূচক দস্তখত নিয়ে এসেছে। আমি তো অনুগত কর্মী ছিলাম। যা বলেছে তাই করেছি। সম্মতি জানিয়ে দস্তখত দিয়ে দিয়েছিলাম। ১৯৫৫ এর মাঝামাঝি সময়ে আমি জেল থেকে বের হয়ে এলাম। আমি রিলিজ পেয়ে বাইরে আসার পর ইলেকশানটা হয়েছিল।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি গঠিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাক্ট অনুসারে। গোলাম মহম্মদ সাহেব এই কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি ভেঙে দিলেন। তমিজউদ্দীন খান সাহেব এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। সেই মামলায় জাস্টিস মুনীর রায় দিলেন যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাক্টে কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি ভাঙার কোনো কথা নাই। তবু যখন ভেঙে দেওয়া হয়েছে তখন আর কি করা। এখন সেন্টারে নূতন একটা কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি গঠন করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বিভিন্ন পার্টি থেকে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তারা কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি সদস্য নির্বাচিত করবেন।

প্রাদেশিক পরিষদে তখনো কংগ্রেসের একটা অংশ ছিল আর কমিউনিস্ট হিসেবেও কিছু সদস্য ছিলেন : প্রসূন কান্তি রায়, (বরুণ রায়), চট্টগ্রামের একজন সাহিত্যিক পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সুধাংশু দস্তিদার। এঁরা ধর্ম বা সম্প্রদায়গতভাবে ছিলেন হিন্দু কিন্তু আদর্শগতভাবে ছিলেন কমিউনিস্ট। এঁদের একটা ক্ষমতা ছিল। কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী সদস্যের সংখ্যা ত্রিশের কম ছিল না।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটা ছিল এ রকম : ধরা যাক, পূর্ব পাকিস্তান থেকে সদস্য নির্বাচিত হবে পঞ্চাশজন। এই পঞ্চাশ দিয়ে আপনি তিনশকে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে অর্থাৎ ছয়জন সদস্যের সমর্থন যদি আপনি পান তবেই আপনি নির্বাচিত হয়ে গেলেন। কোনো সদস্য একবার ভোট দিয়ে ফেললে তার ব্যালটটা বাতিল হয়ে যাবে। এই নির্বাচন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্ধতির নাম ছিল প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশান উইথ সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট। যে দলের যে রকম শক্তি আছে সেই শক্তি অনুযায়ী সে সদস্য পাবে।

আওয়ামী লীগের প্যানেলটা হচ্ছে প্রধান প্যানেল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যে কমিউনিস্ট কর্মীরা ছিলেন তাঁরা শেখ মুজিব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে একটা কথা নাকি এভাবে বললেন যে, আওয়ামী লীগের মেইন প্যানেলকে আমরা ভোট দেব তবে আমাদের নিজেদের একটা দাবি আছে। আমাদের নিজেদের একজন লোককে কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লিতে পাঠাতে চাই। তাঁরা জানতে চাইলেন 'সে কে?' কমিউনিস্ট নেতারা উত্তর দিলেন, 'সে যেই হোক'। পরে আমার নামটাও আওয়ামী লীগের প্যানেলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের প্যানেলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এটা আমি তখনো জানতাম না। এ ব্যাপারটাকে আমি বলি, বাঙালের হাইকোর্ট দেখা। আমার কাছে করাচী ইত্যাদি দূর মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপার। আমি কোনোদিন চিন্তা করি নাই যে, আমি করাচী যাবো বা আমি আইন সভায় যাবো। আমি হচ্ছি একজন মোস্ট নন-এ্যামবিশাস পারসন। নন-এ্যামবিশাস অবজার্ভার অব লাইফ। আই টুক ইন্টারেস্ট ইন দি অবজার্ভেশন অব লাইফ। জেলখানায় ৫৮ দিনের হাঙ্গার স্ট্রাইকে আমি অংশগ্রহণ করেছি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নুরুল হক এবং প্রফেসার আনিসুজ্জামানের স্মৃতিচারণে আছে কনস্টিটিউশান এ্যাসেমব্লির ব্যালটিংটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখন যেটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিস সেখানে। ওটা আগে ছিল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিশনার্স অফিস। ইলেকশানের শেষে তরুণ কর্মী যারা আছেন তাঁদের প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াল যে সরদার ফজলুল করিম ইলেক্টেড হয়েছেন কিনা। তারা যখন শুনল যে তাঁদের প্রার্থী সরদার ফজলুল করিম নির্বাচিত হয়েছেন, তখন তাঁরা খুবই উৎফুল্ল হলেন।

সে সময় আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। রোযার দিন ছিল তখন। পুলিশেরা তাদের কি একটা দাবি নিয়ে স্ট্রাইক করেছিল সে সময়। এ অপরাধে পুলিশদের এ্যারেস্ট করা হয়। ঘেরাও করা হয় তাদের। আইয়ুব খান তখন চার্জে ছিল। গভর্নমেন্ট কমিউনিস্টদের এই পুলিশ ধর্মঘটের সাথে ইনভল্‌ভ করে এবং তাদের এ্যারেস্ট করতে শুরু করে। আমাকেও এই সময়ে আবার এ্যারেস্ট করা হল।

আমি রিলিজ পেয়েছিলাম ঢাকা থেকে। ইলেক্টেডও হয়েছিলাম ঢাকা থেকে। ইলেক্টেড হয়ে আমি এ্যাসেমব্লিতে এ্যাটেন্ড করতে গেলাম। এ্যাসেমব্লির প্রথম অধিবেশন বসে মারী পাহাড়ে। মারী পাহাড় রাওয়ালপিন্ডির কাছে। এই মারী পাহাড়েই মোঘলরা তাদের রাজবন্দিদের রাখত। এটা একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজার ব্যাপার যে পাকিস্তান সরকার কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির প্রথম অধিবেশনটা করাচীতে করল না, করল পিন্ডির কাছে মারী পাহাড়ে গিয়ে।

আমি যখন পাকিস্তান পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলাম, তখন বিভিন্ন মহলে আমার বন্ধুবান্ধবেরা ছিল। হক সাহেবের দলের লোকদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব আমাকে খুব এ্যাফেকশনেটলি দেখতেন। ওঁর একটা কমেন্ট আমার এখনো মনে আছে। করাচীতে পার্লামেন্টের মেম্বারদের থাকার জন্যে যে মেস ছিল (এখনকার এমপি হোস্টেলের মতো) সেখানে আমি দেখতাম পাকিস্তানের পলিটিক্স শুরু হয় আফটার মিড নাইট বা মধ্যরাতের পর। মধ্যরাতের আগ পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট আছে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, সেই গভর্নমেন্ট আর নাই। যত ষড়যন্ত্র, যত আলোচনা সব সেখানে হত মধ্যরাতের পরে। আমি ছিলাম একটা নরমাল মানুষ। আমি হয়তো সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে খুব বেশি হলে বারোটা পর্যন্ত জাগব, তারপর বারোটার সময় ঘুমাতে যাব। যদিও আই ওয়াজ এ্যালাইড টু আওয়ামী লীগ এবং আমি আওয়ামী লীগের যে কোনো মিটিং-এ যেতে পারতাম কিংবা আমি জিজ্ঞেসও করতে পারতাম কোনো ব্যাপারে, কিন্তু আমি দেখলাম যে আমি স্যুটেবল না। আমি অংশগ্রহণ করতাম না মধ্যরাতের পরে সংঘটিত হওয়া এই সব গোপন সভায়।

সুতরাং গভর্নমেন্টের উত্থান এবং পতনের সঙ্গে আমি খুব একটা জড়িত ছিলাম না। সে জন্যেই সৈয়দ আজিজুল হক যার পরিচিত নাম নান্না মিয়া এবং যিনি হচ্ছেন হক সাহেবের নিজের ভাগনা, তিনি আমাকে একদিন বললেন, 'সরদার (কিংবা ফজলুল করিম, এই দুই নামেই তিনি আমাকে ডাকতেন) একটা আশ্চর্য ব্যাপার শুনবেন?' আমি বললাম 'কী?' উনি বললেন, 'আপনি তো বড় সাংঘাতিক মানুষ। হোয়াইল উই রান আফটার পাওয়ার, পাওয়ার রানস আফটার ইউ।' তারা একদিন মন্ত্রী হতে চাচ্ছেন, একদিন সরকার গঠন করতে চাচ্ছেন। আমার ভোট একটা হলেও অনেক সময় এক ভোটে ডিসিশন হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি এই পক্ষে ভোট দিই তা হলে সে জিততে পারে—এরকম হতে পারে। সেই জন্যেই উনি বললেন যে পাওয়ার তোমাকে ধরতে পারছে না। এটা আমার জন্যে একটা বড় ট্রিবিউট বলে আমি মনে করি।

গীবন নামে একজন ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। স্পিকার ছিলেন আবদুল ওহাব খাঁ। গীবন আমার সম্পর্কে প্রশংসা করে লিখেছেন : হি ইজ এ সিরিয়াস ম্যান। পাঠানেরা যখন আমার সম্পর্কে একটু ঠাট্টা করে বলেছে, 'ইয়ে সরদার হ্যায়, ইস্ট পাকিস্তানকা, মাশরেকী সরদার। মানে এ একটা লিলিপুটের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ, তার নাম নাকি আবার সর্দার। এরকম বলেছিল হয়তো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আবদুর রশিদ যে আগে পুলিশের আই জি ছিল পরে চিফ মিনিস্টারও হয়েছিল। সে তখন পার্লামেন্টের মেম্বার এ ধরনের মন্তব্য শুনে গীবন বলতেন, ছোটা হ্যায়তো ক্যা হ্যায়, ইয়ে সরদার তো হ্যায়। সীমান্ত প্রদেশের কোনো কোনো পাঠান হয়তো আমাকে ডিফেন্ড করে বলত, 'নেহি নেহি, ইন্‌কো দিমাগ হ্যায়'। এই কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির একটা বুকলেটে পাকিস্তান সরকার বের করেছিল তাতে আমার ছবি ছিল। শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান এদের সবার ছবি ছিল। কিন্তু '৫৬-এর পাকিস্তান সংবিধানে আওয়ামী লীগ স্বাক্ষর করেনি। আমারও কোনো স্বাক্ষর ছিল না।

পাকিস্তান হওয়ার পর চারটি প্রভিন্সিয়াল ইউনিট ছিল : সিন্ধ, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পূর্ব বাংলা। এর পর ওয়ান ইউনিট করে সিন্ধ, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অটোনোমি বাতিল করা হয়। তখনি সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই ফর্মুলা নিয়ে আসেন যে ইস্ট পাকিস্তান আর ওয়েস্ট পাকিস্তান সমান। পার্লামেন্টের ওয়ান ইউনিটের ডিবেটে আওয়ামী লীগ সাপোর্টেড ওয়ান ইউনিট। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সাপোর্টেড ওয়ান ইউনিট। এক সময় আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পলিসির বিপক্ষে ভোট দিতে পারিনি কারণ আমার পাশে তখন কেউ ছিল না। এবং কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল যে আই ভোট এগেইনস্ট সোহরাওয়ার্দীর ফরেন পলিসি। কিন্তু ওয়ান ইউনিটের সময় আই ডিড নট হেজিটেট। আই সেইড মাই পয়েন্ট। ইংরেজিতে আমি বলেছি এই যে, এ্যাবোলিশান অব প্রভিন্সিয়াল অটোনোমি অব নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স, অব সিন্ধ, অব বালুচিস্তান—দিস ইজ নট গুড।

পাঞ্জাবিদের কারসাজিতে এসব হয়েছিল। 'জিয়ে সিন্ধ' নামে একটা আন্দোলন পর্যন্ত হয়েছিল সিন্ধ প্রদেশে। সে সময় তাদের মধ্যে প্রচলিত একটি কৌতুক ছিল এ রকম : ধরা যাক, একজন সিন্ধ কোনো একটা ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। সেই ঘরে যদি একটি সাপ আর একটা পাঞ্জাবি ঢুকে পড়ে তবে সিন্ধটি তার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কাকে আগে মারবে? সিন্ধটি অবশ্যই পাঞ্জাবিটিকে আগে মারবে, কারণ সে সাপের চেয়ে ভয়ঙ্কর।' পাঞ্জাবিদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বাকি প্রদেশবাসীদের মনোভাব এই গল্পে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমার এই বক্তৃতা পাঠানেরা খুব এ্যাপ্রিসিয়েট করেছে। পাঠানেরা তো ওয়ান ইউনিট চায়নি। এ্যাবোলিশান অব পাখতুনিস্তান তারা চায়নি। আওয়ামী লীগ ওয়ান ইউনিট চেয়েছে কারণ পূর্ব পাকিস্তানে তারা ছাড়া তো আর কেউ ছিল না তখন! সুতরাং ওয়ান ইউনিট হলেই বা তাদের লোকসান কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ছিলাম ইন্নোসেন্ট একটা মেম্বার। আমি এসব কিছু দেখেছি। এমন হয়েছে, কোনো কোনো সময় যে, পত্রিকায় কোনো মেম্বারের নাম আসছে না। কিন্তু পত্রিকায় নাম কেমন করে আসবে যদি তিনি এ্যাসেমব্লিতে বক্তৃতা না দেন? আমার এক বন্ধু (আমি নাম বলছি না) পিছন থেকে বারবার স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বলছেন, 'স্যার!' মানে উনি কিছু বলতে চান আরকি। স্পিকার বলছেন, 'ইউ সিট ডাউন।' দুই মিনিট পরেই আমার ফ্রেন্ড আবার বলছে, 'স্যার আই ওয়ান্ট টু স্পিক।' স্পিকার হয়তো আবার তাকে বলছেন বসে পড়তে। পরের দিন হি বিকেইম হেড লাইন অব পাকিস্তান টাইমস কিংবা ডন ইত্যাদি পত্রিকায়। প্রথমে তার নাম তারপর লেখা 'দি ইনডোমিটেবল'। দি ইনডোমিটেবল মি. অমুক। স্পিকার তাকে সুযোগ দিচ্ছিলেন না, কারণ তার হয়তো সময় তখনো আসে নাই বা সময় দিলেও যে তিনি ইংরেজিতে একটা ডেলিবারেশন দিতে পারবেন এমন যোগ্যতা হয়তো তার নেই। যদিও বাংলা তখন গৃহীত হয়েছে তবুও বাংলায় বক্তৃতা দেওয়াটা নর্ম নয়। বাঙালি কেউ পাকিস্তান পার্লামেন্টে বাংলায় বক্তৃতা করেছে বলে আমার মনে পড়ে না। তারা উর্দুতে বা ইংরেজিতে বলেছেন। এমনকি বঙ্গবন্ধুও বেশিরভাগ সময় ইংরেজি ব্যবহার করেছেন, ইন হিজ ওন ওয়ে। শেখ সাহেব দেখতাম, বক্তৃতার ব্যাপারে খুব একটা পরোয়া করতেন না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা মাথায় আসত তাই ইংরেজিতে বলতেন। তিনি খুব একটা মেপে কথা বলতেন না।

একমাত্র ঐ পাগলা, মানে ফরিদ আহমদ ইংরেজিতে প্রফিসিয়েন্ট ছিল। আমার ক্লাসফ্রেন্ডও ছিল সে এবং ইংরেজির ছাত্র ছিল। যেমন ইংরেজি, তেমন উর্দু এবং তেমন বাংলা—এই তিনটি ভাষাতেই সে বক্তৃতা করতে পারত। ওর মেম্বারশিপটাকে, হি মেড ইট এ প্রফেশান। কারণ তখন বিজনেসম্যানরা পার্লামেন্টের মেম্বারদের দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রবলেম এ্যাসেমব্লিতে প্রজেক্ট করত : উইল দি অনারেবল মিনিস্টার রিপ্লাই হোয়াই দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড? কিংবা লাইসেন্স-টাইসেন্স ইত্যাদি নানান ব্যাপারে সে প্রশ্ন করত। এই ফরিদ আহমদ প্রত্যেকটা প্রশ্ন করার জন্যে ফি আদায় করত পাবলিকের কাছ থেকে। দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট এ বিজনেস। হি ওয়াজ মোর এ ক্যারিকেচার দ্যান এ সিরিয়াস স্পিকার। পরবর্তীকালে তার যে পরিবর্তন হয়েছে তাতো আপনারা দেখেছেন।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির মেম্বারদের মধ্যে একমাত্র আমিই বলতাম যে আমি কৃষকের ছেলে। আওয়ামী লীগের মেম্বারদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন এ্যাডভোকেট বা উকিল। এদের কেউ কেউ কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসতে পারেন। এ্যাসেমব্লি ওয়াজ কনস্টিটিউটেড বাই মুসলিম মিড্‌ল ক্লাস, মুসলিম রাইজিং মিড্‌ল ক্লাস। পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা সবাই ছিলেন বড় বড় সামন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভু। পূর্ব পাকিস্তানের একজন সদস্যও তাদের কাছে গণনীয় ছিলেন না। পাকিস্তানেরও ইস্কান্দর মির্জার মতো বড় বড় নেতারা সব ছিলেন। মিয়া ইফতেখার উদ্দিন ছিলেন পাকিস্তান টাইমসের মালিক এবং জাতীয়তাবাদী। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একজন বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা। পরে পাকিস্তান সরকার তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

মিয়া মমতাজ দৌলতানার বক্তৃতা আমি শুনেছি। পারফেক্ট বক্তৃতা দিতেন তিনি এবং সিরিয়াস ব্যাপারে আলোচনা করতেন। পাকিস্তান পার্লামেন্টে সিরিয়াস কোশ্চেন উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সিরিয়াসলি তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত প্রভুরা একে অপরের সাথে টেক্কা দেবার জন্যে একটি নির্বাচনী ট্যাকটিস ব্যবহার করত। সামন্ততন্ত্রের টপ সেকশানটা যদি মনে করত যে অমুককে আমরা নির্বাচনে কনটেস্ট করতে দেব না, তবে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে পঞ্চাশ বা একশত মাইল দূরে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। এর ফলে একদিকে সেই প্রার্থীর পক্ষে বাড়ি ফিরে এসে আবার নোমিনেশন পেপার সাবমিট করা সম্ভব হত না আর অন্যদিকে যে ব্যক্তি এটা করত তার বিরুদ্ধে কোনো মার্ডার কেস ফাইল করা যেত না।

কমিউনিস্ট কর্মী পশ্চিম পাকিস্তানেও ছিল, তবে ইস্ট বেঙ্গলের মতো অত বেশি ছিল না। এরিক রহিম নামে এক কমিউনিস্ট নেতার কথা মনে পড়ছে। ওখানকার কমিউনিস্ট কর্মীরা আমাকে যথা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। সব সময় আমার পেছনে স্পাই আছে এটা তো জানাই ছিল। প্লেনে করে করাচী হয়ে যখন মারী গেলাম তখন আমার পাশের সিটেই বসে ছিল উচ্চপর্যায়ের এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা। আমার নির্বাচনটা পূর্ব ও পশ্চিম, এই উভয় পাকিস্তানে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। ওরা আমাকে কমিউনিস্ট বলে আখ্যায়িত করে, যদিও আমি নিজেকে কমিউনিস্ট দাবি করতাম না। আমি নিজেকে বললাম 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট'। কিন্তু ওরা সে কথা স্বীকার করত না।

৩১. ওয়াশিংটনের উদ্বেগ ও দ্বিতীয়বার কারাবরণ

ওয়াশিংটনে আমার নির্বাচনের খবরটা আসে এভাবে : ওয়ান কমিউনিস্ট ফ্রম জেইল ইলেক্টেড টু কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি। তাদের কাছে এটা একটা বড় ব্যাপার। ওয়াশিংটন এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দাবি করে করাচীতে আমেরিকান এ্যামবেসাডরের কাছে। আমেরিকান এ্যামবেসাডর ব্যাখ্যা দাবি করে করাচীতে পাকিস্তানের হোম ডিপার্টমেন্টের কাছে। করাচীর হোম ডিপার্টমেন্ট ব্যাখ্যা দাবি করে ঢাকার আবু হোসেন সরকারের কাছে যে, 'টেল আস, হাউ সরদার ফজলুল করিম হ্যাজ বিন রিলিজড!' তখন আবু হোসেন সরকার কোনো রকম করে একটা কৈফিয়ত তৈরি করে জানান যে, সরদার ফজলুল করিমকে রিলিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়নি। সরদার ফজলুল করিম নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে জেল থেকে বের হয়ে এসেছে। আমরা শিগগিরই তার বিরুদ্ধে আবার মামলা করব এবং তাকে আবার এ্যারেস্ট করা হবে।

আমি পুলিশ ধর্মঘটের কথাটা জানতাম। এও জানতাম যে কমিউনিস্টদের আবার জেলে ঢোকানো হচ্ছে এবং তারা আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে। একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলি। সেদিন দ্বিতীয় বারের মতো পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে এ্যাসেমব্লিতে যোগ দেবার জন্যে আমি তেজগাঁও এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে উঠেছি। শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান ইত্যাদি বড় বড় লিডাররাও প্লেনে উঠে পড়েছেন। বোর্ডিং শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ আগে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্লেনটা ছাড়ছে না, দেরি করছে। এমন সময় এয়ারপোর্টের ওসি প্লেনে উঠে ডেকে বলছে, 'হু ইজ সরদার ফজলুল করিম?' আমি নিজের পরিচয় দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, 'ইউ প্লিজ কাম ডাউন। ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট।' এই বলে আমাকে বিমান থেকে নামানোর সময় আমি 'মুজিব ভাই' বলে ডাক দিলাম। বললাম, 'মুজিব ভাই, আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।' পুলিশ আমাকে সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদ করল, আমি কেমন করে রিলিজ পেয়েছি ইত্যাদি ব্যাপারে এবং তারপর সোজা আমাকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল।

৩২. জেল থেকে পালিয়েছে!

সেন্টাল জেলে আমাদের পুরোনো সাথীরা অল্পবিস্তর তখনো আছে। সিকিউরিটি এ্যাক্টের আন্ডারে তো আমি আছিই। ডেপুটি জেলারকে দিয়ে একটা মামলা ওরা দায়ের করল। মামলাটা হচ্ছে এ রকম : সরদার ফজলুল করিম ওয়াজ নট রিলিজড। দি রিলিজ অর্ডার ওয়াজ অন ফজলুল করিম সরদার অব রাজশাহী। যশোরের এক কর্মী অবশ্য ছিল যার নাম ফজলুল করিম সরদার। হোম ডিপার্টমেন্ট আবু হোসেন সরকারকে বলেছিল, এ ব্যাপারটাকে ব্যবহার করে আমার বিরুদ্ধে কোনো কেস ফাইল করা যায় কিনা। অভিযোগটা হবে এই যে, সরদার ফজলুল করিম নিজের নাম ভাঁড়িয়ে জেল থেকে রিলিজ নিয়েছেন, তাকে রিলিজ দেওয়া হয়নি।

কেস যেহেতু হয়েছে, আমাকে মাঝে মাঝে কোর্টে নিয়ে যেত জেল-প্রশাসন। আতাউর রহমান খান সাহেব নিজে আমার পক্ষে মামলা লড়লেন। তিনি আবু হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা কি করেছো? সরদারের নামে এটা কি রকম কেস তুমি করলে? তখন আবু হোসেন সাহেব উত্তর দিলেন, 'এতে তো কিছু হবে না। কেস একটা করতে বলেছে তাই করেছি।' কিছু হলো না অবশ্য শেষ পর্যন্ত। কোর্টে ডেপুটি জেলারকে জেরা করা হল এভাবে : 'সরদার ফজলুল করিমকে আপনি চেনেন?' উনি উত্তর

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন : 'হ্যাঁ চিনি'। 'সরদার ফজলুল করিমকে ওঁর সেল থেকে কে ডেকে নিয়ে এসেছিল আপনাদের অফিসে?' উনি উত্তর দিলেন, আমরাই'। তা হলে কেমন করে আপনি বললেন যে, উনি নিজের নাম ভাঁড়িয়ে জেল থেকে পালিয়ে গেছেন? তখন জেলার মুখ ফসকে বলে ফেলল : 'স্যার আমাদের উপর হুকুম হয়েছে একটা কেস করার, তাই করেছি।' এ কথা বলাতে ডেপুটি জেলার বেচারার চাকরিটা চলে যায়। তিনি নিজেকে ঠিকভাবে ডিফেন্ড করতে পারেননি। আমি অবশ্য মানহানির মামলা করতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। জজ বললেন, 'মিসটেকেন রিলিজ হয়ে গেছে'। এরপর সিকিউরিটি অধ্যাদেশের আওতারে আমাকে আবার সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

৩৩. ৫৬-র সংবিধান : স্বাক্ষরবিহীন ছবি

১৯৫৬-এর কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেমব্লি একটা স্মরণিকা বের করেছিল। এই স্মরণিকাটি এখনো পাওয়া যায়। সেই স্মরণিকায় আমার ছবি আছে। একটা হ্যাংলা-পাতলা, মুখ ভাঙা লোকের ছবি যার নিচে ইংরেজিতে নাম লেখা আছে সরদার ফজলুল করিম। তাতে আওয়ামী লীগের সদস্যদেরও ছবি আছে কিন্তু ঐ ব্যাখ্যাটা নাই যে কেন তারা কনস্টিটিউশনে সই করেননি। হাসান হাফিজুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের যে দলিলপত্রের একটা সংকলন করেছেন তার মধ্যে এই ব্যাপারগুলো আছে কিনা, আমি জানি না। ওখানে প্রথম খণ্ডে ৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলির একটা বিবরণ দেওয়া আছে। এই কনস্টিটিউশান মেকিং-এর ব্যাপারটা সেখানে কতখানি আছে তা আমি দেখতে পারিনি।

AMARBOI.COM

সেন্টারে যখন সরকার পরিবর্তন হল অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তার আগে খুব ভাঙাগড়া হয়েছে সরকারে। কখনো চৌধুরী মুহম্মদ আলী, কখনো বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন আইনমন্ত্রী। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হল। শেখ মুজিব একদিন ডেমোনেসট্রেটিভলী জেলখানায় গিয়ে সিকিউরিটি প্রিজনারদের বার করে নিয়ে আসলেন। এই ঘটনাটা ঘটে ১৯৫৬ সালে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত দেওয়া হচ্ছে তখন। জয়েন্ট ইলেকশানের পক্ষে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বক্তৃতাটা এ সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো লোকেরা খুব বড় রকমের এ্যাডভোকেট ছিলেন। তাঁরা যখনই কিছু এ্যাডভোকেট করতে চাইতেন তখন খুবই দক্ষতার সঙ্গেই তা করতে পারতেন। তখনই আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মুভমেন্টটা প্রথম দেখি। হি ওয়াজ এ সিরিয়াস ম্যান। যখন যে কাজ তিনি করতেন, তিনি তখন তা সিরিয়াসলিই করতেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন ঠিক করতেন যে তিনি একটা বক্তৃতা দেবেন তখন বক্তৃতার পয়েন্ট সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক করা, পয়েন্টগুলো উচ্চারণ করা, এ্যাসেমব্লির করিডোরে ঘুরে ঘুরে নিজের বক্তৃতা রপ্ত করা ইত্যাদি তিনি নিজেই করতেন।

তখন পূর্ববঙ্গ আইন সভার একদিকে হক সাহেবের দলের আবু হোসেন সরকার আর অন্যদিকে আওয়ামী লীগ। তারা পালটাপালটি করছে, এক দল আরেক দলকে কথা বলতে দিচ্ছে না, আজ আবু হোসেন সরকার সাহেবের গভর্নমেন্ট আছে কিন্তু পরদিন আওয়ামী লীগ তাকে সমর্থন না করার ফলে আবু হোসেন সাহেবের সরকার নো কনফিডেন্স ভোটে ডিফিটেড হয়ে যাচ্ছে, আবার আওয়ামী লীগ আসছে—এই যে ব্যাপারটা, এটা অত সহজে আমি পিকচারাইজ করতে পারব না।

এই টাগ অফ ওয়ারের অবসান হল যখন ১৯৫৮ সালের অক্টোবরের গোড়ার দিকে (সম্ভবত ৭ অক্টোবর) পাকিস্তান সরকার মার্শাল ল জারি করল এবং এ্যাসেমব্লি ভেঙে দিল। ফলে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানটাও বাতিল হয়ে গেল। যে অজুহাতটা দেখিয়ে আইয়ুব খান ক্ষমতায় এল ১৯৫৮ সালে সেটা হচ্ছে প্রাদেশিক পরিষদের সভায় শাহেদ আলী সাহেবের মার্ডার হবার ঘটনাটা।

৩৪. '৫৮-এর সামরিক শাসন

জগন্নাথ হলের যে অংশটা এখন ভেঙে পড়েছে (অর্থাৎ যে জায়গায় এখন অক্টোবর বিল্ডিং) সেখানেই ছিল এই পার্লামেন্টের অবস্থিতি। এখানে পার্লামেন্টের সেশন হয়েছে। সেখানে দর্শকদের গ্যালারিতে বসে আমি পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পার্লামেন্টের সেশন অবজার্ভ করেছি। কিন্তু পাকিস্তান পার্লামেন্টের কোনো সেশন এই ভবনে হয়েছিল কিনা দ্যাট আই ক্যান্‌ট্ রিমেমবার*। সেই প্রাদেশিক আইন সভায় শাহেদ আলী মার্ডারড্ হন। ব্যাপারটা ঘটেছিল এ রকম : পার্লামেন্টে পেপার ওয়েট ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছিল, এবং একটা পেপার ওয়েট ইনোসেন্ট শাহেদ আলী সাহেবের কপালে গিয়ে লাগে এবং রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালাইজ করা হয়েছিল কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত কারণে শাহেদ আলী সাহেব মারা যান। দিজ গেইভ এ ক্যজ টু আইয়ুব খান টু ডিক্লেয়ার মার্শাল ল এন্ড ডিজলভ্ অল এ্যাসেমব্লিজ। অল দিজ ওয়াজ ডান ইন অক্টোবর ১৯৫৮।

১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত আমি ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির মেম্বার হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছি। যেমন, বরিশাল গিয়েছি। সেখানে বিভিন্ন

---

* অধ্যাপক আহমেদ কামালের বাবা আদেল উদ্দীন আহমদ কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির মেম্বার ছিলেন। আহমেদ কামাল সংশোধনী হিসাবে জানিয়েছেন তখনকার জগন্নাথ হল ভবনে পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির অধিবেশন বসেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছি। ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির মেম্বার হিসেবে আমার কিন্তু প্রিভিলেজ ছিল যেমন, ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর টিকেট পেতাম আমি। ১৯৫৮-এর শেষের দিকে একদিন বরিশাল গিয়েছি। তখন অক্টোবর মাসই ছিল সম্ভবত। এখনো মনে আছে, আমি জাহাজ থেকে ডিসএম্বার্ক করব তখন দেখি আমার বন্ধুবান্ধবরা, আমার কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বাররা সবাই স্টিমার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং পাড়ে দাঁড়িয়ে তারা চিৎকার করে ঘোষণা দিচ্ছেন, মার্শাল ল জারি হয়ে গেছে। তখন আমি বুঝলাম যে মার্শাল ল জারি হয়ে গেছে। তখন আমি চিন্তা করলাম, আমার আর নরমাল জাহাজে করে (অর্থাৎ যে জাহাজে আমি সাধারণত চলাফেরা করতাম, R.S.N.I.G.N কোম্পানির বড় বড় সব জাহাজে) আমার ঢাকায় ফেরা উচিত হবে না। ঘটনা আরো ঘটবে। সুতরাং তার পরদিন বরিশালে আমি কোনো মিটিং করলাম না।

তখন বরিশাল-ঢাকা লঞ্চ সার্ভিস চালু হয়ে গেছে। আর এস এন আই জি এন কোম্পানির ভালো জাহাজও যেমন অস্ট্রিচ, লেপচা ইত্যাদি চলছে, আবার প্যারালাল ওয়েতে লঞ্চও চলছে। আমি এ রকম একটা লঞ্চে করে ঢাকায় ফেরত আসলাম। আমার তখন বাসস্থান ছিল, এখন যেটা মতিঝিল এ জি বি কলোনি সেখানে। এই 'একাউন্টেন্ট জেনারেল', কলোনিতে আমার একটা কোয়ার্টার ছিল। কোয়ার্টারটা পেয়েছিলাম, কারণ আমার ওয়াইফ মতিঝিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের টিচার ছিলেন। এ্যাডুকেশন সার্ভিসের লোক তিনি, সে যুগের এম এ বি টি ছিলেন। মাহফুজুল হক সাহেব নামে হক সাহেবের দলের একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি যখন তাকে বললাম যে, 'আমার তো বাসা নাই, আমার ওয়াইফ কেমন করে কাজ করবে?' তখন মাহফুজুল হক বোধ হয় স্টেট মিনিস্টার ছিলেন। মাহফুজুল হক সাহেব ইন্টারভেন করে এ জি বি কলোনিতে আমার নামে একটা দুই কামরার বাসা এ্যালট করালেন। ঐ বাসাতেই আমার স্ত্রী আমাদের একটি বাচ্চা (তখনো সন্তান আমাদের একটি) নিয়ে থাকতেন।

আয়ুব খান মার্শাল ল জারি করার পর সব এ্যাসেমব্লি ওয়াজ ডিজলভ্ড। সো আমার মেম্বারশিপ ওয়াজ ডিজলভ্ড। আমি জানতাম, আমাকে আবার এ্যারেস্ট করা হবে। অন্য কাউকে এ্যারেস্ট করা হোক বা না হোক আমাকে এ্যারেস্ট করা হবে। তার জন্যে আমি মনে মনে তৈরি হলাম। আমার পরিবারকে এসব কথা জানালাম। আমার ফাদার ইন ল একজন অফিসার ছিলেন। তাকেও বললাম যে আমি যদি এভেইলেবল না হই অর্থাৎ আমি যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাই বা আমি যদি বাসায় না থাকি তা হলে এ্যাটাক উইল কাম অন মাই ফ্যামিলি। পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করবে : উনি কোথায় গেলেন?' উনি তো ছিলেন। আমাদের কাছে খবর আছে যে সন্ধ্যার সময় উনি বাসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। আমি দুই এক সময় যে রাত্রে আমার বাসা এ্যাভয়েড করে আমার বন্ধুদের বাসায় না গেছি তা না। কিন্তু আমি যে এভইলেবল অর্থাৎ আমাকে যে পাওয়া যায় এটাও আমি ওদের চোখের সামনে রেখেছি।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আমি যখন আমার বাসার কাছাকাছি একটা জায়গায় বেড়াচ্ছিলাম আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে তখন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কিছু লোক এসে আমাকে বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে আসেন।' তারা আমাকে থানায় নিয়ে গেল। থানা থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল সেন্ট্রাল জেলে। আগের বার জেলে থাকা অবস্থায় আমি ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির মেম্বার ছিলাম। কিন্তু এবার যেহেতু এ্যাসেমব্লি ডিজলভ্ করে দেওয়া হয়েছে সেহেতু আমি এখন একজন সাধারণ সিকিউরিটি প্রিজনার মাত্র।

৩৫. আবার কারাবরণ

পাকিস্তান নামক ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রটি ছিল আমার বৈরীশক্তি। এই শক্তি আমাকে জেলখানায় আটকে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীটাকে তো আটকে রাখতে পারেনি। এটা আমরা জেলখানায় বসেও বুঝতাম। পৃথিবী একটা গ্রহ, তার মধ্যে পাকিস্তান একটা উপগ্রহ, সেই উপগ্রহেরই আর একটা তস্য উপগ্রহ হচ্ছে জেলখানাটা। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে জেলখানাটাও ঘুরছে। এভাবেই আমরা জিনিসটাকে দেখতাম। পৃথিবী ঘুরছে—এটা বিশ্বাস করতাম বলেই, ঐ যে কনসোলিডেশনের কথা বলছিলাম, সেখানে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যাপার, এর অগ্রগতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতাম। আমাদের কল্পনার সাথে বাস্তবের মিল থাকুক বা না থাকুক, জেলখানার মধ্যে আমরা সবসময় একটা রাজনৈতিক জীবনযাপনের চেষ্টা করেছি।

মার্শাল ল জারি হওয়ার পরে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হল এবং ইমিডিয়েটলি আমাকে ঢাকা থেকে রাজশাহী জেলে ট্রান্সফার করে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে ১৯৫৯ গেল। ১৯৬০ গেল। ১৯৬১ও কেটে গেল। রাজশাহী থেকে হয়তো আমাকে কুমিল্লা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমার তরফ থেকে সরকারের কাছে আবেদন ছিল, আমি তো কোনো পলিটিক্যালি ইনভলব্ড লোক নই, আমাকে কেন এতবার এ্যারেস্ট করা হচ্ছে? জেলে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক এসে মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। কাজী এমদাদুল হক সাহেবের ছেলে কাজী আনোয়ারুল হক একজন বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন। ওঁরা মনে করতেন যে আমি একজন বড় কমিউনিস্ট লীডার। এটা ভেবে একদিন ঢাকা জেলে তিনি আমার সাক্ষাৎকার নেন। উনি আমাকে কিছু পলিটিক্যাল প্রশ্ন করেন : 'এই যে কমিউনিস্ট থিসিস, এই থিসিস সম্পর্কে আমার কি বক্তব্য?' আমি তাঁকে উত্তর দিলাম যে এই সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থিসিস আমি কিছুই জানি না। উনি বললেন, 'আপনার মতো লোক কিছু জানেন না এটা হয় কখনো?' আমি রিয়েলি তেমন কিছুই জানতাম না।

১৯৬২-এর শেষের দিকে 'আমার ফাদার ইন ল যিনি একজন ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি গভর্নমেন্টের কাছে যান। উনি বললেন, ও তো ইন্নোসেন্ট লোক। ওকে আপনারা কেন আটকে রেখেছেন। ছেলেটা তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বললেন যে আমরা তো জানি ওনাকে। কিন্তু আপনারা যদি ওনার পক্ষে সিকিউরিটি হিসেবে না দাঁড়ান তবে তাকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। আমরা ওনাকে কিছু রেস্ট্রিকশান দেব। উনি যেন এসব রেস্ট্রিকশান ভালোলেট না করেন। এই সিকিউরিটিটা আপনারা যদি না দেন তবে আমাদের পক্ষে ডিসিশন নেওয়া মুস্কিল হবে। অন্য কোনো আত্মীয় হয়তো সাহস করতেন না, কিন্তু আমার ফাদার ইন ল অফারড হিমসেলফ্ এ্যাজ সিকিউরিটি ফর মাই রিলিজ।

এর ফলে ১৯৬২-এর ডিসেম্বর মাসে আই ওয়াজ রিলিজড আন্ডার সারটেন কনডিশনস্। দুই বছর সেসব কনডিশন আমাকে মানতে হয়েছিল। দি ফলোয়িং কন্ডিশনস আর ইমপোজড আপন ইউ : ১. দ্যাট ইউ উইল নট ইনভলব ইয়োরসেলফ্ ইন এনি পলিটিক্যাল এ্যাকটিভিটিজ, ২. ইউ উইল নট মেক এনি পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট, ৩. দ্যাট ইউ উইল নট লীভ দি ঢাকা টাউন উইদাউট দি পারমিশন অব দি পুলিশ, ৪. ইফ ইউ গো সাম হোয়ার, ইউ উইল রিপোর্ট দি পুলিশ দেয়ার... এই কনডিশনগুলো আমি দুবছর ধরে স্ক্রুপুলাসলি মেনটেন করেছিলাম।

আমার বাসাটা তখনো এ জি বি কলোনিতে ছিল। কমিউনিস্টেরা বুঝতে পেরেছিল যে আমি আর সক্রিয় নই। তবে ওদের বিরুদ্ধেও আমি নই। আগে তারা চাঁদাটাদা চাইত, এখন আর চায় না। কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেকে আমাকে যত না পছন্দ করত তার চেয়ে বেশি পছন্দ করত আমার বাচ্চাদের। বাচ্চাদের কাছে এসে তারা গল্প করত। অনিল মুখার্জী সে সময়ের একজন বড় কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক। আমি তাকে 'অনিলদা' বলতাম। তিনি আমার বাসায় একজন রেগুলার ভিজিটর ছিলেন। তিনি আমাদের বাসায় অনেক দিন খেয়েছেন। কিন্তু হি হ্যাড এ মেথড অফ হিজ ওন। তিনি কখনো কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলতেন না। অনিলদা আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থাতেই রাশিয়া ভিজিট করেছিলেন।

৩৬. বাংলা একাডেমী

১৯৬৩-তে বাংলা একাডেমীতে যোগ দিলাম। সৈয়দ আলী আহসান সাহেব তখন বাংলা একাডেমীর পরিচালক। তিনি আমার অপরিচিত লোক নন। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই সৈয়দ আলী আশরাফ ইন্টারমিডিয়েটে আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। আলী আশরাফ খুব ভালো ছাত্র ছিল। আলী আশরাফ, অজিত দে এবং আমি একেবারে এক সেকশানে পড়েছি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। কার্জন হলের বিপরীত দিকের বিল্ডিংটা ছিল তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। ১৯০৫ সালে এটি তৈরি করা হয়।

সৈয়দ আলী আহ্সানদের বাড়ি ছিল হোসেনী দালানে। তাঁদের বাড়িতে আমার যাতায়াত ইন্টারমিডিয়েট থেকে। তিনি আমার সিনিয়র ছিলেন এবং আমার মেরিট তিনি জানতেন। আমাকে এবং আবু জাফর শামসুদ্দিন সাহেবকে বাংলা একাডেমীর অনুবাদ বিভাগে নিয়ে গেলেন সৈয়দ আলী আহসান। পরে আমি জানতে পারি যে আমার ব্যাপারে সৈয়দ আলী আহসান হ্যাড টু টক উইথ আবদুল মোনায়েম খান, হি দেন গভর্নর অব ইস্ট পাকিস্তান। সৈয়দ আলী আহসান মোনায়েম খানকে জিজ্ঞেস করেন যে, উনি আমাকে অর্থাৎ সরদার ফজলুল করিমকে বাংলা একাডেমীতে রাখতে পারেন কিনা। তখন মোনায়েম খান পরিষ্কারভাবে সৈয়দ আলী আহসানকে বলেন, 'আই উইল নট লেট সরদার ফজলুল করিম গো ব্যাক টু ঢাকা ইউনিভার্সিটি বাট ইউ ক্যান কিপ হিম আন্ডার ইউ'। পরবর্তীকালে মোনায়েম খান পাবলিক মিটিং-এও এ ব্যাপারটার উল্লেখ করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান সাহেব আমাকে যখন বাংলা একাডেমীর অনুবাদ সেকশানে নিলেন, তখন আবু জাফর শামসুদ্দীন আমার মতিঝিল বাসায় গিয়ে খবর দেন যে, আমার কেসটা হয়ে গেছে। আই রেসপেক্টেড হিম এন্ড হি লাভড মি লাইক এ্যানিথিং। তিনি ছিলেন ফ্রেন্ড অব দি কমিউনিস্ট। তাকে আমি 'জাফর ভাই' বলতাম। সিকান্দার আবু জাফরকেও 'জাফর ভাই' বলতাম। সিকান্দার আবু জাফর বড় কবি হিসেবে, নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।

আবু জাফর শামসুদ্দীন একজন সেলফ্ মেইড ম্যান। তিনি ঢাকার একটা অঞ্চল থেকে এসেছেন। তিনি প্রথমে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তিনি কোনো ইংরেজি ডিগ্রি নিয়েছেন বলে আমি জানি না। কিন্তু তিনি ইংরেজিতে দক্ষ হন। ইংরেজিতে তিনি প্রবন্ধও লিখেছেন। গোড়াতে তিনি ছিলেন এ্যালাইড টু সৈয়দ আলী আহসান। আবু জাফর শামসুদ্দীন পিইএন নামে যে একটা ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকান অর্গানাইজেশন ছিল তার সঙ্গে যুক্ত হন, যদিও এর সম্পর্কে খুব একটা এ্যাডভোকেসি তিনি করতেন না। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। মাওলানা ভাসানীর কৃষক সমিতির সাথে তিনি এ্যালাইড হন। কাগমারী সম্মেলনে হি প্লেইড হিজ পার্ট বাই গিভিং এ্যাডভাইস এন্ড এটসেটেরা। তিনি ঔপন্যাসিক। তিনি গল্পকার। তাঁর একটা গল্পের সঙ্কলন ছিল। 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' নামে একটি বেশ বড় রকমের বই লেখেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উলটো দিকে আবু জাফর শামসুদ্দীন সাহেবের বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি সেক্রেটারি ফরহাদের সময়ে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি সিমপ্যাথেটিক ইন্টেলেকচুয়ালদের নিয়ে একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। আবু জাফর শামসুদ্দীন ছিলেন এই উপদেষ্টাদের একজন। তাঁর বাড়িতে তিনি উপদেষ্টা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ডাকতেন এবং খই, মুড়ি, চানাচুর ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। '৬০-এর দশকে কমিউনিস্টদের একজন বড় বন্ধু ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের পদটা হয়েছে স্বাধীনতার পরে। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত পরিচালক পদই ছিল। মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের পরে বাংলা একাডেমীর পরিচালক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। আলী আহসান সাহেব টুক হিজ প্রফেসরশিপ এবং তাঁর পরে এলেন কাজী দীন মুহম্মদ। কাজী দীন মুহম্মদের একটা ধর্মীয় ভাব ছিল। ওয়েস্ট পাকিস্তানের লিডারেরা তখনো এখানে আসছে। কাজী দীন মুহম্মদ তাদের খুব করে আপ্যায়িত করার চেষ্টা করছেন।

আমি তখন সংস্কৃতি বিভাগের একজন কর্মকর্তা। তরুণ ছেলেরা একদিন এসে আমাকে বলল যে তারা একটা সভার স্থান চায়। বাংলা একাডেমীর বটতলা ব্যবহার করতে পারলে তাদের খুব লাভ হয়। আমি তাদের বললাম : 'বটতলার পারমিশন আমি তোমাদের দিতে পারি না। তোমাদের যেতে হবে কাজী দীন মুহম্মদের কাছে। আমি নিয়ে যাবো।' ছেলেরা তখন আমাকে বলল, 'আপনি তো দীন মুহম্মদের দালাল হয়ে গেছেন।' আমি তখন হেসে বললাম : 'দেখো, আমি যদি কাজী দীন মুহম্মদের দালাল না হবো তা হলে আমি আজ বাংলা একাডেমীতে কেন থাকবো? এটা তো তোমাদের বোঝা উচিত।' এরপর সেদিন বিকাল বেলাতেই ছেলেরা এসে আমার কাছে মাফ চেয়ে গেছে এই বলে যে, আপনার সম্পর্কে এই কথা বলা আমাদের ঠিক হয় নাই।

আর একবার ছেলেরা এসে বলল যে, তারা সোমেন চন্দের উপর একটা অনুষ্ঠান করবে। আমি যেন একটা পারমিশান দিই। আমি বললাম, 'আমি পারমিশান দিলে তো হবে না। তোমরা দরখাস্ত করো পরিচালকের বরাবরে। সংস্কৃতি বিভাগের কর্মকর্তার মাধ্যমেই করো। আমি তোমাদের নিয়ে যাবো দীন মুহম্মদের কাছে।' ছেলেদের নিয়ে গেলাম আমি কাজী দীন মুহম্মদের কাছে। বললাম যে, এরা সোমেন চন্দের উপর একটা অনুষ্ঠান করতে চায়। এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, কাজী দীন মুহম্মদ বললেন, 'সোমেন চন্দটা কে?' আমি বললাম, 'সোমেন চন্দ ওয়াজ কিলড ইন ১৯৪২।

সোমেন চন্দ ওয়াজ এ ভেরি পোটেনশিয়াল রাইটার।' দীন মুহম্মদ সাহেব বললেন, 'আমি তো জানি না!' এ ব্যাপারে আমার একটা রাইট আপ আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, সোমেন চন্দকে একটা জেনারেশন চেনে না কিন্তু একটা সময় আসছে যখন তরুণরা সোমেন চন্দকে মাটি খুঁড়ে বার করবে।

সংস্কৃতি বিভাগে যত অনুষ্ঠান হত আমিই সব কনডাক্ট করতাম। যাঁরাই অনুষ্ঠান করতে আসতেন তাঁরা সবাই আমাকে খুবই এ্যাফেকশনেটলি গ্রহণ করতেন। যে অনুষ্ঠানই হত আমি তার বিবরণ একটা মাস্টার বুকে নোট করতাম। দৈনিক ইনকিলাব কদিন আগে লিখেছে যে সরদার ফজলুল করিমের সম্পাদনায় 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য' নামে একটা সঙ্কলন বের হয়েছিল। এই সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা ছিল। এই লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন।

যখন উন্নয়নের দশক অর্থাৎ ছয়েক দশক সেলিব্রেট করা হচ্ছে তখন সৈয়দ আলী আহসান বাংলা একাডেমীতে এক সপ্তাহের একটি সেমিনার করেন। সেই সেমিনারটার নাম দেন তিনি 'আমাদের সাহিত্য'। এতে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পার্টিসিপেট করেছিলেন। মনসুর মুসা পার্টিসিপেট করেছিলেন কিনা আমি জানি না। আবুল কাসেম ফজলুল হক পার্টিসিপেট করেছেন। এক একটা শাখায় যেমন, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এই প্রবন্ধগুলো নিয়ে আমার সম্পাদনায় 'আমাদের সাহিত্য' নামে একটা সঙ্কলন বের হয়েছিল। এ এইচ এম আবদুল হাই যিনি এখন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের চীনা ভাষার অধ্যাপক তিনি এ কাজে আমার সহকারী ছিলেন। আমি ছিলাম বাংলা একাডেমীর কালচারাল অফিসার। তিনি ছিলেন সহকারী কালচারাল অফিসার।

AMARBOI.COM

পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা 'আমাদের সাহিত্য' সঙ্কলনটিকে একটি রেফারেন্স বুক হিসেবে কনসিডার করেছেন। 'আমাদের দেশ' বা 'এই আমার দেশ' ধরনের একটা প্যাট্রিয়টিক শিরোনাম দিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্যেও আমি একটা সঙ্কলন করেছিলাম। এতে আমরা পুরস্কারও দিয়েছিলাম। বই পুস্কার দিয়েছিলাম। অনেকে এসে পুরস্কার নিয়েছেন। সংস্কৃতি ডিপার্টমেন্ট ওয়াজ কোয়াইট এ ক্রিয়েটিভ ডিপার্টমেন্ট এ্যাট দ্যাট টাইম।

বাংলা একাডেমীতে কাজ করাকালীন সময়ে আমার চেষ্টা ছিল, টু গো ব্যাক টু দি ইউনিভার্সিটি। মফিজ উদ্দিন সাহেব যিনি এক সময় ইস্ট পাকিস্তান গভর্নমেন্টের মিনিস্টার ছিলেন, তিনি আমার একটা রিলেশন হন, খালুশ্বশুর। আমি ওনাকে দুই-একবার এ্যাপ্রোচ করেছি। আমি অবশ্য তাঁকে বলিনি যে আপনি অমুককে একটু বলেন। আমি গোবিন্দ চন্দ্র দেবকেও বলেছিলাম, 'স্যার আমাকে ইউনিভার্সিটিতে আসতে দেন না? আপনি তো আমাকে জানেন'। জি সি দেব বলেছেন, 'হ্যাঁ তোমাকে তো জানি, কিন্তু গভর্নমেন্ট না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে আমি তো তোমাকে নিতে পারি না'। মফিজ সাহেব নামে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন বড় কর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন ইউনিভার্সিটির একজন বড় লি ার। তিনি মারা গেছেন কিনা আমি জানি না। তিনি সিন্ডিকেটের মেম্বা। হলেন। আমি ওনাকেও ইমপ্রেস করার চেষ্টা করলাম এই বলে 'হোয়াই ডোন্ট ইউ গিভ মি এ চান্স টু গো ব্যাক টু দি ইউনিভার্সিটি?' তখন উনি আমাকে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কমিউনিস্ট নন?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো কোনো অর্গানাইজেশন করি না।' উনি বললেন, 'আই ডু নট বিলিভ দ্যাট।' যে বীজ আপনার মধ্যে এসেছে তা কোনো দিনও আপনার মধ্য থেকে চলে যেতে পারে—এটা আমি বিশ্বাস করি না। তখনকার দিনে একজন সিরিয়াস কমিউনিস্ট ওয়ার্কারের প্রতি একজন সিরিয়াস নন কমিউনিস্টের যতটা না হোস্টিলিটি ছিল তার চেয়ে বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। যার জন্যে হি ডিড নট এ্যালাও মি টু গো ব্যাক টু দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বাট হি ডিড নট ডিজরেসপেক্ট মি। তিনি আমাকে এভাবে রেসপেক্ট দিলেন যে, আমি মনে করি না, আপনি কমিউনিজম ছাড়তে পারেন।

'৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মুনীর চৌধুরী একটু পার্টিজান হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান গভর্নমেন্ট যা চেয়েছে ও তাই করেছে। গভর্নমেন্ট তাকে খেতাব দিয়েছে। মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তান সরকার ফ্রন্টেও নিয়ে গিয়েছিল। আবু জাফর শামসুদ্দীন সাহেব ও পথে যায়নি। মুনীর এ সময়ে আমাকে একটু এড়িয়েই চলত। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে চাই—এটা সে জানত। কিন্তু আমার পক্ষে কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সেটা তার নিজেরই ক্ষতি করতে পারত। সরদার ফজলুল করিমের পক্ষে যে বলে সেও যে কমিউনিস্ট—এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আর কোনো সন্দেহই থাকত না।

প্রশাসন ভাবত, মুনীর বামপন্থী রাজনীতি থেকে দূরে সরে এসেছে। কিন্তু আমার সম্পর্কে এ রকম ধারণা তাদের কখনোই জন্মায়নি। একবার পাকিস্তান গভর্নমেন্ট মুনীরের পাসপোর্ট আটকে দেয়। সে আমেরিকায় যেতে চাচ্ছিল উচ্চশিক্ষার জন্যে। তখন মুনীর তাদের ঠাট্টা করে বলেছিল, 'মিয়ারা আপনারা কার পাসপোর্ট আটকাইতাছেন? আপনাগো পরে যারা ক্ষমতায় আইবো তারা তো প্রথমে আমার পাসপোর্টটাই সীজ করবো!'

সে সময় কমিউনিস্টরা আমাকে তাদের একজন নিষ্ক্রিয় মিত্র হিসেবে বিবেচনা করত। মণিদা অবশ্য দুই-একবার বাংলা একাডেমীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কমিউনিজমই যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি তুমি কি তা আর বিশ্বাস করো না? আমি তাঁকে উত্তর দিয়েছিলাম, 'মণিদা, বিশ্বাসের কথাটা যদি তোলেন তো সেটা অন্য ব্যাপার হয়ে যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার আমেরিকান দূতাবাসের এক সেক্রেটারি আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসে বাংলা একাডেমীতে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ঐ সেক্রেটারি আমাকে বলে, 'হোয়াই ডোন্ট ইয়ু জয়েন আস ইন লাঞ্চ?' আমি তখন তাকে জবাব দিই, 'ইয়োর টাইম ইজ ভ্যালুয়েবল এ্যান্ড মাই টাইম ইজ অলসো ভ্যালুয়েবল। লেট আস নট ওয়েইস্ট আওয়ার টাইম!'

৩৭. '৬৯-এর গণআন্দোলন

১৯৬৯ থেকে শুরু করে ১৯৭০ এবং ১৯৭১-এর ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম। আই ওয়াজ এ কনসাস অবজার্ভার অব দি টোটাল প্রসেস। আই ওয়াজ ভেরিটেবলি এ ক্যামেরাম্যান। আমি ফটোগ্রাফারও ছিলাম। '৭১ সালের উত্তাল দিনগুলোর বিভিন্ন ঘটনা খুব সুন্দরভাবে আমি কালেক্ট করেছিলাম আমার ইয়াশিকা ক্যামেরায়। এগুলো প্রিজার্ভেবল ছিল।

১৯৬৯-এর গণআন্দোলন আমি নিজের চোখে দেখেছি। আসাদের যে ঘটনা অর্থাৎ আসাদকে যখন মার্ডার করা হল, সে দিনের কথাও মনে আছে। সেদিন কাজী দীন মুহম্মদ মটর গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কক্সবাজার। সেখানে একটি মিটিং-এ তিনি বক্তৃতা দেবেন। আমরা যখন মাঝপথে তখন এই নিউজটা এল যে, হাতিরদিয়াতে, আসাদ ওয়াজ কিলড। আমরা আর কক্সবাজার যেতে পারলাম না। আমরা ঢাকায় ব্যাক করলাম। আসাদকে আমি জানতাম না। কিন্তু তার মৃত্যুতে ঢাকায় সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয়। এক মন্ত্রীর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় মর্নিং নিউজ অফিস। আমার এসব ঘটনা মনে আছে। সত্যেন সেনের মতো লোকেরা তখন জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে আসেন। সত্যেন সেনের মতো একটা নিরীহ লোক একটা লাঠি হাতে কয়েদিদের সাথে মিছিল করে যাচ্ছে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে, চিন্তা করুন একবার! এ ঘটনাটা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। ইট ওয়াজ রিয়েলি এ গণঅভ্যুত্থান।

১৯৬৯-এ আগরতলা মামলা থেকে যে বঙ্গবন্ধু বের হয়ে এলেন—এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তাকে দেখার জন্যে আমি গেলাম তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে। আমি অবশ্য জানতাম যে জনতার ভিড়ে শেখ মুজিবের কাছে আমি যেতে পারব না। কিন্তু তবু আমি গেলাম, কারণ আমি মনে করতাম জনতাই হচ্ছে শেখ মুজিব এবং শেখ মুজিবই হচ্ছেন জনতা। এভাবে আমার একটা রাইট আপ আছে। রাইট আপটির শিরোনাম : তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৮. ১৯৭০-এর নির্বাচন ও অতঃপর

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করল। এই জয়ের পর বাংলা একাডেমী আয়োজিত ২১ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হল*। এ ব্যাপারে কবীর চৌধুরী ওয়াজ দি টপমোস্ট পার্সন। তিনি তখন পরিচালক। আমি এবং কবীর চৌধুরী (এ এইচ এম আবদুল হাইও ছিলেন বোধ হয় আমাদের সঙ্গে) তাকে আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা গিয়ে পৌঁছার আগেই বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমীতে এসে গিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমীতে একটি উদাত্ত বক্তৃতা দেন এই বক্তৃতায় তিনি সবার জবাবদিহিতার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলেন, আপনারা ভাষার জন্যে কি করেছেন? দেশের জন্য আপনারা কি করেছেন?' তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমরা যেদিন ক্ষমতায় যাবো সেদিন থেকে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে। পরবর্তীকালে ক্ষমতায় গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কথা রক্ষা করেছিলেন।

শেখ সাহেব যখন বাংলা একাডেমীতে বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন খবর এল যে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছেন : 'সিডিউল্ড মিটিং অব দি ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি ওয়াজ পোস্টপনড'। এই মেসেজ ওয়াজ গিভেন টু শেখ সাহেব এবং দি মোমেন্ট দি মেসেজ ওয়াজ গিভেন টু হিম, শেখ সাহেব বাংলা একাডেমীর মিটিং থেকে চলে যান। মিটিংটা ওভার হয়ে যায়। 'আমি যাই, পরে দেখা হবে'—বলে আমাদের দিকে হাত নেড়ে শেখ মুজিব চলে গেলেন আওয়ামী লীগ অফিসে।

AMARBOI.COM

তখন ফান্ড-টান্ড রেইজ করার প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হচ্ছে এবং সেই কমিটির জন্যে চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমরা চাঁদা তুলেছি, চাঁদা দিচ্ছি। আহমদ শরীফ স্যারসহ আমরা শহীদ মিনারে মার্চ করে যাচ্ছি। এই সমস্ত জঙ্গি ব্যাপার '৭১-এর প্রথম থেকেই শুরু হয়।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানের বিখ্যাত জনসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি বারবার বর্ধমান ভবনের ছাদে উঠে দেখছিলাম কী রকম গণজমায়েত হয়েছে। তখন রেসকোর্স ময়দানের উপর পাকিস্তানি বিমান চক্কর দিচ্ছিল বারবার।

'৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে বাংলা একাডেমী ওয়াজ এ্যাটাকড। তিন তলায় একটা আধফাটা শেল পাওয়া গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, শেলের

---

* বঙ্গবন্ধুর বাংলা একাডেমীতে আসার ঘটনাটা হয়তো ঘটেছিল ১লা মার্চ তারিখে : সেদিনই জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত সভা স্থগিত করার ঘোষণা প্রচারিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোলসটা মিউজিয়ামে রাখতে। ২৫ মার্চের শেলিং-এ তিনতলার তেমন ক্ষতি হয়নি। দোতলার ক্ষতি হয়েছিল বেশি। ২৭ মার্চ তারিখে অফিসে এসে দেখলাম, আমার ঘরের দরজা ভেঙে ফেলা হয়েছে। দেয়ালে অনেকগুলো বুলেট চার্জ করা হয়েছে। আমার টেবিলের পিছনে যে স্টিলের আলমারি, সেটার জিনিসপত্র সব তছনছ করে ফেলা হয়। সেই ঝাঁঝরা দেয়ালের সামনে, ভাঙা দরজাওয়ালা ঘরে বসেই পুরো '৭১ সালটা আমি অফিসের কাজ করেছি।

আই কনটিনিউজ ওয়ার্কিং ইন মাই অফিস। ইফ আই এ্যাম নট এ্যাভেইলেবল টু আর্মি, দেন আর্মি উইল জাম্প ওভার মাই ফ্যামিলি ইন মতিঝিল এ জি বি কলোনি। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম না আমার ছেলেমেয়েদের সামনে আমাকে গ্রেপ্তার করা হোক। সে জন্যে আমি সকাল-সন্ধ্যা বাংলা একাডেমীতে অফিস করতাম। কবীর চৌধুরী সাহেব ওয়াজ কোয়াইট ওকে। তিনি তাঁর লেখাপড়া করতেন। আমরা কথাবার্তা বলতাম। সাধারণ কিছু কাজকর্ম হত কিংবা হত না—সেটা বড় ব্যাপার ছিল না। এই যে এখলাস উদ্দিন এখন চোখে প্রায় দেখতেই পায় না, সে তো বড় এ্যাকটিভিস্ট ছিল। এই যে আমার গিয়াস, হিস্ট্রির, সে ক্লাস এইটে পড়ার সময় থেকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে সরদার ভাই বলতে অজ্ঞান ছিল। গিয়াসের বড় ভাই নাসিরুদ্দীন আহমদ আমার ইন্টারমিডিয়েটের বন্ধু। গিয়াস, এখলাস এরা সবাই বাংলা একাডেমীতে আসত।

AMARBOI.COM

আমরা সময় কাটানোর জন্যে এক টেবিলে বসে গল্প করতাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কী বলা হয়েছে, মুকুলের চরমপত্রে নতুন কী বলা হল ইত্যাদি আলোচনা করতাম। কতদিন লাগবে দেশ স্বাধীন হতে, কোন ফ্রন্টে কী হবে? এসব জানার জন্যে আমরা শেষ দিকে প্ল্যানচেট করা শুরু করলাম। প্ল্যানচেটের মধ্যে জিন্নাহ সাহেব আসলেন একবার। তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হল। জিন্নাহ সাহেব কোনো কথাই বলতে চান না। তারপর হক সাহেব আসলেন। হক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বলেন, দেশ স্বাধীন হতে কতদিন লাগবে?' আমাদের আঙুল নড়ে উঠল। কাগজে লেখা হল : 'ইট উইল টেক টাইম।' এটা বলেই হক সাহেব চলে গেলেন। এইসব করে আমরা বাংলা একাডেমীতে সময় কাটাতাম।

বাংলা একাডেমীর কর্মচারীদের মধ্যে মিলিটারিদের এজেন্ট ছিল। স্বাধীনতার পর তাদের হ্যাক্‌ল করা হয়েছে। তাদের থাপ্পড়টাপ্পড় মেরেছে অনেকে। এক এজেন্টের নাম ছিল হেমায়েত। হেমায়েত রেডিও পাকিস্তানে কাজ করত। 'দি সিচুয়েশন ইজ নরমাল' বলে একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করে রেডিও পাকিস্তানের কিছু লোকজন সেই স্টেটমেন্টে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেন। তারা হেমায়েতকে সাথে নিয়ে বাংলা একাডেমীতেও যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমায়েত আমার কাছে গিয়ে বলল, 'সরদার ভাই, এটা দেখেন। সিগনেচার না দিলে যে কি হবে তা আমরা বলতে পারি না। আপনি নিজে তো বুঝতে পারেন।' তখন আমি নিজে চিন্তা করলাম যে আমি যদি সাইন না দিই তবে আমাকে ইমিডিয়েটলি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে অর্থাৎ আমাকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে অথবা আমি যদি বাসায় থাকি, তবে আই শেল বি এ্যারেস্টেড।' এটা আমার পজিটিভ কনক্লুশান। আমি দস্তখত দিতে বাধ্য হলাম। এ্যাট দি গান পয়েন্ট। উপায় ছিল না।

আমি ঢাকা ছাড়তে পারিনি, কারণ পরিবার নিয়ে আমি কোথায় যাবো? গ্রামে চলে যেতে পারতাম আবু জাফর শামসুদ্দীন ভাইয়ের মতো। কিন্তু সেখানে গিয়ে পরিবার প্রতিপালন করব কীভাবে? ভারতে যাইনি, কারণ, ঢাকা শহর থেকে ভারতে যাবার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। আমি কোনো দলের নই। সুতরাং কোনো দল আমাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাবে না। আমি তখন কোনো রাজনীতি করি না। কোনো পার্টির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িতও আমি ছিলাম না। আমি বড় কোনো নেতাও ছিলাম না যে পার্টি আমার ভারতে যাবার সব ব্যবস্থা করে দেবে। তা ছাড়া দল না হয় আমাকে রক্ষা করল কিন্তু আমার ফ্যামিলিকে রক্ষা করবে কে? আর আমি ভারতে গেলেই তো হবে না, আমার পুরো পরিবারটিকেও সেখানে নিতে হবে। আমার ফ্যামিলিকে আমি যদি রক্ষা করতে না পারি তবে হোয়াট উইল আই ডু উইথ মাই লাইফ? এই জন্য আই ডিড নট লিভ মাই কোয়ার্টার। সকালবেলা নিয়মিত অফিসে গেছি, বিকালবেলা বাসায় ফিরেছি। মাঝখানে অফিসে বসে গল্পটল্প করেছি। অনুবাদও করেছি কিছু।

আমি ইতোমধ্যে আমার বাসায় বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। আমি বিভিন্ন গণআন্দোলনের অনেকগুলো ছবি তুলেছিলাম। সেসব ফটোগ্রাফ ইত্যাদি আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি। 'বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম' লিখে টাঙিয়ে দিয়েছি আমার দরজায়। পাকিস্তানের পতাকাও একটা রাখা হয়েছে, দরকার মতো সেটাও দেখানো হবে। তখন আমার ছেলেমেয়েরা, দুটি বা তিনটি বোধ হয় ছিল তখন, তারা রাত্রে মিলিটারিদের গাড়ি যেমন, ট্রাক বা মাইক্রোবাস আসতে দেখে বা আসার শব্দ শুনে কেঁদে উঠত : 'আব্বা, ঐ আসছে'। তারা বুঝে গেছে, আমাকে এখনো নেয় নাই কারণ, অন্যরা লিস্টের প্রথম দিকে আছে, আমার পালা আসবে একটু পরেই। আর্মি ঘুরে ঘুরে অন্যদের পিক আপ করে নিয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল মাসের দিকে যখন পজিশনটা আরো এ্যাডভান্স করেছে অর্থাৎ মুজিবনগর গভর্নমেন্ট ফর্ম করেছে তখন আরো নানান ঘটনা ঘটছে। ঢাকায় প্রতি রাত্রেই বোমা ফাটছে এদিক ওদিক। যে রাত্রে বোমা ফাটছে না সে রাত্রে মনে হচ্ছে একটা বোমা ফাটলে হত। আমরা রেডিও কানের কাছে ধরে চরমপত্র শুনেছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৯. হু ইজ সরদার ফজলুল করিম

১৯৭১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, বাংলা একাডেমী থেকে মিলিটারিরা আমাকে ধরে নিয়ে যায়। এর আগে আবু জাফর শামসুদ্দীনকেও নিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। আমি অপেক্ষা করছিলাম যে জাফর ভাই ফিরে এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব মিলিটারিরা তাকে কী কী ধরনের ইন্টারোগেশন করেছে। জাফর ভাইয়ের কাছ থেকে সব শুনে আমি ডিসিশন নেব আমি কী করবো। জাফর সাহেব ফিরে এসে আর জয়েন করেননি। ঐ যে তাকে ইন্টারোগেশনে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি আর জয়েন করেন নাই। তিনি সেখানে থেকেই তাঁর গ্রামের বাড়িতে চলে যান।

৭ সেপ্টেম্বর তারিখে আমি অফিসে যাই সকাল ১০টা বা সাড়ে ১০টার সময়। অফিসে গিয়ে বসার কিছুক্ষণ পর কয়েকটা লোক এসে আমার টেবিলের পাশে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বাঙালি এবং নন বেঙ্গলি দুইই ছিল। তারা জিজ্ঞেস করল : 'হু ইজ সরদার ফজলুল করিম?' আমি উত্তর দিলাম : 'আই এ্যাম সরদার ফজলুল করিম'। তারা আমাকে বলল, 'ইউ কাম উইথ আস। ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট।' আমি আশপাশের বন্ধুদের বললাম, 'দেখেন, আমি তো চলে গেলাম। আমার বাসায় একটু খবর দেবার চেষ্টা করবেন।' মোতাহের বলে এক কর্মচারী ছিলেন। এখন তিনি মারা গেছেন। এই মোতাহারই বোধ হয় সেদিন বিকালে আমার মতিঝিলের বাসায় গিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবরটা পৌঁছে দিয়েছিলেন আমার ওয়াইফের কাছে। আমি পরে জেনেছি, ৬ সেপ্টেম্বরই আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোক বাংলা একাডেমীতে এসে জিজ্ঞেস করে গিয়েছিল, সরদার ফজলুল করিম কখন আসে। এই খবরটা কিন্তু আমাকে কেউ দেয় নাই। অবশ্য খবর দিলেও আমার কিছু আসত যেত না।

বাংলা একাডেমীর পাশে একটা আর্মি জিপ রাখা ছিল। জিপে আর্মড ম্যান ছিল। আমাকে ওরা জিপে নিয়ে গিয়ে উঠাল। আমি ভাবলাম, বাংলা একাডেমীর গেট থেকে বের হয়েই ওরা ক্যান্টনমেন্টে যাবে। কিন্তু জিপটা ক্যান্টনমেন্টে গেল না। আমাকে নিয়ে শহরের মধ্যে মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়াতে ঢুকল। ঢুকে তারা এখানে-ওখানে ওয়ারলেসে নানা কথাবার্তা বলছে : হ্যালো, হ্যালো। টকিং ফ্রম মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া। হোয়াই ডোন্ট ইউ ফাইন্ড হিম, হি সিটস্ দেয়ার, হি হ্যাজ এ লিগাল ফার্ম, সার্চ আফটার হিম ইত্যাদি। তখনি আমি বুঝে নিই ব্যাপারটা : ওরা কামরুদ্দীন সাহেবকে খুঁজছে। কামরুদ্দীন সাহেব অনেক বই-পত্র লিখেছেন পাকিস্তান পিরিয়ডটার বিভিন্ন দিক নিয়ে। কামরুদ্দীন সাহেবের অপরাধ হচ্ছে এই যে, তাঁর ছেলে নিজাম ছাত্র ইউনিয়ন করত এবং সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সম্ভাবনাময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ছেলেটি সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করত এবং বাপের সঙ্গে এ নিয়ে তার তর্কও হত। ফেনীতে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে মুখোমুখি সংগ্রামে নিজাম শহীদ হয়। এই ছেলেটিকে নিয়ে কামরুদ্দীন সাহেবের অনেক আশা ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উলটো দিকে কামরুদ্দীন সাহেব আর তার পার্টনারের লিগাল ফার্ম ছিল একটা। ওদের কাছে ক্রমাগত নির্দেশ আসছে 'ক্যাচ হিম', 'টেক হিম আপ'*। কিন্তু ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত যেতে যেতে কন্ট্রোল রুমের সাথে আলাপ করতে করতে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশে দিয়ে গাড়িটা রাখল এবং এক সময় দেখলাম, কামরুদ্দীন সাহেবকে ওরা নিয়ে আসছে। কামরুদ্দীন সাহেব গাড়িতে এসে আমার পাশে বসলেন। আমরা দুজনে এমন ভাব দেখালাম যেন উই ডু নট নো ইচ আদার। আমরা একে অপরকে চিনি না।

জিপটা এরপর আর কোথাও দাঁড়াল না। সোজা চলে গেল এম পি হোস্টেলে যেটা এখন প্রাইম মিনিস্টারের অফিস তার পিছনে একটা এম পি হোস্টেল ছিল। এম পি হোস্টেল ছিল একটা টরচার প্লেস অব দি আর্মি। ওখানে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে আমাদের দুজনকে বসাল। আমরা বসে আছি। একটা মেজর আসল কিছুক্ষণ পরে। মেজর এসে আমাকে একটা গাল দিল : 'ইউ পিপল, দি বাস্টার্ড সানস অব তাজউদ্দীন। উই শ্যাল টিচ ইউ এ গুড লেসন।' তাজউদ্দীনের নামটা তারা নিল, অন্য কারো নাম না। অবশ্যই শেখ সাহেব তখন ওয়েস্ট পাকিস্তানে আটকা পড়ে আছেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট তখন হয়ে গেছে এবং তাজউদ্দীন তখন সরকার প্রধান। তাজউদ্দীন ওয়াজ এ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্সন। কিন্তু তাজউদ্দীন সাইলেন্টলি কাজ করত। তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর পাশে বসে থাকত, সাইলেন্টলি বের হয়ে আসত। যা ফাইল ওয়ার্ক ছিল তা করত। তার কোনো বক্তৃতাবাজি ছিল না। আমাকে যেটা স্ট্রাইক করল সেটা হচ্ছে, মেজর বেটা আমাকে গালি দিতে গিয়ে তাজউদ্দীনের নামটা উল্লেখ করল কেন!

আমরা বসেই আছি। বিকেলবেলায় আমাদের আর একটা অফিসারের সামনে হাজির করল। অফিসারের র‍্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক আমি জানি না। কামরুদ্দীন সাহেবের তো একটা পরিচয় ছিল। হি ওয়াজ এ্যান এক্স এ্যামব্যাসাডর। ওঁকে ছয় মাসের ডিটেনশন দিল। আমাকে দুই বছরের ডিটেনশন দিল। এরপর আমাদের দুজনকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি তো জেলবার্ড। আমার মনে একটু ভরসা এল যে, জেলে অন্তত সিপাহীটিপাহীদের মধ্যে কিছু পরিচিত লোক পাব।

---

* সাইদুল হাসানকে এই ঘটনার পূর্বে জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে পাক আর্মি নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দুজনকে জেলে নেওয়ার পরে যে ট্রিটমেন্টটা আরম্ভ করল সেই ট্রিটমেন্টের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স ছিল। দি ট্রিটমেন্ট হুইচ ওয়াজ গিভেন টু কামরুদ্দীন আহমদ এ্যান্ড দি ট্রিটমেন্ট গিভেন টু সরদার ফজলুল করিম ওয়াজ নট দি সেম। আমাকে তারা জেলের মধ্যে এমন খারাপ জায়গায় পাঠাল সেখানকার খাবার খেয়ে ব্লাড ডিসেন্ট্রি হতে বাধ্য। কাছাকাছি একটা আর্মির লোকও ছিল যে আমার কাছ থেকে সমস্ত কথা বার করার চেষ্টা করছিল। আমার বাইরের বন্ধুরা চেষ্টা করেছিল যাতে জেলের মধ্যে কোনো একটা ডিভিশন আমাকে দেওয়া হয়। এ জন্যে ওরা অনেক অফিসারের সঙ্গে মিট করেছে। এমনকি তারা মাহমুদ আলীর সঙ্গেও মিট করেছে। মাহমুদ আলী পাকিস্তানিদের সঙ্গে কাজ করছিল। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা বিফলে গিয়েছিল। তারা কিছু করতে পারে নাই। ইন দি মিন টাইম সিচুয়েশনও ক্রমাগত চেঞ্জ করছে। পাকিস্তানিদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ইতোমধ্যে অক্টোবর গেল, নভেম্বর এসে পড়ল। এই দুই মাস আমি খুব সাফার করেছি।

পরাজয় নিশ্চিত—এটা বুঝে যাবার পর ডিসেম্বরের ১৩-১৪ তারিখে রাজাকার-আলবদররা বুদ্ধিজীবীদের খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করে। অনেকে প্রশ্ন করে, শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো লোক কেন সে সময় ঢাকা শহরে থেকে গেল? কিসের ভরসায়? মুনীর চৌধুরী কেন তার বাসায় অবস্থান করছিলেন? মুনীরের সাথে বহুদিন যাবৎ রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে ভাবত তাকে কেন পাকিস্তানিরা মারবে? কিন্তু রাজনীতির সাথে কোনো কালে কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিল না এমন অনেক বুদ্ধিজীবী যেমন, মোফাজ্জল হায়দায় চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকেও* রাজাকাররা হত্যা করেছে। আসলে কোনো বুদ্ধিজীবীই ভাবতে পারেননি তাঁদের এভাবে ধরে এনে হত্যা করা হবে।

আমরা যারা জেলে ছিলাম তাঁরা বেঁচে গেছি জেলে থাকার জন্যে নয় বরং আলবদর রাজাকাররা আমাদের হত্যা করার সময় পায়নি বলে। দেশটা এত তাড়াতাড়ি স্বাধীন হয়ে যাবে এটা তারা ভাবতে পারেনি। তারা ভেবেছিল, এগুলো তো জেলে আমাদের হাতের কাছেই আছে জিয়ল মাছের মতো; যে কোনো একদিন মেরে ফেললেই চলবে! ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের দেয়ালের উপর মেশিনগান ফিট করাও ছিল। জেলে আমাদের হত্যা করলে এমন কিছু আসত যেত না ওদের। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগারে ১৯৭১ সালে জেলের ভিতরেই রাজবন্দিদের ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়েছে।

---

* জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী গুলিবিদ্ধ করে। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা পরবর্তীকালে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার খবরটা আমরা জেলে বসেই পাই। সিপাহীরাই আমাদের খবরাখবর দিতে। ১৬ ডিসেম্বর তারিখে আমরা জেলেই ছিলাম। ১৭ ডিসেম্বর তারিখে মুক্তিযোদ্ধারা এসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের দরজা খুলে দেয়। ঐ দিন অন্য সব কয়েদির সাথে আমি আর কামরুদ্দীন সাহেবও মুক্তি পাই এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বহু স্মৃতি-বিজড়িত গেটটি পার হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখি।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, ঢাকা তখনো একটি ভূতের নগরী। ট্রাফিক সিস্টেম তখনো কাজ করছিল না। আমি হেঁটে প্রথমে বাংলা একাডেমীতে গেলাম। সেখানে পুরোনো কর্মচারীরা সব ছিল। তারা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

৪০. রিটার্ন অব দি প্রডিগ্যাল সন : দুষ্ট গরুর গোয়ালে ফেরা

পাকিস্তান হওয়ার কিছু দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক আবার আমাকে নিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি পলিটিক্যাল সাইন্স ডিপার্টমেন্টে জয়েন করলাম এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর হিসেবে। এরপর প্রমোশন পেয়ে এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হয়েছিলাম। কিন্তু আমি প্রফেসর কোনো দিন হতে পারিনি। কেন পারিনি সেটার গল্প অন্য এক সময় করা যাবে।

অনেকে আমাকে বলতেন, 'রাজ্জাক সাহেব তো আপনার উপকার করতে গিয়ে আপনার ক্ষতি করলেন।' আমি রাজ্জাক স্যারকে বলেছিলাম, 'স্যার আমি তো দর্শনের লোক। পলিটিক্যাল সাইন্সে তো আমার এম. এ. নেই। আপনি আমাকে এখানে কেন নিয়ে এলেন?' রাজ্জাক সাহেব আমাকে উত্তরে বলেছিলেন, 'আপনি ফিলসফির উপর কি সব লেখালেখি করছিলেন না? ঐগুলো আমার দরকার।' উনি বিশ্বাস করতেন, দর্শন ছাড়া রাজনীতি সম্ভব নয়।

ওসমান নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাইব্রেরি এ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। এখনো লাইব্রেরিয়ানরা ওকে চিনতে পারে। আমি যখন প্রথম দিন লাইব্রেরিতে গেলাম তখন এই ওসমান আমাকে যেভাবে ওয়েলকাম করল সেটা খুব সিগনিফিকেন্ট : 'স্যার আপনি তো একটা ডেঞ্জারাস্ লোক। আপনি সেই যে পাকিস্তান ভাঙবেন বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লেন, পাকিস্তান না ভাইঙ্গা আপনি আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরলেন না!' আমার জীবনটাকে আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিনি। কিন্তু ওর অবজার্ভেশনটায় কিছুটা সত্য যে আছে তা অস্বীকার করি কি করে?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরিশালের 'পোলা'র ঢাকা আগমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপক্রমণিকা

চল্লিশের দশকের ঢাকা—এই শিরোনাম আমার মনে অনেক দিন ধরেই বেশ আলোড়ন তুলে চলেছিলো। ওই দশকের লোকজন আমাদের পরিচিত মহলে আজ একেবারেই কমে গেছেন। চল্লিশের দশকের ঢাকা, বিশেষ করে সে সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, তখনকার সক্রিয় পরিচিত প্রগতিশীল তরুণ ছাত্রদের প্রসঙ্গ, বিশিষ্ট শিক্ষকদের কথা স্মরণ করা এবং বর্তমানের তরুণদের কাছে সেসব জানানোর একটা প্রয়োজন ও গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান অবশ্যই বর্তমানের হাতে। বর্তমানের যুবক আর তরুণরাই বর্তমানের মীমাংসাকারী শক্তি, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি। এই বর্তমান অবশ্যই নতুন। এরা চল্লিশে ছিলো না। চল্লিশে এদের জন্মই হয় নি। চল্লিশে যাদের জন্ম হয়েছে তাদের বয়সই এখন, এতো বছর পরে পঞ্চাশের ওপর। এই বয়সের ব্যক্তিরাও আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এঁদের কেউ সমর অধিনায়ক, কেউ বা সেক্রেটারিয়েটের কর্মকর্তা, অনেকে রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী। তবু এরা চল্লিশের দশককে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করেন নি। অথচ চল্লিশের দশকের যে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ভাবনা-ধারণা-চিন্তা, তারই ফসল, তারই সৃষ্টি এরা। কিন্তু এই চল্লিশের দশকের ঢাকার জীবন সম্পর্কে বর্তমানের একজন প্রৌঢ়ের যেমন কোন অন্তরঙ্গ ধারণা নেই, তেমনি বর্তমানের তরুণদের কাছে চল্লিশের দশক একেবারেই অতীত ইতিহাসের ব্যাপার। কেবল যে অতীত ইতিহাসের ব্যাপার তাই নয়, অজ্ঞাত এক ইতিহাস। এ ইতিহাসের ওপর গবেষণা আবশ্যক। কারণ চল্লিশের দশকের ঢাকার গুরুত্ব কেবল এ কারণে নয় যে, ওই দশকে যে ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের একটি শহর মাত্র, সমগ্র বঙ্গদেশের এবং রাজধানী কলকাতার তুলনায় মফস্বল শহর মাত্র, সেই ঢাকাই দশকের শেষে '৪৭-এর বঙ্গবিভাগের পর পরিণত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের রাজধানীতে। কেবল এই কারণেই নয়। বঙ্গদেশের একটা ঐতিহাসিক বিভাগ পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে ইতিহাসের বেশ কিছুটা পর্যায় থেকেই একটা সত্য এবং তার একটা বৈশিষ্ট্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যটি প্রধানত এই সম্প্রদায় কিংবা ঐ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অপ্রাধান্যের বৈশিষ্ট্য। অন্তত সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর বৈশিষ্ট্য। এবং সে দিক থেকেই পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজে শিক্ষার ক্রমপ্রসারের ক্ষেত্রে কলকাতার বাইরে ঢাকা, তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তেমনি ঢাকার শিক্ষাগত এবং সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, তার ধারা-উপধারা সমগ্র বঙ্গদেশের রাজনীতিতে, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের রাজনীতিতে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ক্রমিক গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছিল।

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালে তখনকার প্রধান মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো লাহোরে। সে প্রস্তাবের শাব্দিক গঠন যাই থাক, পাকিস্তান আন্দোলন মানে ভারতকে হিন্দু-মুসলমান হিসেবে ভাগ করে মুসলমানদের জন্যে একটা ভিন্ন এবং নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তান প্রস্তাব থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সে আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত হয়েছে। শিক্ষিত তো বটেই, শিক্ষিতদের মাধ্যমে ব্যাপকতর মুসলিম সমাজ তাতে আলোড়িত হয়েছে। সে ইতিহাসে যাচ্ছি নে। হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায় বলে আমরা অনেক সময়ে কথা বলি। 'সম্প্রদায়' কথাটার মধ্যে কোনো নিন্দামূলক ভাব থাকার কারণ নেই। মানুষ গোত্র, ধর্ম, সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা ও অর্থনৈতিক শ্রেণী—বিভিন্নভাবে বিভক্ত। কিংবা মানুষকে এভাবে বিভক্ত বলে বিবেচনা করা যায়। মানুষের সমাজের বিকাশ, এই ক্ষুদ্রকায় পৃথিবীতেও সর্বত্র সমান এবং সমতালে হয় নি। ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে ধর্ম হিসেবে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম এবং তাদের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক উনবিংশ থেকে বিংশ শতকের মধ্য ভাগে নানা কার্যকারণে রাজনৈতিক তাৎপর্য গ্রহণ করে। হিন্দু-মুসলমান কথা দু'টির মধ্যে একটি মানসিক আবেগের ভাব ক্রমান্বয়ে আপসহীনভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে। বিশেষ করে মুসলমান ধর্ম বিশ্বাসীদের উচ্চ শ্রেণীগত শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ উনিশ এবং বিশের শতকে নিজেদেরকে যেমন মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিচালনকারী বলে প্রচার করতে লাগলেন, তেমনি মুসলমানরা একই ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুধর্ম বিশ্বাসীদের চাইতে 'একেবারে ভিন্ন' এরূপ ব্যাখ্যা-বক্তব্যের ওপর জোর দিতে থাকেন। যে ভারতীয় উপমহাদেশে, নানা ধর্ম, ভাষা ও জাতির অবস্থান, বিদেশী শক্তির থেকে স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে তার অপর কোন সমাধানের স্থানে মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র স্থাপন, তথা ভারত বিভাগের ওপরই এই নেতৃবৃন্দ তথা মুসলিম লীগ জোর দিতে লাগলেন। এখান থেকেই মুসলিম লীগের আন্দোলনটি 'সাম্প্রদায়িক'। এই আখ্যা পাকিস্তান আন্দোলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারার বাইরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক—রাজনৈতিক মহলে উচ্চারিত হতে থাকে। তবু সেদিন সাম্প্রদায়িক বলেও যেমন পাকিস্তান আন্দোলনকে বাতিল করে দেয়া দেশের বৃহত্তর দল এবং জনসমষ্টির পক্ষে সম্ভব হয় নি (তার কার্যকারণের বিশ্লেষণের কথা ভিন্ন), তেমনি কেবল যে অমুসলমানরাই পাকিস্তান আন্দোলনকে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক—সামাজিক বিকাশের সুস্থ কোনো পথনির্দেশক নয় বলে বিবেচনা করেছেন, তাই নয়, মুসলিম সমাজের মধ্যেও, বিশেষ করে তার বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে এমন একটি অংশ চল্লিশের দশকে উদ্ভূত হচ্ছিল, যে অংশটি পাকিস্তান আন্দোলনের শক্তিকে অস্বীকার না করলেও তার সাম্প্রদায়িক আবেগে নিজেরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়তে চায়নি।

মুসলিম সমাজের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এবং ক্রমাধিক সংখ্যায় মুসলিম সমাজের মধ্যস্তর থেকে আগত তরুণদের আধুনিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ঢাকা শহর তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বের কথা আমি উল্লেখ করছি। কলকাতার সেইকালের সামাজিক—সাংস্কৃতিক—রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে আমার নিজের কোন গভীর ধারণা নেই। কিন্তু ঢাকার সঙ্গে ১৯৪০ সাল থেকেই আমার একটি সচেতন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে জন্যই চল্লিশের দশকের ঢাকার জন্য আমার মমতাবোধ, পেছন ফিরে তাকানোর একটা গভীর আগ্রহ। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে কেবল ব্যক্তিগত আবেগের দিকই নেই। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার পর থেকে পূর্ববঙ্গে সাংস্কৃতিক—রাজনৈতিক যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, আরো নির্দিষ্ট করে বললে, পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গে যে গণতন্ত্রিক ও বামপন্থী সামাজিক—সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমপ্রকাশ ও বিকাশ দেখা গেছে, তার ভিত্তি চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে উপ্ত হয়েছিলো। এরকম ভিত্তির কথা যখন বলা হয়, তখন এটা স্বাভাবিক যে, এর মূলে কোনো একটি ব্যক্তি বা কারণকে উল্লেখ করা হয় না। চল্লিশের দশকের ঢাকায় পঞ্চাশের দশকের গণতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো বলার অর্থ, চল্লিশের দশকের ঢাকা তথা মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবাসক্ষেত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা পরিবেশ ছিল যার মধ্যে মানবতাবাদী, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে যায় এমন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। সবকিছু মিলিয়ে বলা চলে, একটি মানবতাবাদী, গণতন্ত্রী, বামপন্থী পরিবেশ। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা কি সেসিনকার প্রধান ধারা ছিলো, তবে তার জবাব অবশ্যই এই হবে যে, না, এটা নিশ্চয়ই সেদিনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে প্রধান ধারা ছিলো না। কিন্তু তার বীজ যে ছিলো, এটা তো গুরুত্বহীন নয়। বীজ বাদে বৃক্ষের বিকাশ সম্ভব নয়। এটা কোনো রূপক অর্থে নয়, একেবারে বস্তুগত অর্থেই সামাজিক—সাংস্কৃতিক—রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সত্য। অবশ্য চল্লিশের দশকে দুর্বল হলেও, সেদিনও দৃশ্যমান এই বীজটিরও কিছু পূর্বভিত্তি নিশ্চয়ই ছিলো। আমার নিজের চিন্তায়, এই পূর্বভিত্তিটি স্থাপন করেছিলেন অধিকতর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিশ ও ত্রিশের দশকের ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ, তার মুখপত্র 'শিখা' এবং তার মুখ্য পাত্রবৃন্দ, যথা কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার তরুণ কিংবা প্রৌঢ় শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দ। এই পর্যায় সম্পর্কে কিছু পরিমাণ আলাপ-আলোচনা আমাদের সাহিত্য-আলোচকবৃন্দ করেছেন। যে চল্লিশের দশকের ঢাকার কথা আমি বলতে চাই সে চল্লিশের দশকের ঢাকা অবশ্যই তার পূর্বসূরি ত্রিশের দশকের ঢাকার উত্তরসূরি।

বরিশালের 'পোলা'র ঢাকা আগমন

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জবানবন্দিতে যদি চল্লিশের দশকের ঢাকার কিছু স্মৃতিচারণ করতে হয় তাহলে আমাকে তো প্রথমে ঢাকায় আসতে হয়।

আমি নিজে ঢাকা এসেছিলাম চল্লিশের দশকের ঠিক সূচনাতেই। ১৯৪০ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাস করার অব্যবহিত পরেই।

আমি এসেছিলাম বলাটা ঠিক নয়। বরিশালের একটি কিশোর। বরিশালের ভাষায় বরিশালের একটি 'পোলা' এসেছিল ঢাকায়, ঢাকা কলেজ পড়তে ম্যাট্রিক পাস করার পর অবশ্যই সে বরিশালের বিএম কলেজেও পড়তে পারত। তার সহপাঠী অনেকে তাই করেছে। অনেকে কলকাতা গিয়েছে। বরিশাল থেকে তখন সকাল-বিকাল এক্সপ্রেস আর মেইল, বিলাতি আর.এস.এন—আই.জি.এন কোম্পানির বিরাট বিরাট চাকাওয়ালা স্টিমার, যেমন 'ফ্লোরিকান', 'নাগা', 'গারো' কলকাতা রওনা হয়ে যেতো। খুলনা গিয়ে যাত্রীরা ঘাটে দাঁড়ানো রেলগাড়িতে উঠত এবং তাতে চড়ে সোজা কলকাতা। কিন্তু বরিশালের এই 'পোলাটি' কেন কলকাতা যায় নি, সেটাও আজ খোঁজ করে বার কবার ব্যাপার।

এর একটি বোধগম্য কারণ হচ্ছে আর্থিক। কলকাতা গেলে খরচ বেশি পড়বে। ঢাকায় তত পড়বে না। কিন্তু তাছাড়াও আর একটা কারণ ছিল এই যে, কিশোরের বড় ভাইও উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা না গিয়ে এসেছিলেন ঢাকাতেই, সেই বিশের দশকের শেষ দিকে, ১৯২৭ সালে। বড় ভাই মঞ্জে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী সরদারের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি তাঁরও বরিশালের বিএম কলেজ থেকে বিএ পাস করে এমএ পড়ার জন্য ঢাকায় আসবার কারণের মধ্যে প্রধান ছিল আর্থিক বিবেচনা। ঢাকায় হল বা হোস্টেলে অল্প খরচে থাকা যাবে। এ বিবেচনা একটি গরিব কৃষক পরিবারের সন্তানের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দূরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা নয়।

কিন্তু আজ এতো বছর পর সেই ছেলেটির ঢাকা আসবার ছবিটির দিকে তাকাতে গিয়ে যে কথা মনে পড়ে, সেটা আর্থিক সেই বিবেচনার ব্যাপার নয়। মনে ভেসে ওঠে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ছবি। খাল-বিল-বরিশালের ছেলে হলেও এমন বড় 'জাহাজে' চড়ে আর সে নিজের জেলার বাইরে কখনো যায় নি। রওনা করলো যখন সে ঢাকার পথে, তখন কোনো আত্মীয়জন আসে নি সেই পনের বছরের কিশোরের সঙ্গে। ঢাকাতে কোনো আত্মীয়জন থাকার মত অবস্থাই তার ছিলো না। তার বড় ভাই-ই তার মুরুব্বি আর অভিভাবক। তিনি তখন সরকারি চাকুরে। বরিশালেরই কোনো থানা শহর বা বন্দরে। তিনি তাঁর ছোট ভাইটিকে তাঁর পরিচিত ঢাকায় পাঠরত বয়স্ক কোনো ছাত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হবার জন্য।

ঝমঝম করে বিরাট জাহাজ (সেদিনকার সেই কিশোর এর চাইতে বড় জাহাজ যথার্থই দেখে নি) বরিশাল থেকে ছেড়ে বিরাট বিরাট নদীর বুকে ঢেউ তুলে, চাঁদপুর বন্দর এবং মুন্সিগঞ্জে নোঙর করে, নারায়ণগঞ্জের নদীতে ঢুকে সেখানে কিছুক্ষণ থেমে তারপর আবার মীরকাদিম হয়ে সন্ধ্যার পরে যখন বুড়িগঙ্গায় ঢুকল, তখন কিশোরের চোখে পড়ল, দূরের রাস্তা দিয়ে আরো দ্রুতবেগে এক-চোখো কি একটা দৌড়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। সঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র কিশোরকে তার বিস্ময় আর ভয়ের ঘোর কাটিয়ে দেবার জন্য নিশ্চয়ই বলেছিল: 'ঐ দেখ রেলগাড়ি যায়।'

রেলগাড়ি! অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কিশোরটি দূরে অদৃশ্যপ্রায় সেই অজানা কিন্তু নামেশোনা ছুটন্ত লৌহদানবের দিকে। 'বলত, কোন্ জেলায় রেল যায় নি?'—এ প্রশ্ন কেবল সেদিনের নয়, আজকের দিনের কিশোরের কাছেও সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন আর তার জবাব আজও এক: সে জেলা বরিশাল।

সে যাই হোক, শান্ত বুড়িগঙ্গায় ঢেউ তুলে জাহাজ এসে ভিড়েছিলো বাদামতলি ঘাটে। সেদিনকার বাদামতলি ঘাট বা তার লাগোয়া সদরঘাটের 'বাকল্যান্ড বান্দ' এলাকা আজকের মত সরগরম ছিলো না। বুড়িগঙ্গাও এত কৃশকায়া ছিলো না। ছিলো বেড় বড়। বরিশালের নদীর মতো না হলেও বুড়িগঙ্গা দিয়ে কোম্পানির বড় জাহাজগুলোর চলাচলে, ভিড়তে, কিংবা ছাড়তে কোনো অসুবিধে হতো না। কিন্তু সেকালের বাদামতলি ঘাটে জাহাজ ভেড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ছাড়ার সঙ্গে যে বিষয়টি কিশোরের মনে জড়িত ছিলো সে হচ্ছে তার আর একটা বিস্ময়। কোম্পানির যাত্রীজাহাজ ঘাটের সীমানায় পৌঁছুলে লম্বা ভোঁ দেয়: 'ডবল সিটি মারে', যাত্রীরা বোঝে তাদের গন্তব্য প্রায় এসে গেছে। ছাড়ার সময়েও বারংবার সেই একই ভোঁ। কিন্তু ঢাকার বাদামতলিতে রাতের অন্ধকারে জাহাজ ভিড়তো যেন চোরের মতো, ছাড়তোও প্রায় চোরের মতোই। ইঞ্জিনের আওয়াজ যেনো ভেড়ার আর ছাড়ার সময়ে কম হতো, অন্য জায়গার চাইতে। কিন্তু কেনো? রহস্যটা কিশোরের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতায় বেশিদিন রহস্য হয়ে রইল না। বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুরা বলল : 'আরে জানো না, বাদামতলি ঘাটের কাছেই ঢাকার নওয়াবের বাড়ি, 'আহসান মঞ্জিল'। নওয়াবের হুকুম, সন্ধ্যার পরে স্টিমার আসা আর যাওয়ার সময় কোন 'হুইসল' দিতে পারবে না—নওয়াবের তাতে 'ঘুমের ব্যাঘাত হবে।' নওয়াবের হুকুম কিনা তা জানা নেই। (সেকালে ঢাকার নওয়াব পরিবার ঢাকার সমাজ জীবনের অন্যতম প্রধান বলেই বিবেচিত হতো।) কিন্তু সেকালে বাদামতলি ঘাটে জাহাজ নোঙর করা, নোঙর উঠিয়ে ছেড়ে যাওয়ার সময়ে যে ভোঁ দিত না, একথা সত্য।

প্রৌঢ়ের কৈশোর স্মৃতি

অপরে বৃদ্ধ বললে তেমনি উপাদেয় বোধ হয় না। প্রৌঢ় বরঞ্চ চলে। পঁয়ষট্টি প্লাসের প্রৌঢ়। তারই কিশোরকালের কিছু স্মৃতিকথা।

সাজিয়েগুছিয়ে বলার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। স্মৃতির পটে যখন যা ভেসে ওঠে, তাকেই আবার তলিয়ে যাবার আগে টেনে তোলার চেষ্টা করা ভাল। এ কোনো সাহিত্যকর্ম নয়। কাজেই সাহিত্যিক সৌকর্যের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়াও নিরর্থক।

১৯৪০ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বরিশালের সেই কিশোর পোলাটি ঢাকা এসেছিলো। 'বিদেশ' ঢাকায়। সেদিন ঢাকায় আসার জন্য জাহাজে চড়ে জাহাজ ছাড়ার সময়ে সে ফেলে আসা বরিশাল শহরের দিকে তাকায় নি। তাকিয়েছিলো অজানা ঢাকা দেখা যায় কি না, কখন দেখা যাবে, তার দিকে। সেদিন ছিলো অজানার আকর্ষণ। 'লিউর অব দি আননোন্।' কিন্তু আজ স্মৃতির বাহনে চড়ে সেই ৪০ সালে ফিরে গিয়ে অত সহজে বরিশাল ছেড়ে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এখন 'লিউর অব দি আননোন' কোথায়? এখন জিজ্ঞাসা সেদিনের ফেলে আসা বরিশালকে কি জানা শেষ হয়েছিলো?

সেই বেল ইসলামিয়া হোস্টেল, পাশের এ. কে. স্কুলের খাবার ঘর, নামাযের সময়ে রোলকল, হোস্টেলে কড়া সুপার সাহেব : টুপি মাথায় দিয়ে খেতে বসতে হবে। তা না হলে খাওয়ার টেবিল থেকে সুপার এসে তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবেন। রাত দশটা বাজতেই হোস্টেলের লাইট নিবিয়ে দেওয়ার হুকুম। আর তারপরেই অন্ধকারে ৩৯-৪০ সালে সেই কিশোরটির গা ঢাকা দিয়ে খান কয়েক বই হাতে নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের গা ঘেঁষে, লোহার রেলিং টপকে ছবির মতো সুন্দর স্টিমার ঘাটের বুকিং অফিসের 'টাইম-বোর্ড'টার নিচে বসে বই পড়া। আহা, যদি জানতাম, এমন জীবন আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তাহলে ফেলে আসা কৈশোরের জীবনকে আরো গভীর করে ভালবাসতাম! পূর্ণতরভাবে বাঁচতাম।

জেলা স্কুলের হেডমাস্টার সিরাজউদ্দিন সাহেবের দস্তখত করা আমার ক্লাস টেনের একটা প্রশংসাপত্র এখন পর্যন্ত সযত্নে রাখা আছে। সবল অথচ কম্পিত হাতের সেই সইটির দিকে তাকালেই হেড স্যারের গৌরবর্ণ দেহের ছবিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এখনো ভাবতে ভয় লাগে : আপাতভাবে কি কড়া মেজাজের মানুষ। আর এমন কাঠামোর স্কুল-দালানও আমি আর কোথাও দেখি নি। সামনে—পেছনে বিরাট সিঁড়িওয়ালা একতলা দালান। মাঝখান দিয়ে লম্বা করিডোর। দু'পাশে ক্লাসঘর। হেডমাস্টার সাহেব এই করিডোর দিয়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথা হেঁটে যেতেন। তাঁর পায়ের আওয়াজেই সব ক্লাসরুম হিম-ঠাণ্ডা হয়ে যেতো।

কিন্তু শশধর স্যার ছিলেন কী সুন্দর হাসিখুশি মেজাজের শিক্ষক। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। আর অঙ্কে আমি আজীবনই কাঁচার কাঁচাই রয়ে গেলাম।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অঙ্কের দিন অঙ্ক পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়েছি। কোনো রকম দিয়েছি। একেবারে যে ফেল করব, তা নয়। তবে কানের পাশ দিয়ে যাওয়ার ব্যাপার। তাই উদ্বেগের অন্ত ছিলো না। পরীক্ষা শেষ হতে শশধর স্যারই সহাস্যে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিরে পাশ করবি তো? আমি সভয়ে এবং শঙ্কিতভাবে বলেছিলাম : পাশ করব না স্যার? চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশও কি পাবো না? স্যার হেসে বলেছিলেন : ঘাবড়াসনে। আমি খাতা একবার দেখে দিয়েছি। পঞ্চাশের মতো তোর থেকে যাবে।

অঙ্কে এমন কাঁচা মানুষের পৌঢ় বয়সে অঙ্কের কিছু স্মরণে আসবার কথা নয়। তবু স্মৃতিতে সে যে উঠে এলো, সেটাই মজার। আর মজার ঘটনা বলেই মনে এলো।

ম্যাট্রিকের আগে এ্যানুয়ালে, নাইন থেকে যখন টেনে উঠেছিলাম, তার ফলাফলের ওপর যেদিন পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হয়েছিলো, সেদিন আমাকে অঙ্কের ওপরও পুরস্কার দেওয়া হয়েছিলো। না, ফেল করার জন্য নয়। বাংলাতে বোধ হয় নম্বর একটু ভালো উঠেছিলো আর অঙ্ক-বাংলার মিলিত নম্বরের এটা পুরস্কার ছিলো। আর তাতেই আমি এই দু'বিষয়ে পুরস্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলাম। কিন্তু আসলে এটাও মূল কারণ ছিলো না। মূল কারণ এ্যানুয়ালে তপনের পরীক্ষা না দেওয়া। তপন ছিলো ক্লাসের হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে তুখোড় ছেলে। ওই-ই ফার্স্ট হতো। ওরই ন্যায্যত প্রাপ্য ছিল সব পুরস্কার। কিন্তু কোনো অসুখের জন্য বোধ হয় সেবার তপন এ্যানুয়াল দেয় নি। আর তাতেই খুলেছিল আমার কপাল।

কিন্তু ব্যাপারটাতে আমার আনন্দ বা গর্ববোধ হওয়ার চাইতে কৌতুক জেগেছিলো বেশি। বেশ মজার মনে হয়েছিলো। তবে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া ইংরেজি-বাংলা বই-এর বোঝায় তিনফুটি ছোট্ট কিশোরটির কাঁধ যে ভরে গিয়েছিলো, সেটা সত্য। আর তাতেই দর্শকদের মধ্যে যে কী বাহবা!।

তাই বলে একেবারেই কি যোগ্য ছিলাম না? মিলাদ হতো স্কুলে। সে উপলক্ষে হযরতের জীবনের ওপর রচনা প্রতিযোগিতা হতো। আর তাতে একবার 'মানুষ হযরত মোহাম্মদ' শিরোনামের আমার লেখাটিকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়েছিলো। এ পাওয়াতে হয়ত তেমন ফাঁকি ছিলো না।

আসলে মোজাম্মেলের সামনে এই ভালো হওয়া, পুরস্কার পাওয়া নিয়ে কোনো কথা বলারই উপায় ছিলো না। ইচ্ছা করলে মোজাম্মেল আমাদের অনেকের চাইতেই ভালো ফল করতে পারতো। ক্লাস এইটে বৃত্তি নিয়ে নাইনে এসে ভর্তি হয়েছে ও। কালো ছিপছিপে গড়ন। চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। ওর চিন্তা ভালো ফলের নয়, চিন্তা নিজের বিপ্লবী দল 'আর.এস.পি'র সাংগঠনিক প্রভাবে কোন ছেলেকে কীভাবে যোগাড় করতে পারবে সেটা। আর তাই আমাকে ঠাট্টা করে বলতো : এই ভালো ছেলে! বই পড়া রাখো। এই লিফলেট ক'টা নিয়ে যাও। দেখো, একটু সাবধানে নিও। কেউ যেন জানে না। কালই ফেরত দিও। ওর কথাবার্তায় সত্যি ভয় হতো। লাল কালিতে ছোট ছোট অক্ষরে ছাপা ইশতেহার : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খতম করে ভারতবর্ষে শোষিত জনতার রাজ কায়েম করার জঙ্গি আওয়াজ।

একদিন দিয়েছিলো পড়তে একটা বই। তিনশ' পৃষ্ঠার ওপরে তার আকার। বাংলায় বলেছিলো : প্রোসক্রাইবড় বই; বেআইনি বই। খবরদার, কেউ যেন টের না পায়। একরাতে শেষ করতে হবে। আমি তাই করেছিলাম। কোনো কষ্ট করতে হয় নি। একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কেবল যে নিষিদ্ধ বই পাঠের আকর্ষণ, তাই নয়। গ্রন্থের বিষয়বস্তুও। প্রবন্ধ নয়। গল্প। বিপ্লবী উপন্যাস।

নায়ক-নায়িকারা সমিতি করে। শ্রমিকদের মধ্যে সভা করে। ভারতবর্ষের বাইরে। রেঙ্গুনে। মান্দালয়ে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা তাদের লক্ষ্য। নায়ককে ভালবাসে নায়িকা। কিন্তু নায়ক দুর্বল। পুলিশের আতঙ্কে সে দলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়। এই অপরাধে গুপ্ত দলের গোপন বিচার বসে। রায় হয় : এই গুরুতর অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। কিন্তু সে দণ্ড কার্যকর হতে পারে না। নায়িকা তার প্রেমিকের দণ্ডে বিমূঢ়। কিন্তু তাকে অভয় দেয় সব্যসাচী। দলের বিপ্লবী অধিনায়ক। রহস্যপুরুষ। সব্যসাচী বলেন : ভয় পাসনে বোন, ভারতী। অপূর্বর কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু অপূর্ব বিপ্লবীদলের যোগ্য নয়। ওকে তুই এই বিপদের মধ্যে আনিসনে .... ।

আজ জানি এ কাহিনী হচ্ছে 'পথের দাবী'র কাহিনী। বই-এর নাম 'পথের দাবী'। লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই বই তখন ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণায় নিষিদ্ধ আর বিপজ্জনক বই। এ বই কারুর হাতে পেলে অমনি তার গ্রেপ্তারের আশংকা। সশ্রম কারাদণ্ডের ভয়। আর তাই সে রাতে বইটার পুরোটা পড়েও বুঝতে পারি নি : কি নাম এ বইয়ের। বইয়ের পাতার মাথায় মুদ্রিত হয়েছিলো যেখানে যেখানে 'পথের দাবী' নামটি, সবখান থেকেই সেটাকে কেটে ফেলে আপাত নির্দোষ করা হয়েছিলো 'পথের দাবী'কে। 'পথের দাবী হীন' 'পথের দাবীকে।

মোজাম্মেলের এই ছিল কারবার। তাই ওর ধমকে ক্লাসে ভালো ফল করেছি বা অনেক বই পুরস্কার পেয়েছি, একথা বলার সাহসই হতো না।

এই বই পড়া স্মৃতি যেমন মনে গেঁথে রয়েছে, তেমনি মজার স্মৃতি হিসেবে গেঁথে আছে বেল ইসলামিয়া হোস্টেলের কম্পালসরি নামাযের রোলকলের স্মৃতি।

এখন আর বেল ইসলামিয়ার সেই পুরনো মর্যাদা নেই। তার দেওয়ালেও দেখলাম, আজকাল আর চুনকাম হয় না। অথচ সেদিন শহরে 'বি আই' হোস্টেল বা বেল ইসলামিয়া হোস্টেল ছিল জেলা স্কুল আর এ. কে স্কুলের ছাত্রদের ছাত্রাবাস। কোনো ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নামে প্রতিষ্ঠিত হোস্টেল।

এ. কে স্কুলের মৌলবী, দীর্ঘদেহী, শ্মশ্রুমণ্ডিত সুলতান সাহেব তার সুপারিনটেন্ডেন্ট। তাঁর গলার আওয়াজ আর দীর্ঘ চেহারার সামনে নাইন-টেনের বড় সাইজের ছেলেরাও কুঁকড়ে যেতো। তাঁর রেওয়াজ ছিলো, মগরেবের আর এশার নামাযে বোর্ডিং-এর প্রত্যেক ছাত্রকে হাজির থাকতে হবে। নামাযের জমাত হবে বোর্ডিং-এর টানা বারান্দায়। আর সুপারিনটেন্ডেন্ট নিজে তার ইমামতি করবেন। মোনাজাত শেষে রেজিস্টার ধরে রোলকল। রোলকলের জবাবে 'লাব্বায়েক' বলতে হবে। 'লাব্বায়েক' মানে হাজির।

কিন্তু সন্ধ্যার পর ছাত্রদের দুষ্টুমি যে বাড়তে থাকতো, সুলতান সাহেব সেটা বুঝতে পারতেন। কেউ কেউ নামাযে উপস্থিত হতো না। উপস্থিত না হলে ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত 'ওয়াক্ত' প্রতি জরিমানা ছিল, যতদূর মনে পড়ে, এক আনা। আর ক্লাস সিক্স পর্যন্ত বেত। আমি সাহস করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লাব্বায়েক' বলি নি বা জামাতে অনুপস্থিত রয়েছি, এমন কথা মনে করতে পারছি নে। কিন্তু সহপাঠী আমিনুলকে দেখতাম বেপরোয়া। হাসি হাসি মুখ। কিন্তু নামাজে, বিশেষ করে এশার নামাজে সে হাজির হতো না। সুলতান সাহেব এর কৈফিয়ত তলব করতেন। সুপারিনটেন্টকে আমরা 'স্যার' বলতাম না। বলতে হতো 'হুজুর'। আমিনুলকে তলব করলে আমিনুল হাসিমুখে বলত : হুজুর, আমি তো বলেছি, আমার জরিমানাটা আগাম নিয়ে নিন....।

সুলতান সাহেব আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু শুনেছি, আমি বরিশাল থেকে আসার পরেও তিনি আমাকে স্মরণে রেখেছিলেন, তাঁর আত্মীয়জন আর অন্য ছাত্রদের কাছেও আমার কথা বলেছিলেন।

এই বরিশালেই সেই '৩৮ সালে এসেছিলেন ছবির মতো দেখতে সুন্দর, সুভাষচন্দ্র বসু। বক্তৃতা করেছিলেন বি.এম স্কুলের উল্টো দিকের বার একাডেমির মাঠে। এসেছিলেন নিশ্চয়ই। তা না হলে বার একাডেমির মাঠের পাশ দিয়ে এরপর যখনই হেঁটেছি, তখুনি সুভাষ বসুর চেহারা আমার মনের চোখে কেনো ভেসে উঠেছে বারংবার! আজ হয়ত সেই বার একাডেমিও নিচিহ্ন। বরিশাল শহরে যতগুলো হাইস্কুল ছিল, এতগুলো হাইস্কুল খুব কম জেলা শহরেই দেখা যেত।

এমনি জানা-অজানা নানা উপাদান। নানা উপাদান দিয়ে গঠিত হয় যে কোনো পদার্থ। একজন কিশোরও একটা পদার্থ। চারদিকের আলো-হাওয়া, পানি, মানুষজন, দয়া-মায়া, আঘাত, স্নেহ, সব নিয়ে যে পরিবেশ তারই মিলিত উপাদানের ফসল সে। এমনি করেই তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। তারপরে একদিন আবার সে যৌগিকের বিশ্লিষ্ট উপাদানে পর্যবসিত হয়।

যেমন ছিলো তেমনভাবে হয়ত নয়। নতুনভাবে নতুন উপাদানের সৃষ্টি করে পুরনো উপাদান তার ভূমিকা পালন করে। তার কতোখানি সচেতন, কতোখানি অচেতন : সে অনেক তত্ত্বের কথা। সে তত্ত্ব থাক। কিন্তু কোনো এক সময়ে যদি বসতেই হয় কোন উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে একটা জীবন, তার হিসেব নিতে, তখন কোনো উপাদানকেই হিসেবের বাইরে রাখবার উপায় থাকে না। কাউকেই বাইরে রাখা উচিত নয়। অবশ্য সব উপাদানকে নির্দিষ্ট করাও সহজ নয়।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর স্মৃতিচারণ

চল্লিশের দশকের ঢাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশের কোনো রেখাচিত্র আমার একার পক্ষে তৈরি করা আদৌ সম্ভব নয়। আমি কেবল এর বৈশিষ্ট্য, একে জানবার প্রয়োজন আর এ বিষয়ে আমার আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত এই আগ্রহের কথা প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক সৈয়দ নুরুদ্দিনকে আমি বলেছিলাম। কবি সানাউল হকও এই সময়কার ছাত্র। আমার অগ্রবর্তী। তাঁর সঙ্গেও এ সম্পর্কে আলাপের প্রয়োজন রয়েছে। 'সংবাদ' এর এককালীন সম্পাদক খায়রুল কবির এবং তার বর্তমান সম্পাদক আহমদুল কবির এঁরা দু'জনও আমার অগ্রবর্তী। চল্লিশের দশকের ঢাকার কাহিনী লেখার অধিকতর উপযুক্ত পাত্র এঁরা। ঢাকা শহরের না হলেও ঢাকা জেলার এঁরা অধিবাসী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, চল্লিশের দশকেই। এবং বুদ্ধিবৃত্তি-গতভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁরা এদের অধ্যয়নকাল থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছিলেন। চল্লিশের দশকের ঢাকার অন্তরঙ্গ পরিচয় এঁরাই জানেন। এ. কে. নাজমুল করিম আজ প্রয়াত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি ১৯৪১ থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পর সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর। কলেজে পড়ার সময় থেকেই দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না হলেও, এ সম্পর্কে কৌতূহলী মন ছিল তাঁর। তাঁর সহপাঠী হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছাত্র সংগঠন 'ছাত্র ফেডারেশন' এর কর্মী। এঁদের একজন ছিলেন রবি গুহ। রবি গুহ ছিলেন সর্বদা হাসিমুখ, আলাপপ্রিয়, সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যাকারী এবং ছাত্র-শিক্ষক মহলে খুব সাদরে গৃহীত ছাত্রকর্মী। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আমার অগ্রজদের কথা স্মরণ করতেই মনে এল নাজমুল করিমের নাম। নাজমুল করিম যে সমাজতন্ত্রে দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করতেন, তা নয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর ছিলো বিশেষ কৌতূহল। চল্লিশের সনে না হলেও বিয়াল্লিশ সনের দিকে ঢাকার কমিউনিস্ট কর্মীরা ছাত্রদের মধ্যে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হওয়ার পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ সম্পর্কে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যে নীতি গ্রহণ করেছিলো, তাতে কমিউনিস্ট পার্টিকে ভারত সরকার আর নিষিদ্ধ রাখা আবশ্যক মনে করে নি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জার্মানি-ইতালি-জাপান মিলে যে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তি তৈরি হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের নীতি ঘোষণা করেছিলো। এ নীতির ব্যাপারে ভারতের কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের ভেতরে কিংবা বাইরে ফরোয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি বা বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রভৃতির বিরোধিতা ছিলো। ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রখ্যাত নেতা সুভাষচন্দ্র বসু সে সময়ে ব্রিটিশ সরকারের অন্ত রীণ অবস্থা থেকে কৌশলে পালিয়ে বার্লিন হয়ে টোকিওয়েত গিয়ে ভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতার জন্য জাপানের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে ভারতে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অধিকতর জটিল রূপ গ্রহণ করে। ঢাকাতে কমিউনিস্ট কর্মীদের এই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী নীতি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর.এস.পি মহল থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এর বিভিন্ন আত্মঘাতী প্রকাশ সংঘটিত হত হিন্দু ছাত্রদের হল ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং হিন্দু দু মধ্যবিত্ত প্রধান তাঁতীবাজার, শাঁখারী বাজার, ওয়ারী ও নবাবপুর প্রভৃতি এলাকার ছাত্র মধ্যবিত্ত কর্মীদের মধ্যে। এসব বিরোধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে তেমন কোনো আলোড়ন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো না। যুদ্ধের চরিত্রের ব্যাখ্যা-প্রতিব্যাখ্যা মুসলিম ছাত্রদের চিন্তা ও আলোচনার কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে, ঢাকা শহরের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হিন্দু ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত অন্য কর্মীরা তাদের নিজেদের সমাজে তীব্র বিরোধের সম্মুখীন হলেও মুসলিম ছাত্র, বিশেষ করে তার মধ্যকার উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের কাছে বেশ সমাদর পেতে লাগল। এই ধারাতেই চল্লিশের দশকে, বিশেষ করে '৪২ থেকে ৪৫-৪৬ সালে ছাত্র ফেডারেশনের এবং ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের কর্মীদের সম্পর্ক তৈরি হয় এই সময়কার মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে। এবং এদের মধ্যে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে যেমন ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ.কে. নাজমুল করিম, তেমনি বাংলার হেসামুদ্দিন আহমদ, ইংরেজির এ.কে.এম আহসান, কবীর চৌধুরী, অর্থনীতির সানাউল হক এরা। সৈয়দ নুরুদ্দিন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন কিংবা একেবারে সহপাঠী, সেটাও হিসেব করার বিষয়। সৈয়দ নুরুদ্দিনের পাঠ্য বিষয় ছিল বোধ হয় ইতিহাস। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে প্রয়াত মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর নামও স্মরণীয়। তিনি ছিলেন এ.কে. নাজমুল করিমেরও অগ্রবর্তী। কিন্তু তাঁর সঙ্গেও কমিউনিস্ট কর্মীদের একটা পরিচয় এবং হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিলো।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। ইংরেজিতে অনার্স এবং এম.এ. উভয় পরীক্ষাতে তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ করেছিলেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ছোট ভাই মুনীর চৌধুরী। এককালে যখন জঙ্গি এবং বামপন্থী রাজনীতিতে মুসলিম মধ্যবিত্ত কোনো মেয়ে বা ছাত্রীর সক্রিয়তা একেবারে অচিন্তনীয় ছিল, বিশেষ করে ঢাকায়, তখন পাকিস্তানের গোড়ার দিকে কবীর চৌধুরীর ছোট বোন নাদেরা বেগমের রাজনৈতিক উৎসাহ এবং কর্ম ছাত্রছাত্রী মহলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর একটি পারিবারিক অন্তরঙ্গ নাম 'মানিক'। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অগ্রজপ্রতিম হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে পড়বার সময় থেকে তাঁকে 'মানিক ভাই' বলে সম্বোধন করেছি। এই 'চল্লিশের দশকের' ঢাকার কথা মনে করে সেদিন, ১৭ জুন '৮৩, তাঁর বাসায় গিয়ে বললাম, আপনি কিছু বলুন আমাকে, সেদিনের কথা যা মনে আছে।

কবীর চৌধুরী সহাস্যে বললেন : সেদিনের সঙ্গে আজকের কালের ব্যবধান তো কম নয়। ঘটনা এবং চরিত্রের স্মৃতিও তো প্রায় বিলুপ্ত।

আমি বললাম : আপনি কি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়েই ঢাকা এসেছিলেন?

কবীর চৌধুরী বললেন : না, আমি বেশ কিছু আগেই ঢাকা এসেছিলাম।

কবীর চৌধুরী ঢাকাতে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছেন ১৯৩৮ সালে। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন ১৯৪০ সালে। তারপর আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবা আবদুল হালিম চৌধুরী ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মচারি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার ছবিটা স্মরণ করে কবীর চৌধুরী বললেন : ছাত্রসংখ্যা তো তখন কত কম! ধরো, সেই ১৯৪০-এর কথা। আমি অনার্স দিয়েছিলাম '৪৩-এ। তখন আমরা মাত্র জনাবিশেক ছাত্র ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে। মেয়ে ছাত্র চারজন।

আমি বললাম : মেয়েদের মধ্যে মুসলমান ছাত্রী ছিল কি একটিও?

মানিক ভাই বললেন : না, আমাদের ইংরেজিতে আদৌ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানে ছিলেন মেহের, যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, পরবর্তীকালে।

দু' একটা কথা। খণ্ডচিত্র। আজ বেশি কিছু মনে পড়ে না। কেবল রমনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত রোমান্টিক পরিবেশ বাদে মনে পড়ার মতো হয়তো কিছু নেইও। তবু সেদিনকার পটভূমিতে তার একটি ভূমিকা ছিলো, যা পরবর্তীকালকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী বললেন : সাম্প্রদায়িকতা চারদিকে বিস্তারিত হচ্ছিল, একথা সত্য। কিন্তু ১৯৪২-এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের মনে পড়ে না।

'৪২ সালের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটা সংঘাত ঘটেছিলো। এর সূত্রপাত হয়েছিলো কার্জন হলে ছাত্রীদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সলিমুল্লাহ হলের কিছু ছাত্রের আচরণ নিয়ে, হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদের ফলে। পরের দিন এর বিস্তার ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস এবং অফিস বিল্ডিং অর্থাৎ এখনকার বর্তমানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিং-এ। এ ভবনের দোতলার একদিকে ছিল ফজলুল হক হল অর্থাৎ মুসলিম ছাত্রদের বাসস্থান। ভবনের পুবদিকে ছিল ক্লাসঘর, ছাত্রীদের কমনরুম আর শিক্ষকদেরও বসার ঘর। নিচে ছিল লাইব্রেরি। এই দিনের সংঘাতের সময়টাতেই নাজির আহমদ নামের একজন মুসলমান ছাত্র আকস্মিকভাবে ছুরিকাহত হন এবং ঐদিনই বিকেলে মিটফোর্ড হাসপাতালে তিনি মারা যান। আমি তখন মাত্র আই.এ. পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। নাজির আহমদের স্মরণে পরবর্তীকালে নাজিরাবাজার এলাকায় একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল মুসলিম ছাত্রবৃন্দ, যার নাম দেয়া হয়েছিলো শহীদ নাজির লাইব্রেরি।

আমি কবীর চৌধুরী সাহেবকে জিগ্যেস করলাম, কিন্তু এ ঘটনা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে আপনার কি কিছু মনে পড়ে?

কবীর চৌধুরী সাহেব বললেন : এ ঘটনাকে বলতে পারি সেদিনকার আবহাওয়ার একটি ব্যতিক্রম। কারণ আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কেবল হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে নয়। শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সমাজের। আমাদের ইংরেজিতে ড. মাহমুদ হাসান ব্যতীত সেদিন কোনো মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন না। আমার ছাত্র জীবনের শেষদিকে, আমার মনে পড়ে, প্রয়াত ফজলুর রহমান সাহেব এসে ইংরেজি বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন তিনি। পরে তিনি কিছুদিন পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা পরিচালক অর্থাৎ ডি.পি.আই হয়েছিলেন। অকালে তিনি মারা গেছেন। হিন্দু শিক্ষকদের বাড়িতে গিয়ে আমাদের গল্প করা, ক্লাস করা—এটা ছিল সেদিনকার সেই পরিবেশের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন যেমন মন্মথ ঘোষ, তেমনি পি.কে. গুহ. অমলেন্দু বোস আর এস.এন.রায়। এঁদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, ছাত্রদের এত আন্তরিক, অমায়িক সম্পর্ক ছিলো যে, সে কথা আজ একেবারে অকল্পনীয় বলে মনে হয়। আমাদের সে সম্পর্কটা ছিলো, বলা চলে, একেবারে পারিবারিক ব্যাপার। অধ্যাপক জুনারকরের পরিবারের কথা মনে পড়ে। এই পরিবারের সঙ্গে মুনীরের সম্পর্ক তো পরবর্তীকালে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো। এইসব শিক্ষক এত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, ছাত্রদের সঙ্গে এঁদের ব্যবহার এত খোলামেলা ছিলো যে, সে কথা ভাবতেই আজ মনে একটা আবেগের সঞ্চার হয়।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী নিজের বিভাগের অন্য মুসলিম ছাত্রদের কথাও স্মরণ করলেন। বললেন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার এক বছর কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'বছর আগে। অবশ্য সৈয়দ আলী আহসান আমার সহপাঠী। আমাদের সময়ে অনার্সে প্রথম শ্রেণী আমি একাই পেয়েছিলাম। ১৯৪৩-এ। কিন্তু এম.এ-তে আমরা প্রথম শ্রেণী লাভ করেছিলাম পাঁচজন। সে একটা রেকর্ড বিশেষ। এদের মধ্যে আমি ছাড়া ছিলেন আজিজুল হক (কিছুদিন আগে তিনি উপদেষ্টা তথা সরকারের মন্ত্রী ছিলেন)। আজিজুল হক নানা ক্ষেত্রে তখন থেকেই খুব এ্যাকটিভ ছিলেন। খুব ভাল ডিবেট করতেন। তাছাড়া ছিলেন প্রণব গুহ। প্রণব গুহ পরে ভারতীয় ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন এবং আমাদের এখানে একবার ডেপুটি হাই কমিশনার হিসেবেও এসেছিলেন। প্রণব ছিলেন অধ্যাপক মন্মথ ঘোষের আত্মীয়। মন্মথ বাবু ছিলেন আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কৃতী অধ্যাপক। ইংরেজির কৃতী ছাত্রদের স্মরণ করে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এ.কে.এম আহসান সাহেবের কথাও বললেন। এ.কে.এম. আহসান আমার কিছুটা পরবর্তী—হয়ত এক বছর পরে এসেছিলেন ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু সেদিনও সামাজিক—রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনাকে তাঁর মধ্যে একটা তীব্র অতৃপ্তি আর জ্বালার আভাস থাকতো বলে আমার মনে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী সাহেব হঠাৎ তাঁর একজন সহপাঠীর নাম এবং তাঁর অকাল মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বললেন : দেখ, হঠাৎ আমার রউফের কথা মনে পড়েছে। কত মেধাবী ছাত্র ছিলো সে। ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিলো। উত্তরবঙ্গে বোধ হয় বাড়ি ছিলো। যক্ষ্মাতে মারা গিয়েছিলো পরে, অকালে। কিন্তু ওর কথায় একটি ব্যাপার মনে পড়ে। বাংলা বিভাগে সম্ভবত উমা বলে একটি মেয়ে ছিলো। এই মেয়েটির সঙ্গে রউফের বেশ একটি প্রণয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো।

কথাটায় কিছুটা চমকিত হওয়ার ব্যাপার আছে। আজ আন্তঃসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রীতি-প্রণয়ের কথা, এমন কি আন্তঃসম্প্রদায়িক পরিণয়ও আর কোনো চমক সৃষ্টি করে না, সমাজে কোন তরঙ্গ তোলে না। কিন্তু একদিন, এবং সেই ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে এমন ঘটনা যেমন বিরল, তেমনি সাংঘাতিকই ছিলো। সমাজের মধ্যে এমন সম্পর্কের উপলক্ষে মর্মান্তিক বিরোধেরও সৃষ্টি হয়েছে, মারাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রউফের সঙ্গে উমার সম্পর্ক তেমন কোনো বিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিল বলে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী স্মরণ করলেন না। বরঞ্চ সেই উমাকে স্মরণ করে বললেন : আজও রউফের প্রতি ওর আকর্ষণের প্রগাঢ়তা এবং সাহসের কথা মনে হলে আমার আনন্দ হয়। সেদিন হিন্দু-মুসলমান সব মেয়েরেই বাইরে যাতায়াত ছিল সীমাবদ্ধ। মুসলমান মেয়েরা তো বদ্ধ ঘোড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়িতে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে পায়ে হেঁটে বা উন্মুক্ত গাড়িতে আসতেই পারত না। হিন্দু মেয়েদের সীমাবদ্ধতা অতখানি ছিলো না। কিন্তু উমা শাড়ি ছেড়ে সেলোয়ার-কামিজ আর বোরখা পরে মুসলমান মেয়ে সেজে রউফের সঙ্গে রমনার লেকের কাছে এসে যে আলাপ করার সাহস দেখাত, সে চিত্রটি আমি ভুলতে পারি নি।

কাহিনীটি আমারও ভালো লাগে।

তারপরেই কবীর চৌধুরী সাহেব বললেন : তবে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে সেইকালে সাম্প্রদায়িকতা তীব্রভাবে না থাকলেও একটা গোত্রবোধ যে ছিলো, সেটি আমি স্মরণ করতে পারি। এবং সেটি আজ বেশ কৌতুকজনক বোধ হয়।

আমি বললাম : এর কোনো ঘটনা আপনার স্মৃতিতে আসে?

কবীর চৌধুরী বললেন : সে এক মজার ঘটনা। আমাদের বিভাগের একটি খ্রিস্টান ছাত্রীর সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় এবং আলাপ-বিনিময় ছিল। আর সেকালে এটিও ছিলো চোখে পড়ার বিষয়। এ নিয়েই চলত জল্পনা-কল্পনা। একদিন দেখলাম, সলিমুল্লাহ হলের সহপাঠী কিছু ছাত্র এসে আমাকে খুব তমিজ করে বললেন : কবীর সাহেব, আপনার একটা ব্যাপারে আমরা খুব উদ্বিগ্ন। (সেকালে সহপাঠী সহপাঠীকে আপনি করে বলত, বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে এই রেওয়াজটি ছিল)। আমি বললাম, কি ব্যাপার? তাঁরা বললেন, এই যে আপনি আমাদের সমাজের বাইরের একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছেন, আপনার মত একটি মুসলমান ভালো ছাত্র, এটি ঠিক নয়।

ঘটনাটি বলে কবীর চৌধুরী বললেন, এতে তেমন কিছু ঘটে নি। তবে এই যে এঁরা বললেন, মুসলমান সমাজের আমি ভালো ছাত্র, অপর সমাজের কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারব না, এটিতে সেদিনকার মুসলিম ছাত্রদের একটি গোত্রবোধের প্রকাশ দেখা যায়।

ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী সাহেব সেদিনের কথা স্মরণ করে বললেন, মুনীর তো ঢাকা এসেছিল আমার পরে। আমি যখন আসি তখন মুনীর আলীগড়ে পড়ে। তবে ছাত্র-শিক্ষক সবার মধ্যে আমি সেদিন সাম্প্রদায়িকতার চাইতে মানবিক একটি বোধেরই প্রকাশ দেখতাম। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে এবং শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে যে চল্লিশের দশকে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করছিলো এবং নানা মহল থেকে প্রবেশ করানো হচ্ছিল, সে কথাও ঠিক। কিন্তু এখানে যেটি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, এমন অবস্থায়ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এমন কিছু ছাত্র ছিলো যারা সাম্প্রদায়িক হওয়ার চাইতে বামপন্থী রাজনীতির দিকে অধিক আকর্ষিত হয়েছে। নিজের কথা বলতে গিয়ে কবীর চৌধুরী বললেন, আমি সেদিন রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে কোন সক্রিয় কর্মী ছিলাম না। কিন্তু তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেদিনকার ঢাকার বামপন্থী গুণীদের মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (কবি), রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী—এঁরা যে ক্রমান্বয়ে আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন এবং আমরা যে তাঁদের দিকে এগুচ্ছিলাম, এ ভাবটি তো আমার আজো মনে জাগে। কারণ, '৪৭-এর পূর্ববর্তী সময়ে একদিকে কংগ্রেস, আর একদিকে মুসলিম লীগ : এর বাইরে প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তাসম্পন্ন একটা ধারা ছিলো।

তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন : তোমার মনে পড়ে, রায় সাহেব বাজারের সেই দালানটির কথা, যার তেতলাতেই বোধ হয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অফিস ছিলো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই দালানটি এখনো আছে। যেখানে এখন একটা ওভারব্রিজ উঠেছে তার পূর্বপাড়ের গোড়াতে। এই গলিটির নাম জি. ঘোষের গলি। এবং এক সময়ে এই গলির মুখের প্রথম তেতলা বাড়িটির দোতলাতে ছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের অফিস। পরে এর নিচের তলায় প্রগতিশীল বইপত্রের একটি দোকানও খোলা হয়েছিলো।

কবীর চৌধুরী বললেন, আমি খুব বেশি হয়ত যাতায়াত করি নি সেদিন প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সেই অফিসে। তবু আমার যোগ নিশ্চয়ই কিছুটা ছিল। তাই সেদিনের কথা মনে হতে আজ এই কবি-সাহিত্যিকদের কথা মনে ভেসে উঠছে।

কবীর চৌধুরী এম.এ পাস করে ('৪৫ সালে) সরকারি চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। খাদ্য বিভাগে। মুসলিম ছাত্রদের ওপর বামপন্থী বা সমাজতন্ত্রী ভাবনার ক্রমপ্রসারের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বললেন, আমি তখন রাজবাড়িতে সরকারি চাকরি করি। রাজবাড়ির একটা ঘটনা কিন্তু এখনো মনে পড়ে।

আমি বললাম : কি ঘটনা, বলুন।

কবীর চৌধুরী বললেন, আমার মনে আছে, রেল শ্রমিকদের সংগঠক ব্যারিস্টার জ্যোতি বসু এসেছেন রাজবাড়িতে রেল শ্রমিকদের এক সম্মেলনে। জ্যোতি বসু তখনি কলকাতার প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা। রাজবাড়িতে তিনি বক্তৃতা করবেন শ্রমিকদের সম্মেলনে। আমার মত চাকরিজীবীর সেই সম্মেলনের কাছে যাওয়া সেদিন খুব নিরাপদ ব্যাপার ছিলো না। আমার মনে যেমন শঙ্কা ছিলো, তেমনি আকর্ষণও ছিলো। আমার এখনো কৌতুকের সঙ্গে মনে পড়ে যে, সেই আকর্ষণ এবং আশঙ্কা নিয়ে আমি রাত্রির অন্ধকারে আমার এক বন্ধুকে সাথে করে গায়ে-মাথায় কাপড় জড়িয়ে প্রায় আত্মগোপনের ভাব নিয়ে সেদিন জ্যোতি বসুর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।

১৯.৬.৮৩

* * *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘চল্লিশের দশকের ঢাকা’ নামের লেখাটি প্রসঙ্গে ‘সংবাদ’-এর বিদগ্ধ পাঠকজনদের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সহপাঠী জনাব বোরহানউদ্দিন আহমদ ইতোমধ্যে ‘সংবাদ’-এ তাঁর ছাত্রজীবনের কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। জনাব সিরাজুল ইসলামের একটি চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজশাহীর নওগাঁ থেকে জনাব আতাউল হক সিদ্দিকী অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তাঁর সহপাঠী কৃতী ছাত্র আবদুর রউফ এবং তার সঙ্গে এক হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্রীর যে প্রণয়-প্রীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন তার সূত্র ধরে একটি দীর্ঘ রচনা সংবাদ-এর সাহিত্য সম্পদককে পাঠিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও তিনি এ সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁর এই লেখাটিতে তিনি উল্লিখিত তরুণ ছাত্র আবদুর রউফের শিক্ষাগত জীবন এবং তার সঙ্গে এক হিন্দু তরুণীর প্রণয়ের বিষয়টিকে বিশদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জনাব আতাউল হক সিদ্দিকী অকাল প্রয়াত রউফের ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে এ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে তিনি তাঁর রচনাটি তৈরি করেছেন। জনাব সিদ্দিকী বলেছেন, রউফের বাড়িও ছিল নওগাঁতে।

তিনি রউফের ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের অধিকতর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : ‘১৯৩৮ সালে ঢাকা সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল থেকে রউফ ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন’ এবং বাংলাতেও তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ‘পার্বতীচরণ মেডাল’ নামে সাধারণ মেধার স্বর্ণপদকের অতিরিক্ত আর একটি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন এবং ‘তখনকার দিনে শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদপদ বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে রউফের মত একজন মুসলিম ছাত্রের ঐ রকম কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের একটা আলাদা গৌরব ছিল’—জনাব সিদ্দিকীর এ মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ এবং যথার্থ। পত্রলেখকের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী অর্ধ—শতাব্দী পূর্বের সেই ঢাকার সমাজে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সংঘাতের পরিবেশে দুই সম্প্রদায়ের দুই তরুণ-তরুণী রউফ এবং উমার প্রণয়, পরিণয়ের প্রস্তাব অবধি নাকি পৌঁছেছিলো। কিন্তু প্লুরুসিতে আক্রান্ত রউফের আকস্মিক প্রয়াণে তাদের সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হতে পারে নি। ছাত্রীটির প্রকৃত নাম নাকি ছিল জয়ন্তী মজুমদার। ডাকনাম ছিলো উমা। এই বিষাদময় কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করেছেন পত্রলেখক জনাব সিদ্দিকী। সেকালের আবহাওয়াতে এই প্রণয় কাহিনীটি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণের তেমন প্রয়োজন হয়ত আজ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলেজ নয় তো রাজপ্রাসাদ

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জবানবন্দিতে যদি চল্লিশের দশকের ঢাকার কিছু স্মৃতিচারণ করতে হয় তাহলে আমাকে তো প্রথমে ঢাকাতে আসতে হয়।

আমি নিজে ঢাকা এসেছিলাম চল্লিশের দশকের ঠিক শুরুতেই। ১৯৪০ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাস করার অব্যবহিত পরেই।

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট সরকারি কলেজে আই.এ.- তে ভর্তি হয়ে গেলাম। কত সহজে, একবাক্যে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন ব্যাপারটা এমনিই ছিলো। যারা ভর্তি হতে চাইত, যারা আগের পরীক্ষা পাস করে এসেছে তাদের জন্য ভর্তি হওয়া কোন সমস্যা ছিলো না। আজ সেদিনের কথা শায়েস্তা খাঁর আমলের চাল-ডালের মতোই শোনায়। চাল-ডালের কথা তুলছিনে। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে সেদিনটি শায়েস্তা খাঁর আমলের ব্যাপারই ছিল। স্কুল-কলেজই ভর্তির জন্য ছাত্র খুঁজে বেড়াত। কোনো স্কুল বা কলেজ কত ভালো, তার প্রসপেকটাস বার করতো।

ঢাকা শহরে তখন প্রধান কলেজ ছিলো ঢাকা কলেজ আর জগন্নাথ কলেজ। আরো কলেজ ছিলো। কিন্তু এ দু'টিই পুরানো এবং পরিচিত।

ঢাকা কলেজে আই.এ.-তে আমার বিষয় ছিলো ইংরেজি, বাংলা এবং তার সাথে ইতিহাস, মানে পৃথিবীর ইতিহাস, লজিক এবং সিভিকস ও ইকনমিকস।

'ঢাকা কলেজ' কথাটি মনে করতেই আমার চোখে ভেসে ওঠে প্রাসাদের মত সেই দালানটি, যেটি ১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের পরে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নিয়ে গঠিত প্রদেশের লাট সাহেবের ভবন হিসেবে তৈরি হয়েছিলো। অনেকটা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর প্যাটার্নে তৈরি। সাদা ঝক্‌ঝকে বাড়ি। উঠতে রাজকীয় সিঁড়ি। মার্বেল পাথরের। তারপরে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। ফটো নেওয়ার মতো। উপরে উঠে বাঁদিকে কাঠের মেঝে, বিরাট হলঘর। পরে শুনেছি এটি নাকি সাহেবদের বলরুম বা নাচঘর ছিলো। মোট কথা কোনো ঘরই ছাত্রদের ক্লাস করার জন্য তৈরি নয়। তাই জীবনকালের ভাগ্য যে এমন দালানে ঢোকার অধিকার পেল বরিশালের প্রত্যন্ত গ্রামের এক 'ছাওয়াল'। দিনকালই বদলে যাচ্ছিল। তা না হলে, এমন হয়? প্রাসাদের মধ্যে কৃষকের সন্তানের প্রবেশ ঘটে?

রাস্তার একদিকে এই দালান। বর্তমানে পুরানো হাইকোর্ট নামে পরিচিত। আর একদিকে কার্জন হল। মাঝখানের এই রাস্তাটি সেদিন থেকেই আছে। এর তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তা না হলে সেদিনের ঢাকা আর অপরিবর্তিত নেই। এমন কি শহরের মধ্যকার দোলাইখালও আজ রাস্তা হয়ে গেছে এবং ঢাকার রেলস্টেশন বলতেই যে ফুলবাড়িয়াকে বোঝাত সে এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই '৮৩ সালে ঢাকা থেকে যাতায়াতকারী বাসের প্রধান কেন্দ্র। রেল লাইন আর বিদ্যমান নেই। পুরানো সেই রেললাইনকেই তেজগাঁ থেকে গেন্ডারিয়া পর্যন্ত রাস্তা করা হয়েছে।

পরিবর্তিত ঢাকায় হাঁটতে কিংবা রিকশা করে যাতায়াতেও ঢাকাকে যেমন অপরিচিত তেমনি নিজেকে বিদেশি বলে বোধ হয়।

১৯৪০ সালেও নিজেকে ঢাকাতে বিদেশি বলে মনে হয়েছিলো। বিদেশি কিশোর হিসেবেই সেদিন শান্ত ঠাণ্ডা রমনার নাম না জানা এ-রাস্তা, ও-রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবিষ্কার করেছি সলিমুল্লাহ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং অর্থাৎ বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ঢাকা কলেজ আর কার্জন হলের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা পূর্বদিকে গিয়ে কোথায় যে মোড় নিয়েছিলো, কোন মাঠে বা বাগানে তা আর এখন স্মরণ করতে পারছিনে। অথচ মন চায় পুরনো দিনে ফিরে যেতে, পুরানো রাস্তায় হাঁটতে। পুরানো বাড়ি আজ বিধ্বস্ত, পুরানো মাঠ আজ সরকারি- বেসরকারি বাড়িতে রূপান্তরিত। এমন অবস্থায় পুরানো জীবনকে স্মরণ করার উপায় কি? তাই অসহায় বোধ করি পুরানো জীবনকে স্মরণ করার চেষ্টায়। ঢাকার সেই ৪০-এর দশকের কোনো পুরানো মানচিত্র আছে কিনা আমার জানা নেই। না থাকাই সম্ভব। থাকলে সেখানে রাস্তাঘাটের নাম দেখেও হয়তো পুরানো কথা কিছু স্মরণ করতে পারতাম। বস্তুর সঙ্গে স্মৃতি জড়িত থাকে, ঘটনার, এমন কি ভাব-ভাবনারও। সেই বস্তুর বাস্তব পরিবর্তনে পুরানো ঘটনাকে স্মরণে আনা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকায় এসে প্রথম রাতটি কাটিয়েছিলাম নওয়াব মনজিলের ন্যায় গঠিত বিরাট সলিমুল্লাহ হলে। এ কথাটি স্মরণ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক যে ছাত্রটির হাতে জিম্মা করে দিয়েছিলেন আমাকে আমার অভিভাবক বড় ভাই, সে ছাত্রটিই আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। সেকালে যেমন তার বাইরের সৌকর্য ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি ভেতরের বাগানটিও ছিল ছবির মতো সাজানো, মনোহারী। তার চারপাশে কোথাও এমন মনোহর গম্বুজওয়ালা দালান আর ছিলো না। এখান থেকে জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে এগিয়ে কার্জন হল অবধি এলেই মাত্র আমাদের ঢাকা কলেজের সাদা গম্বুজওয়ালা বাড়ির সাক্ষাৎ মিলতো।

আজো এই দালানের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে মনে ইচ্ছা জাগে একবার ভেতরে যাই, দেখি আমাদের সেই ক্লাস রুমগুলো এখন কেমন আছে। কিন্তু এমন ইচ্ছা পূরণ করার উপায় নেই। এ ভবন এখন নিষিদ্ধ এবং সংরক্ষিত এলাকা। সরকারের কোনো গোপন বিভাগ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে দালানটিকে জাতীয় জাদুঘর হিসেবে বিবেচনা করে তাকে যেমন আবিকৃত রাখার চেষ্টা করার আবশ্যক, তেমনি তাকে আজকের যুগের শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, প্রবীণ-প্রবীণার দর্শনের জন্য প্রবেশযোগ্য করাও আবশ্যক। এই ভবনের বিভিন্ন ঘরেই পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের বিকাশ ও বিবর্তনের নানা উপাদান সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হওয়া উচিত। নতুন যাদুঘর ভবন বিশাল বটে, কিন্তু পুরানো এই ভবনটির মত ইতিহাসের সাক্ষাৎ সাক্ষ্য সে এখনো হয়ে ওঠে নি।

ঢাকা কলেজের কথা বলতে কেবল কলেজ ভবনই যে মনের মধ্যে ভেসে উঠছে, তা নয়। এখানে কলেজের আর একটি ভবনের কথাও বলতে হয়। সেটি ঢাকা কলেজের ছাত্রদের থাকার ভবন। ভবনটি কার্জন হলের দক্ষিণ-পূর্বে লাল ইটের ভবন। এটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের মূল ভবন বলে পরিচিত। এর মূল কাঠামোটি এখনো অপরিবর্তিত। কিন্তু দোতলার সঙ্গে আর একটি তলা যুক্ত করা হয়েছে। সামনের মাঠেও নতুন ভবন তৈরি হয়েছে। তবে বৃহৎ আকারের পুকুরটি এবং তারই দুই পাড়ের বড় বাঁধানো ঘাট এখনো আছে। এই পুকুরের পশ্চিম পাড়ে সেকালে ছিলো ঢাকা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস। থাকতো প্রধানত হিন্দু সমাজেরই ছাত্রবৃন্দ। এখন সে ছাত্রাবাসের নাম দেওয়া হয়েছে শহীদুল্লাহ হল: ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল।

কাজেই যেটি এখন ফজলুল হক হল, সে ভবনটি আসলে ঢাকা কলেজেরই ছাত্রাবাস। এই ভবনটির সঙ্গে আমার ছাত্রজীবন, বলা চলে '৪০ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যায়, এম. এ. পর্যন্ত জড়িত ছিলো। কারণ দ্বিতীয় মহাদ্ধের কালে ঢাকা কলেজের ভবনটি যেমন তখন ব্রিটিশ ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর পূর্ব রণাঙ্গনের সৈনিকদের একটা হাসপাতালে পর্যবসিত হয়েছিলো, ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসও অন্যত্র অপসারিত হয়েছিলো। যুদ্ধের সময়ে ইউনিভার্সিটির মূল আর্টস বিল্ডিং-এর একাংশও সামরিক হাসপাতালে পরিণত হয়েছিলো এবং তখনি বোধ হয় এই ভবনের দোতলাতে অবস্থিত ফজলুল হক হলকে ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাস তথা বর্তমান ফজলুল হক হল ভবনে নিয়ে আসা হয়।

কিন্তু ভবনসমূহের এমন প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার দক্ষ লোক আমি নই। তবু ভবনের মধ্যকার মানুষজন, তার ভাবনাচিন্তার কথা বলতে গেলে ভবনের কথাই আগে আসে।

একটা কথা বলা ভাল। সেদিন এটাকে তেমন বেমানান মনে হয় নি। কিন্তু আজ কথাটা ভাবতে গিয়ে একটু বিস্ময় বোধ হচ্ছে। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের হোস্টেলের কথা বলেছি। কিন্তু ছাত্রীদের সন্ধান কি? আসলে এখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা কলেজ বোধ হয় কেবল মাত্র ছাত্রদেরই কলেজ, যদিও শিক্ষক বা অধ্যাপকরা কেবল অধ্যাপকই নন, অধ্যাপিকাও বটে। কিন্তু সেদিনও ঢাকা কলেজে কোনো ছাত্রী পাড়তো না। জগন্নাথ কলেজেও নয়। ছাত্রীদের ইডেন কলেজ শহরের এ মাথাতেই ছিলো না। ছিল ওয়াইজঘাট নামে সদরঘাটের কাছে যে এলাকা আছে সেখানে। মোট কথা মেয়েদের সঙ্গে সেই 'ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে'ও আমাদের কোনো যোগাযোগই ছিলো না।

প্রবীণ অগ্রজ সাহিত্যিক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষদের স্মৃতিচারণে দেখছি যে, তাঁরা অনেকে ঢাকা কলেজে পড়েছেন এবং ঢাকা কলেজে প্রখ্যাত সাহিত্যিক কাজি আবদুল ওদুদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁর সাহিত্য আলোচনা শুনেছেন। কিন্তু আমার সে সৌভাগ্য হয় নি। হয়ত কাজি আবদুল ওদুদ '৪০-এর পূর্বেই ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা অপর কোথাও বদলি হয়ে গিয়েছিলেন।

'৪০ থেকে '৪২ সালের কলেজজীবনে আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে প্রয়াত ডক্টর মমতাজউদ্দিন আহমদের নাম। তিনি তখন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাছাড়া আমার নিজের শিক্ষকদের মধ্যে ইংরেজির জালালউদ্দিন আহমদ, পি.কে.রায় (সঠিক মনে করতে পারছিনে নামটি), ইতিহাসের পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী। (আহা! কি নিরীহ কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক। শুনেছি পরবর্তীকালে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হন)। সিভিকস ও ইকনমিকস-এর অধ্যাপক জনাব শফিকুর রহমান, লজিকের জনাব ফজলুর রহমান—এঁরা ছিলেন। শফিকুর রহমান সাহেব এবং ফজলুর রহমান সাহেব এখনো জীবিত আছেন এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক কার্যাদির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন। এটি আনন্দের কথা। জালালউদ্দিন সাহেব খুব রসিক মেজাজের মানুষ ছিলেন। তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে সেদিনও আমরা ছেলেরা নানা রস-রসিকতা করতাম। তাঁকে অনুকরণ করে কথা বলতাম। জালাল সাহেব পরবর্তীকালে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে দীর্ঘদিন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তিনি এখন প্রয়াত।

দু'বছরের সেই কিশোরকালের কলেজ জীবনে বড় রকমের কোনো ঘটনা স্মৃতিতে নেই। যে একটির কথা স্মরণে আছে তা একটু বিস্তারিতভাবে পরে বলব। কিন্তু তার চেয়ে হালকা ধরনের নিজের যে আচরণের কথা মনে পড়ছে তারই একটু উল্লেখ এখানে করা যায়। বিজ্ঞানে সেদিন কারা ছাত্র ছিলেন, তা আজ জানিনে। কারণ আমি ছিলাম আই.এ. তথা কলা শাখার ছাত্র। কলা এবং বিজ্ঞান, এ দু'টিই প্রধান শাখা ছিলো। বাণিজ্য শাখা তখনও চালু হয়েছে কিনা স্মরণ নেই। কলা শাখায়, বিশেষ করে আমার ক্লাসে সহপাঠী হিসেবে আমি পেয়েছিলাম সৈয়দ আলী আশরাফকে। সৈয়দ আলী আশরাফ সৈয়দ আলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহসানের অনুজ। সৈয়দ আলী আশরাফ ছিলেন যেমন মেধাবী তেমনি সিরিয়াস। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এইচ.এল.দে'র ছেলে অজিত দেও আমার সহপাঠি ছিলো। আমার সহপাঠী ছিলেন কামালউদ্দিনও। ইনি পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স এবং এম.এ পড়েছেন এবং এখন ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। নাসিরউদ্দিনও আমার তখনকার বন্ধু; নাসিরউদ্দিন আহমদ। ডাক বিভাগ এবং যোগাযোগ বিভাগের উচ্চতর দায়িত্ব পালন করে হয়ত এতদিনে অবসর নিয়েছেন। নাসিরের ছোট ভাই ছিলো গিয়াসউদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক, '৭১ সালে হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হয়ে নিজের সতেজ স্বাদেশিক জীবনবোধের অপরাজেয়তাকে প্রমাণ করে গেছেন। তাদের পরিবারেও যেমন, আমিও তেমনি গিয়াসকে তার কিশোরকালে ডাকতাম 'বাচ্চু' বলে। নাসিরের বাবা ১৯৪১-৪২-এ চাঁদপুর মহকুমার প্রধান ছিলেন। জনাব আবদুল গফুর। উদার হৃদয়ের মানুষ। নাসির নিয়ে গিয়েছিলো আমাকে তাদের সেই বাসায়। আর সেখানেই কিশোর বাচ্চুকে পেয়েছিলাম আমার অনুরাগী স্নেহভাজন হিসেবে। '৪২-এর কথা বলতে এমনিভাবে '৭১-এর শহীদ বাচ্চুও স্মৃতির পাতায় স্মৃতি হিসেবে জ্বলে ওঠে। আমার আর একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আবদুল মতিন। এককালে সাংবাদিক ছিলেন। এখন বিলেত প্রবাসী। ইনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু হোস্টেলে আমার সঙ্গী ছিলেন। হোস্টেলে সঙ্গী ছিলেন কামালও। তাছাড়া ইতিহাসের আর একজন মেধাবী ছাত্রের নাম আজ স্মরণ হচ্ছে। ফরিদপুর থেকে এসেছিলেন মোজাহেরউদ্দিন আহমদ। মেধাবী এবং ব্যতিক্রমী জীবনবোধ আর আচরণের এক তরুণ ছাত্র ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে ইতিহাসে এম.এ.পাস করেছেন। আইন শাস্ত্রেও কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রি নিয়েছেন। মুন্সেফ থেকে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা এবং অধ্যক্ষতা করেছেন। কিন্তু সংসার বা চাকরি, কোথাও যেন কোনো স্থিতি পান নি তিনি। এবং মানাতে পারেন নি পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে। সে পরিবেশে তিনি এককালে যেমন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের তীব্রতা দেখেছেন, তেমনি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ এবং দুর্নীতি তাঁর আপসহীন মনকে বিচলিত করেছে। তিনি অকালে মারা গেছেন। বন্ধুবর আবুল কাসেম ছিলেন দরাজমন, মেজাজ এবং চিন্তার কিশোর। কূপমণ্ডুকতা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন সেই তাঁর কলেজের ছাত্রজীবন থেকে এবং কারুর মধ্যে এমন সঙ্গীর্ণতার পরিচয় পেলে তাকে স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করতে কাসেম ছিলেন দ্বিধাহীন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটিও বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। সরকারি কলেজে ভূগোলের অধ্যাপনা করেছেন। ইংরেজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যেও ডিগ্রি নিয়েছেন। এখনো তিনি তাঁর সেদিনকার সরস মেজাজ এবং ভঙ্গি নিয়ে বেঁচে আছেন।

কলেজের মধ্যে রাজনৈতিক হৈ-হাঙ্গামা সেকালে তেমন ঘটে নি। তখনো রমনা শান্ত। ৪০, ৪১, ৪২-বিশেষ করে যুদ্ধ বাধার পূর্ব পর্যন্ত সেকালের কিশোর ছাত্রদের জীবন তরঙ্গবিহীন অলস-আনন্দঘন অধ্যয়নের জীবন। শিক্ষকরা ক্লাস করতেন রীতিমত। বরঞ্চ সেই রীতিমত ক্লাসের মধ্যে দু'এক সময়ে ক্লাস না করাতেই মন আনন্দ পেতো। (এখন রীতি হচ্ছে ক্লাস না হওয়ার। ক্লাস হওয়াটাই রীতির ব্যতিক্রম।) ক্লাসে আমরা শিক্ষকদের সঙ্গে নির্দোষ দুষ্টামিতে আনন্দ পেতাম। জালাল সাহেবের বেপরোয়া ঢাকাইয়া উচ্চারণের ইংরেজি বক্তৃতাতে আমরা বেশ আমোদ বোধ করতাম। শফিকুর রহমান সাহেব সিভিকস্ আর ইকনমিকস্ পড়াতেন। নিরীহ এবং সিরিয়াস অধ্যাপক। হয়ত ছাত্রদের সঙ্গে রস-রসিকতার যোগাযোগ কম ছিল। আর তাই তাঁর কোনো ভঙ্গি নিয়ে ছাত্ররা তাঁকে জ্বালাতন করার চেষ্টা করতো। তাঁর আলোচনা রীতিকে আমরা একটা রঙ্গ করে প্রকাশ করে নিজেদের মধ্যে তিনি ক্লাসে আসার আগে বলতাম: 'চ্যাপম্যান ওপাইনস্, সেলিগম্যান কনক্লুডস এ্যান্ড শফিকুর রহমান জয়েনস': এটা সেকালের দুষ্ট কিশোর আমাদের মস্তিষ্কের সৃষ্টি। শফিকুর রহমান সাহেব হয়ত তাঁর বক্তৃতায় অথরিটির উদ্ধৃতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করতেন। তার প্রতি তাঁর ছাত্রদের সরস সমালোচনা। কিন্তু এমন সমালোচনা তাঁর কানে কখনো গেছে বলে আমি মনে করিনে।

মমতাজউদ্দিন সাহেব নিজে দর্শন শাস্ত্রের বিলেত-ফেরত অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক কলেজে দর্শন পড়াবার তো কোন জায়গা ছিলো না। লজিকের ক্লাস নিয়েছেন, এমনও মনে পড়ে না। কিন্তু ইংরেজির ক্লাস নেওয়াটাই বোধ হয় অধ্যক্ষকে অধিক মানায়। তাই তিনি আমাদের দু'একটা ইংরেজি ক্লাস নিয়েছিলেন। তার একটা ক্লাসে তিনি 'এসথেটিক্স্' ব্যাপারটির সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করে তাঁর নিজস্ব কিছুটা তোতলানো ভঙ্গিতে এবং বিশিষ্ট উচ্চারণে যে বিব্রত হয়ে উঠছিলেন, সেটি আজ ৪৩ বছর পরেও মনে ভেসে উঠছে। 'ইউ আনডারস্ট্যান্ড, এসথেটিকস্ মিনস্—' সে উচ্চারণটি কানে বাজলেও তাকে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সেদিনকার তাঁর বিব্রতকর অবস্থায় দুষ্ট ছাত্র হিসেবে আমোদ বোধ করলেও আজ তাঁর জন্য মমতাবোধ হচ্ছে। মমতাজউদ্দিন সাহেবই পরবর্তীকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন ও বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন 'মমতাজউদ্দিন কলাভবন' বলে অভিহিত হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তিনি বেশ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। কলেজের পেছনে মাঠের মধ্যে একতলা বাড়িটিতে প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে তাঁর বাস ছিলো। আমরা সেবার হোস্টেলে কি নিয়ে যেন 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করেছিলাম। তখন রেডিওর যুগের সবে সূচনা। হয়ত আমাদের দাবি ছিলো হোস্টেলের কমনরুমে একটি রেডিও কেনো বসানো হচ্ছে না। কিংবা হয়ত অভিযোগ ছিলো ডাইনিংহলের ডাল এত পাতলা হয় কেনো? আমরা ঘোষণা করে দিলাম আমরা আর ভাত খাবো না। দুপুর গড়িয়ে যায়, আমরা ভাই খাইনে। অবশ্য নিজের নিজের ঘরে বসে কেক, বিস্কুট খেতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি। আমাদের ক্ষোভ বোধ হয় বেশি ছিলো হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট জাঁদরেল মানুষ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে। ওয়ালীউল্লাহ সাহেব অবশ্য মুসলমান ছাত্রদের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা আমরা একই দালানে থাকতাম। পশ্চিম দিকের ভাগটা বোধ হয় হিন্দু ছেলেদের ছিলো। পূর্বদিকের ভাগটা মুসলমান ছেলেদের। তিনটা দালান। একটার সঙ্গে আর একটা যোগ করা। উত্তরের অর্ধেক বোধ হয় হিন্দু ছেলেদের। অর্ধেক মুসলমান ছেলেদের। এরও আগে হয়ত হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি ছিলো। '৪০-এর দিকে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। সে যা হোক, হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের দুটো ভিন্ন হোস্টেল ছিলো, এমন আমার মনে পড়ে না। হিন্দু ছাত্রদের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন বোধ হয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক নির্মল সেন। আমাদের একজন এসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর নাম জনাব কফিলউদ্দিন। ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এবং কফিলউদ্দিন সাহেব—এঁরা দু'জনেই আজ প্রয়াত। যে 'হাঙ্গার স্ট্রাইকের' কথা বলছিলাম তাঁর স্মৃতিতে দেখছি, মমতাজউদ্দিন সাহেব যখন শুনলেন আমরা বেলা দুটো পর্যন্ত খাচ্ছিনে, তখনি তিনি ছুটে এলেন আমাদের রাগ ভাঙাতে। নিজে ছেলেদের পিঠে হাত দিয়ে আদর করে ডাইনিং হলে নিয়ে গেলেন এবং নিজে তাদের সঙ্গে বসে খেলেন এবং ভরসা দিলেন, ডাইনিং হলের খাওয়ার তিনি উন্নতির ব্যবস্থা করবেন।

শিবরাত্রির ফুল সিরিয়াল

'৪০-৪২ সালের কথা। ঢাকা কলেজের ক্লাসের স্মৃতি যতো না মনে পড়ে তার চেয়ে বেশি মনে পড়ে হোস্টেলের। সহপাঠী নূরুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর ছিলেন লুৎফুল করিম। এরা ক'জন কেবল যে কলেজের সহপাঠী ছিলেন তাই নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্নতা হলেও এঁদের অনেককেই আমি একই ভবনে, অর্থাৎ ঢাকা কলেজের হোস্টেল ভবন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রাবাস ফজলুল হক হলে রূপান্তরিত হলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন হলের সঙ্গী হিসেবেও পেয়েছিলাম। নূরুল ইসলাম চৌধুরী সম্প্রতি বাংলাদেশের ফরেন সারভিস থেকে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রয়াত অধ্যাপক এ.কে নাজমুল করিমের কনিষ্ঠ ভাই লুৎফুল করিমও সরকারের প্রশাসন বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু সেই '৪১-৪২ সালের ইন্টারমিডিয়েট হোস্টেলের স্মৃতির মধ্যে আর যে ঘটনাটি ভাসছে সেটিকে কিছুটা রাজনৈতিক ঘটনা বলা চলে। এই ঘটনাটির উৎসও বোধ হয় হোস্টেলের জাঁদরেল সুপারিনটেনডেন্ট ওয়ালীউল্লাহ সাহেব। সাংঘাতিক কড়া মানুষ ছিলেন। হোস্টেলে নিয়ম করেছিলেন, রাত ন'টা বাজতেই লোহার সদর গেট বন্ধ করে দিবেন। এরপরে কেউ বাইরে থেকে এলে তাকে গেট বইতে নাম লিখতে হবে এবং তার এমন বিলম্বের জন্য পরের দিন সুপারিনটেনডেন্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। রাত দশটার পরে হোস্টেলের মেইন সুইচ অফ করে দেবার হুকুম দিতেন। দশটার পরে সবাইকে ঘুমাতে হবে। সিনেমা যাওয়া বারণ ছিল। অথচ এমন সমস্ত নিয়ম-নিষেধ আমরা মান্য করার চাইতে ভঙ্গই হয়ত বেশি করতাম। বিলম্বে ফিরলে গেটের খাতায় নাম লেখার বদলে গেটের উঁচু শিক বেয়ে তা টপকে ভেতরে ঢোকার পন্থাই ছেলেরা অধিক গ্রহণ করতো। একবার ব্যাপারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো।

সে রাতটা ছিল শিবরাত্রি। হিন্দু পর্বের দিন। এমন পর্বে ঢাকায় তখন যে কয়টি সিনেমা ঘর ছিলো তাদের মধ্যে বিশিষ্টরা বিশেষ আকর্ষণীয় ছবির প্রদর্শনী করতো। এই শিবরাত্রির তারিখেও ঢাকার অন্যতম সিনেমা হল মুকুলে (এর বর্তমান নাম 'আজাদ', ঢাকা কোর্টের বিপরীতে) এই রাতে তিন তিনটা পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি দেখবার আকর্ষণ ছিলো। এমন আকর্ষণে আকৃষ্ট না হওয়া কঠিন ব্যাপার। ভক্ত, অনুরক্ত ইত্যাদি মিলে আমার প্রায় একটি দল বা উপদলের মতো গড়ে উঠেছিলো। এরা একজোটে হাঁটতো, চলতো, গল্প করতো। এদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয় হতো সাহিত্য বা কোনো উল্লেখযোগ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঘটনা। নিজেদের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করার জন্য হাতে লেখা ম্যাগাজিনও আমরা সেদিন তৈরি করেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম : 'পাগলা ঝোরা'। এ নামের কি অর্থ, তা আমি আজো জানিনে। হয়ত বা উৎফুল্ল নির্ঝর। এই দলের প্রায় স্বনির্বাচিত নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আর সেজন্যই বোধ হয় আমার নামের প্রধান দুই অংশকে বাদ দিয়ে বন্ধুরা নামের অপ্রধান অংশকে প্রধান করে 'সরদার' বলে আমাকে সম্বোধন করতো। শিবরাত্রির ফুল সিরিয়ালে যাবার গোপন ব্যবস্থার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। সন্ধ্যার পরেই ডাইনিংহল থেকে খেয়ে কাউকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু না জানিয়ে সোজা রওনা দিলাম রমনা হোস্টেল থেকে মুকুল বরাবর। ভরসা ছিল, ছবি দেখতে দেখতে তো ভোর হয়ে যাবে। তখন ফিরে এলে গেট খোলাই পাওয়া যাবে এবং ওয়ালীউল্লাহ সাহেব টেরও পাবেন না। তিন তিনটে ছবি। একটির বোধ হয় নাম ছিলো 'দেশের মাটি'। আর দু'টির নাম মনে নেই। তবে ঠিকই, সারারাত্রি ছবি দেখেছিলাম। পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছবি মানে প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য কমসে কম আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। ছবি যখন শেষ হলো তখন ভোর হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু সারারাত ধরে এমন অদ্ভুত আনন্দ ভোগের নেশায় ছ'সাতজনের সেই দলের সকলেরই চোখ রাঙা আর ঢুলঢুলু, মাথার চুল বেপাট, উস্কখুস্ক। কারুর মুখেই তেমন কোনো কথা নেই। আধ বোজা চোখে নির্জন ঠাণ্ডা রাস্তা দিয়ে 'মুকুল' থেকে সারাটা পথ হেঁটে এলাম। মনে কোনো ভয় ছিলো না। ভেবেছিলাম, এত সকালে ওয়ালীউল্লাহ সাহেব জানতেও পারবেন না। কিন্তু প্রবাদে যা আছে বাস্তবে তা সত্য বৈ মিথ্যা হয় না। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়। আমাদেরও তাই হলো। হোস্টেলের কাছে প্রায় এসে গেছি। এখনো রাস্তার পাশের গেটে পৌঁছি নি। হঠাৎ শুনলাম হাঁক এলো : এই তোমরা সবাই কোথেকে এলে, এত ভোরে? ঐ হাঁকের চোটে আমাদের সকলের তন্দ্রা টুটে গেল। চোখের পাতা পুরো খুলতেই দেখি সামনেই ব্যাঘ্র স্বয়ং, সুপারিনটেণ্ডেন্ট ওয়ালীউল্লাহ সাহেব। কিন্তু যেটা মারাত্মক হয়েছিলো, সে হচ্ছে এই দলের মধ্যে জবাবদানকারী একজনের সত্যবাদিতা। সে মুখে আর কোনো জবাব না পেয়ে অক্লেশে বলে ফেলল : স্যার, সিনেমায় গেছিলাম।

বিস্ময় আর আতঙ্কভরা প্রশ্ন এলো আবার : সিনেমায়? সারারাত? ডিড ইউ টেক পারমিশন?

জবাব এলো : স্যার সরদার বলেছে, পারমিশন পাওয়া গেছে ...

কিন্তু সত্যি কি সরদার বলেছিলো, 'পারমিশন পাওয়া গেছে'? সরদারের একথা সেদিনও মনে পড়ে নি, আজো মনে পড়ছে না। তাই বলে, তা নিয়ে বাদপ্রতিবাদের প্রশ্ন ওঠে না। যে বিপদ এসেছে, তার আশঙ্কা তো ছিলই।

: সি ইন মাই অফিস " আমার অফিসে সবাই দেখা করো। ...

যা হোক, বিস্তারিত সংলাপ উল্লেখ করে লাভ নেই। ওয়ালীউল্লাহ সাহেব 'শোকজ' করলেন আমাদের সবাইকেই; 'শোকজ' কেন তোমাদের স্টাইপেন্ড কেটে দেওয়া হবে না এবং লুৎফুল করিমকে (এবং আরো একজনকে বোধ হয়) হোস্টেল থেকে বহিস্কৃত করা হবে না? লুৎফুল করিম ছিলো নাজমুল করিমের ছোট ভাই। নাজমুল করিম ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স পড়েন। আমরা ঢাকা ইন্টার হোসেটল থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প করি। তাঁরও একটি ভক্ত এবং গুণমুগ্ধ সহপাঠীর দল ছিলো। লুৎফুল করিমের ওপর খড়গহস্ত হওয়ার কারণ বোধ হয় ওর ত্যাড়াবাঁকা জওয়াব। লুৎফুল করিম সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবকে হয়ত তেমন মান্য করতো না এবং এই অপরাধের ব্যাপারে তাঁকে কিছু একটা বলে থাকবে।

এবং এই বহিষ্কারের আদেশ থেকেই ব্যাপারটা কিছুটা রাজনৈতিক হয়ে দাঁড়াল। আমরা যুক্ত হয়ে পড়লাম আমাদের কলেজের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়, এমন কি বৃহত্তরভাবে দেশের মধ্যে প্রবাহিত রাজনৈতিক ধারা-উপধারার সঙ্গে। ১৯৪০-এর পরবর্তীকাল। যুদ্ধ বেধে গেছে ইউরোপে। সে যুদ্ধ ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে বিশ্বের চারদিকে। '৪২-এর গোড়াতে এশিয়াতে যুদ্ধ চলছে। জাপান এগুচ্ছে চীনের দিকে এবং বর্মার দিকে। ভারতবর্ষে প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছে। প্রধান ধারার বাইরে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বে দাবি তুলেছে পাকিস্তানের। '৪০-এর মার্চে লাহোরে পাশ হয়েছে পাকিস্তান প্রস্তাব। মুসলিম সমাজের ছাত্রদের মধ্যেও পাকিস্তান আন্দোলন সাড়া জাগাচ্ছে। মুসলিম ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলন সমর্থন করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রগণ বোধ হয় এই প্রথম দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মঞ্চের ঘটনা-দুর্ঘটনা, দাবি প্রতি-দাবির প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে। তারা আন্দোলিত হচ্ছে তার দ্বারা।

বঙ্গদেশ এবং তার রাজধানী কলকাতায় তখন এই রাজনীতিই নানা জটিলতা লাভ করছে। বঙ্গদেশের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক। তিনি এতদিন মুসলিমদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা ঘটেছে। তিনি মুসলিম লীগের বাইরের শক্তি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সঙ্গী করে কলকাতায় আইন পরিষদে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এই মন্ত্রিসভাকেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এবং অনুসারীগণ নিন্দাসূচকভাবে 'হক-শ্যামা' বা 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা বলে অভিহিত করছে। এই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ। পুরাতন ঢাকা তথা ঢাকার স্থানীয় মুসলিম সমাজের ওপর নওয়াব পরিবারের তখনো বিপুল প্রভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্ররা প্রধানত ঢাকার বাইরে থেকে আগত। তাদের বাস ছাত্রাবাসগুলোতে। মোট কথা বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেমন, ঢাকাতেও তেমনি হক সাহেবের মন্ত্রিসভার পক্ষের, বিপক্ষের একটি রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা কলেজের হোস্টেলে আমাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন তারা তখন জরুরিভাবে আবেদন করল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেবের কাছে। হয়ত এটা তাদের কৌশলগত একটা ব্যাপার ছিলো। তারা বলল, যেহেতু তারা হকপন্থী সে কারণে তাদের বিরুদ্ধে এরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। হক সাহেব নাকি কলেজ কর্তৃপক্ষকে এই দণ্ড অবিলম্বে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমাদের হোস্টেলের ব্যাপারটি সাংঘাতিক কিছু অবশ্যই ছিলো না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে যে আমরা যুক্ত হয়ে পড়ছিলাম বৃহত্তর রাজনৈতিক ধারা-প্রতিধারার সঙ্গে, সেটি উল্লেখ করা আবশ্যক।

এমনি সময়ে শোনা গেল হক মন্ত্রিসভার নেতৃবর্গ ঢাকা আসবেন আগামী অত তারিখে। ঢাকায় এপক্ষ, ওপক্ষের যেন সাজসাজ রব পড়ে গেল। মুসলমান ছাত্রদের প্রধান অংশ হক সাহেবের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, মুসলিম লীগ হক সাহেবের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তখন পাকিস্তান আন্দোলনই মুসলমান সমাজের প্রধান আন্দোলন। মুসলিম ছাত্ররা সংগঠিত হলো, ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে হক সাহেবের মন্ত্রিসভার নেতারা যখন নামবেন তখন তাঁদের বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শন করে তাদের বিরোধিতা করা হবে। শহরের মহল্লা সরদারগণ নওয়াববাড়ির নেতৃত্বে সংগঠিত হলো ঢাকা রেলস্টেশনে হক মন্ত্রিসভার সদস্যদের সংবর্ধনা জানাবার জন্য। খুব সম্ভব এই সদস্যদের মধ্যে নওয়াব হাবিবুল্লাহ মাত্র সেদিন কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। আর কেউ নয়। তবু সেদিন স্টেশনে দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়েছিলো।

ঘটনার আগে থেকে ঢাকা কলেজের আমাদের হোস্টেলেও এই সংবর্ধনা প্রতি-সংবর্ধনার ঢেউ এসে লাগছিলো। একদিন দেখলাম হঠাৎ কয়েকটি ছাত্র এসে আমাদের কয়েকজনকে বলল, আগামী অত তারিখে স্টেশনে যেতে হবে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শনে। তারা এমনটি করেছিলো আমাদের হকপন্থী ভেবেই। একথা ঠিক যে, দেশের রাজনীতির ব্যাপারটা আমরা তত বুঝতাম না। এবং সুনির্দিষ্টভাবে সেদিন আমরা হক মন্ত্রিসভার সমর্থক কিংবা বিরোধী হিসেবে দাঁড়াই নি। কিন্তু হোস্টেলের মধ্যে আমাদের নিয়ে ইতোপূর্বে যে ব্যাপার ঘটেছিলো তাতে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আমাদের উপায় ছিলো না। আমরা বললাম: 'প্রতিবাদে যাবো, কি যাবো না, সে আমাদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের ব্যাপার। একথায় আমাদের হোস্টেলের প্রতিপক্ষ দল রুষ্ট হলো।

তাদের এই রোষের প্রকাশ ঐ মুহূর্তে না ঘটলেও ঘটলো সংবর্ধনা প্রতি-সংবর্ধনার সন্ধ্যায়। কারণ ঐ দিন সলিমুল্লাহ এবং ফজলুল হক হলের হক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধী যে ছাত্ররা প্রতিবাদ জানাতে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে গিয়েছিলো তারা তাদের চাইতে দলে ভারি হক-নওয়াবের সমর্থনকারী মহল্লার লোকদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলো। তাদের কালো পতাকা প্রদর্শন তত কার্যকর হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। এবং এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাল তারা ঐ সন্ধ্যায় ফজলুল হক হল এবং সলিমুল্লাহ হলের যেসব ছাত্রকে তারা হক-সমর্থক বলে মনে করল তাদের বিছানাপত্র ওলটপালট এবং ফেলে দেয়ার মাধ্যমে। ফজলুল হক হলে তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো নাজমুল করিম। তাঁর বিছানাপত্র তাঁর প্রতিপক্ষীয়রা ওপর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিলো। এই আক্রমণ আমাদের হোস্টেলেও বিস্তারিত হলো।

কয়েক মাস পরেই আমার আই.এ. ফাইনাল পরীক্ষা। এমন সময়ে হোস্টেলের আবহাওয়া এই সব ঘটনায় পড়াশুনার জন্য প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াল। আমি অবশেষে হোস্টেল ত্যাগ করে আমার বড় ভাই সাহেবের বাসায় চলে যাই। তিনি তখন বরিশাল জেলার নলচিটিতে সাবরেজিস্টার হিসেবে চাকরিরত। সেখানে তাঁর বাসায় বসে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। আমার বড় ভাই হোস্টেলের ঘটনার বিবরণ শুনে আমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মন্তব্য হলো : 'তোমরা হচ্ছ কওমের দুশমন। তোমরা হুমায়ুন কবীরের মতোই ক্ষতিকারণ শক্তি।' বড় ভাই আমার মুরুব্বি। তাঁর সামনে মুখ তুলে কখনো কথা বলিনে। সেদিনও কিছু বলি নি। কিন্তু একটু মজা লাগছিল, তিনি যে আমাকে হুমায়ুন কবীরের নামের সঙ্গে যুক্ত করে আঘাত করছেন, তাই দেখে। কারণ হুমায়ুন কবীরকে আমি ততটা খারাপ কিছু মনে করতাম না। সাংঘাতিক বিদ্বান বলে যেমন তিনি পরিচিত ছিলেন, তেমনি তাঁকে জাতীয়তাবাদী বলে আমি প্রশংসা করতাম।

লাস্টবেঞ্চের আমি

সে যাহোক, মাস দুই পরে পরীক্ষা দিতে যখন ঢাকায় নিজের হোস্টেলে ফিরে এলাম তখন দেখলাম হোস্টেলের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেছে। এমন কি যারা সেদিন সক্রিয়ভাবে আমার বিরুদ্ধতা করেছিলো তাদের মধ্যেও কোনো কোনো সহপাঠী এসে বলল: সেদিন উত্তেজনার মধ্যে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। তুমি সেটা মনে রেখো না।

শান্ত পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা শেষ হলো। সে পরীক্ষা ছিলো ঢাকা বোর্ডের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। ঢাকা বোর্ড তখন ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঢাকা শহরের বাইরের সমগ্র বঙ্গের সব স্কুল-কলেজই ছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পরীক্ষার সিট পড়েছিলো জগন্নাথ কলেজে। কেন্দ্রের কথা মনে পড়লো এই কারণে যে, সেদিন আমি বোধ হয় লজিক পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। সেদিন দেখলাম আমি কিছু লেখার পর থেকেই একজন অধ্যাপক, যিনি পাহারা দিচ্ছিলেন হলে, আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার লেখা দেখতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরেই যদি তিনি চলে যেতেন তাহলে ঘটনাটি মনে দাগ কাটতো না। কিন্তু তিনি প্রায় সারা সময়টাই আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। যেন আমি নকল-টকল করতে না পারি, তার বিরুদ্ধে পাহারা। ব্যাপারটাতে প্রথমে আমি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করলেও কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের লেখায় মগ্ন হয়ে গেলাম। তখন বাংলা বাদে সব বিষয়ের প্রশ্নের জবাবই আমারা ইংরেজিতে দিতাম। যে-অধ্যাপক আমাকে সারাক্ষণ পাহারা দিলেন তিনি যে আমার জবাবদানের দ্রুততায় এবং জবাবের মানে বেশ সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন তাই যেন বুঝিয়ে গেলেন একেবারে শেষ ঘণ্টা পড়ার সময়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে।

পরীক্ষা দিয়ে আবার চলে এলাম বড় ভাইয়ের কাছে। বড় ভাই জিগ্যেস করলেন : কেমন হবে তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট। জিজ্ঞাসার মধ্যেও একটু খোঁচা ছিলো। ভাবটা এমন যে, পড়ার চাইতে অপড়ার কাজেই তো জুটে গেছ। কাজেই কি আর ফল করবে। আমি ছোট কথায় বললাম। পাস নিশ্চয় করব।

তিনি বললেন : আর কিছু নয়?

আমি বললাম : পরীক্ষায় পাস করা ছাড়া আর কি করা যায়?

যা হোক, ছোট-বড়র এমন সংলাপ আর বেশি এগোয় নি।

কিন্তু আমার জবাবে কোনো ক্ষোভ ছিলো না। আসলেই পরীক্ষার ফলাফলে আমার কোনো চিন্তা ছিলো না। একে তো ম্যাট্রিকে স্কুলে দেখেছিলাম মোজাম্মেলকে, যে পরীক্ষায় ভাল ফল করাকেই খারাপ মনে করতো। (মোজাম্মেলের একালের পরিচয় অনেকে জানেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক, এককালের রাজনৈতিক দল আর.এস.পি'র নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং ১৯৬৫ সালে কায়রোতে পিআইএ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত। মোজাম্মেল হক আমার স্কুল সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু)। তাছাড়া একবার যখন ম্যাট্রিকের অঙ্কের বাধা পার হতে পেরেছি কোনো প্রকারে, টায়ে টায়ে, তখন বই পড়াতে আমায় আর আটকায় কে? আর বই পড়ার মত সোজা কাজ আর কি আছে? অন্তত বই পড়া যে তামাক সাজাবার চাইতে সোজা, সে কথাটা আমি জীবনের পাঁচ ছ'বছর বয়সেই বুঝেছিলাম, বাবা যখন বাড়িতে মেহমান কেউ এলে ডাক দিয়ে বলতেন, করিম তামাক নিয়ে আয়। আর তখন সে হুকুমে হুঁকা জোগাড় করতে হতো, হুঁকার কল্কেতে তামাকের দলা পুরতে হতো এবং সেই তামাকে উনুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে হুঁকার মাথায় বসিয়ে মজলিশে নিয়ে হাজির করতে হতো। সে এক কঠিন পরীক্ষা। সে কঠিন পরীক্ষায় বিনা বকাবকুনিতে পাস খুব কমই করেছি। তখনি বুঝেছিলাম এর চাইতে কত সহজ কোরানের বাণীর সুললিত কাব্যিক অনুবাদ পড়া, আর তা পড়ে মা, বোন, চাচা, চাচীকে শোনানো। কত আকর্ষণীয় হাসান-হোসেনের করুণ কাহিনী পড়া, 'বিষাদ-সিন্ধু' থেকে। আহা ইমাম হোসেনের জীবনের শেষ মুহূর্তটি কি করুণ, কি নিদারুণ। 'সীমার ইমাম হোসেনে বক্ষে চাপিয়া বসিয়াছে। সে হোসেনের কণ্ঠে খঞ্জর চালাইতেছে। কিন্তু খঞ্জর হোসেনের কণ্ঠ ভেদ করিতেছে না। ইমাম হোসেন বলিলেন: ভাই সীমার এ জায়গায় তুমি কিছু করিতে পারিবে না। এ জায়গায় হযরত মুহম্মদ মোস্তফা, আমার নানাজান আমাকে চুম্বন করিয়াছিলেন।' 'আর ফোরাত নদীর তীরে এক ফোঁটা পানি না পেয়ে ইমাম হোসেনের পরিবার-পরিজন' বিশেষ করে শিশুদের কি করুণ মৃত্যু। পড়তে পড়তে সত্যি গলা ধরে আসত, চোখে পানি জমত। বাড়ির চাচা, চাচী, বড় ভাই, এরা কেবল ডেকে ডেকে আদর করে বলতেন : করিম তুইতো সুন্দর পড়িস। পড়তো আবার সেই জায়গাটি।

তাই পরীক্ষার ভয় নয়, পড়ার আনন্দই আমাকে আনন্দিত করতো। এই পরীক্ষা পাসের সুযোগেই যখন গ্রামের কৃষক পরিবারের একটি ছেলে আমার পক্ষে ঢাকা কলেজের প্রাসাদ আর হোস্টেলের পাকা ভবনকে নিজের বাড়িতে পরিণত করা সম্ভব হলো তখন আমার চেতন-অবচেতনে আর আনন্দের সীমা রইল না। কলেজ আর হোস্টেল এবং তার শিক্ষকবৃন্দ, সহপাঠী বন্ধুরা হোস্টেলের ওয়ালীউল্লাহ সাহেব, এসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট কফিল উদ্দিন সাহেব এঁরা হয়ে দাঁড়ালেন আমার এই বৃহত্তর এবং নতুন পরিবারের আত্মীয়বর্গ। ক্লাস এইট কিংবা নাইন থেকে হোস্টেল জীবনযাপনে অভ্যস্ত আমি তাই কোনদিনই কলেজ আর হোস্টেল জীবনকে বৈরী বলে ভাবতে পারি নি। এত যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঢাকার বুকে বয়ে গেল, কোনোদিন তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে কোথাও যেতে মন চায় নি। ঢাকার মধ্যে থেকেই ঢাকাকে উপভোগ করার একটি বোধ ছিল মনে।

কয়েক মাস পরে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো। তার খবর পেলাম বড় ভাইয়ের চাকরিস্থানের বাসায় বসে। ঢাকা থেকে আমি তখন দূরে। নিরুদ্বিগ্ন আমার নামে বড় ভাইয়ের 'কেয়ার অবে' হঠাৎ একদিন একটি টেলিগ্রাম এলো ঢাকা থেকে। পাঠিয়েছেন ইউনিভার্সিটির অনার্স ক্লাসের ছাত্র নাজমুল করিম। তাঁর সঙ্গে ইতোমধ্যে সম্পর্কটি আমার অগ্রজ-অনুজের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। টেলিগ্রামে তিনি আমার পরীক্ষার ফল জানিয়েছেন। বুঝলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পরীক্ষার ফলের ব্যাপারে আমার চাইতে তাঁরই আশা—আকাঙ্ক্ষা ছিলো অধিক। সে টেলিগ্রামের মর্ম আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিলোঃ কেবল আমার বড় ভাইয়ের জন্য নয়। আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিলো খোদ আমার জন্যও। টেলিগ্রাম করেছেন নাজমুল করিম : 'ইউ হ্যাভ স্টুড সেকেন্ড ইন দি বোর্ড। হারটি কনগ্রেচুলেশনস': তুমি বোর্ডে সেকেন্ড হয়েছ। আমার অভিনন্দনও নিও। নাজমুল করিম কোনোদিন আমাকে তুমি বলে ডাকেন নি। বলেছেন, 'আপনি'। অথচ আমি তাঁর বয়োকনিষ্ঠ এবং অনুজপ্রতিম। কিন্তু সেকালে সহপাঠীও সহপাঠীকে খুব ঘনিষ্ঠ না হলে আপনি বলে সম্বোধন করতো। কিন্তু আপনি বললেও আমার জন্য নাজমুল করিমের স্নেহ ছিলো অপার। তিনি আজ অকালে প্রয়াত। সেদিনের এই স্মৃতিতে স্বাভাবিকভাবে আমার মনে একটি আবেগের সৃষ্টি হচ্ছে।

টেলিগ্রাম পেয়ে বড় ভাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। তিনি অমনি তাঁর পাড়া-প্রতিবেশীকে খবর দিলেন, যেন আমি মস্ত একটা কাজ করেছি। বিকেলে মসজিদে মিলাদেরও আয়োজন করলেন।

তার কয়েকদিন পরে ঢাকায় পাঠাবার সময়ে হুকুম দিলেন : 'ইংরেজিতে কিন্তু অনার্স নিবে।'

এ হুকুম তিনি করতে পারেন। কি আশ্চর্য অক্লেশে ইংরেজি লিখতে পারেন তিনি। নিজে অনার্স পড়তে পারেন নি। বরিশালের বি.এম কলেজ থেকে বি.এ পাস করে এম.এ পড়তে এসেছিলেন ইংরেজিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, ১৯২৭ সালে। কিন্তু সাংসারিক দৈন্যের কারণে একটি চাকরির সুযোগ পেলে সেই পড়া আর শেষ করতে পারেন নি। অথচ পুরোনো সকল শিক্ষক আর সহপাঠীদের কাছেই তাঁর প্রশংসা শুনেছিঃ 'আহ! মৌজে আলী! খুব ভালো ছেলে ছিলো সে'। তাই বড় ভাইয়ের হুকুম ছিলো ইংরেজিতে অনার্স নিতে। আমি প্রথমে ইংরেজিতেই অনার্স নিয়েছিলাম। পরে তাকে বাদ দিয়ে দর্শন। কিন্তু সে কাহিনী পরে বলা যাবে। পরীক্ষায় ভাল ফল করলে ব্যাপারটা যে কেবল ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত নয়, সেটা ব্যক্তি এবং পরিবারকে ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠান, এমনকি বৃহত্তরভাবে সম্প্রদায়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিংবা সেদিন সেরূপ দাঁড়াতে সেটা বুঝলাম, এই মহাকাণ্ড সেকেণ্ড হওয়ার ব্যাপারটির প্রতিক্রিয়া দেখে, ঢাকা ফিরে এসে। কলেজে যেতে ইংরেজি অধ্যাপক পি.কে রায় গর্বের সঙ্গে হাত ধরে অফিস ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন অধ্যক্ষ এবং অপর অধ্যাপকদের : দেখুন, আমিই একে হদিস করেছিলাম। আমি জানতাম ও ভাল করবে। ও আমাদের কলেজের নাম রেখেছে। কথাটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখলে কিছুটা সত্য বটে। সেকালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাপড়া আর পরীক্ষাতে সত্যেন ভদ্রের অধ্যক্ষতায় জগন্নাথ কলেজই ছিল প্রধান। পরীক্ষায় জগন্নাথ কলেজই ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হতো। কিন্তু '৪২ সালের পরীক্ষায় ঢাকা কলেজ কলা শাখায় সেকেন্ড 'পোস্ট' দখল করেছে, এটা কি কম কথা। এ প্রায় ফুটবলের কম্পিটিশনের ব্যাপার : কলেজে কলেজে। কলেজের দল জিতলো তো কলেজের নাম। ব্যাপারটাতে আমার বেশ মজাই লাগছিলো। কিছুটা অজাতশত্রুরই ব্যাপার ছিলো একটু। সবাই খুশি হলো। এমন কি আশরাফও, সৈয়দ আলী আশরাফ। আসলে অধিক ভালো ছাত্র আশরাফ আর অজিত দে-ই ছিলো। আশরাফ ইংরেজিতে কত দক্ষ। পারিবারিক পরিবেশও উচ্চশিক্ষা আর সাহিত্যের। সৈয়দ আলী আহসানের অনুজ। অজিত দেও ইতিহাসে কত ভালো নম্বর পেত ক্লাসে আর কলেজের পরীক্ষায়। ওরা ক্লাসে বসত ফাস্ট বেঞ্চে। একেবারে অধ্যাপকের চোখের সামনে। আর আমি বসতাম পেছনে, অধ্যাপকদের চোখ এড়িয়ে, যেখানে বসে পাশের বন্ধুর সঙ্গে একটু খুনসুটি করতে পারি আর স্যারকে দু'একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করতে পারি। (এটা বুঝতে পারছি, এ সমস্ত গোপন কথা এই বয়সে, বিশেষ করে মাস্টারি করার অবস্থায়, নিজের ছেলেমেয়ে আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রকাশ করা বুদ্ধির কাজ নয়। তবু কথার টানে কথা আসছে, স্মৃতির টানে স্মৃতি। বাস্তব বিবেচনাবোধ আর থাকছে কোথায়?)। সবচেয়ে খুশি হলো দেখলাম লাস্ট বেঞ্চের হাসিখুশি মেজাজের সুঠামদেহী কামালউদ্দিন। ওরই বেশি টান ছিলো আমার উপর। ওর ডাক নাম ছিলো 'ঠাণ্ডা'। ওই-ই অনেক সময়ে কিছুটা সামনের বেঞ্চ থেকে টেনে আমাকে একেবারে পেছনের বেঞ্চে নিয়ে যেতো। 'আপনি' সম্বোধন করতো না। 'তুমিও' না। করত 'তুই' বলে। বলতঃ 'তোর জায়গা সামনে নয়। সামনে বসবে 'গুড বয়েজ'রা। তুই বসবি আমাদের কাছে আর দেখে দিবি আমাদের খাতা। তুই পড়া নিবি আমাদের। ব্যাপারটা প্রায় তাই ছিলো। কামাল, ওরা যে লেখাপড়ায় খারাপ ছিলো তা নয়। ওরা সমগ্র জীবনটাকে অধিকতর স্বাভাবিকভাবে নিতো। আমি যখনি পারতাম আন্তরিকভাবে ওদের সাহায্য করতাম। বিশেষ করে সেই কামালউদ্দিনের চেহারা আর কথা এত বছর পরেও মনে ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে একটা বেদনাবোধের সঙ্গে। কামালউদ্দিন নাকি মারা গেছেন। একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি তখন আমার পরবর্তী জীবনে, এক পর্যায়ের রাজবন্দিত্ব শেষ করে বেরিয়েছি, পাকিস্তান আমলে। ঘটনাচক্রে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হয়েছি, ১৯৫৫ সালে। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন পথে দেখা কামালউদ্দিনের সঙ্গে। দেখা মাত্র একেবারে জোর করে রিকশায় উঠিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে মার কাছে হাজির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বললঃ 'দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি। আমার কলেজের বন্ধু, সরদার.....।' কামালের বাবা তখন মারা গেছেন। কিন্তু সেদিন অমনি করে ধরে নিয়ে মার কাছে হাজির করে যে পরিচয় আমার সে দিয়েছিলো এবং মা স্নেহযত্নে যেভাবে আপ্যায়িত করেছিলেন এবং তাতে কামালউদ্দিনের আন্তরিকতার যে প্রকাশটি ঘটেছিলো, তাতে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

কেবল কলেজের নয়, নাজমুল করিম, দেখলাম, তাঁর দলের একটি ছেলের এমন ভাল ফলকে তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের কাছে একটি 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে উপস্থিত করলেন। দেখ, আমার ছেলেরাই ভালো করে, তারা খারাপ করে না। হোস্টেলের এসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট কফিলউদ্দিন সাহেব সত্যই আন্তরিকভাবে আমাদের, অর্থাৎ কেবল আমার ফলে নয়, আমাদের 'দুষ্টু' দলটির লুৎফুল করিম, আবুল কাসেম, মোজাহার—সকলের রেজাল্টেই খুশি হলেন। সুপারিনটেনডেন্ট ওয়ালীউল্লাহ সাহেব আমাদের ওপর একটু খাপ্পাই ছিলেন। আমাদের প্রতি তাঁর সব আচরণ কফিল উদ্দিন সাহেবের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতো না। তাই আমাদের জন্য কফিল উদ্দিন সাহেবের যথার্থই একটি মানসিক সহানুভূতি ছিলো।

ঢাকা কলেজের স্মৃতির কথা এখানে শেষ করতে গিয়ে নিজের মনে কেবল একটি বোধই জাগছে। যে কলেজ একদিন আমার অপরিচিত এবং বিস্ময়ের জগৎ বলে বোধ হতো, সে কলেজ, তার হোস্টেল এবং পরিবেশ আর একদিন যথার্থই আমার অস্তিত্বের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ঢাকাতে তখনো কলেজের পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে কলেজের সঙ্গে কোনো বিচ্ছেদবোধ জাগত না। কারণ ঢাকাতেই ইউনিভার্সিটি। আর আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে যে 'অনভিজাত' তথা কমনারের হল অর্থাৎ ফজলুল হক হলে জায়গা নিলাম সে ফজলুল হক হলও আমার অপরিচিত ছিলো না। সে পরিচয়ের সূত্র ছিলেন নাজমুল করিম এবং তাঁর অপর সহপাঠীরা। এবং তাঁর সহপাঠীদের অন্যতম ছিলেন রবি গুহ।

সিনেমা বিশারদ

এই স্মৃতিচারণের একটি জায়গায় সে যুগে সারারাত জেগে সিনেমা দেখার 'পাপের' কথা যখন আজকের নিজের ছেলেপিলের কাছে একবার বলেই ফেলেছি তখন সেকালে কত সিনেমা দেখেছি তার একটি লিস্টিই দিয়ে দিই। তালিকাটি পেলাম ছেঁড়াখোঁড়া প্রায় ৪৫ বছর পুরোনো একটি খাতার পৃষ্ঠায়। এ লিস্টি দেখে আমার নিজের তো এখন গর্বই হয়। আর কিছু না হোক, সেদিনকার একজন 'সিনেমা এক্সপার্ট' বলে তো নিজেকে দাবি করতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান কথা, রক্ষিত এই লিস্টি থেকে বাংলা ছায়াছবির সেই কৈশোরকালের চিন্তা-ভাবনা, আকর্ষণ রুচির কিছু শিরোনাম একালের মানুষ পেতে পারে। সেজন্যই তালিকাটির এই উদ্ধৃতি। সেকালে যে দু'একটি ইংরেজি ছবি আসত তার নামও দেখছি খাতাটিতে মেলে। তাই তাও তুলে দেয়া হলো। সংখ্যাগতভাবে প্রায় 'সেঞ্চুরি'। সংখ্যার ক্রম না দিয়ে কেবল শিরোনামগুলো দিচ্ছি; মুক্তি, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, দিদি, অভিনয়, টারজানকি বেটি, খনা, অভিজ্ঞান, অচ্ছুৎ কন্যা, রিক্তা, দেবদাস, গৃহদাহ, পুকার, সাপুড়ে, গোরা, পরপারে, পায়ের ধুলো, পথের শেষে, বড়দিদি, রজত জয়ন্তী, অধিকার, অভিনেত্রী, শুকতারা, জীবন-মরণ, দুশমন, যখের ধন, সাথী, পথভুলে, ঘরকি রানী, ডাক্তার, তরুণী, কলঙ্ক ভঞ্জন, মাদার ইন্ডিয়া, দি লায়ন হ্যাজ উইংস, লাইফ অব এমিল জোলা, দি ম্যান দে কুড নট হ্যাং, ক্রিমিন্যাল অব দি এয়ার, টাইফুন, শাপমুক্তি, দেশের মাটি, হাতেখড়ি, শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, সোনার সংসার, রেবেকা, স্বামী-স্ত্রী, ভালবাসা ও মায়ামৃগ, শিবরাত্রি, পুনর্মিলন, পরিচয়, খাজাঞ্চী, বিজয়িনী, গ্রহের ফের, চাণক্য, অমরগীতি সার্জেন্ট ম্যাডেন, দি বিস্ট অব বারলিন, পথিক, ঠিকাদার, পরশমণি, রমা, কয়েদী, জেইলর, রাজকুমারের নির্বাসন, দি রেইনস কেইম, দি কোর্ট ড্যান্সার, রাজনর্তকী, মায়ের প্রাণ, উত্তরায়ন, আজাদ, পড়শী, প্রতিরোধ, অভয়ের বিয়ে, স্কুল ডেজ অব টম ব্রাউন, গ্রেট কম্যান্ডমেন্ট, কৃষ্ণপ, জীবন প্রভাত, দি বার্থ অব এ বেবী, নন্দিনী, বন্দী, শেষ উত্তর, দি স্পিরিট অব দি জারমানস নিয়ার মস্কো, প্রিয় বান্ধবী, ভীষ্ম, বন্ধন।

এবার শুনে দেখুন! না! প্রায় ৪৫ বছর আগেকার জীবনের এদিক-ওদিকে দৃষ্টিক্ষেপকারী সেই কিশোর ছাত্রটিকে আমার খুব যে খারাপ লাগছে, এমন বলতে পারিনে। বরঞ্চ একটু মমতা জাগছে এবং কৃতজ্ঞতাও। অন্তত তার খাতায় সিনেমা দেখার 'পাপের' এই সাক্ষ্যটি তুলে রাখার জন্য।

সোমেনের হত্যাকাণ্ড এবং সেকালের এক কিশোর মনের প্রতিক্রিয়া

একালের প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যকর্মীদের কাছে সোমেনকে পরিচিত করার দায়বদ্ধতা থেকে আমি কিছু যে না লিখেছি, তা নয়। কিন্তু সেকালের কথা আমার স্মৃতিতে তত সজাগ নেই। সে এখন ঝাপসা হয়ে গেছে। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ, অসামান্য সম্ভাবনার আকর, রেলশ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, তরুণ লেখক সোমেন চন্দ একটি শ্রমিক মিছিল পরিচালনাকালে প্রতিপক্ষীয়দের দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। আমি তখন আই.এ পরীক্ষা পাস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটির দরজায় মাত্র পা রেখেছি। প্রগতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখক সঙ্ঘের সাথে তখনো হয়ত হৃদ্যতা ততো তৈরি হয় নি। সোমেনের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনাই হয়তো চুম্বকের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীদের আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিলো প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে, আলোচনায়, ক্রিয়াকর্মে। আমার ভাগ্য যে, আমিও সে আহ্বানের বাইরে সেদিন থাকতে পারি নি। কিন্তু ঘটনা হিসেবে তার কোনো স্মৃতিকে টেনে তুলতে পারছিনে। আকস্মিকভাবে দেখলাম, কলকাতা থেকে এ যুগে, ১৯৭৩ সালে দিলীপ মজুমদারের সম্পাদনায় দু'টি খণ্ডে' সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র' নামে যে সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়েছে তার একটির মধ্যে সেকালে সোমেনের গল্পসংগ্রহ 'সঙ্কেত'-এর ওপর আমার একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন : "প্রতিরোধ পত্রিকায় (১৩৫০ : ১৯৪৩ : সোমেন স্মৃতি সংখ্যা) সরদার ফজলুল করিম 'সঙ্কেত' নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করেন সেই প্রবন্ধেও 'সোমেনের সঙ্কেত ও অন্যান্য গল্প' সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য, এতে একজন সমসাময়িক মুসলিম লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমিক কম্যুনিস্ট সোমেনকে তাঁরাও চিনতে পেরেছিলেন। ভালোবেসেছিলেন তাঁকে।"

সেকালের একটি কিশোরের প্রতিক্রিয়ার স্মারক হিসেবে লেখাটির খানিকটা গুরুত্ব এখনো আছে বলেই সম্পাদক পুনর্মুদ্রিত করেছেন। লেখাটির সাহিত্যিক গুণাগুণের কথা নয়। সেই ইতিহাসের আভাস হিসেবে লেখাটিকে এখানেও প্রকাশ করা যায়।

"১৯৪২ সালের মার্চ মাসে সোমেন চন্দ যখন নিহত হয়, আমাদের মুসলমান ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ তখন নিজেদের নেতৃবৃন্দের মান-অপমানের পরিমাণ নির্ধারণ লইয়া ব্যস্ত। কোনো বিশিষ্ট নেতাকে পুষ্পমাল্য প্রদান বা অপর কাহাকেও কালো পতাকা প্রদর্শন, ইহাই ছিলো আমাদের রাজনীতির তখনকার বৈশিষ্ট্য। আমাদের সেই চেতনাহীন অবস্থাতে সোমেন চন্দের মৃত্যুকে আমরা হয়তো ঠিকভাবে দেখিতে পারি নাই। এমনি সময়ে শুনিয়াছিলাম সোমেনের মৃত্যুর কথা। ঢাকা শহরের চির পুরাতন দাঙ্গা ব্যতীত সেইদিন তাহাকে কিছু ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি সেই অবস্থাতেও পরিচিত-অপরিচিত কাহারো কাহারো মুখে সোমেন চন্দের মৃত্যু—সংবাদের সাথে বক্রহাসি দেখিয়া সন্দেহ জাগিয়াছিলো।

'তাহার পরে বাহিরের আলোবাতাসে আসিলাম—বক্রহাসি সেদিন কাহারা হাসিয়াছিলো, কেনো হাসিয়াছিলো পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। সোমেনের কাহিনী তো পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নহে। জীবনের কল্যাণের বিরোধী গুণ্ডার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দল অনেক সোমেনকে হত্যা করিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের জয়কে ওরা রোধ করিতে পারে নাই। সেদিনও কাপুরুষ ফ্যাসিস্ত গুণ্ডার দল সোমে কে হত্যা করিয়া সোমেনের জীবনের আদর্শকে নষ্ট করিতে পারে নাই। তাই অ.জ যদি দিনের আলোতে তাদের কারুকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে জোরগলায় বলিতাম : সোমেনের সঙ্কেতধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে—তোদের দিন শেষ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, দিনের আলোয় আজ আর উহারা বাহির হয় না—পৃথিবীর জনগণের অগ্রগতির প্রতিটি শক্তিতরঙ্গ ওদের বুকে শেল হানিয়াছে—চোরা গর্তে উহারা আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়াছে। তাই আজকাল নিশাচরের বেশে ওদের দুর্বল ছোবল ওদের বিলোপের আভাস দেয়।

"সোমেন চন্দ যখন মারা যায় তখন তাহাকে চিনিতাম না—চিনিবার পর্যায়ে তখন ছিলাম না। সোমেনকে চিনিলাম তাহার 'সঙ্কেত ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ হইবার পরে। বইখানা হাতে লইতে প্রথমে সঙ্কোচ ছিলো যথেষ্ট-অবহেলাও সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের বাজার বাংলা গল্প উপন্যাসে ভরিয়া গিয়াছে—এত বই! কত আর পড়া যায়? আর নিছক একই সুরের বিভিন্ন দুর্বল প্রকাশ। তাই সোমেনের 'সঙ্কেত' হাতে আসার পরেও অনেকদিন যাবৎ অপঠিত হইয়া পড়িয়াছিলো।

"তাহার পর সত্যই 'সঙ্কেত' একদিন পড়িতে আরম্ভ করিলাম। 'রাত্রিশেষ' সঙ্কেতের প্রথম গল্প। বৈষ্ণবদের আখড়ার কাহিনী। পড়িতে আরম্ভ করিয়া তেমন ভাল লাগিল না। পড়িতে পড়িতে কিছুদূর যাইতে একখানে টের পাইলাম, নিজের অজ্ঞাতে ভাল লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। সোমনে একস্থানে চাঁদিনী রাতের বর্ণনা করিতেছে। '... আজ এতোক্ষণে মাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। বনানী কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। পায়ে হাঁটা সাদা পথ টুকরা জ্যোৎস্নায় মনোরম। সৌন্দর্য আহরণের নেশায় চোখ বুজিয়া আসে—পা ফেলা মন্থর—দেহ শিথিল...' দেখিলাম আমার অবহেলায় ভাঙন ধরিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম কয়েকটি মাত্র লাইনে বেশ তো বর্ণনাটি দিয়াছে। পিছনের পাতা উল্টাইয়া সোমেনের জন্ম-মৃত্যুর তারিখটা দেখিতে ইচ্ছা হইলো। দেখিলাম জীবনের পরিধি মাত্র বাইশ বছর। চমক লাগিল। এ গল্প তাহা হইলে নিশ্চয়ই ষোল সতের বছর বয়সে লেখা। আহা, লেখাটার যদি তারিখ থাকিত। গল্পটা শেষ করিলাম। কাহিনীর তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নাই, কিন্তু সংযত হাতের প্রকাশ-ক্ষমতা যেভাবে গল্পটার শেষের দিকে এক জায়গায় সোমেন গাঢ় সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার বর্ণনা দিয়াছে—'... বাহিরে অন্ধকার আরো গাঢ়তায় চাপিয়া আসিয়াছে। একটানা ঝিঁঝিপোকার শব্দ। কিছুদূরে কামার বাড়ির লোহা ঠুকিবার আওয়াজ...' চমৎকার লাগিল। লাইন তিনটি পড়িতে যাইয়া আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের বাড়ির বিশিষ্ট একটা জায়গার কথা মনে পড়িল, যেখানটায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার সময়ে কামার বাড়ির লোহা ঠোকার শব্দ ঠিক শোনা যায়। তিন লাইনে সোমেন সব ছবিটা আঁকিয়া দিল! আজ আবার লাইন তিনটার পানে চাহিয়া সোমেনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, যে সম্ভাবনাকে গুণ্ডা পশুর দল বর্বরভাবে হত্যা করিল, সেই সম্ভাবনার ছবিকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। দ্বিতীয় গল্প 'স্বপ্ন' ও 'রাত্রি শেষ' এর সুরেই লেখা—কিন্তু এখানে গল্পটির মধ্যে উপমা শক্তির নতুনত্বের যেমন খবর পাইলাম, তেমনি তাহার দরকার মত কাহিনীর মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির অদ্ভুত হাতেরও স্পর্শ অনুভব করিলাম। এই গল্পে একখানে সোমেন রাত্রিকে বলিয়াছে 'সাপের দেহের মত পিচ্ছিল নিস্তব্ধ'। এবার বইখানা দরদের সহিত জোর করিয়া ধরিলাম—সোমেন গতানুগতিক নয়, সোমেন নতুন পথের যাত্রী।

"তাহার পরে 'একটি রাত'। প্রায় এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া কেবল খুঁজিতে লাগিলাম যদি গল্পটার রচনার তারিখটা পাইত পারি—যদি আগের দুইটা গল্পের সাথে এই গল্পের সময়ের ব্যবধানটা ও অবস্থা নিরূপণ করিতে পারি। সেদিন পারি নাই। আজো জানি না সোমেন 'রাত্রি শেষ' ও 'স্বপ্ন' কবে লিখিয়াছিলো—ইহার পরে তাহার মনে ভাবের বন্যা কিভাবে বহিয়াছিলো। সঠিক জানিতে পারি নাই। কিন্তু আভাস পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত নির্মল ঘোষকে লিখিত সোমেনের যে ক'খানি চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একখানে ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে সোমেন এই বলিয়া লিখিল : 'গ্রামের অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর, এমন কী যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন, বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি। কিন্তু ওসব পুরানো হয়ে গেছে—এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। বছরখানেক আগে সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কোনোই পথ খুঁজে পেতাম না—এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে।' ১৮ বছর বয়সে সে এই চিঠি লিখিয়াছিলো। কাজেই এরও দুই এক বছর আগে হয়ত লিখিয়াছিলো 'স্বপ্ন' ও 'রাত্রি শেষ'। তাই আজ কেবল সোমেন সম্বন্ধে মনে হয়, জীবনের গতি কত সবল ও দ্রুত হইলে ঐ সময়ে এই বয়সে, এই দৃষ্টিভঙ্গি রূপ পাইতে পারে। ... গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সুকুমার। সাম্যবাদে বিশ্বাসী সে—তার কর্মীও। ঘরে শুধু বৃদ্ধা মা। ঘরের অভাব-অভিযোগ কত স্পষ্ট—কিন্তু সুকুমারের কর্মে বাধা নাই—'সুকুমারের কাছে কতো লোক যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। সারাদিন ডাকাডাকি লেগেই আছে। সর্বদা যারা আসে তাদের মধ্যে গ্লাস ওয়ার্কসের সামসুর একজন... ।' বৃদ্ধা মা ছেলের কাজকর্ম দেখিয়া চোখের জল ফেলেন—কিন্তু ছেলের জন্য তৃপ্তি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অনুভূতি তা্হার মনকেও ভরিয়া তোলে। ... এই সুকুমারের জীবন কাহিনী—বিশেষ ক'রিয়া তাহার একটি রাতের কথা, যে রাত্রিতে পুলিশ আসিয়া সুকুমারের বাড়ি ঘেরাও করিল। তাই সোমেন শুধু নতুন পথের যাত্রীই ছিলো না—সে ছিলো নতুন দিনের অগ্রদূত—আমাদের দেশে তার প্রথম বীর সৈনিক। ইহার পরের গল্প তিনটি 'সঙ্কেত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর'।

'এক রাত্রি'তে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের সাক্ষাৎ পাইলাম; শেষের এই গল্প তিনটি তাহারই উন্নততর ও পূর্ণতর প্রকাশরূপ হইয়া রহিয়াছে। 'সঙ্কেত' ও 'ইঁদুর' দুইটিই বড় গল্প। 'ইদুর' সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ অসঙ্কোচে শিল্পের উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন। সোমেনের শক্তির প্রমাণের ইহার পরে আর প্রয়োজন হয় না। 'ইঁদুর' ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাদেশিক গল্পে পরিণত হইয়াছে। ঢাকার সোমেন আজ শুধু বাংলার সোমেন নয়—সে আজ ভারতের সোমেন। 'ইঁদুর' গল্পের প্রথম পাঠে আমার মনে যে তৃপ্তির শিহরণ জাগিয়াছিলো, তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার জন্মায় নাই। তাহার কতকগুলি জায়গা ভুলিতে পারি না—কেবল পড়িতে ভাল লাগে। গরিব মধ্যবিত্ত পরিবার। সোমেনের নায়ক গরিব মা-বাপের মধ্যে সন্ধ্যার পূর্বে মান-অভিমান হইয়াছিলো! গভীররাত্রে ইঁদুরের উৎপাতের মধ্যে তাহাদের মান ভাঙনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। সোমেনের নায়ক এইখানকায় বলিতেছে: 'বাবা মাকে ডাকলেন নাম ধরে। ভারি চমৎকার মনে হলো—মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম—আর আমার প্রতি ভালবাসা কামনা করতে লাগলাম তার কাছ থেকে... ।' কিন্তু এই স্থানটি! সোমেনের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সংযত নায়কের মনের অবস্থার কি অভিনব প্রকাশ: 'মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম .... ।' সোমেনও ছিলো গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখময় কাহিনী— সেই দুঃখের সংসারেও নব জীবনের যে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হইতেছে, তাহার এমনি সরস মধুর সাহিত্যিক প্রকাশ আর কি কোথাও পাইয়াছি? তারপর সেইখানটা, সোমেনের নায়ক (এটি সোমেন নিজে?) রেল ইউনিয়ন হইতে ফিরিয়া আসিতেছে—মজুর, ইয়াসিন, সুরেন—সোমেনের আপন-জনের মধ্য হইতে সোমেনের নায়ক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিতেছে: 'আমি ফিরে এলাম। সাম্যবাদের গর্ব—তার ইস্পাতের মতো আশা তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলাম..... ।'

'সঙ্কেত' গল্পটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করা প্রয়োজন। 'সঙ্কেত'-এ সোমেনের সাহিত্যিক শক্তি। কতখানি প্রকাশ হইয়াছে তাহাই একমাত্র বিচার্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নহে। কিন্তু সেদিক দিয়া বলিতে গেলেও গ্রামের অধিবাসী ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের পরিচয় ও তাহার সাহিত্যিক প্রকাশ 'সঙ্কেতে' আছে। কিন্তু সঙ্কেতের অপর যে দিকটা, সে আমাদের দেশের সর্বহারা মজুর ও কিষাণদের জাগরণের সঙ্কেতধ্বনির প্রকাশ। ... কোন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়াছে। মিলের মালিক তাহাদের ধর্মঘট শক্তিহীন করিয়া দিবার জন্য দূর গ্রাম হইতে লোভ দেখাইয়া কৃষকদের লাইয়া আসিয়াছে। নতুন সংগৃহীত শ্রমিকগণ মিলের মধ্যে ঢুকিতে যাইতে কলের ধর্মঘটি মজুরগণের নেতা তাহাদের বুঝাইয়া বলিতেছে যে, যেন তাহারা তাহাদেরই ভাইদের মুখের ভাত কাড়িয়া না লয়—দুঃখ-দুর্দশা তাহাদের উভয়েরই সমান—উভয়ের উপরই শোষণ সমানভাবে চলিয়াছে—মিলের ম্যানেজার হতভম্ব হইয়াছে কি করিতে সে কি করিল? শ্রমিকের শক্তি সে আরো জোরালো করিয়া দিলো। সোমেনের 'সঙ্কেত', কৃষক মজুরের একতাবদ্ধতার যে সঙ্কেত আমরা আমাদের দেশে পাইতেছি তাহারই প্রকাশ।

'দাঙ্গা' সম্বন্ধে কোনো বিশেষণই বোধ হয় যোগ্য হইবে না। ঢাকা শহরের ১৯৪০-৪১ সালের দাঙ্গার সময়ে প্রায়ই ঢাকাতে ছিলাম। সোমেনের 'দাঙ্গা' পড়িয়া শেষ করিয়া আবার সেই অবস্থা সুস্পষ্ট মনে পড়িল—সেই 'আল্লাহু আকবার' 'বন্দেমাতরম'-এর মুহুর্মুহূ ধ্বনি—বাড়িকে বাড়ি পোড়াইবার সেই অমানুষিক দৃশ্য। সোমেনের এই গল্প সেই সময়ে হয়তো কোথাও প্রকাশ হয় নাই—হয়তো এই বইতেই ইহার প্রথম প্রকাশ—নচেৎ দেশের সেই দুর্দিনে বাংলার সাহিত্যিক জগৎ ঢাকার অবস্থা সম্বন্ধে নিছক নিস্তব্ধ! প্রতিবাদের শব্দ কাহারো লেখনী হইতে তখন বাহির হয় নাই—কোনো সমাজেরই না—না হিন্দু, না মুসলমান। হয়তো একমাত্র সোমেনের হাত হইতে বাহির হইয়াছিলো সমবেদনা ও প্রতিবাদের এই তীক্ষ্ণবাণ। 'দাঙ্গা'র একটা স্থান—সোমেনের নায়ক অশোক দাঙ্গার বিরোধিতা করে, তাহাতে তাহার ছোট ভাই অজয় ক্ষেপাঃ অজু কর্কশ স্বরে বললে, 'তোমরা তো বলবেই'—আবার মৃদু স্বরে—'তোমরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়।' নায়ক অশোক জবাব দিলঃ 'আমরা ইহুদির বাচ্চা নারে?' তাহার পর আর একস্থানে—মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, 'আগামী নূতন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি—তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানর সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে। সেজন্য আমার গর্বের সীমা নেই। আমি জানি আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে—প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম—আমার কোনো ভয় নেই।' পড়িয়া ভাবিলাম দেশকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহার জনগণকে কতখানি দরদ দিয়া ভালবাসিলে লেখক এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক হইতে পারে—তাহাদেরই জন্য শহীদ হইতে পারে। আর আমাদের দেশের যাহারা সাহিত্যের পবিত্র প্রাসাদে বসিয়া মনে করেন, দেশের জনগণের সমস্যা লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না—দেশের সমস্যাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়া মানে প্রোপাগান্ডা করা, তাহারা অন্ততপক্ষে সোমেনের 'দাঙ্গা' পড়িয়া দেখিতে পারেন।

টর্লার ও রালফ ফক্সের জীবনী পড়িয়া সোমেন একদিন লিখিয়াছিলো : 'ফক্স সবচেয়ে গৌরবজনকভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে—কিন্তু যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকত!' আজ সোমেনের স্মৃতিবার্ষিকী উদযাপন করিতে যাইয়া তাহার নিজের কথাই তাহার সম্বন্ধে কেবল বলিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকত! তবু সোমেন আজ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা হতাশ হইব না। সোমেনের মৃত্যুদিনে মুষ্টিবদ্ধ হাতে আমরা আজ এই প্রতিজ্ঞা লইব, যেন তাহার আদর্শের বীজ লক্ষ কোটি হইয়া আমাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে; জীবনের যে ইঙ্গিত সোমেন তাহার জীবনে পাইয়াছিলো—আজ যাহার সুস্পষ্ট আভাস সোমেনের ও হাজার লক্ষ জনগণের রক্তের মধ্যে দিয়ে আমাদের দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠা যেন আমরা করিতে পারি—কেননা একমাত্র তাহার প্রতিষ্ঠাতেই হইবে সোমেনের জীবনের নব প্রতিষ্ঠা।"

'দি রুটস'

গাছের শক্তি শেকড়ে। মাটির কত গভীরে তার শেকড় গেল তাতে। কথাটা মনে পড়েছে, আমার বাসা থেকে নিউমার্কেটের পথে যে দুটো গাছ দেখেছিলাম কয়েকদিন আগেও, সামান্য ঝড়ের আঘাতে তাদের পড়ে যেতে দেখে। ঝড়ের পরেও রাস্তায় গাছ দুটো শুয়ে ছিলো। গোড়ার দিকে চাইতে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আরে! এর যে শেকড়ই নেই। এ দাঁড়িয়ে ছিলো কি করে এতদিন! এটাই বিস্ময়। বৃহৎ বৃক্ষ যেগুলো, যেগুলো বড় ঝড়েও পড়ে না, তার ডালপালা ভাঙলেও সে যে আমূল উল্টে যায় না, তার কারণ তার শেকড়ের গভীরতা। স্বর্ণলতার কথা অবশ্য আলাদা। স্বর্ণলতা, সোনার মতো রং। তাই বোধ হয় স্বর্ণলতা। আমরা গ্রামে থাকতে বলতাম, শূন্যলতা। শূন্যলতা অবশ্য গাছ নয়, লতা। কিন্তু যথার্থই শূন্য। শেকড়বিহীন। ওর বাঁচন ও বৃদ্ধি অন্য গাছকে শোষণ করে। কিন্তু তবু তারও বিপদ আছে। যাকে শোষণ করে এমন সোনার রং, সে যদি উল্টে যায়, তবে তারও শেষ। এমন কি, সে যদি ঝেড়ে ফেলে দেয় নিজের গা থেকে এমন পরভোজীকে তবু তার শেষ।

মানুষের বেলায় কি ব্যাপারটা আলাদা? না। তা নয়। মানুষেরও শক্তি তার শেকড়ে। ব্যক্তি বা জাতি যেভাবেই দেখিনে কেনো, শক্তি তার শেকড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত গভীরে সে প্রবিষ্ট হয়েছে, তার ওপর। মানুষের শেকড়ের মাটি কেবল আক্ষরিক অর্থে মাটি নয়। মানুষের শেকড়ের মাটি তার অভিজ্ঞতা, তার ইতিহাস, তার অতীত। যার অভিজ্ঞতা নাই, ইতিহাস নাই, অতীত নাই, সে শেকড়হীন, প্রায় শূন্যলতার মতো। যে মানুষ, ব্যক্তি বা জাতি হিসেবে ঋদ্ধ হতে চায়, কিংবা যদি সে পতিত হয় সঙ্কটে, তবে তার উচিত অন্বেষণ করা তার শেকড়ের। দেখা, কত দূর গেছে সে শেকড়। আর এই চেষ্টাতেই তার শেকড় গভীর থেকে গভীরে চলে যেতে বাধ্য। নিজের আত্মবিশ্বাসে সঙ্কটের সমাধানের অস্থিরতায় জিজ্ঞাসা যদি জাগে, সন্ধান করো তোমার শেকড়ের।

আমিও তো জানিনে আমার শেকড় কোথায়? কি দিয়ে তৈরি হয়েছি আমি। চল্লিশ সালে যে কিশোরটি এসেছিলো একেবারে 'বিদেশ' এক ঢাকায়, তারও তো কিছু শেকড় ছিলো তখনো। কিছু পূর্বকাহিনী। কিছু মালমশলা, পরিবেশ। সুতোর টানে তাও আসে। তাকেও আনতে হয়। জানতে হয়। সেই বোধ থেকে এতদিন পরে গেলাম নিজের বড় ভাইয়ের কাছে, যিনি বেঁচে আছেন এখনো। একদিন ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস হতো না। কিন্তু স্নেহশ্রদ্ধায় দু'জনে প্রায় বন্ধুর মতো। গেলাম তাঁর কাছে পুরনো দিনের কিছু কথা জানতে। আমার ভাল লেগেছিলো তাঁর সঙ্গে সেদিনের এই আলাপটি, মাত্র অল্পক্ষণের। সেই সাক্ষাতের রোজনামচাটিই বরঞ্চ তুলে দিই।

১৩.৭.৮৩ : গুলশানের কাছেই বনানী। ছোট ছেলে তিতুকে সঙ্গে করে গুলশানে বড় বোনের কাছে বিদায় নিয়ে বনানী এলাম। বনানীতে বড় ভাই একটি ছোট বাড়ি করেছেন। চাকরিজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি অবসর নিয়েছেন। সেও অনেক বছর হয়ে গেছে। সাবরেজিস্ট্রার এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উভয় পদমর্যাদায় বিভিন্ন স্থানে, পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরেও কিছুকাল নানা দায়িত্ব সততা এবং শ্রমের সঙ্গে পালন করেছেন। চাকরিজীবনে তাঁর সততার নানা ঘটনা পরিচিতজনদের কাছে প্রবাদ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। চাকরির কোনো এক স্থলে প্রতিবেশী কোনো এক সহকর্মীর কাছ থেকে নাকি সেলাইকরণের জন্য সুই এনেছিলেন একটি, ধার করে। বদলির সময়ে ভুলে ফেরত দেওয়া হয় নি ধার করা সেই সুই। তাতেই মনে শান্তি আসে না। খামে করে চিঠি লিখলেন সহকর্মীকে নতুন জায়গা থেকে এবং খামের মধ্যে ধার করা সেই সুচটি পাঠিয়ে দিলেন সহকর্মীকে। আমাদের কাছে অতিরিক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর কাছে একেবারে ফরজ। নিজের চোখে দেখেছি, প্রৌঢ় বয়সে যখন বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছেন, একটি জেলা মিউনিসিপ্যালিটি শাসনের। তখন সেই শহরের টাউন হলের বিদ্যুতায়নের সাজ-সরঞ্জামে যেন না কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজে দূর ঢাকা শহরে এসে হেঁটে হেঁটে দোকানে দোকানে ঘুরে বাল্ব, তার, সুইচ, কাঠি, বকস্ দর দস্তুর করে ক্রয় করেছেন। সে সব বাক্সবন্দী করেছেন। কুলির মাথায় চাপিয়ে লঞ্চে উঠিয়ে নিজে নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করে টাউন হলের ইলেকট্রিকের কাজ সমাধা করেছেন। সাবরেজিস্ট্রার যখন ছিলেন, তখন দু'পয়সা উপরি আয়ের কর্মচারিরা অসুবিধায় পড়ত তাঁর অফিসে। তিনি অফিসে নোটিশ টানিয়ে দিতেন, সরকারি নিয়মের বাইরে কেউ কিছু দাবি করলে দলিল করার জন্য আগত ব্যক্তিগণ যেন সরাসরি তাঁর কাছে অভিযোগ করেন। অথচ রেজিস্ট্রি অফিসের সুপরিচিত রেওয়াজ ছিলো (এবং আজো আছে) কেনা-বেচার দলিলের ব্যাপারে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত কর্মচারিগণ উপরি গ্রহণ করে।

এই কথা বলতে আমার আকস্মিকভাবেই মনে পড়ে গেল আমার একেবারে শিশুকালের কথা। আমার বড় ভাই তখনো নিজের সংসার করেন নি। চাকরিজীবন হয়ত মাত্র শুরু করেছেন। আমি হয়ত বাল্যশিক্ষা শেষ করেছি। শ্রেণী হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণী বলা চলে। মিয়াভাই (বড় ভাইকে আমরা মিয়াভাই ডাকতাম) তখন বরিশাল জেলার পিরোজপুরের মধ্যকার নাজিরপুরের সাবরেজিস্টার। ডাকবাংলো ধরনের লাল টালির ঘরটি আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি। সামনে অদূরে নদী বয়ে যাচ্ছে। বড় বড় পেডাল অর্থাৎ চাকাওয়ালা স্টিমার। যাত্রী কিংবা মালটানা স্টিমার। আমি বলতাম জাহাজ। সামনের নদীর বুক দিয়ে এই জাহাজ যাতায়াত করে। নাজিরপুর স্টেশন পৌঁছার আগে গম্ভীর গলায় দীর্ঘ ভোঁ করে দু'বার আওয়াজ দিতো। অফিস বাংলোর সামনে বড়ো মাঠ। পাশে একটা জোঁকভরতি পুকুর। তারও একটু পরে আর একটা 'রিজার্ভ' পুকুর। এই পুকুরের পানি সবাই খায়। গোছল করা, কাপড় কাচা এতে নিষিদ্ধ। আর একটু দূর নদীর পারে পোস্টঅফিস। তারও পরে পুলিশের থানার দালান। নদীর ওপারে হাট। হাটের পারেই স্টিমার ভিড়ে এবং ওখান থেকে মোড় ঘুরে ফিরে চলে যায়। আহা! কি সুন্দর ছবি। মনে হয়, সেই জায়গাটিতে, সেই বয়সটিতে আমার বড় ভাইয়ের কাঁধে চড়ে চলে যাই! কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। কাঁধে চড়ার কথাটা আক্ষরিকভাবেই সত্য। সেবার হয়ত ১৯৩০ কিংসা ১৯৩১-এ মিয়াভাই এসেছিলেন ছুটিতে বাড়িতে। ছুটি শেষে রওনা হলেন সন্ধ্যার সময়ে আমাদের গ্রাম আটিপাড়া ছেড়ে উজিরপুরের দিকে। হেঁটে যাবেন উজিরপুর। সঙ্গে ছিলো তাঁর অফিসের চাপরাসি, ফজল মিয়া। মিয়াভাইয়ের এই এক গুণ। যেখানেই কাজ করেছেন, অফিসের কেরানি, কর্মচারি, নিম্নপদের পিয়ন—সবাইকে আত্মীয়ের মতো আপন করে নিয়েছেন। একবার কারুর সঙ্গে দায়িত্বের ক্ষেত্রে পরিচয় ঘটেছে তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাজীবন সে পরিচয় সজীব রয়েছে। আঘাত বা শত্রুতামূলক সম্পর্ক কারুর সঙ্গে তাঁর তৈরি হয়েছে, এমন ঘটনা তিনি কখনো বলেন নি। উজিরপুর আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে তিন কিংবা চার মাইল। ওখান থেকে নদীপথে যেতে হবে বানরীপাড়া। বানরীপাড়াতে স্টিমার পাওয়া যাবে সকালে। সেই স্টিমার যাচে হুলার হাট হয়ে নাজিরপুর, মিয়াভাইয়ের যেখানে চাকরি স্থান। আমি তখন বোধ হয় ভাইদের মধ্যে সবচাইতে ছোট এবং স্নেহের। বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার মুহূর্তে বায়না ধরলাম, আমিও যাব বড় ভাইয়ের সঙ্গে। নানা নিরোধ। মা বলেন, তুই কোথায় যাবি? আমি বলি না, আমি যাব। নাছোড়বান্দা। স্নেহপরায়ণ বড় ভাই বলেন: ঠিক আছে, ও যাক। উজিরপুর পর্যন্ত। ওখান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেব বাড়ির লোকের সঙ্গে। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। আমাকে উজিরপুর থেকেও ফেরত পাঠানো গেলো না। শেষপর্যন্ত ঠিক হল মিয়াভাই আমাকে সঙ্গেই নিবেন। হয়তো সেদিন তাঁর প্রশ্ন ছিলো কিরে, তুই পারবি, আমার সঙ্গে থাকতে? এ প্রশ্নের কি জবাব দিয়েছিলাম আজ আর তা স্মরণে নেই। কিন্তু ফেরত যে পাঠাতে পারলেন না তাতেই জবাবটি যে ছিলো দৃঢ় এবং নাছোড়বান্দা ধরনের তাতে সন্দেহ নেই। সেই রাত্রির কথা আজো মনে ভেসে ওঠে। বড় ভাইয়ের ইচ্ছা ছিলো, উজিরপুর থেকে নৌকা করে বানরীপাড়া যাবেন। কিন্তু নৌকোর কোন মাঝি রাজি হলো না। বলল, নৌকো করে গিয়ে সকালে স্টিমার ধরিয়ে দেওয়া যাবে না।

উজিরপুর থেকে বাড়ির আত্মীয়-স্বজনরা বিদায় নিলেন। এবার উজিরপুর থেকে হাঁটাপথে রওনা হলাম আমরা তিনজন। মিয়াভাই, তাঁর চাপরাসি ফজল মিয়া এবং আমি। তিনজন বলে কোন লাভ নেই। আসলে দু'জন। পাঁচ বছরের শিশুকে ঐ রাতে দশ-বার মাইল পথ হাঁটিয়ে নেওয়া যাবে কি করে? কিছুদূর না যেতে শক্ত সবল ফজল মিয়া আমাকে অক্লেশে তাঁর কাঁধে তুলে নিলেন। অন্ধকার পথে হেঁটে ঐ পথে মিয়াভাই কিংবা তাঁর চাপরাসিও যে কখন বানরীপাড়া গিয়েছিলেন তা মনে হয় না। কারণ, কোনো এক পথ ধরে ঘণ্টাখানেক হাঁটার পরে দেখা গেল, যে-নদীর পার থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিলো সেই নদীর পারেই তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন। কিছুটা আতঙ্ক নিয়ে আবার হাঁটা শুরু হলো। রাত তখন দুপুর পেরিয়ে হয়ত একটা কিংবা দু'টা বেজে গেছে। কত পথ বাকি তাই বা কে জানে। এবার হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লেন তাঁরা দিগন্তবিস্তারী নির্জন মাঠে। এদিকে-ওদিকে ঝাঁকড়ামাথা তালগাছ সেই রাত্রির বুকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরবাড়ির নাম-নিশানা কোনো দিকে নেই। এরকম মাঠ উজিরপুরের মতো ঘনবসতি এলাকায় থাকতে পারে, তা আমি কোনোদিন কল্পনা করতে পারি নি। পরবর্তীকালেও এই মাঠের রূপটি আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষিত করেছে। এই মাঠের নাম নাকি হলুদপুরের মাঠ। সারারাত ধরে এই হলুদপুরের মাঠে এ ভুল ও ভুল করে চলতে চলতে একেবারে ভোরবেলা যে বানরীপাড়া এসে পৌঁছেছিলাম এবং চাকাওয়ালা যে স্টিমারটি ঘাটে ছিলো সেটি যে ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম করে তার সিঁড়ির একটি তক্তা উঠিয়েও ফেলেছিলো এবং আমাকে কাঁধে করে আমার ভাই এবং তাঁর চাপরাসি উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে সেই স্টিমারটিতে উঠেছিলেন—সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি আজকের সাতান্ন বছরের জীবনের কত শত বিপদ-আপদের স্মৃতি-বিস্মৃতি ঘটনার মধ্যেও জ্বলজ্বল করে ভাসছে। স্মৃতির এই ব্যাপারটিও বিস্ময়কর। কোনটি যে স্মৃতিতে থাকে, ভেসে ওঠে এবং কোনটি যে থাকে না, তলিয়ে যায়—সে এক অজানিত রহস্য।

এমনি করে সেদিন বড় ভাইয়ের সঙ্গী হয়ে এসেছিলাম তাঁর কার্যস্থল নাজিরপুরে। মিয়াভাইয়ের সঙ্গে শিশু ও কিশোরকালের তাই আমার নানা স্মৃতি। আসলে ভাই হলেও তিনিই ছিলেন আমার এবং অপর সকল ছোট ভাইবোনের নিকট পিতার মতো। তাঁর বয়োকনিষ্ঠ সকলের পড়াশুনার দায়-দায়িত্ব তিনিই বহন করেছেন। বাবা-মার কাছে তিনি ছিলেন ভরসার এবং গর্বের ধন। গ্রামের লোকেরা বাবা-মাকে ডাকতো মৌজালীর (মৌজে আলী) বাবা কিংবা মা বলে। বাবা-মা তাঁদের ছেলেকে ডাকতেন 'মনু' বলে। কথার টানে সে ডাক শোনাত 'মউন্না' বলে।

আজ তিনি সংসারী তো বটেই। প্রবীণ। চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা মোটামুটি স্থিত হয়েছে আপন আপন সংসারে এবং অবস্থানে। বড় ছেলে ইংরেজির অধ্যাপক। এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। মেয়েরাও শিক্ষিত এবং সংসারী। একটি ছেলে '৭১ সালে জীবন বীমায় চাকরি করত। '৭১-এর আগে কোনো রাজনীতি করতো বলে শুনি নি। কিন্তু '৭১ সালে জড়িত হয়ে পড়েছিলো যুদ্ধের সঙ্গে এবং '৭১-এর শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কোনো জায়গাতে কোনো কর্মসূচি সম্পন্ন করতে সেই যে, গেলো, আর কিন্তু এলো না। মা-বাবা বহুদিন ভেবেছিলেন, ছেলে তাঁদের বেঁচে আছে, ফিরে আসবে। কিন্তু বাংলাদেশের অসংখ্য হারিয়ে যাওয়া যুবকের ন্যায় সেও আর ফিরে আসে নি। ছেলেটির নাম ছিল হুমায়ুন। পুরো নাম আহমদ নিয়াজ। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ওর একটি ছবি জীবন বীমা কর্পোরেশনের গুলিস্তানের অফিসে এখনো টাঙানো দেখা যায়। তাতে বোঝা যায়, ছেলেটি তার সহকর্মীদের মনেও দাগ কেটেছিলো।

বড় ভাইয়ের জীবনে এই এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কোনোদিন রাজনীতি করেন নি। আমার নিজের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় ক্ষুব্ধ ছিলেন আমার ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৮ সালে হঠাৎ একদিন আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষকতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিষিদ্ধ রাজনীতিক জীবনে আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলাম, সেদিন সেই মুহূর্তে পুলিশের লোক অন্বেষণ করে আমাকে না পেলেও বড় ভাই ঠিকই আমাকে বের করেছিলেন ঢাকার শহরতলির একটি এলাকাতে। দেখা হতেই বলেছিলেন : 'তুমি বোকার বোকা তো বটেই। এখন দেখছি পাগল। বিলেত যাওয়ার চান্স পেলে। তাও গেলে না। (কথাটা মিথ্যা নয়।) এখন হাতের চাকরিতে ইস্তফা দিলে। এ সবের অর্থ কি?' বড় ভাইয়ের এরকম প্রশ্নের মোকাবেলা আমাকে আগেও করতে হয়েছে। এবং এসব ক্ষেত্রে আমার কৌশলটি কিছুটা ব্যতিক্রমী ধরনের ছিলো। আমার নীতিটি ছিলো: মুরুব্বিজনের সঙ্গে তর্ক করবে না এবং নিজের বিবেকের সিদ্ধান্তে বিচলিত হবে না। আর এই নীতিতে সেদিনও আমি মিয়াভাইয়ের প্রশ্নের কোনো জবাব দিই নি। শুনেছি, তিনি তখনি ছুটে গিয়েছিলেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ড. বিনয় রায়ের কাছে। ড. বিনয় রায় আমার নাম ধরে আমার ভাইকে বলেছিলেন : ওকে তো আমরা চিনি। ওতো আমাদের একান্ত স্নেহের ছাত্র। কিন্তু ওর সিদ্ধান্ত থেকে তো ওকে ফেরানো যাবে না। তা না হলে এখনো যদি ও ফিরে আসে, আমরা ওকে আবার সাদরে নিয়ে নেবো।

অধ্যাপক বিনয় রায়ের কথা মিথ্যা নয়। আমার প্রতি এ শিক্ষকদের ছিলো অপার স্নেহ। দর্শনের প্রখ্যাত শিক্ষক অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের, অধ্যাপক বিনয় রায়ের, অধ্যাপক ক্ষিরোদ মুখার্জি বা কেসি মুর্খাজির এবং অধ্যাপক রাকেশ রঞ্জন শর্মার স্নেহ। হিন্দু শিক্ষকই তখন সংখ্যায় অধিক ছিলেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালেও। আমাদের দর্শন বিভাগে মুসলিম শিক্ষক ছিলেন হাদি সাহেব। আব্দুল হাদি তালুকদার। এবং পরবর্তীকালে গোলাম জিলানী, উর্দুভাষী। বোধ হয় লাহোরের। ইনি পড়াতেন মুসলিম দর্শন।

বিনয়বাবুর স্মৃতিটি উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৯৪৬ সালে আমি যখন এম.এ পাস করি তখন দর্শন বিভাগের তিনি অধ্যক্ষ। হরিদাস ভট্টাচার্য তখন অবসর নিয়ে চলে গেছেন, কলকাতায়। এম.এ পাসের পরে কোনো আনুষ্ঠানিকতা করে যে আমাকে দর্শন বিভাগের শিক্ষক হতে হয়েছিলো, তা আদৌ মনে পড়ে না। আসলে কেবল আমাদের বিভাগ নয়, তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টিই ছিল ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি ছোট পরিবারের ন্যায়। আমাদের বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অধিকতর সত্য। দর্শনের অনার্সে এম.এতে গুটি পাঁচ-ছয় ছাত্রছাত্রী। শিক্ষকদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিলো সন্তানের সম্পর্ক। তাঁদের নিজেদের বাড়ি আর ছাত্রদের ক্লাস, এর মধ্যে কোনো ভেদরেখা ছিলো বলে মনে পড়ে না। হরিদাস বাবু বা বিনয়বাবুর ক্ষেত্রে একথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই সত্য। হরিদাস বাবু ছিলেন সারা ভারতব্যাপী বিখ্যাত বাগ্মী, দার্শনিক। কলকাতা, লখনৌ, বেনারস, দিল্লি, বোম্বে, লাহোর—সকল জ্ঞানকেন্দ্রে তাঁর অবাধ যাতায়াত, অহরহ ডাক।

বিনয়বাবুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের স্মৃতি আমার মনে অমলিন হয়ে ভাসছে। সেটিই আমার শেষ সাক্ষাৎ। (বিনয়বাবু ছিলেন ইংরেজির অধ্যক্ষ এস.এন রায়ের ছোট ভাই। এস.এন রায় ছিলেন সেকালের ইডেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুজাতা রায়ের স্বামী। আসলে স্বামী-স্ত্রী হওয়ার পূর্বেও এঁরা একই পরিবারের লোক ছিলেন। আমাদের সামাজিক ভাষায় হয়ত খালাত-মামাত ভাইবোন। হিন্দু সমাজে এত নিকট আত্মীয়ের মধ্যে নাকি সেকালে বিয়ের সম্পর্ক হতো না। কিন্তু এস.এন রায়-সুজাতা রায় সে সংস্কারকে ভেঙে ছিলেন।)

১৯৪৬-৪৭ সাল। কিংবা তারও কিছু পর ১৯৪৮-এর মধ্যভাগ। তখন বিনয়বাবু ছিলেন দর্শন বিভাগের প্রধান। তাঁর মারফতেই বয়োকনিষ্ঠ বা জুনিয়র শিক্ষকদের নিয়োগ—তথা তাদের সকল আবেদন—নিবেদন : বিদেশ যাওয়ার বৃত্তির দরখাস্ত বা ছুটির প্রার্থনা। আমি তখন বিভাগের একজন তরুণ শিক্ষক। বিনয়বাবু জানতেন, আমার কিছু এদিক-ওদিক চলাচল আছে। পড়াশুনার বাইরে : এই কনফারেন্সে যাওয়া, ঐ মিটিং করা, করোনেশন পার্কে বক্তৃতা দেওয়া, রাজনৈতিক পত্রিকা বিক্রি করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নপদস্থ পিয়ন বা চাপরাসিদের ছেলেমেয়েদের নাইট স্কুল চালানো, এমন কি তাদের নিয়ে বেয়ারার সমিতি গঠন করা। এসব কিছুকে আমার ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার শিক্ষকরা প্রশ্রয় এবং স্নেহের চোখে দেখতেন। মোট কথা, কেবল বই পড়তে ছেলেটি যে ব্যস্ত থাকে না, আবার এটা-ওটা করেও ছেলেটি বেশ ভাল ফল করে পরীক্ষাতে, এটি আমার অধ্যাপক-শিক্ষকদের বেশ আমোদিত করতো। সে যা হোক, '৪৭-৪৮-এ আমি যখন দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা করছি, তখন দেশ বিভাগ তথা পাকিস্তান হওয়ার পরে ঢাকার রাজনীতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে উঠছিলো। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার বামপন্থী রাজনীতিকদের বিষয়ে তাদের দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণ করে তুলছিলো। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করা থেকে ধর-পাকড়ও শুরু হয়েছিলো। তখনো বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের অধিকাংশ হিন্দু সমাজভুক্ত। তাঁরাই অধিক পরিমাণে গ্রেফতার হচ্ছিলেন। কিন্তু সরকারের আই.বি তথা গুপ্তচর বিভাগ খোঁজ করছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে এমন ধরনের কর্মী আছে কিনা। শিক্ষকদের মধ্যে মুসলিম তরুণ শিক্ষক হিসেবে স্বাভাবিকভাবে এক্ষেত্রে আমি এই বিভাগের নজরে পড়েছিলাম। তাদের এ দৃষ্টি হয়ত আমার ওপর পড়েছিলো বিভাগের পূর্বে, সেই '৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ৪৫-৪৬ সালের সারাদেশব্যাপী ছাত্র এবং শ্রমিক আন্দোলনের আলোড়নের কালেইঃ নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলী দিবস, ঢাকার ছাত্রদের দাঙ্গাবিরোধী শান্তি মিছিল হিসেবে ইতিহাসে যে ঘটনাগুলো পরিচিত হয়ে আছে, তার মধ্যেই। কিন্তু বিভাগের পূর্বে আমার ওপর তাদের দৃষ্টি ততো খর হওয়ার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে আমি এমন কর্মীদের মধ্যে প্রায় অন্যতম হয়ে দাঁড়ালাম। পাকে প্রকারে আমি নোটিশ পেলামঃ আমাকে তারা অন্বেষণ করছে। এমন অবস্থায় প্রকাশ্য চাকরিরত হয়ে বেশিদিন বাইরে থাকা যাবে না, সংগঠনের এই বিবেচনা থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছিলোঃ তুমি চাকরি ছেড়ে আত্মগোপন করবে। সিদ্ধান্তটি কার্যকর করতে আমার কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসে নি। সাংসারিক কোনো দায়-দায়িত্ব আমি কোনোদিন পালন করি নি। একমাত্র আকর্ষণ জন্মেছিলো ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। বেশ লাগছিলো ছাত্র—প্রায় আমার শিক্ষকের মতো বক্তৃতা দিতে। কেমন করে যে সেদিন ছাত্রছাত্রীদের কাছে গুরুগম্ভীর কথা বলতাম, তা স্মরণ করতে পারছিনে। তবে গোবেচারী আমার প্রতি ছেলেমেয়েদেরও কিছুটা আকর্ষণ যেন তৈরি হচ্ছিলো। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, এই 'স্যারটি'র যেমন 'অ-স্যারমূলক' নানা আচার-আচরণের কথা শোনা যায়, তেমনি আবার ব্যতিক্রমহীনভাবে তাকে নির্দিষ্ট সময়ে তার ক্লাসটিতেও পাওয়া যায় আর সেখানে তাকে সাগ্রহে পাঠ্য কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যাতে নিবদ্ধ হতেও দেখা যায়। আর এ কারণেই একদিন আমি তাদের সতর্ক করে দিয়েই বললাম : 'আমি আর তোমাদের ক্লাস নেব না।'

তারা বলল : 'কেন স্যার, কেন স্যার?

আমি বললাম : 'আমার জীবনে অ-শিক্ষক কিছু দায়দায়িত্ব আছে। সেটি পালন করে শিক্ষকতার পুরো দায়িত্ব পালনে আমি ব্যর্থ হবো। কিন্তু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবো না জেনেও চাকরিতে বহাল থাকব, এমন কথা আমি ভাবতে পারিনে।' সেদিনকার সেই পরিবেশে ছেলেমেয়েদের কাছে আমার এমন কথা নিশ্চয়ই বেশ রহস্যের সৃষ্টি করেছিলো, কিন্তু কথাটা সঠিকই ছিলো।

দু'দিন পরে আমি একটুকরা কাগজ নিয়ে অধ্যাপক বিনয় রায়ের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমার সাক্ষাৎশিক্ষক এবং বিভাগের প্রধান, যিনি আমাকে ঘরের ছেলের মতো স্নেহ করতেন, তিনি ভেবেছিলেন, কাগজটিতে আমার কোনো আবেদন আছে, কোনো পদোন্নতির, বা বিদেশ গমনের জন্যে বৃত্তির। আমার হাতের কাগজটিতে আবেদন অবশ্যই একটি ছিলো। কিন্তু পদোন্নতির নয়, অব্যাহতিরঃ 'স্যার, আই বেগ টুবি রিলিভ্‌ড্‌ অব মাই ডিউটিস এ্যাস এ টিচার ইন দি ডিপার্টমেন্টঃ স্যার, বিভাগের শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে অব্যাহতি দিবেন।' সোজা কথায়, পদত্যাগ। বিনয়বাবু আমার হাত থেকে সেই কাগজটুকু নিয়ে বেশ কয়েক মিনিট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, যেন বাক্যটির মর্ম তিনি অনুধাবন করতে পারছেন না। এবং যথার্থই তিনি আমাকে রাগের স্বরে জিগ্যেস করলেন : 'এসবের অর্থ কি? তুমি কি পাগল হয়েছো? আর ইউ ম্যাড?' বিনয়বাবুর বিস্মিত হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিলো না। তখনকার হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত কত ছেলে রাজবন্দী হিসেবে জেলে গেছে, এমন কি ফাঁসিতেও ঝুলেছে। আন্দামানে নির্বাসিত হয়েছে, আত্মগোপন করেছে। বিনয়বাবু, এস.এন রায়, পৃথ্বিশ চক্রবর্তী, হরিদাস বাবু। এঁদের কাছে এমন ব্যাপার বিস্ময়কর কিছু ছিলো না। সেকালে তাঁদের কাছে চমক ছিলো : একটি মুসলমান ছাত্রের এমন 'বিপথে' পা বাড়ানোর। সেদিন মুসলমান সমাজে এমন ঘটনা তাঁদের সমাজের ছেলেদের ন্যায় সচরাচর ছিলো না। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেক্ষিতে এ ছিলো ব্যতিক্রম।

বিনয়বাবু তারপরে আবার বললেন : 'তোমার এ রেজিগনেশন লেটার আমি ছিঁড়ে ফেলব। এমন পাগলামি তুমি করো না।'

আমি বললাম : 'স্যার আপনি তো আমাকে জানেন। ব্যাপারটাতে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এটা তো আর পাল্টানো যাবে না।'

শুধুমাত্র এই কথা কয়টিই । আর কিছু নয়। আর তারপরেই আমার স্বভাবসুলভ সলজ্জ নিঃশব্দতা ব্যতীত আর কোনো জবাব ছিলো না আমার। আরো কয়েক মুহূর্ত বোধ হয় পার হয়েছিলো। তারপরের ঘটনাটি আজ মনে করতে আমার চোখে পানি আসছে। কিন্তু সেদিন যে কিভাবে ঘটনাটিকে অতিক্রম করে এসেছিলাম, তা আর স্মরণ করতে পারিনে। আমার শিক্ষক ড. বিনয় রায়, বিভাগের প্রধান, আমাকে হঠাৎ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন : তোমার মত পাগল ছেলে আমি আর পাই নি। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি .... ।

বিনয়বাবু আজ হয়ত বেঁচে নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার সেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে শত দ্বন্দ্ব দাঙ্গা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধার ক্রমপ্রসার সত্ত্বেও এমন স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক যে ছিলো, তার কথা আজ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করা, ব্যক্তিগত আবেগ থেকে স্মৃতিচারণের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হচ্ছে। সেই বোধ থেকেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করার এই দুর্বল চেষ্টা।

এক কিশোরের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

ধারাবাহিকভাবে স্মৃতিচারণের চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আত্মজীবনী লেখার মতো 'বড়লোকও' আমি নই। তবু 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'র কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলার কিছুটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের মনের আলো-আঁধারিতে হাতড়ে বেড়াবার চেষ্টা করছি নিরন্তর। হঠাৎ হঠাৎ কোনো একটা উদ্দীপক বা 'স্টিমুলাসে' তার কোনো কোনো জায়গা যেন আকস্মিকভাবে দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। কিছুটা পরিমাণে দেখা যায়। চিত্রবৎ ভেসে ওঠে ১৯৪০, ৪১, ৪২, ৪৩-এর জীবন, তার কোনো ঘটনা, কোনো চরিত্র। তারপরেই আবার হয়ত অন্ধকার। এ প্রায়, অতীত নিয়ে কানামাছির খেলা: এই ছুঁই, এই পাই: এই পাইনে...

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পেয়ে গেলাম কয়েকটি হাতে লেখা খাতা। বয়স হয়েছে তার চল্লিশ বছরের ওপর। তারিখ আছে কোনো কোনোটির গায়ে: ১৯৪০-৪১ সালের। একটি কিশোরের খাতা। প্রায়ই ছিন্ন। আবার কোথাও কিছুটা ধারাবাহিকতা আছে। একটি কিশোর ছাত্রের খাতা। কিশোর তো বটেই। মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছে। পনের বছরও পুরো হয় নি ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়ে। যে লেখক বর্তমানে এই ভূমিকাটি লিখছে তার নামের সঙ্গে এই কিশোরের নামের অবশ্যই মিল আছে। কিন্তু তাই বলে সেই খাতার মধ্যে যে দুই-একটি সাহিত্যচর্চামূলক লেখার আভাস পাওয়া গেল, সে লেখা বর্তমানের এই লেখকের, এমন কথা বলা অর্থহীন। তার মানে এই নয় যে, বর্তমানে প্রৌঢ় বয়সের এই লেখক সেই কিশোরের চাইতে উচ্চতর স্তরের কোনো লেখক, তাই একটি কিশোরের রচনাকে নিজের বলতে তার সঙ্কোচ। ব্যাপারটি তা নয়। বরঞ্চ সেই কিশোরের কাঁচা হাতের লেখার মধ্যে, শব্দের বানানে ভুল এবং ভাষা ব্যবহারের সাধু চলতির মিশ্রণ সত্ত্বেও যে অকৃত্রিম আবেগের পরিচয় আছে, সেটি বর্তমানের এই তিত-পোড়া প্রৌঢ়ের জীবনে বা তার লেখায় নেই। তাই সে কিশোরের আবেগময় লেখার মালিকানা দাবি করার হক বর্তমানের একই নামধারী এই লেখকের নেই।

সেই কিশোরের এই লেখার একটিও সেদিন কোনো সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয় নি। অপর কোনো লেখা হয়ত ঢাকা কলেজের ম্যাগাজিনে কিংবা 'মাসিক মোহাম্মদী', 'মাসিক সওগাতে' প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

কিন্তু অপ্রকাশিত এই পাণ্ডুলিপির একটি রচনা আমার কাছে আজ একটু তাৎপর্যপূর্ণ বলে বোধ হচ্ছে। লেখাটি গল্প। রচনার কাল ১৯৪১-এর শেষে কিংবা '৪২। খাতার বিভিন্ন চিহ্ন থেকে এমন অনুমানই করতে হয়।

দাঙ্গার শহর, ঢাকা শহর। এই দাঙ্গার পটভূমিতে একটি মুসলমান ডাক্তার ছেলে এবং দাঙ্গায় সদ্য নিহত একটি হিন্দু যুবকের অসহায় বোনকে নিয়ে কিশোর লেখক তার গল্পটি তৈরি করেছে। গল্পটিকে আমি নিচে তুলে দিচ্ছি। সেদিনের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে একটি মুসলিম কিশোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র তার সাহিত্যচর্চার চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসা তথা হৃদয়গত ঐক্যের সূত্রটিকে যে মূল্যবান বলে মনে করেছিলো, এই ঘটনাটি সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত প্রবাহিত সামাজিক-রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই একটি সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বহন করে। এবং সে কারণেই সেই কিশোরের এই কাঁচা লেখাটি অভিজ্ঞ-পক্ক এই প্রৌঢ়ের ভাল লেগেছে।

ভূমিকার এই কথাটি বলে আমি গল্পটি তুলে দিচ্ছি। পাণ্ডুলিপিতে গল্পটির কোনো নাম পাওয়া যায় নি। হয়ত কিশোরের এটি খসড়ামাত্র ছিলো। একে মার্জিত করা হয় নি। কিন্তু আজ একে মার্জিত করে কোনো লাভ নেই। সেটি উচিতও নয়। এবং এর নামকরণেও কোনো প্রয়োজন নেই। পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম ছিলো না। খাতার উপর তার নিজের নামটি লেখা ছিলো। এবং দ্বিতীয়বার কোনো ব্যাখ্যা না করে বলছি; সে লেখক এই লেখক নয়। কিন্তু তার নাম এবং বর্তমান লেখকের নামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। লেখার পুরোটি পাওয়া যায় নি। যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে 'শরতী' প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। সে যাক, লেখাটির সাহিত্যিক মূল্য বড় নয়। বড় তার কালগত বৈশিষ্ট্য।

* * *

'দাদা, তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেও না, যেও না'।

অমল আর সুরমা। দুই ভাইবোন। আত্মীয় বান্ধব বলিতে তখন আর কেহই অবশিষ্ট ছিলো না। মানুষের বাঁচিবার উপায় কম। কিন্তু মরণের পথের অল্পতা নাই। মরণের পথ অসংখ্য। মরণের পথের প্রশস্ততা সত্ত্বেও অমল আর সুরমা এতদিন বাঁচিয়াই ছিলো। পূর্ববঙ্গেরই ওরা মানুষ। বাবা ছিলেন জমিদার। অমল কিন্তু গ্রামের জমিদারি বাদ দিয়া পূর্ববাংলারই ঢাকা শহরে বোন সুরমাকে লইয়া বাড়ি করিয়া বাস করিতেছিলো। যখনকার কথা বলিতেছি, অমল তখন বি.এ. পড়ে, বোন সুরমা ম্যাট্রিক।

অমল আর সুরমা। এদের একের বাঁচার জন্য দায়ি অপরে। অমল সুরমার শুধু বড় ভাইই নয়। ছেলেবেলা হইতে অমল সুরমার ভারপ্রাপ্ত। বোন সুরমার একাধারে সে বড় ভাই, মাতা-পিতার মত রক্ষণকারী সব। সুরমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বই অমলের বাঁচার একমাত্র প্রয়োজন।

ঢাকার ১৯৩৯ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার কালে অমল পাইল এক ভীষণ আঘাত। হাসপাতালে অমলকে স্থানান্তরিত করা হইল। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল। সুরমার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। হাসপাতালে মুমূর্ষু ভাইয়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অঝোরে সে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। সুরমার চক্ষুর সম্মুখে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ লেপিয়া-মুছিয়া একাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া গেল। অমল তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। অথচ অমলের এই চলিয়া যাওয়া সুরমার নিকট যে ভবিষ্যতে কি একটা ভয়াবহ আলোড়ন, একটা ভূমিকম্প আনিয়া উপস্থিত করিবে সে কথা সুরমা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, অমল তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অন্তরের নিগূঢ় ক্রন্দন ধ্বনি মুহূর্তে মুহূর্তে সুরমার মুখে প্রকাশ পাইতেছিলো: 'দাদা, তুমি যেও না'...

অমল? নির্বানোন্মুখ প্রদীপ। সুরমার কথা কানে প্রবেশ করিতেই জ্বলিয়া ওঠে। কিন্তু কথা বাহির হয় না। কোমরের পাশের ক্ষতটার ব্যাণ্ডেজ আবার রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। মরণপথের যাত্রীর শেষ নিশ্বাস পড়িতে নিমেষমাত্র বাকি। অমল হঠাৎ একটি অস্বাভাবিক চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, সুরমা, এই প্রকাণ্ড বিশ্বটায় এমন একটা মানুষও কি নেই যার হাতে তোর ভার আমি ন্যস্ত করে যেতে পারি, নেই?

এতক্ষণ পর্যন্ত হাসপাতালের বারন্দায় একটি মুসলমান ডাক্তার ছেলে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলো। 'ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত সে। গত রাত্রি বারটা হইতে কত মানুষকেই তো সে ভর্তি করিয়াছে এই ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে। কতজনের শেষ নিশ্বাস তো এরই মধ্যে বাহির হইয়া গিয়াছে। আর একটা কেস এই অমল বাবু। তারও হয়ত আর বেশি বিলম্ব নাই। অথচ অমল চলিয়া যাইবার পরে ঐ পার্শ্বে উপবিষ্ট মেয়েটির অবস্থা এই দাঙ্গা-হাঙ্গামারকালে কিরূপ নিঃসহায় হইয়াই যে দাঁড়াইবে, সে কথা কি সে এতক্ষণে কম বুঝিতে পারিয়াছে? দাদার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও যে বলিতে পারে, 'তুমি যেও না', সে যে কতটা আশ্রয়হীন, সমস্ত পৃথিবীটায় যে তাহার কোথাও মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থানও নাই, সে কি তাহার বুঝিতে বাকি রহিয়াছে? অথচ কিইবা সে করিতে পারে? আজিজ রেলিং-এ ভর দিয়া দূরে রাঙা আকাশটার পানে নির্মিমেষে চাহিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, মানুষে মানুষে এই যে হানাহানি, এই যে লহুর স্রোত দিনরাত বিচারহীনভাবে বহিয়া চলিয়াছে, এর শেষ কোথায়? আজ ভাইয়ের পাশে উপবিষ্ট ঐ নিঃসহায় মেয়েটির আর্তরব, তার বুকফাটা ক্রন্দন কি এই নিষ্ঠুর নির্দয় পশুগুলিকে অভিশাপ দেয় না? আর এই যে বছরে বছরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, এর নিবারণই বা কিসে?

আজিজ ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়ে। ওর এই ডাক্তারি পড়ার পেছনেও বেশ একটু গল্পের মতো আছে।

বছর দুই পূর্বে আজিজ যখন স্কলারশিপ লইয়া আই.এ পাস করিল তখন সবাই ভাবিয়াছিলো, আজিজ বি.এ পড়িতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু আসলে তা হইল না। পরীক্ষা দিয়া ও বাড়ি য়ায়। গ্রামে তখন বসন্ত দুর্দম বেগে বহিয়া চলিয়াছে। প্রতিদিন লোক মরিতে লাগিল। মাটি দিবার কেহ নাই। প্রতিষেধক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য উপদশ দিতে কোনো লোক নাই। দিনের পর দিন গ্রাম উজাড় হইয়া চলিল। রোগ চড়াইতে ছড়াইতে ক্রমে আজিজদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট ভাইটি ওর যেদিন ওরই সম্মুখে শত শুশ্রুষা সত্ত্বেও ওষুধ না লইয়া মরিয়া গেল, সেদিন ওর সমস্ত চিত্ত আলোড়িত হইয়া নিজের বিদ্যাশিক্ষার উপর একটা ধিক্কার আসিল। পরীক্ষার পরে আজিজ ভবিয়াছিলো, পিতার সম্মতি লইয়া সে বি.এ পড়িতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু পিতার সম্মতি দেওয়ার সময়ও অতিবাহিত হইয়া গেল। তিনিও তাঁহার ছোট্ট ছেলেটিকে অনুসরণ করিলেন। আজিজের মা ছিলো না। বাপ আর ভাইকে কবরগাহে রাখিয়া আসিবার কালে মনে মনে আজিজ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া লইল যে তাহার ভ্রাতার এবং পিতার আত্মার কল্যাণের জন্য সে ডাক্তারি পড়িবে। রোগে শোকে সে সমস্ত গরিবকে সেবা করিবে। গরিবেরই আর্শীবাদের অশ্রু লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আজিজ তাহার পিছনের ইতিহাসটাকেই উল্টাইতেছিলো। নিঃসহায় আজ ঐ মেয়েটির মতো সেও একদিন এমনিভাবে সহায় সম্বলহীন হইয়াছিলো। কিন্তু তবুও তো কত তফাৎ। এ যে দুর্বল।

দূরে শহরের মধ্যে 'বন্দেমাতরম' আর 'আল্লাহ আকবরের' চাপা ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। একটা বাড়িতে এইমাত্র আগুন দেওয়া হইল। তাহার লেলিহান শিখা সন্ধ্যার আকাশটাকে আরো ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। আজিজের মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, ধর্মের নামে এরা কত অনাচার কত অত্যাচারই না করিতে পারে। তবুও মনে করে, ইহারা ইহাদের স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

হাসি মিলাইয়া যাইতেই ভিতরে অমলের চিৎকারে আজিজের মুখে কালো ছায়া নামিয়া আসিল। অমল তখন বলিতেছিলো, সুরমা, বোন আমার, মানুষ নাই। কার হাতে তোকে সঁপে দিই...।

অমলের কথা ভালমতো শেষ হইতে পারিল না। মাঝপথে থামিয়া পড়িল। সুরমা চিৎকার করিয়া উঠিল, ওগো কে আছ? দাদা আমার কেমন করছে।

আজিজ তাড়াতাড়ি আসিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া অমলের হাতের নাড়ি ধরিল। সুরমা বলিয়া উঠিল, ডাক্তার সাহেব, দেখুনতো দাদা আমার—। সুরমার কথা থামিয়া গেল। ডাক্তারের চক্ষে জল।

কি ডাক্তার, দাদা আমার নাই? বলিয়া সুরমা অমলের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ডাক্তার রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বাহির হইয়া আসিল। এ দৃশ্য সহ্য করা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। চক্ষু বাঁধ মানিল না। বারবার ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজ ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারি মন ওর ছিলো না। একবার ডিসেকটিং রুমে আজিজ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলো। জ্ঞান হইবার পরে সার্জন আসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইউ শুড নট হ্যাভ কাম টু দিস ডিপার্টমেন্ট মাই বয়। এ ভেরি টেন্ডার হার্ট ইউ পজেজ।'

রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সুরমা এখনো ভাইয়ের বুক আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আজিজ আসিয়া ডাক দিল, সুরমা দেবী, একটু উঠুন। সুরমা উঠিয়া চাহিল আজিজের পানে। শান্ত সমাহিত সে চাহনি। কত বড় ব্যথা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে ঐ চক্ষুর কোটরে। আজিজ নিজের দৃষ্টি নামাইয়া বলিল রাত নয়টা বেজে গেছে। এরপরে সৎকার করানো অসম্ভব হবে। কাকেও পাওয়া যাবে না। এখন কয়েকটি বিশ্বাসী লোক যোগাড় করতে পেরেছি। আপনি একটু আমার প্রাইভেট রুমটায় যেয়ে অপেক্ষা করুন। আমি ফিরে এসে যা হোক একটা ব্যবস্থা করব।

আজিজের নতদৃষ্টির উপর একদৃষ্টে সুরমা চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি তাহার বিস্ময়ের। আজিজ কে? আজিজ ডাক্তার। হাসপাতালের ডাক্তার। সে কোথায় যাইবে? কেনো যাইবে? কাহার জন্য যাইবে? ইহা কিছুই সুরমা বুঝিতে পারিল না। ভাইকে তাহার সৎকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে ডাক্তারের কি? সুরমার মুখ দিয়া বিস্ময়ের সহিত বাহির হইলো, আপনি কোথায় যাইবেন?

ডাক্তার ম্লান হাসিয়া বলিল, আমি না গেলে তো সৎকার করা সম্ভব হবে না। আর যার তার হাতে তো আমি এ মৃতদেহকে ছেড়ে দিতে পারিনে। ডোমের নিকট আমি এঁকে দিতে পারব না। তাছাড়া নেবার পথে লাশের উপর আবার আক্রমণ হতে পারে। কাজেই আমার না গেলেই নয়। আপনি কিছু ভয় করবেন না। আমার ঘরে একটা ইজি চেয়ার আছে। সেখানে যেয়ে আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

তাহার ভাইয়ের শেষ গতি করিতে আজিজ যাইবে? এত দয়া তাহার? সুরমার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

আজিজ বলিল, আপনি যান সুরমা দেবী। আপনি ঘরে গেলে পরে আমি দাদার দেহটা তুলব।

আবার সুরমার মাথা যেন কেমন হইয়া গেলো। কিছুক্ষণ পূর্বে এই দেহটাই ছিলো তাহার একমাত্র ভরসাস্থল। এই দেহেরই আত্মা কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্তও ভবিষ্যৎ নিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলো। আর এখন কিনা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জোও তাহার নাই। সুরমা আবার অমলের পা জড়াইয়া লুটাইয়া পড়িল। আজিজের চক্ষু ছাপিয়া কান্না আসিল। কিছুক্ষণ পরে আজিজ আবার ডাকিল, সুরমা, সুরমা দেবী, উঠুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরমা উঠিয়া বলিল, চলুন।

সুরমাকে ঘরে মধ্যে রাখিয়া আজিজ অমলের মৃতদেহকে লইয়া কয়েকজন সাথী সঙ্গে করিয়া শ্মশানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। দূরে 'বন্দেমাতরমের' সাথে সাথে আর একটি বাড়ি জ্বলিয়া উঠিল।

আজিজ চলিয়া যাইবার পরে হঠাৎ সুরমার একটা কথা মনে পড়িল, মৃতদেহের উপর পথে আক্রমণ চলিতে পারে। ভাবিতেই সুরমা শিহরিয়া উঠিল। তাহার ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। যদি ডাক্তারও তেমনি করিয়া আঘাত পায়, যদি ডাক্তারও আর ফিরিয়া না আসে। দাদাকে সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। দাদা তাহার চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরে ডাক্তার একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া আসিয়া দেখা দিল তাহার ভাইয়ের মৃত্যু সময়ে। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সে তাহার দাদার মৃতদেহের সৎকার করিতে গেল। কিন্তু যদি? সুরমা আর ভাবিতে পারিল না। নিজের মনে মনে বারবার সে আবৃত্তি করিতে লাগিল, না না, ডাক্তারের বাঁচিতে হইবেই। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই অপরিচিত ডাক্তার ছেলেটি যে তাহার কত বড় আত্মীয়, কতদূর নির্ভরস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিয়া এত বড় বিপদের মধ্যেও সুরমার বিস্ময়বোধ হইল।

রাত্রি বারটা পার হইয়া গিয়াছে। আজিজ তখনো অমলের দেহ সৎকার করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। সুরমার চিন্তা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। সুরমার পাশের ঘরে ইমারজেন্সির কেসের রুগীদের কাতরুক্তি শোনা যাইতেছে। দূরে একটা হল্লার সাথে সুরমা চমকিয়া উঠিল। কি একটা অশুভের সম্ভাবনায় সুরমার মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

AMARBOI.COM

রাত্রি একটার কালে আজিজ ফিরিয়া আসিল। চিতার আগুনের হল্কার জন্য তখনো আজিজের মুখ লাল। আজিজ ফিরিয়া আসিতেই সুরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ডাক্তার আপনি ফিরে এসেছেন? কোনো বিপদ হয় নি তো?

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিল—না, সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু হয় নি। কিন্তু আমি চিন্তিত হয়েছিলুম আপনার জন্যে।

: আপনার মুখ অত লাল কেন?

: আগুনের তাপে বোধ হয়। কিন্তু সুরমা দেবী আপনি তো পরিশ্রান্ত। আপনার বিশ্রামের জন্য আমি কি বন্দোবস্ত করতে পারি? যে ঝড় এইমাত্র আপনার ওপর দিয়ে বয়ে গেল সে ঝড়ের প্রাবল্যই আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে কত বড় হয়ে এর আঘাত লেগেছে আপনার ওপরে। কিন্তু কিইবা সাধ্য আছে আমাদের এর বিরুদ্ধে? আচ্ছা সুরমা দেবী, আপনাদের বাসায় কোনো চাকর আছে?

: না, একটা চাকর ছিলো। সেও আজ দু'দিন পর্যন্ত আসে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে। আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি ইজি চেয়ারটায় একটু বিশ্রাম করে নিন। আমার ওয়ার্ডে আরো প্রায় গোটা বারো কেস এসে জমা হয়েছে। তাদের এ্যাডমিশন করে নিতে নিতে প্রায় সকাল হয়ে যাবে। দেখি তখন একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না। আমার ডিউটিও তখন শেষ হয়ে যাবে। বলিয়া আজিজ সুরমাকে একটু বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া ডিউটিতে চলিয়া গেলো।

ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়াছে। এতক্ষণে সুরমা একটু নিশ্চিন্তে নিজের জীবনটা লইয়া আলোচনা করিবার অবসর পাইল। সুরমা ভাবিয়া পাইল না মানুষের জীবনটা এত দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া যায় কেমন করিয়া। তাহা না হইলে গত পরশু যে নিজের জীবন সম্বন্ধে, তাহার দাদার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কিছুর কল্পনাই না করিয়াছিলো। আর আজ সে সমস্ত কিরূপভাবে এক নিমেষের ফুৎকারে সব অন্ধকারে লীন হইয়া গেল। সে সমস্তকে আর দ্বিতীয়বার কল্পনা করিবার পথও তাহার রহিল না। ভাবিতে ভাবিতে সুরমা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চিৎকার ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। দূরে কতগুলি বড় বড় কাপড়ের দোকান পুড়িয়া শেষ হইতেছিলো। তাহার মৃদু আলোকরশ্মি কিঞ্চিৎ ধুমের সহিত আকাশের দিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে উঠিতে সেখানের আকাশটাকে একটু গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছিলো। আজিজের ডিউটি শেষ হইয়া আসিয়াছিলো। হাসপাতালের গাড়িটার ব্যবস্থা করিয়া সুরমার দুয়ারে আসিয়া আজিজ ডাক দিল : সুরমা দেবী।

সুরমার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। কবাট খুলিয়া বলিল, আপনার ডিউটি শেষ হলো?

: হ্যাঁ, আপাতত শেষ হয়েছে। একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করতে পেরেছি। শহরের দাঙ্গাটা এখন একটু শান্ত আছে। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ডাক্তারের নির্দেশমত সুরমা আসিয়া গাড়িতে উঠিল। আজিজ ড্রাইভারকে রাস্তার কথা বলিয়া গাড়িতে উঠিল।

সুরমা এতক্ষণে অনেকখানি স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিয়াছিলো। অমল থাকিতে সুরমা একটা দিনও ভাবিতে পারে নাই যে, দাদার অনুপস্থিতিতে তাহার নিজের কোনো অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুরমার অনেকখানি জ্ঞান, অনেকখানি অভিজ্ঞতা হইয়া গিয়াছে। দাদার মতো স্নেহ, দাদার মতো উদার হৃদয় যে আর কাহারো থাকিতে পারে সে কথাটাও সুরমা এই অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল। গাড়িতে সম্মুখে ঐ ড্রাইভারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশে বসা ঐ যে ডাক্তার ছেলেটি, ভিন জাতি, ভিন ধর্ম, অথচ কত উদার তাহার হৃদয়, কত কোমল তাহার অন্তর। একথা কি সে এই একটি রাত্রির মধ্যে কম বুঝিতে পারিয়াছে? এর মধ্যেই তো সে সুরমার দাদার অভাব কতটা পূরণ করিয়া দিয়াছে। দাদার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও সুরমা যখন দাদার পাশে বসিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য আকুলভাবে চেষ্টা করিতেছিলো, তখন তাহার সম্মুখে তাহার ভবিষ্যতটা কত ভয়াবহ হইয়াই না দেখা দিয়াছিলো। আর সত্যই তো, আজ এই আত্মীয়-স্বজনহীন দাঙ্গা-হাঙ্গামার শহরে তাহার ভাইয়ের অন্তিম গতির কে ব্যবস্থা করিত। হাসপাতালের কর্মকর্তারা যদি তাহার মৃতদেহকে ডোমের হাতেই তুলিয়া দিতেন তাহা হইলেই বা সে কি করিতে পারিত। এই হাঙ্গামা মাথায় লইয়া কে তাহাকে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতো। অথচ বেচারির না হইয়াছে একটু ঘুম না একটু বিশ্রাম। সারাটা পথ সুরমার চিত্ত ব্যাপিয়া আজিজের কথাই দোল খাইতে লাগিল। তাহার অন্তর আজিজের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায় অকৃত্রিম সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

বাসায় নামিয়া আজিজ বলিল, সারারাত্রি আপনি একটুকুও চক্ষু বন্ধ করতে পারেন নি, সে আমি বুঝি। আর যে বিপদ এইমাত্র বয়ে গেল তার পরে একটুও বিশ্রাম করা যে কত দুঃসাধ্য সে কথা ডাক্তার হলেও আমার চেয়ে বেশি কে জানে? আপনি দেরি করবেন না। এখনি স্নানাদি সেরে নিন। আমি এই গাড়িতেই যাচ্ছি। কিছু খাবার যদি কোথাও পাই, দেখি। আর একটি বামুনকে চেষ্টা করে যদি পাই তো আমি এখনি নিয়ে আসব।....

সুরমা ভারি গলায় বলিল, আমি যদি ঘুমোতে না পেরে থাকি, আপনি যে একটু জিরোতেও পান নি। সেও তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। না, ডাক্তার সাহেব, আপনি যা করেছেন, কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে সে অমূল্যদানকে আমি মূল্য দিতে চাইব না। কিন্তু আপনিও আর দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন না।

একটু থামিয়া আবার বলিল, আর বামুন ঠাকুরের জন্যও এত ব্যস্ত হতে হবে না। আমি নিজের হাতেই সব আপাতত করে নিতে পারব। আর আপনি কোথায় পাবেন বামুন ঠাকুর। কে আসবে এই দাঙ্গার কালে নিজের প্রাণটুকু হারাতে। বৃথা চেষ্টা করবেন না। ওর চেয়ে আপনি দেরি না করে হাত-মুখ ধুয়ে নিন। চা বোধ হয় কিছু আছে। বিনা দুধে আমিই সত্বর যোগাড় করে আনছি। বলিয়া সুরমা আজিজকে কথার অবসর না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজিজের সেবার একান্ততায় সুরমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলো। এই সেবার একাগ্রতাই সুরমাকে তাহার এতবড় বিপদের মধ্যেও সান্ত্বনা আর ভরসা দিয়াছিলো। কিছুটা পরিমাণে সে তাহার নিজের দুঃখও এরই জন্য ভুলিতে পারিয়াছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। রাত্রি জাগিবার অভ্যাস তাহার আছে। কিন্তু ঘুমে ক্লান্ত না হইলেও অনেকগুলি অনেক প্রকার চিন্তা আসিয়া তাহার প্রাণশক্তিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছিলো। একটি আত্মীয় নাই, বান্ধব নাই, একটি বামুন ঠাকুর পর্যন্ত নাই। একা নির্বান্ধবভাবে কেমন করিয়া সুরমা থাকিবে। এই চিন্তাটাই তাহাকে বড় করিয়া পাইয়া বসিল। আজিজ বুঝিতে পারিয়াছে, এই বিপদের সময়ে আজিজের ওপর কতখানি নির্ভর করিয়া আছে সুরমা। কিন্তু সেই বা কি করিতে পারিবে। ক্ষণিকের দেখা। একে স্থায়ী করে রাখার বিপদও কি কম। হাসপাতালের ডাক্তার সে। এই দাঙ্গার কালে এই সাহায্যকে হিন্দু-মুসলমান, কেহই কি ভাল চক্ষুতে দেখিতে পারিবে? অথচ কোন হৃদয়েই বা সে সুরমাকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এই সমস্ত চিন্তা আসিয়া আজিজকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলো। আজিজ নিজেকে মহা সমস্যায় দেখিতে পাইল।

স্নান করিয়া চায়ের ব্যবস্থা সারিয়া সুরমা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। পায়ের শব্দে আজিজ চক্ষু মেলিয়া চাহিল। ডাক্তার আজিজের চক্ষে একটা মস্ত বড় আর্ট এক্ষণে ধরা পড়িল। সবুজ সাধারণ একখানা শাড়ি পরনে সুরমার। অবিন্যস্ত চুলের কয়েকটি আসিয়া কপোলের দুই পাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিলো। অনিন্দ্যসুন্দর মুখে গত রাত্রির বিপদের ছায়া পড়িয়া তাহাকে আরো গম্ভীর, সুন্দর ও শান্ত করিয়া তুলিয়াছিলো। আজিজ বিস্ময়ে মুগ্ধ-প্রায় চাহিয়া রহিল।

সুরমা ঘরে পা দিয়াই বলিল, খুব ঘুম পাচ্ছে বুঝি? পাবেই তো। ঘুমের তো আর দোষ নয়। এক নিমেষের জন্য কি চক্ষের পাতা বন্ধ করতে পেরেছিলেন? কিন্তু এখনো মুখ ধোননি যে? যান। আমার চা হয়ে গেছে?

আজিজ সুবোধ ছেলেটির মতো আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বলিল, যাই। আবার প্রশ্ন জাগিল, এতো বিপদের মধ্যে এতো যে স্বাভাবিক, সে কাহার জন্য, কাহাকে আশ্রয় করিয়া?

চা ঢালিতে ঢালিতে সুরমা বলিল, আজকেও আপনার নাইট ডিউটি আছে নাকি?

: না, আজ আর নাই।

: আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ঐ রুগীদের আর্তধ্বনির মধ্যে থেকে কাজ করতে আপনার অসহ্য বোধ হয় না?

আজিজ বুঝিল, সুরমা নিজের দুঃখ ভুলিয়া স্বাভাবিক হইতে চাহিতেছে।

আজিজ বলিল, যতক্ষণ হাসপাতালে থাকি ততক্ষণ আমার হুঁশ থাকে না, আমি কোথায় আছি। কোনো দিনই আমি হাসপাতালে বসে নরমাল কনডিশনে থাকতে পারিনে। কি একটা ভাব, একটা ইনসপিরেশন আমাকে রুগীদের ...।

*　　　*　　　*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে এসে পাণ্ডুলিপির দুটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেলো না। ছিঁড়ে গেছে। তারপরে আরো কয়েকটি পৃষ্ঠা আছে। গল্পের নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রীতিতে আবদ্ধ হচ্ছে। তবু তাদের দ্বিধা আছে। দ্বন্দ্ব আছে। একের মনে প্রশ্ন: এর শেষ কোথায়? অপরের মনের প্রশ্ন: 'ভিনজাতের এই যে লোকটি প্রতিদিন যে তাহাকে বিপদের আরম্ভ হইতে আগুলিয়া রাখিতেছে, তাহার বিপদের আরম্ভ হইতে সে যে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে অসংখ্য বিপদের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে বিপদের আগুনের হল্কা হইতে আড়াল করিয়া রাখিল, তাহার কি কোন দাম নাই? ...

তারপরে আবার ছিঁড়ে গেছে কিশোর লেখকের সেই পাণ্ডুলিপি। কেমন করে লেখক গল্পটিকে শেষ করেছিলো, তা আজ আর জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সেটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কয়টি পৃষ্ঠা পাওয়া গেল এই পাণ্ডুলিপির, তাতে অন্তত চল্লিশ বছর পূর্বের ঢাকা শহরের অধ্যয়নরত মুসলিম সমাজভুক্ত একটি কিশোরের মনের কিছু আভাস পাওয়া গেল। হয়ত এর মূল্য আছে কিছু, চল্লিশ বছর পরের প্রবহমান জীবনের নতুন কারিগরদের কাছে। কোনো কিছুই শূন্যের ওপর তৈরি হয় না। আর তাই কিছু তৈরির সময়ে তার ভেতরে সন্ধান আবশ্যক তার জমির, সে জমির নরম, শক্ত, গভীর, অগভীর উপাদানের।....

২০.৭.৮৩

AMARBOI.COM

আবে আইজ আর থাউক্কা

ঈদের পরদিন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের বাসায়, সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য। এখন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে কাছে পেলে আমি 'জিল্লুর' বলে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বোধনে ডেকে থাকি।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বেশ কয়েক বছর যাবৎ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ইংরেজির অধ্যাপক। বাংলাদেশের তিনি একজন সুপরিচিত কবি, প্রবন্ধকার এবং চিন্তাশীল সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর আলাপআলোচনা কিংবা বক্তৃতাতেও বেশ একটি চারুশীলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। পোশাক-পরিচ্ছদে অনাড়ম্বর, কিন্তু সুপরিপাটি। যে কারুর সঙ্গে আলাপে দুষ্প্রাপ্যরূপে ভদ্র, সুজন।

আমাকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। তাঁরও আগে তাঁর স্ত্রী আমার স্ত্রীকে চিনতেন। তখন অবশ্য এঁরা কেউ কারুর স্ত্রী হন নি। জিল্লুরের স্ত্রী শিক্ষাজীবনে আমার স্ত্রীর কিছু বয়োকনিষ্ঠ বলে আমার স্ত্রী তাঁকে নাম ধরে ডাকেন। এঁদের সাক্ষাৎ ঘটেছিলো যখন এঁরা ইউনিভার্সিটিতে বি.এ এবং এম.এ পড়েন, তখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিল্লুর আমাকে জানেন জেলখাটা লোক বলে। পঞ্চাশের দশকে জেলখাটা মুসলমান বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের একটা ভিন্নতর সম্মান ছিলো উন্মুক্ত মুসলমান বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদদের কাছে।

পঞ্চাশের দশকেরও বোধ হয় পরের কথা। আমি ছিলাম রাজশাহী জেলে বন্দী। হয়ত '৬০-৬১-র দিকে। আমার স্ত্রী ঢাকা থেকে আমাকে পাঠাতে চেয়েছিলেন কিছু খাবার-দাবার, টুকিটাকি। জিল্লুর তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজির অধ্যাপক। জিল্লুর আগ্রহ করে তা সংগ্রহ করে আমার জেলখানাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ কাজটি আমার প্রতি তাঁর একটি সশ্রদ্ধ প্রীতিরই পরিচয়। তারপরে আমার নিজের বর্তমানে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতার পর্যায়ে প্রায়ই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে কোনো আলোচনার বৈঠকে কিংবা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে। কিন্তু সম্প্রতি এই পরিচয়টিকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করে তুলল আমাদের উভয়ের উত্তর-পুরুষগণ : তথা আমার মেয়ে এবং তাঁর মেজ ছেলেটি। তারা উভয়ই চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত। ছেলেটি (শাকিল) মাত্র মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষা পাস করেছে। আমার মেয়েটি শেষ বর্ষে উঠেছে। তাদের নিজেদের জগতের বক্তৃতা, বিতর্ক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের পারস্পরিক পরিচয়। উভয়েরই সরল এবং সাহাস্য সামাজিকতার একটি গুণ আছে এবং কিছুদিন পরে উভয়েই সরলভাবে তাদের বাপ-মা'র কাছে বলল : তারা দু'জনে সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। ছেলে, মেয়ে, কোনো পক্ষের বাবা-মা'রই এতে আনন্দ বই আপত্তির কোনো কারণ ছিলো না। এ ক্ষেত্রে জিল্লুরের মন্তব্যটি ছিলো সরস। বলেছিলেন : যা দিনকাল! ছেলে যে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করেছে, এতেই তো বাবা-মা কৃতজ্ঞ।

কাজেই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সামাজিক আত্মীয়তার ক্ষেত্রে আজ আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ। গতকাল কিছুক্ষণ বসেছিলেন। 'কেমন আছেন' কথার পরেই আমি বললাম : 'চল্লিশের দশকের ঢাকা' সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? আপনি কবে এসেছিলেন ঢাকা?' জিল্লুর প্রশ্নটির তাৎপর্য বুঝলেন। সম্প্রতি 'চল্লিশের দশকের ঢাকা' আমাকে প্রায় ভূতের মতো পেয়ে বসেছে। এর ওপর একটি লেখা এবারকার ঈদসংখ্যা 'সংবাদ-এ' দিয়েছি। সবটা বেরোয় নি। তবু কিছুটা বেরিয়েছে। তাতে চল্লিশের দশকের ঢাকার কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য উদঘাটনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই একই সংখ্যায় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নিজেরও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যার ওপর একটি লেখা বেরিয়েছে। একই সংখ্যায় একই পৃষ্ঠায় রাজশাহীর অধ্যাপক সনৎকুমার সাহার 'আর এক একুশে ফেব্রুয়ারি' নামে 'তেভাগা' আন্দোলনের প্রসঙ্গ নিয়ে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা বেরিয়েছে। এ লেখাটিও ভাল। পুরোন যে ঘটনা ও আন্দোলনে মহৎ ঐতিহ্যের সম্ভাব রয়েছে তাকে এ যুগের তরুণ ও সমাজকর্মীদের কাছে তুলে ধরার যে প্রয়োজনের কথা আমি 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'র সূচনাতে উল্লেখ করেছি, সেই বোধ থেকেই সনৎও তেভাগার অবিস্মরণীয় কিছু ঘটনাকে আবার স্মরণ করেছেন এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রখ্যাত কৃষকনেতা আবদুল্লাহ রসুল তেভাগার কাহিনী নিয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার আলোচনা প্রসঙ্গেই ব্যাপারটি এসেছে।

জিলুরের কাছে আমার প্রশ্নে জিলুর বললেন : একে তো ছেলে আমি যশোরের এবং কলকাতার সাথে চলাচলের ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক ছিলো সকাল-বিকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তায় আমার শৈশব যদি বা কেটেছে যশোরে, কৈশোর কেটেছে জলপাইগুড়িতে, আব্বার সঙ্গে। আরো যখন একটু বড় হলাম, আই.এ পড়ার সময় এল, তখন গেলাম স্বাভাবিকভাবে কলকাতার প্রেসিডেন্সিতে। ঢাকাতে তো আমি আসি নি। কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে এসেছি ভাঙ্গাভাঙ্গির পরেই মাত্র, '৪৭-এ।

আমি বললাম : তবু কলকাতা থেকে ঢাকাকে সেকালে কি চোখে দেখতেন?

জিলুর বললেন : ঢাকার প্রধান পরিচয় ছিলো আমাদের কাছে দাঙ্গার শহর বলে। তাই ভীতিজনক।

আমি বললাম : অথচ '৪৬-এ সাম্প্রদায়িক গণহত্যা হলো কলকাতাতে। তার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাতেও শুরু হয়ে যেতে পারত নরমেধযজ্ঞ। কিন্তু তা যে হলো না, সে স্মৃতি আমার সচেতন গৌরবের স্মৃতি। ১৬ আগস্টের খবরে আমরাও কেঁপে উঠেছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার প্রগতিশীল অংশটি। আমি তখন এম.এ পড়ি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ কিছুটা জড়িত হয়েছি। আমরা ১৭ কিংবা ১৮ আগস্ট ঢাকাতে বের করেছিলাম হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি রক্ষার শান্তি মিছিল। সে মিছিলটি স্মরণীয় ছিলো। তার উদ্যোগ এসেছিলো বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী মহল থেকে। ঢাকার মুসলিম লীগের প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দ যাঁরা বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, তাঁরাও যুক্ত ছিলেন এই মিছিলে। এ কারণে শাহ আজিজুর রহমান, ফরিদ আহমদ এদের মতো সেদিনকার মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের পক্ষে এ শান্তি মিছিলের বাইরে থাকা সম্ভব হয় নি।

শাহ আজিজের কথা উঠতে জিলুর বললেন, ঐ প্রেসিডেন্সিতে পড়ার কালে মুসলিম লীগ এবং শাহ আজিজের রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ আমারও একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটেছিলো। '৪৬ সালে ফরিদপুরের নির্বাচনে ভলান্টিয়ারি করেছি বলে আমারও মনে পড়ে। সেটার নেতৃত্ব শাহ আজিজই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমাদের, মোহন মিয়াকে জেতাতে হবে। মোহন মিয়াই মুসলিম লীগের আসল প্রার্থী। বাদশাহ মিয়া নন। বাদশাহ মিয়াকে সমর্থন যোগাচ্ছেন জনাব সোহরাওয়ার্দী।

জিল্লুরও যে রাজনীতির কাছাকাছি কিছুটা ছিলেন তা শুনে আমার আনন্দ হলো। শাহ আজিজকে আমি '৪২-৪৩ সাল থেকে দেখেছি। '৪৬ সালে আমার মনে হয়, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজিতে। অবশ্য এর আগে আলীগড়ও হয়ে এসেছেন। তুখোড় বক্তা ছিলেন : ইংরেজি, বাংলা ও উর্দুতে। অবশ্য কারুর মধ্যে এতো বেশি দক্ষতা থাকলে স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে অহমিকা আর দক্ষতার সুবিধাজনক ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি প্রবণতারও প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে শাহ সাহেব কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন বলে আমার স্মৃতিতে তেমন কোনো ঘটনা নেই। শাহ সাহেবের সঙ্গে বহুদিন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটে নি। সাম্প্রতিকালে তিনি 'রাজপুরুষ' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সরকারি নেতার স্থানেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ এমন হলে তখনি আমার বেশি করে সঙ্কোচ জাগে। ব্যবধানটা তখনি বৃদ্ধি পায়। অথচ এটা ঠিক যে, চল্লিশের দশকের ঢাকার কর্মকাণ্ডে, এর প্রতি-ধারার অন্যতম নেতা হিসেবে শাহ আজিজুর রহমানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো।

দাঙ্গার শহর ঢাকা। একথা ঠিক। 'ক্রনিক' দাঙ্গা। তবু তো ঢাকা থেকে পালালাম না কোথাও। এমন মনে পড়ে না, ঢাকাতে দাঙ্গা লেছে এবং সে কারণে হোস্টেল থেকে গাঁটরি-বোচকা বেঁধে ঢাকা ত্যাগ করে নিজ বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছি। না, তেমন কোনোদিন হয় নি। ঢাকার দাঙ্গা আমাদের সেকালের ম্যালেরিয়ার মতো আমরা সহ্য করেছি। তা নিয়ে জীবনযাপন করেছি। মহামারী আকারে ঢাকায় কখনো দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নি। গণহত্যা ঘটে নি। দাঙ্গা বাধলে তার শিকার অবশ্য নিরীহ পথচারীরা হয়েছে। যারা গ্রাম থেকে হঠাৎ শহরে এসেছে। কোনটা প্রধানত হিন্দুপাড়া, কোনটা মুসলমান পাড়া, তা যার জানা নেই। ঢাকার মানুষ দাঙ্গায় নিহত হয়ত কমই হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে মহররম বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে। কিংবা ভারতের অপর কোথাও কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় যদি কেউ নিহত হয়েছে তবেই বুঝতাম দাঙ্গা বেধেছে। দাঙ্গার এমন সংবাদে শহরটা বিভিন্ন জায়গাতে দু'ভাগে আপসে ভাগ হয়ে যেতো। যেমন ধরা যাক, ঢাকার মধ্যকার মূল সড়ক নওয়াবপুরের কথা। ঢাকা রেলস্টেশন থেকে নওয়াবপুর ছিলো হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাকা। কিন্তু নওয়াবপুর রোড যেই রায় সাহেবের বাজারের পুল পৌঁছত, অমনি শুরু হত মুসলিম এলাকা। সদরঘাট থেকে তখন আমি মুসলমান যদি রমনা আসতে চাইতাম তবে রায় সাহেবের বাজার পর্যন্ত এসে ঘোড়ার গাড়ির 'খেয়া' ধরতাম। ইংলিশ রোড আর নাজিমুদ্দীন রোড বরাবর এই খেয়া চলত। যেন মাঝখানে একটা নদী বা খাল বিশেষ। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা শেয়ারে যাত্রী নিয়ে ইংলিশ রোডের বিপজ্জনক এলাকা পার করে ফুলবাড়িয়া-নাজিমুদ্দীন রোডে আমাদের পৌঁছে দিত।

দাঙ্গার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি দেখা দিতো ঢাকার বিখ্যাত দু'টি পর্বের সময়ে। এদের একটি ছিলো জন্মাষ্টমীর মিছিল। 'জন্মাষ্টমী' মানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন : ভাদ্র মাসে পর্বটি অনুষ্ঠিত হতো। হিন্দু সম্প্রদায়ের। আর একটি ছিলো মহররমের মিছিল। হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর মিছিলের উদ্যোগ নিত হিন্দু মধ্যবিত্ত তরুণরা এবং শাঁখারী পট্টি বা নওয়াবপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা। এই মিছিল হয়ত শুরু হতো সদরঘাট বা তারও পূর্বের লালকুঠি, লোহারপুল ইত্যাদি এলাকা থেকে। বহু চলন্ত মঞ্চে নানা রঙ্গ-তামাশা মঞ্চস্থ হতো। এই সব চলন্ত মঞ্চ আস্তে আস্তে অগ্রসর হত নওয়াবপুর রোডের মধ্য দিয়ে। দু'পাশে রাস্তায় এবং বাড়ির বারান্দা ও ছাদে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মিছিল দেখত। দূর-দূর গ্রাম থেকে শিশু কিশোর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আসত। জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখা একটা পুণ্যের কাজ বলে তারা মনে করত। মহররমের মিছিলও তাই। তাজিয়া বেরুত। 'হায় হাসান, হায় হোসেন' করে শোক মিছিল বেরুত। আজকাল জন্মাষ্টমীর মিছিল একেবারে বিলুপ্ত। মহররমের মিছিলেরও সেই শান আছে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে দুটো জিনিস আমার স্মৃতিতে ভাসে। একটি হচ্ছে, চল্লিশের দশকের মধ্যভাগে এই দু'টি মিছিলের উপলক্ষ এলেই আমরা অর্থাৎ বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতাম, পাছে না এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে যায় এবং যাতে তা না বাধে তার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠিত হতো। এমন কমিটি গঠনের মূল উদ্যোগ আসত সেদিনকার ঢাকার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে। তারাই গায়ে পড়ে, উদ্যোগ নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের যৌথ মিটিং করতেন। এমন মিটিং অনেক সময়ে নওয়াব বাড়িতে কিংবা ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ঢাকা বিভাগের কমিশনারের অফিসেও অনুষ্ঠিত হতো। যখন উত্তেজনা বেড়ে যেত তখন শান্তি কমিটি এবং সরকারি প্রশাসন উভয়ই যৌথভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে কিভাবে শান্তি রক্ষা করা যায়। নওয়াবপুর পুল যেন ছিল 'দুই দেশের' মধ্যকার সীমান্ত। সরকারি ফৌজ নওয়াবপুর পুলের ওপর একদল উত্তরমুখো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ হিন্দু এলাকার দিকে আর একদল দক্ষিণমুখো অর্থাৎ মুসলিম এলাকার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এমন দৃশ্য চোখ বুজলে আমি এখনো দেখতে পাই।

ঠিকই, উত্তেজনা রাজনৈতিক কারণে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ধর্মীয় মিছিল ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করছিলো। জন্মাষ্টমীর চলন্ত রঙ্গমঞ্চে হয়ত বা জিন্নাহ সাহেবকে নিয়ে কৌতুক করা হচ্ছে কিংবা অপর কোনো রাজনৈতিক ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। তারই পাল্টা মহররমের সময়ে মহররমের মিছিলে মুসলিম লীগ অর্থাৎ মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক ধারা যে-সব নেতাকে হেয় করতে চাইত তাদের মূর্তি বা কুশপুত্তলিকা দাঁড় করিয়ে মঞ্চ তৈরি করে তা চালিয়ে নিতো। জিন্নাহ সাহেবকে যেমন হিন্দু সমাজ পছন্দ করতো না, তেমনি মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক গোড়াপন্থীগণ কংগ্রেসের অন্যতম মুসলিম নেতা মওলানা আজাদকে পছন্দ করতো না। তারা তাঁকে মনে করতো কওমের বিশ্বাসঘাতক বা 'গাদ্দার' বলে। আর তাই মহররমের মিছিলে চলন্ত মঞ্চে তাঁকে বিচার করার একটি ব্যঙ্গ অনুষ্ঠানের কথা আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে।

এসবই ছিলো রাজনৈতিক দাহ্য পদার্থ। আর তাই চল্লিশের দশকের গোড়াতে ঢাকাতে এই দুটি মিছিল দেখার যদি আগ্রহ ছিল আমার মনে, পরবর্তীকালে একজন সচেতন কর্মী হিসেবে এই দু'টি মিছিলের সময় হলেই উদ্বেগে আশঙ্কায় মন ভরে উঠতো।

যে শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টার কথা বলেছি তা সেদিন হয়তো ভয়ানক কিছু ছিলো না। এ সব সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে ঘটনা যে না ঘটেছে, তা নয়। তবু জন্মাষ্টমী আর মহররমে যে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটত ঢাকায়, তাতে অশুভ শক্তির বাইরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং সহনশীলতা এবং আনন্দভোগের মনোভাবটি প্রধান না হলে ১৯৪৬-এর আগস্টে কলকাতায় যা ঘটেছে তা ঢাকায় প্রতিবছর অন্তত দু'বার করে ঘটতে পারতো। তেমন যে ঘটে নি, তার কারণ নিয়ে আমাদের তরুণ গবেষকদের কি একটু গবেষণা করা উচিত নয়?

এই প্রসঙ্গে দাঙ্গার ক্ষেত্রেও ঢাকার স্থানীয় অধিবাসীদের রসবোধের যে বৈশিষ্ট্য এককালে সুপরিচিত ছিলো, তার উল্লেখ করা যায়।

আগামসিহ্ লেন মুসলমান পাড়া। বেচারাম দেউড়ী হিন্দুপাড়া। দাঙ্গা চলছে। দাঙ্গার আবহাওয়া। দাঙ্গা কেবল ছুরি দিয়ে হয় না। আগামসিহর ইট পড়ছে বেচারাম দেউড়ীর টিনের চালে। বেচারাম দেউড়ীর ইট আগামসিহতে। বিরামহীনভাবে ইটের উত্তর প্রত্যুত্তর চলতে চলতে রাত দশটা পার হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমের সময় এসে গেছে। তখন আগামসিহ্ ঢাকাইয়া ভাষায় ডাক দিয়ে বলছে : আবে, আইজ আর থাউক্কা, ঘুমা। আবার কাইলকা ছুরু করিছ।' বেচারাম দেউড়ী জবাব দিচ্ছে : ঠিক আছে। ....

অগ্রজপ্রতিমকে স্মরণ করি

প্রয়াত অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিমের লেখা 'ফাল্গুনকরা'। কিন্তু নাজমুল করিম লেখক হিসেবে স্পষ্টভাবে নিজের নাম ব্যবহার করেন নি। লেখকের নাম লিখেছেন, 'ইবনে রশিদ', অর্থাৎ 'রশীদের পুত্র'। নাজমুল করিমের পিতা ছিলেন শিক্ষাবিদ আবদুর রশিদ। কুমিল্লা জেলার মানুষ। নাজমুল করিম তাঁর বাবা, মা, দাদা, নানা, পূর্ব-পুরুষদের জীবনের, তাদের সময়কার সমাজের ঘটনা, কাহিনী, কিংবদন্তি, সংস্কার—এই বইতে বর্ণনা করেছেন তৃতীয় পুরুষ হিসেবে। এর মধ্যে ভেসে উঠেছে পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের একটি মুসলিম পরিবারের ক্রমবিকাশের কাহিনী। লেখকের লেখার ধরনটি প্রাঞ্জল। কথা ছোট ছোট সহজ বাক্যে আবদ্ধ। তাঁর বিবৃত কাহিনীতে উনিশের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকের গ্রামীণ সমাজচিত্রেরও আভাস পাওয়া যায়।

এই 'ফাল্গুনকরা'র প্রকাশকাল দেখা যায় ১৯৫৮ সাল। নাজমুল করিমের একটি সমাজতাত্ত্বিক তথা সমাজের বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর 'ফাল্গুনকরা' বইতে বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যদি তাঁর জীবনের পরবর্তীকালের কর্মকাণ্ড এবং তার ফলের কথা বাংলাতে প্রকাশ করতেন, তাহলে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান প্রভূতভাবে উপকৃত হতো। নাজমুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মহাবিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য একজন মিশনারির ঐকান্তিকতা, উদ্যোগ ও পরিশ্রম নিয়ে কাজ করেছেন। এজন্য বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের অগণিত ছাত্র-শিক্ষক তাঁর গুণমুগ্ধ এবং ভক্ত। তাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

নাজমুল করিমের সঙ্গে আমার নিজের সম্পর্ক ছিলো পারস্পরিক স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক। নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই অসময়ে এবং আকস্মিকভাবে তাঁকে তাঁর জীবনের প্রিয় প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপ্রবাহকে পরিত্যাগ করে যেতে হয়েছে। 'ফাল্গুনকরা'-তে যে জ্যেষ্ঠ ভাই সম্পর্কে তিনি এত বিস্তারিত লিখেছেন এবং নিজেকে নেপথ্যে রেখেছেন, তিনি শুনেছি আজো সৌভাগ্যবশত জীবিত এবং কর্মক্ষম রয়েছেন। এটি নাজমুল করিমের পরিবারবর্গের নিকট যেমন আনন্দের, তেমনি নাজমুল করিম, যিনি তাঁর পরিবারের অন্যতম গর্ব এবং গৌরবের পাত্র তাঁর এই অকাল বিয়োগ তাঁদের নিকট এক দুঃসহ আঘাত-স্বরূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজমুল করিমকে স্মরণ করতে চাইলে আমার নিজের মন চলে যায় দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর আগের কালে। সে সময়টা আমার যেমন কিশোরকাল, তেমনি নাজমুল করিমেরও তরুণকাল। ১৯৪০-৪১ সাল আজকের চুরাশি সাল থেকে চুয়াল্লিশ বছর পেছনের কাল। মহাকালের পরিমাপে এটি ক্ষণকালও নয়। তথাপি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এই সময়টাতেই আমাদের দেশ ও সমাজের এত বিচিত্র পরিবর্তন এত দ্রুত সংঘটিত হয়েছে যে চুরাশি থেকে পেছন ফিরে তাকালে সেই চল্লিশের ঢাকার পরিবেশ ও জীবনকে এক ছায়াঘেরা, নির্দ্বন্দ্ব রোমান্টিক জীবনের যুগ বলে মনে হয়।

আমি নিজে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বরিশাল থেকে এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৪০-এর মধ্যভাগে। ঢাকা কলেজ তখন ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের চিহ্নধারাক কার্জন হলের অপর পারে লাটভবনে স্থাপিত। কেবল যে আমি, তা নয়। সেদিন যে পূর্ববঙ্গের মুসলিম কৃষক বা মধ্যবিত্ত সমাজের কিশোর ও তরুণরা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ঢাকায় আসতে শুরু করেছিলো এবং এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের প্রাসাদোপম ভবনরাজিতে প্রবেশ করছিলো, এ ঘটনাও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের এক স্মারক।

ঢাকা কলেজে আমি নাজমুল করিমের সাক্ষাৎ পাই নি। কিন্তু তাঁর ছোট ভাই লুৎফুল করিমের আমি সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। আমুদে মানুষ লুৎফুল করিম ছিলো আমার সহপাঠী। ঢাকা কলেজের হোস্টেল তথা তার ছাত্রদের আবাসিক ভবন, বর্তমানে ফজলুল হক হলে, লুৎফুল করিমসহ আমাদের সমদৃষ্টি এবং মেজাজের একটি কিশোর দল গড়ে উঠেছিলো। এরা এক সাথে উঠত, বসত, জোট করে বই পড়ত, সাহিত্যের মিটিং করতো, হাতে লেখা সাহিত্যপত্র প্রকাশ করত। এদের মধ্যে ছিলো আবুল কাসেম, নাসিরউদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল মতিন, এ এইচ এম কামালউদ্দিন। এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে শিক্ষা, প্রশাসন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে নিজ নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু সেদিনের কথা স্মরণ করলে আজকের সমস্যাপীড়িত আমাদের কোনো মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। ভেসে ওঠে সেদিনের জীবনোচ্ছল কয়েকটি তরুণের মুখ।

নাজমুল করিম তখন হয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ক্লাসের ছাত্র। তিনি থাকতেন আজকের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভবন এবং সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের দোতলার একটা দিকে। সেই ভবনেই তখন ফজলুল হক হল ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

কেমন করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো, তা আজ স্মরণে নেই। কিন্তু ১৯৪২ সালে আই.এ পাস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পূর্বে যে ঘটনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা স্নেহ-শ্রদ্ধা এবং হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম, সে ঘটনা বিস্মৃত হই নি। বলা চলে সে এক রাজনৈতিক ঘটনা।

নিস্তরঙ্গ ঢাকার বুকেও তখন ছোটবড় ঢেউ জাগতে শুরু করেছিলো। ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে তীব্র হয়ে উঠছিলো। তার ঢেউ ঢাকার ছাত্রদের মধ্যে প্রধানত এসে আঘাত করতো কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির হিন্দু-তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। তারা ধর্মঘট আহ্বান করতো। মিছিল বের করতো। তারাই পুলিশের লাঠি-পেটা খেত। মুসলমান ছাত্ররা তার যে বিরোধিতা করতো, তা নয়। কিন্তু গভীরভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে সেই দৈনন্দিন আন্দোলনে যে তারা জড়িত হতো না, সে কথাও সত্য। কিন্তু সাধারণভাবে কিংবা সামগ্রিকভাবে মুসলিম ছাত্ররা এতে জড়িত না হলেও ইংরেজ সরকার বিরোধী এরূপ জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন মুসলমান সমাজের ছাত্রদের মধ্যে কারো কারো মনকে যে আলোড়িত করে তুলত না, তাদের মনেও যে প্রশ্নের উদ্রেক করতো না, এমনও নয়। এরই প্রভাবে সেকালে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেও, ক্ষুদ্র হলেও, একটা জাতীয়তাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হতে থাকে।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মুসলিম লীগ সম্মেলনে গৃহীত হওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবে ঢাকার মুসলমান ছাত্রসমাজ সেই আন্দোলনের আকর্ষণে আলোড়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু '৪২-৪৩ সালে মুসলমান সমাজের রাজনীতিও অখণ্ড ছিলো না। মুসলিম লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের ফলে বাংলাদেশের কৃষক ও মধ্যবিত্ত সমাজের অবিসংবাদিত নেতা এ.কে. ফজলুল হক আইন পরিষদে ভিন্ন দল গঠন করেছেন এবং আইন পরিষদে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ত্রিপরিষদও গঠন করেছেন। হক সাহেবের সঙ্গে রয়েছে ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ। মুসলিম সমাজের এই বিভেদে ক্ষুব্ধ হয়ে লীগপন্থী ছাত্র এবং তরুণরা নিন্দাসূচক ভাষায় এই মন্ত্রিসভাকে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা বলে অভিহিত করছে। এমনি অবস্থায় হক সাহেবর ঢাকা আসার কথা ঘোষিত হলো। নবাব হাবিবুল্লাহর তখন ঢাকার বাইরে না হলেও ঢাকার স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা। কেননা তিনি ঢাকার নবাব। আর ঢাকার নবাব তখনো ঢাকার মুসলমানদের সমাজ-নমাজের প্রধান পুরুষ। কিন্তু সে প্রভাব রেললাইনের দক্ষিণ পাড়েই সীমাবদ্ধ। ঢাকার রেললাইন ছিলো সেদিন মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে, অন্তত নতুন পুরাতনের বিভক্তি লাইন। রেলাইনের উত্তর পাড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আর তার ছাত্রাবাস সলিমুললাহ এবং ফজলুল হক হলে অবস্থান করে মুসলমান ছাত্রবৃন্দ। এদের সকলেই, বলা চলে, অ-ঢাকাবাসী তথা বহিরাগত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যে কারণে একথার উত্থাপন সেটি হচ্ছে এই যে, নতুন পুরানের দ্বন্দ্ব যে সর্বদা সহজভাবে প্রকাশ পেত, তা নয়। নতুন ঢাকার সকল মুসলমান ছাত্রই যে সেদিন মুসলিম লীগ এবং মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্বে চলত, এমন নয়। তারই প্রকাশ ঘটলো '৪২-এর গোড়ার দিকে, হক সাহেবের ঢাকা আগমনকে কেন্দ্র করে।

হক সাহেব ঢাকা আসবেন। সবেমাত্র তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। কাজেই ঢাকার অধিবাসীদের তরফ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন হলো। এই সংবর্ধনা নিয়েই ঢাকার মুসলিম ছাত্রসমাজ যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। এক দল অভিহিত হল প্রো-হক বা হক সমর্থক বলে, অপর দল এ্যান্টি হক বা হক-বিরোধী বলে।

ফজলুল হক হলে নিশ্চয়ই প্রো-হকদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন এ.কে. নাজমুল করিম। নাজমুল করিম তাঁর কলেজ জীবন থেকেই কলেজের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, আলোচনা, বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর অনুরক্ত একটি দল স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়েছিলো। এ দলটির বৈশিষ্ট্য ছিলো, এ দলের ছাত্ররা চিন্তা এবং বুদ্ধিতে তীক্ষ্ম, মতবাদে সমাজতাত্ত্বিক, অসাম্প্রদায়িক এবং খানিকটা সমাজবাদীও। সংবর্ধনা নিয়ে ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে প্রো-হক ও এ্যান্টি হকদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটেছিলো। প্রো-হকদের প্রধান জমায়েত ছিলো ঢাকার স্থানীয় অধিবাসী, যারা 'কুট্টি' নামে সাধারণত অভিহিত হতেন এবং এ কারণে স্টেশনে প্রো-হক পক্ষই ছিলো প্রধান এবং এ্যান্টি হক ছাত্ররা হয়েছিলো পরাজিত। কিন্তু পর্যুদস্ত দল অর্থাৎ মুসলিম ছাত্রাবাসের রাজনৈতিক ছাত্রদের অধিকাংশের দল প্রতিশোধ নিল হলে ফিরে এসে প্রো-হকদের ওপরে। নাজমুল করিমের বিছানাপত্র তারা তছনছ করল, ফেলে দিল উপর থেকে নিচে। ফজলুল হক হলের এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমার নিজের জানা নেই। কিন্তু ঢাকা কলেজের হোস্টেলের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যেও যে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া পড়েছিলো তা আমি সাক্ষাৎভাবেই জেনেছিলাম। কলেজ ছাত্রাবাসের আমার 'দলটি'ও ঘটনাক্রমে প্রো-হক বলে বাকি ছাত্রদের দ্বারা অভিহিত হলো এবং এই ছাত্রাবাসের মুসলিম লীগপন্থী ক্ষুব্ধ ছাত্ররা স্টেশন থেকে ফিরে এসে আমাদের ওপরও রূঢ় আচরণে আঘাত হানার চেষ্টা করল। আমাদের মধ্যে নাজমুল করিমের অনুজ লুৎফুল করিম ছিলো অধিক পরিমাণে খোলামুখ। খাওয়ার ঘরে যাওয়ার সময়ে আক্রমণ হল তার ওপর। দৈহিকভাবে আঘাত আমার ওপর না এলেও হোস্টেলের পরিবেশ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বেশ গরম এবং পড়াশোনার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াল। এমনি অবস্থাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোস্টেল ছেড়ে আমি বরিশালে নলছিটি শহরে আমার চাকরিরত বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে আই.এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। এ ঘটনা স্মরণে পড়ছে এই জন্য যে, মাস দুই পরে আই.এ পরীক্ষা দিয়ে আবার বরিশাল গিয়ে অপেক্ষা করছি পরীক্ষার ফলের জন্য। তখন একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে নাজমুল করিমই আমার ভাইয়ের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে আনন্দের সঙ্গে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমি ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষাতেই আই.এ-তে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছি, এতে আমার চাইতে তাঁরই আনন্দ এবং গর্ব ছিলো বেশি।

এর পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাজমুল করিমের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলাম। ইউনিভার্সিটিতেও নাজমুল করিমকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গ্রুপ তৈরি হয়েছিলো। এরা যে কেবল মুসলিম ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ছিলো তা নয়। নাজমুল করিমের সহপাঠী ছিলেন রবি গুহ। তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী এবং কমিউনিস্ট। তাঁদের মতাবলম্বী ছাত্রদলের নাম ছিলো ছাত্র ফেডারেশন। রবি গুহ এবং তাঁর অপর বন্ধুরা, যাদের মধ্যে ছিলেন মদন বসাক, অনিল বসাক, দেবপ্রসাদ মুখার্জি এবং হেসামুদ্দিন আহমদ—এঁরা সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট কর্মী। '৪২ কিংবা '৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিলো, যাতে প্রাণ হারিয়েছিলো মুসলিম ছাত্রনেতা নাজির আহমদ, সে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন নাজমুল করিম, হেসামুদ্দিন (বাহাদুর), রবি গুহ এবং তাঁর অপর বন্ধুরা। এবং দাঙ্গাবিরোধী মনোভাবের কারণে তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ছাত্রদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিতও হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রগতিশীল ও সমাজতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন গ্রুপের সঙ্গে পরবর্তীকালে এসে যুক্ত হয়েছিলো মুনীর চৌধুরী। মুনীর চৌধুরী ক্রমান্বয়ে তার বাকশৈলী, তীক্ষ্মধার বুদ্ধি এবং পরিহাসপ্রিয়তার সেদিনকার ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রমনি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমি নিজে ছিলাম দর্শন বিভাগের ছাত্র। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ত অধিকতর তৈরি হয়েছিলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেরই ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে। নাজমুল করিম, রবি গুহ, দেবপ্রসাদ মুখার্জি—এঁরা ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ডি. এন. ব্যানার্জি, এ.কে সেন এবং আবদুর রাজ্জাক—এঁরা ছিলেন যেমন নাজমুল করিম, রবি গুহের প্রিয় শিক্ষক, তেমনি আমারও বস্তুত নাজমুল করিম-রবি গুহের মাধ্যমেই আমি পরিচিত হয়েছিলাম এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সঙ্গে। আমার অনার্সের অনুষঙ্গী বিষয়েরও একটি ছিলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান। নাজমুল করিম তাঁর পরবর্তী জীবনের শিক্ষকতা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণার জীবনে এঁদের কথা, বিশেষ করে অজিতকুমার সেনের কথা, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। নিজের একখানি গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে বলেছেন : 'আমার সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার অনুপ্রেরণাদাতা হচ্ছেন অজিতকুমার সেন।' অজিত সেন যথার্থই একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। আচার-আচরণে তিনি ছিলেন অভিজাত। শুভ্র ধুতি এবং পাঞ্জাবি ছাড়া অপর কোনো পরিধানে তাঁকে কখনো দেখেছি, এমন কথা স্মরণ করতে পারিনে। কথা বলতেন ধীর উচ্চারণে এবং বাংলায়। কেবল যে ব্যক্তিগত আলাপে বাংলা ব্যবহার করতেন, তা নয়। ক্লাসে আলোচনা করতেন বাংলায়। আমাদের টিউটোরিয়াল খাতা সংশোধন করে তার পাশে মন্তব্য করতেন বাংলায় এবং বিভাগে নিজের চাকরিগত ছুটি বা অন্য কোনো প্রয়োজনের বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সম্বোধন করে চিঠিপত্র রচনা করতেন বাংলায়। সুন্দর হস্তাক্ষরে তৈরি তাঁর সেসব মন্তব্য বা যোগাযোগপত্রে কোনো কৃত্রিমতা ছিলো না। বরঞ্চ তাঁর নিজের আচার-আচরণের সরল ও সতেজ ভাবটি সেদিনকার ইংরেজি বচন-বাচন, পোশাক-আশাক পরিবেশকেই করত ব্যঙ্গ। নাজমুল করিম-রবি গুহের সঙ্গেই আমার যাতায়াত শুরু হয়েছিলো অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের বাসায়। সেকালে আমরা যে শ্রেণীকক্ষেই কেবল আমাদের শিক্ষকদের আলোচনা শুনতাম, তা নয়। সেদিনকার সেই রোমান্টিক পরিবেশকে যে উপাদানটি আরো গাঢ় এবং ঘন করে তুলতো তা শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পারিক নৈকট্য ও সাহচর্য। ব্যাপারটি হয়ত ব্যাপকভাবে ঘটতো না। কিন্তু বুদ্ধিমান, লেখাপড়ায় আগ্রহী ছাত্রদের জন্য খ্যাতিমান শিক্ষকদের কেবল দরজা নয়, তাঁদের বাসগৃহের কক্ষও ছিলো অবারিত। অনার্স এবং এম.এ-তে ছাত্রসংখ্যা অবশ্য তখনো কম ছিলো। এবং এদের মধ্যে যারা মেধাবী ছিলো তারা জ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সময়-অসময় নির্বিশেষে চলে যেত শিক্ষকদের রমনার নীলক্ষেতের সড়কের এপাশের-ওপাশের ভবনগুলোতে। আমার নিজের অনার্সের শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্য যেমন ছিলেন দর্শন বিভাগের প্রধান, তেমনি ছিলেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ। নিজে থাকতেন যে ভবনটিতে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের রাস্তার বিপরীতে, সেটি আজ বিলুপ্ত। তার জায়গাতে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের বহুতল আবাসিক ভবন। কিন্তু সেদিন হরিদাস বাবুর ভবনের সামনে ছিলো একটি পুকুরও। এবং তাতে ছিলো বাঁধানো ঘাট। তাঁর এই ভবনটিতে তিনি আমাদের ডেকে নিতেন অনেক সময়ে ক্লাসের অসমাপ্ত আলোচনা সমাপ্ত করার জন্য। বলতেন, চলো বাসায় যেতে যেতে কথা বলি। কিংবা বলতেন, কাল সকালে এসো বাসায়। তখন আলোচনাটা শেষ করে দেবো। রাজ্জাক স্যারের বাসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলো ভিন্ন আকর্ষণ আপ্যায়ন তো বটেই। সহৃদয়, সমৃদ্ধ আপ্যায়ন। ছুটির দিনে সকাল না হতেই আমাদের মনে একটা টান উঠত। হয়ত নাজমুল করিম বলতেন, তাঁর স্মিত মুখে, কি সরদার যাবেন নাকি আজ রাজ্জাক স্যারের বাসায়? এমন আহ্বানে না বলার কোনো ব্যাপার থাকতো না। রাজ্জাক স্যার নিজে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতেন, তা নয়। কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করতে আমাদের ভালো লাগত। প্রশ্ন করলেই তিনি আনন্দিত হতেন এবং যে-কোনো বিষয়ে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের কেবল যে দরাজ মনে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা দ্বারা সাহায্য করতেন, তাই নয়, তাঁর নিজের গ্রন্থ-সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থেকে অকৃপণভাবে বই দিয়ে তাঁর ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। এমন যাতায়াতের কথায় স্মৃতিতে এখনো ভেসে ওঠে তাঁর জেলখানার দিকে যাওয়ার রাস্তার পূর্বপাশের একটি ছোট ঘরের দৃশ্য। একখানি তক্তপোশে নামমাত্র চাদর বালিশ তাঁর শয্যা। কাঠের চৌকিখানার কোনো একটি পা হয়তো-বা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঘরে আর যা কিছুর অভাব থাকুক, রাজ্জাক স্যারের ঘরে বইয়ের কোনো অভাব ছিলো না। এমন পরিবেশেই তৈরি হয়েছিলেন নাজমুল করিম। তৈরি হয়ে উঠেছিলাম সেদিন আমরা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢাকা হল আর জগন্নাথ হলের ছাত্ররাই তাদের বার্ষিক পত্রিকার নাম দিত বাংলা 'শতদল' আর 'বাসন্তিকা'। এবং তাদের তৈরিও করত সাহিত্য পত্রিকার সম্ভারে ও সৌকর্য দিয়ে। তুলনাতে মুসলিম ছাত্রাবাস দু'টির বার্ষিক পত্রিকার চেহারা ছিলো দো-আঁশলা তথা দোভাষী। এ মাথায় বাংলা তো, ও মাথায় ইংরেজি। তাছাড়া আকারে প্রকারে তাদের মনে হতো চপল এবং সামান্য। এই ট্রাডিশনে ভাঙন ধরাবারও চেষ্টা করেছিলাম আমরা, মানে নাজমুল করিম ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। আমরা ফজলুল হক হলের বার্ষিকীর নামকরণ করেছিলাম কেবল হল বার্ষিকী বা হল এ্যানুয়ালের পরিবর্তে 'কলাপী'। ইংরেজিতে কোনো রচনা গ্রহণ করা হয় নি এতে। বাংলাতে যাঁদের লেখা ছিলো তাতে, আমার নিজের একটি লেখা ছাড়া, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আহমদ শরীফ, মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, সানাউল হক, নাজমুল করিম, সৈয়দ নুরুদ্দিন, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সেরাজুন নূর, মনিরউদ্দিন ইউসুফ, আলীম আল রাজি, আবদুস শুকুর—এঁরা। এঁদের বাংলা রচনায় 'কলাপীর' প্রথম সংখ্যাটিই হয়ে উঠেছিলো সেদিনকার মুসলিম ছাত্রদের সাংস্কৃতিক পরিবেশে এক ব্যতিক্রম সৃষ্টিকারী প্রকাশনা। যথার্থই ব্যতিক্রমী। কারণ আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে চলে আসার পরে সাহিত্যিক এই উদ্যোগের অনুসরণে 'কলাপী'র দ্বিতীয় সংখ্যাও আর প্রকাশিত হয় নি। কেবল হলের এই উদ্যোগ নয়। নাজমুল করিম, আহমদুল কবির, সানাউল হক, এ.কে.এম.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহসান—উচ্চতর ক্লাসের অন্য প্রগতিশীল ছাত্রদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মুখপত্ররূপে সেদিন অর্থাৎ '৪৪ কিংবা ৪৫ সালে যে সাহিত্যপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিলো সেটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্র হিসেবে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতার প্রগতিশীল সাহিত্যিক মহলে রীতিমত বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলো।

হয়ত বা এই সাহিত্যপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিলো নাজমুল করিমের সেই লেখাটি যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'ভূগোল ও ভগবান'। সেই লেখাটিতেই প্রকাশ পেয়েছিলো নাজমুল করিমের সমাজ বিশ্লেষণমূলক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি। প্রবন্ধটি হয়ত বা তাঁর পারিবারিক বইপত্রের মধ্যে আজো পাওয়া যাবে। অন্যত্র পাওয়া যায় নি। আমি উদ্ধার করতে পারি নি। কিন্তু পারিবারিক সূত্রে পাওয়া গেলে, লেখাটি পুনর্বার মুদ্রণের উপযুক্ত। লেখাটি যে দীর্ঘ ছিলো, এমন নয়। কিন্তু লেখাটির পরিবেশনায় সাবলীলতা এবং রসবোধে পরিচয় ছিলো। তাছাড়া তার প্রতিপাদ্যটি ছিলো সমাজতাত্ত্বিক। লেখার গোড়াতেই প্রশ্নটি ছিলো, ভগবান ভূগোল সৃষ্টি করেছেন, না ভূগোল ভগবানকে সৃষ্টি করেছে? নাজমুল করিম প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করলেন : দূর উত্তরের শীতের জগতের এস্কিমোদের দেশ লাপল্যাণ্ডের গল্প। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকারী এক যাজক গিয়েছেন এস্কিমোদের মধ্যে খ্রিস্টানধর্ম প্রচারের জন্য। ধর্মের পিতার কাছে সরল, নিরীহ, শীতার্তদের নানা প্রশ্ন, ঈশ্বরের স্বর্গে কি কি দ্রব্য পাওয়া যায়? খুরমা, খেজুর, মেওয়া, বাদাম, পেস্তা, শরবত : এসব পাওয়া যাবে মৃত্যুর পরে স্বর্গে গেলে। এবং খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে স্বর্গে যাওয়া তোমাদের নিশ্চিতই ঘটবে।' ধর্মীয় পিতার এত ওয়াদাতেও শীতার্ত এস্কিমোদের মন ভরে না। তবু তাদের প্রশ্ন থাকে, ঈশ্বরের স্বর্গে অপর যা কিছুই পাওয়া যাক না যাক, তাদের প্রিয় সীল মাছকে পাওয়া যাবে কি না? নাজমুল করিম এ গল্প নিশ্চয়ই শুনেছেন তাঁর প্রিয় অধ্যাপক অজিতকুমার সেনের কাছ থেকে। অজিতকুমার সেন তাঁর প্রিয় ছাত্রদের শুনিয়েছেন সমাজতাত্ত্বিক সেই গ্রন্থের করা যেখানে উদ্ধৃত আছে সমাজতত্ত্বের এমন তাৎপর্যপূর্ণ সব গল্প। নাজমুল করিম তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, ধর্ম প্রচারক খ্রিস্টীয় পাদ্রী এস্কিমোদের আর সব প্রশ্নের জবাব ঠিকই দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বর্গে সীল মাছ পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চিত জবাব তিনি সরল এস্কিমোদের দিতে পারেন নি। এস্কিমোদের জন্যও তাই এমন ধর্মের আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে নি। কারণ, যে স্বর্গে সীল মাছ নেই, সে স্বর্গ দিয়ে এস্কিমোরা কি করবে। নিবন্ধের বক্তব্য তাই, ভূগোলই ভগবানকে তৈরি করেছে। তাই কোনো এলাকার স্বর্গে ঠাণ্ডা শরবতের নহর প্রবাহিত হয়, কোনো এলাকার স্বর্গে সীল মাছ থাকার প্রশ্ন আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ফজলুল হক হলের ১৩৫১ তথা ১৯৪৪ সালের বার্ষিকীটির নামকরণ করেছিলাম আমরা 'কলাপী'। সে কথা আমি ওপরে বলেছি। এই সংখ্যায় নাজমুল করিমের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। লেখাটির নাম 'অবকাশ ও সভ্যতা'। নাজমুল করিম হয়ত তখন এম.এ ক্লাসের শেষ পর্বের ছাত্র। এই লেখাটিতে তরুণ নাজমুল করিমের সমাজবাদ সমর্থনকারী মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। ৪০ বছর আগের কথা। লেখাটিকে ৪০ বছর পরে আবার পাঠ করে আমার ভাল লেগেছে। মনে হয়েছে, মানুষের যৌবনের সৃষ্টিই তার আবেগে, আন্তরিকতায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নাজমুল করিমের প্রবীণ বয়সে এই লেখাটির কথা তাঁর নিজের মুখে আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। হয়তো লেখাটিকে জীবনের নানা টানাপড়েনে এবং ঘটনা-দুর্ঘটনায় পোড়-খাওয়া অধ্যাপক নাজমুল করিম কিশোরকালের কাঁচা রচনা বলে গণ্য করেছেন। একে নিজের বলে আর গর্ব বা দাবি করেন নি হয়ত এমন আশঙ্কায়, পাছে এই ডান-বামের টানাটানি আর দ্বন্দ্বের যুগে তাঁকে কোনো জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আজ যদি নাজমুল করিমের দীর্ঘদিনের শিক্ষাদানের দীক্ষায় দীক্ষিত তরুণরা তাঁর গবেষণামূলক অপর রচনায় মুগ্ধ হন তবে তাঁদের যুবক নাজমুল করিমের এই রচনার কথাটিও জানতে হয়। লেখাটি নাজমুল করিম শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতি দিয়ে, 'রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে এসে বলেছেন, সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ফসল ফলছে অবকাশের ক্ষেত্রে।' এই সূচনা থেকে নাজমুল করিম তাঁর নাতিদীর্ঘ রচনাটিতে মানুষের সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি বর্ণনা করেছেন, কি করে মানুষ আদিম শিকার আর পশুচারণের যুগ থেকে শুরু করে কৃষি যুগের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে উৎপাদনের পদ্ধতি উন্নত করে করে ধনবাদী সমাজে এসে পৌঁছেছে। এককালে মানুষের যেখানে অন্নচিন্তা বাদে কোন প্রকার চিন্তার এবং সৃষ্টির অবকাশ ছিলো না, সেকানে মানুষের হাতে আজ সৃষ্টির যেমন নানা উপাদান, তেমনি সৃষ্টির সেই উপাদান মানুষকে সমৃদ্ধি দিয়েছে, দিয়েছে অন্নচিন্তা বাদেও অন্যতর চিন্তা তথা শিল্প-সাহিত্য-সভ্যতা তৈরির অবকাশ। কিন্তু এখনো কি পৃথিবীর সর্বত্র সর্বমানুষের হাতে এসেছে অবকাশের সেই সুযোগ? ধনিক সমাজে এ অবকাশ ধনবানের হাতে। কিন্তু অবকাশভোগী এই ধনবান একেবারে শ্রম-বিচ্ছিন্ন। নাজমুল করিম আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, এই সনাতনী ধারার ব্যতিক্রম এসেছে মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে নতুনতম সমাজব্যবস্থায়, তথা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায়।

'ফাল্গুনকরা'র পরে নাজমুল করিমের আত্মজীবনীমূলক আর কোনো রচনা প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁর নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবর্তন ও বিকাশ তথা তাঁর পরিবারের পরবর্তী বিকাশেও তিনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। বিষয়টি তাঁর প্রিয় ছিলো। নাজমুল করিম আমার অগ্রজপ্রতিম ছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি ফুলার রোডের তাঁর নিজ বাসা থেকে হেঁটে আমার বাসায় চলে আসতেন। এবং তখন আমরা বর্তমানের চাইতে অধিকতর আবেগে চলে যেতাম সেদিনকার অতীতে। নানা কথায় স্মরণ করতাম চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলোকে, যে দিনগুলোতেই পরবর্তীকালে বিকশিত গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার আন্দোলনের বীজ কিছু উপ্ত হয়েছিলো। নাজমুল করিম আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন একখানি পাণ্ডুলিপি। আমি দেখে তা ফেরত দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম সেই আত্মজীবনীমূলক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার। সে পাণ্ডুলিপির বর্তমান পরিস্থিতি আমি জানিনে। নাজমুল করিমের প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে 'চেঞ্জিং সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান' বিশেষ পরিচিত।

অগ্রজপ্রতিম নাজমুল করিমের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকালীন ক্রিয়াকর্ম এবং বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয়ে আমি অজ্ঞ। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করি শিক্ষকতা নিয়ে, '৭১-এর পরবর্তী পর্যায়ে, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর নিজের প্রাতিষ্ঠানিক-সামাজিক অবস্থান ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অপর সকলে যে সবসময়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, কিংবা পছন্দ করেছেন, এমন নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এ.কে. নাজমুল করিম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানমূলক জ্ঞানচর্চার ও গবেষণার আগ্রহ এবং আবহ সৃষ্টির উদ্যোগী পুরুষ এবং পথিকৃৎ এ বিষয়ে কারুরই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের সকল প্রয়াস, প্রকল্পে তাই নাজমুল করিম অনাগতদিনেও অনিবার্য এক স্মরণীয় নাম হয়ে বিরাজ করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৮৪

আমার শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাট বছরপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার অর্থাৎ ১৯৮১-তে কিছু কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছে। কোনো কোনো উৎসব বা আলোচনার সঙ্গে 'হীরক জয়ন্তী' কথাটি যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টিকে তেমন অনুপ্রেরণাদায়ক করে তোলার চেষ্টা নজরে পড়ে না। কয়েক মাস আগে এ বছরটির উদ্বোধন করেছিলেন উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরী। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সংলগ্ন মাঠে। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ছাত্রাবাসগুলোর পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিলো। আকাশে পারাবত ওড়ানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলো। একটি গেট তৈরি করা হয়েছিলো। পতাকাগুলো এবং প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলরদের উৎকীর্ণ বাণীসহ ফেস্টুনগুলো রোদে-বৃষ্টিতে বিবর্ণ হয়ে আজো দণ্ডের ওপর উড়ছে। ছাত্রছাত্রী মহলে এর কোনো উৎসাহজনক প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট উদ্যোগ নিয়েছেন হলের ষাট বছর পূরণকে স্মরণ করার জন্য একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করার।

জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রভোস্টদের মধ্যে ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন অন্যতম। হরিদাসবাবু আমার সাক্ষাৎ এবং স্মরণীয় শিক্ষক। আমি দর্শন বিভাগ থেকেই বিএ এবং এম.এ পাস করেছিলাম। সে কথা জেনেই জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট বন্ধুবর ডক্টর রঙ্গলাল সেন বারংবার অনুরোধ করেছিলেন হরিদাসবাবুর ওপর একটি প্রবন্ধ তৈরি করে দিতে। হরিদাসবাবু সেই আমলে ক্ষুদ্রায়তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন, তেমনি অখণ্ড ভারত-উপমহাদেশের বিদ্বজ্জনমধ্যে দার্শনিক এবং বাগ্মী হিসেবে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। সেদিন অন্যান্য বিভাগ যেমন, দর্শন বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ছিলো কয়েকজনে মাত্র সীমাবদ্ধ। সেটা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিলো। তার ফলেই এ রকম গুণী অধ্যাপকদের নৈকট্যে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো। কিন্তু হরিদাসবাবুর দার্শনিক মতামত বা তাঁর জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করার মতো তথ্য এবং গ্রন্থ পাওয়া এখন দু[illegible]। তবু জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের অনুরোধটি আমাকে আকর্ষণ করেছিলো। হরিদাসবাবুর দর্শনের আলোচনা না হোক, তাঁর একটি আলেখ্য তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে খোঁজ করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে তাঁর অধ্যাপনার চাকরিকালীন ব্যক্তিগত নথিটি পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল অবশ্য, কিন্তু সবটা নয়। কেবল তাঁর ঢাকা আগমন থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত। কিন্তু হরিদাসবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। তবু তাঁর ব্যক্তিগত নথির এই অংশটির চিঠিপত্র, আলাপ-আলোচনা ও তথ্যাদির ভিত্তিতে আমি একটি লেখা তৈরি করে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টকে দিয়েছি। তাঁরা সেটি হয়তো তাঁদের স্মারকগ্রন্থে প্রকাশ করবেন। লেখাটি সম্পর্কে দর্শন বিভাগের কয়েকজন সাথীকে বলেছিলাম। আশা করেছিলাম, দর্শন বিভাগ যদি এই হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে 'দর্শন বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য'—এই নামে একটি আলোচনার আয়োজন করে, তাহলে সে সুযোগে দর্শন বিভাগের পুরাতন শিক্ষকদের কথা বিভাগের পুরাতন ছাত্ররা স্মরণ করতে পারবেন। তখন হরিদাস বাবু সম্পর্কেও আলাপ উঠবে এবং আমার না জানা আরো কিছু খবর আমি জানতে পারব। কিন্তু দেখলাম, দর্শন বিভাগ বিষয়টিতে তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ্রহ বোধ করছে না। কিন্তু বিভাগের অধ্যাপক জহুরুল হক সাহেব বিষয়টি, বিশেষ করে আমার প্রবন্ধটির ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখালেন। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই সাহেবের বাসায় কয়েকদিন আগে এই প্রবন্ধটি শুনবার জন্য একটি ঘরোয়া আসরের আয়োজন করেছিলেন। হাই সাহেব খুবই সামাজিক এবং অতিথিপরায়ণ প্রতিবেশী। আমার ফ্ল্যাটের বিপরীত ফ্ল্যাটে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আছেন। জহুরুল হক সাহেব খবর দেওয়াতে প্রবীণ অধ্যাপক এবং ত্রিশের গোড়াতেই হরিদাসবাবুর ছাত্র দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ আসরটিতে এসেছিলেন। তাছাড়া ছিলেন দর্শন বিভাগের জহুরুল হক সাহেব ব্যতীত মিসেস আখতার ইমাম, অধ্যাপক আবদুল মতিন, হাসনা বেগম, কাজি নূরুল ইসলাম এবং জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক আবদুল বারি।

আমার প্রবন্ধটি সকলে বেশ আগ্রহ সহকারে শুনলেন। এবং কেবল একটি নথির ভিত্তিতে করা হলেও এটি যে একটি প্রয়োজনীয় কাজ হয়েছে, সেটা তাঁরা বললেন। উপস্থিত এঁদের মধ্যে আজরফ সাহেব, হাই সাহেব এবং মিসেস আখতার ইমাম হরিদাসবাবুকে সাক্ষাৎভাবে পেয়েছেন। এঁরা সকলেই তাঁর ছাত্রছাত্রী। আমি এজন্যই এঁদের কাছে প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনাতে চেয়েছি। এঁদের স্মৃতিচারণে লেখাটিকে আমি আর একটু ভাল করতে পারব। আজরফ সাহেবের বয়স প্রায় সত্তর হলেও তিনি দর্শন ও সাহিত্যচর্চাতে এখনো বেশ সক্রিয়। নানা সভা-সমিতিতে তিনি আলোচনা করেন এবং পত্র-পত্রিকাতে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। হরিদাসবাবু সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস উক্তি এবং স্মৃতিচারণ আমাদের সকলকেই বেশ আনন্দ দিয়েছে। তিনি হরিদাসবাবুর আলোচনা ও বক্তৃতাদানের বেশ কিছু নমুনা এখনো হুবহু উদ্ধৃত করে শোনাতে পারেন। আমাদের শোনালেনও। আমার প্রবন্ধটিতে যেমন, এ দিনের শ্রোতা এবং আলোচকদের স্মৃতিচারণেও তেমনি, হরিদাসবাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হলেও তিনি যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীকে অকৃপণভাবে স্নেহ করতেন এবং জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে তিনি যে স্মরণীয়ভাবে উদার এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীদের জন্য একাগ্র ছিলেন, সেই চিত্রটিই প্রকাশ পেয়েছে। আজরফ সাহেব বললেন, 'একদিন আমি এবং আর এক সহপাঠী, দু'জনে বাসায় গিয়ে বললাম, স্যার, হেগেলকে বুঝিনে। তিনি তখন ধুতি পরে, গলাবন্ধ কোট আর চাদর কাঁধে এবং লাঠি হাতে বেরুচ্ছেন আর এক অধ্যাপকের বাড়ি যাবেন বলে। সেই ত্রিশের দশকে শান্ত, ছায়াচ্ছন্ন নীলক্ষেতের পরিমণ্ডলে। কিন্তু সে অজুহাতে আমাদের ফিরিয়ে দিলেন না। বললেন, 'চলো, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আলাপ করি।' এবং রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁর অনবদ্য ভাষায় যে আলাপ তিনি করলেন তা সেদিনকার কিশোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মনে হেগেলের জটিলতাকে যেমন বিরাটভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছিলো, তেমনি আমাদের মনের ওপর একটা স্থায়ী ছাপও কেটে দিয়েছিলো।' অধ্যাপক দেওয়ান মুহম্মদ আজরফের এ বর্ণনা যথার্থ। হরিদাসবাবুর এই বৈশিষ্ট্যটি আমার মনকেও সেদিন মুগ্ধ করেছিলো। দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের নানা কঠিন তত্ত্ব ভাষা ও ব্যাখ্যার গুণে তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাঞ্জল করে তুলতে পারতেন হরিদাস ভট্টাচার্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর সেই সম্মোহনী বিনয়সূচক উক্তি, 'আরে, আমিও কি বুঝি এসব তত্ত্ব? এই, তোমাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করা, আর কি?' একদিকে রাশভারী ব্যক্তিত্বময় চরিত্র। আবার অন্যদিকে একেবারে আনুষ্ঠানিকতাবিহীন। ক্লাসে তাঁর কক্ষে তাঁর টেবিলের তিনপাশ ঘিরে আমরা বসেছি গুটিকতক ছাত্রছাত্রী। তিনি পড়াচ্ছেন, মানে আলোচনা করছেন। আলোচনা করতে করতে সময় ফুরিয়ে এল। অন্য কোনো ক্লাস বা কাজ রয়েছে হরিদাসবাবুর। তিনি তাই বললেন, 'এখন এ পর্যন্ত রইল। কাল সকালে এসো তোমরা, আমার বাসায়। তখন বাকিটুকু সেরে দেবো।' এমনি করে সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে এই শিক্ষকবৃন্দ একেবারে সেই প্রাচীনকালের ভারতের আশ্রম-প্রায় করে তুলেছিলেন। সেদিনকার ক্রমাধিক পরিমাণে অসঙ্গতিপূর্ণ দেশ এবং সমাজে এও ছিলো আর এক অসঙ্গতি। মাঝে-মাঝেই শহরে দাঙ্গা ঘটত। সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু তখনো, আমার অধ্যয়নকালেও, চল্লিশের দশকে, সংখ্যায় হিন্দু ছাত্রছাত্রীই বেশি। মুসলমান ছাত্রী তো কুল্লে ডজনখানেক। রমনা নতুন শহর। রেললাইনের দক্ষিণ পাড়ে পুরনো শহর। রমনা যদি বা মুক্ত, কিছুটা উদার, ঢাকা রক্ষণশীল। মুসলমান ছাত্রী যারা ঢাকা থেকে আসত, তারা আসত বন্ধ দরোজা—ঘোড়ারগড়িতে। রেললাইন পেরুলেই মাত্র গাড়ির দরজা আর মাথার ঘোমটা ফেলে দিতে সাহস পেত। কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি অভিহিত হত 'মক্‌কা ইউনিভার্সিটি' বলে। তবু 'মক্‌কা ইউনিভার্সিটির' শিক্ষকদের বেশির ভাগ তখনো হিন্দু। দাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও যে দু'এক সময় না হয়েছে তা নয়। পাকিস্তান আন্দোলনে যত জোর বাড়ছিলো, দাঙ্গার প্রকোপ ততো বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। সম্প্রদায়গত উভয় দিকের জঙ্গীবাজদের কারণে। চারদিকের আবহাওয়া ক্রমান্বয়েই অসহিষ্ণু আর আতঙ্কজনক হয়ে পড়ছিলো। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাঁদের তরুণ ছাত্রছাত্রীকে স্নেহ করতেন। কে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সে বিবেচনা তাঁদের ছিলো না। আমার প্রবন্ধটি পাঠের উপলক্ষে মিসেস আখতার ইমামও সে কথা বললেন। তিনি নানা পারিবারিক অসুবিধার মধ্যে এসেছিলেন দর্শনে এম.এ পড়তে। মিসেস ইমামও প্রবন্ধটি শুনে বললেন, 'আমাকেও তিনি নিজের মেয়ের মতোই দেখতেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিজে যে খুব বিশিষ্ট ছাত্র ছিলাম, এমনও নয়। তবে একটু 'বেলাইনের' বটে। যত না রীতিমাফিক পড়াশোনা করতাম, তার চাইতে একটু 'রাস্তার' বাইর দিয়ে হাঁটতাম। রাজনীতি আর ছাত্র আন্দোলনের বৃহৎ দু'টি ধারা, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগপন্থী ধারা, তখন বেশ প্রবল। আমি কোনো ছাত্র নেতা ছিলাম না। তবু যে ভাল করে পড়াশোনা না করে, বিশ্ববিদ্যালয়েরই অল্প বেতনের কর্মচারিদের সঙ্গে মিশতাম, তাদের পাড়ায় গিয়ে নানা রকম কথা বলতাম, তারা আদাব জানাত, নিজেদের লোক বলে মনে করত, এটি হরিদদাসবাবুর দৃষ্টি এড়ায় নি। আমি এ ভয়েই হরিদাসবাবুর কাছে ততো ভিড়তে সাহস পেতাম না। পাছে ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন আর মনোবিজ্ঞানের কঠিন কোনো প্রশ্ন করে আমাকে বিপাকে ফেলেন! কিন্তু না, তেমন কোনোদিন করেন নি। মনে হতো যেন 'বেলাইনের' এই চলার জন্যই আমার প্রতি তাঁর স্নেহ আর কৌতুকমিশ্রিত একটা প্রশ্রয় ছিলো। কখনো কোনো সম্মেলনের কারণে দু'দিন ক্লাসে উপস্থিত না হয়ে তৃতীয় দিনে হাজির হলে বলে উঠতেন, 'কি দেশোদ্ধার হলো! একবার হরিদাসবাবু নিয়ে গেলেন বিভাগের আমাদের সবাইকে সঙ্গে করে লখ্নৌতে। দর্শন সম্মেলনে। সে সম্মেলনে বোধ হয় তিনি সভাপতি ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আমাদের সকলকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। আলাপআলোচনায় রাজনীতির কথা উঠলে রাজনীতিতে আমাদের কিছুটা সংস্রবকে একেবারে নিন্দা করলেন না। বললেন, 'শ্লোগানও অহেতুক নয়। তারও প্রয়োজন আছে।' আমি কাছে যাই নি তেমন। কিছুটা দূর থেকে লক্ষ্য করেছি হরিদাসবাবুকে। কিশোর মনের বিস্ময় আর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে। কিন্তু আজ তাঁকে স্মরণ করতে মনে বেশ আবেগেরও সৃষ্টি হচ্ছে। মনে আছে, কখনো কলকাতা, দিল্লি, বম্বে থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিভাগ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে এলে আমাকে ডেকে বলতেন, 'এ বইটি বেশ ভালো। তোমার ভালো লাগবে। তুমি আগে পড়ো, তারপরে আমি লাইব্রেরিতে জমা দেব।' অনার্স পরীক্ষার ফলের ওপর কিছু বই প্রাইজ পাওয়ার ভাগ্য হলো। হরিদাসবাবু বললেন, 'কি হে মার্কসিস্ট! কি বই কিনবে?' আমি সলজ্জভাবে বললাম, 'ঐ মার্কসিস্ট বই স্যার।' প্রশ্রয় দিয়ে বললেন, 'আমাকে লিস্ট দিও। এখানে কোথায় পাবে? আমি কলকাতা কিংবা বম্বে যাব। নিয়ে আসব তোমার জন্য।'...

... কিন্তু একাল সেকাল নয়। একালের তরুণদের সেকালের এই স্মৃতিচারণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। এবং একালের আমিও আর সেকালের শিক্ষক নই। তাই আফশোস আর অভিযোগের দিকে গিয়ে লাভ নেই। তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একালের মন্দ-ভালো, যা বৈশিষ্ট্য তাতে সেকালের অবদান নিশ্চয়ই আছে। সেকালের ওপরই একালের আগমন। সে সত্যটি স্মরণ করার জন্যই এসব কথার উল্লেখ।...

২০.৩.৮১

*　　　　*　　　　*

হরিদাসবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে স্মরণ করতে গেলেই আমার যে ভবনটির কথা মনে পড়ে সেটি আজ আর নেই। বর্তমানে যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্র তার ঠিক বিপরীতে একটি দোতলা দালান ছিলো। এটিই ছিলো জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের ভবন। ভবনটি সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তার জায়গাতে শিক্ষকদের একটি বহুতল ভবন তৈরি হয়েছে।

খুব যে দীর্ঘ ছিলেন, এমন নয়। কিন্তু গায়ের রঙটি ছিলো খুবই ফরসা। গায়ের রঙ-এর মতোই ধবধবে সাদা ধুতি-চাদর পরতেন। স্যুট-টাইতে কখনো দেখি নি। গলাবন্ধ যে কোট পরতে দেখতাম তাকে আজকালকার ভাষায় বলা চলে 'চীনা কোট'।

হরিদাস ভট্টাচার্যের বাড়ি কোথায়, তাঁর অধ্যয়ন জীবনের কৃতিত্ব কি ছিলো, কি ছিলো না, তা আমি কিছুই জানতাম না। ১৯৪২ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ পাস করে যখন বিশ্ববিদ্যালয়, মানে বর্তমানের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবনে বি.এ পড়তে এলাম তখন প্রথম চোটে আমি দর্শন শাস্ত্রে ভর্তির আবেদনও করি নি। আবেদন করেছিলাম ইংরেজি সাহিত্যে। কিন্তু মাঝখানে করিডোর আর দু'পাশে ক্লাসরুম। এই ভবনের করিডোর দিয়ে যাওয়াতে যে শিক্ষক-বক্তার দর্শন, জ্ঞান, সত্য-মিথ্যার ওপর দরাজ গলার আলোচনা আর যে-কোনো ছাত্রের মতো আমাকেও চমকিত এবং আকির্ষত করেছিলো—সে গলা ছিল হরিদাস ভট্টাচার্যের। আর সেই আকর্ষণেই ইংরেজি সাহিত্য পরিত্যাগ করে দর্শন শাস্ত্রে ভর্তি হবার আবেদনপত্র নিয়ে একদিন হাজির হয়েছিলাম অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সেই বাগ্মী হরিদাস ভট্টচার্যের সামনে। এখনও মনে ভেসে উঠছে, আমার সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিলো দর্শন বিভাগের প্রধানের দপ্তরে নয়, ঘটেছিলো জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের দপ্তরে। আমার আবেদনটি হাতে নিয়ে আই.এ পরীক্ষার নম্বরাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে কথাটি বলেছিলেন, সেটি এখনো কানে বাজছে, 'ফিলসফি পড়তে এসেছ? কিন্তু টিকবে তো?' এ এক কঠিন প্রশ্ন। এর সরাসরি কোনো জবাব নেই। মুখচোরা গোবেচারী আমি সেদিন তাঁকে কি জবাব দিয়েছিলাম, কিসে তিনি খুশি হয়েছিলেন, তা আজ মনে নেই। তবে সেদিন অচেতনভাবে বুঝেছিলাম, একটি কিশোর ছাত্র বা ছাত্রীকে কেবল যে জ্ঞানের একটি শাখাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপর শাখা থেকে কম কিংবা বেশি আকর্ষণ করে, তাই নয়। কোনো বিভাগের প্রতি কম কিংবা বেশি আকর্ষণ করে তার কোনো বিশেষ শিক্ষকও। ব্যাপারটি আজ বিরাট আকারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে হয়তো ততো জোরের সঙ্গে বলা যায় না; কিন্তু সেদিনকার সেই আশ্রয় কিংবা পরিবার প্রায়-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনেকখানি সত্য ছিলো। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন বসু, দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপক এস.এন রায়, গণিতের এস.এন বসু, অর্থনীতির এইচ এল দে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ডি এন বানার্জী, এ কে সেন, অবণীভূষণ রুদ্র, আবদুর রাজ্জাক, বাংলার মোহিতলাল মজুমদার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবী বিখ্যাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি প্রশংসাবাক্য প্রচারিত ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। অক্সফোর্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি, আমার জানা নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে যে তখনকার ভারত উপমহাদেশের জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছিলো তাতে সন্দেহ নেই। আর ছাত্র হিসেবে সেটিই ছিলো আমাদের গর্ব এবং গৌরবের বিষয়। তা না হলে কলকাতা বা লখ্‌নৌ বা কাশী বা আগ্রা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অজ-পাড়াগাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাঁড়াবার উপায় ছিলো না।

কিন্তু যে কথা আজ এই হীরক জয়ন্তীতে ভাবতে গিয়ে চমৎকৃত হতে হয়, সেটি হচ্ছে, সমাবেশের এই ঘটনাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে নি। এমন নয় যে হরিদাস ভট্টাচার্য, সত্যেন বসু, রমেশ মজুমদার, এফ রহমান এরা কোথাও বেকার বসেছিলেন, আর চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে তাঁরা কলকাতাকে ছেড়ে ঢাকাতে দৌড়ে এসেছিলেন। তাঁদেরকে খুঁজে পেতে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। আর তার প্রতিষ্ঠানগত কৃতিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালের সাংগঠনিক কমিটির হলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজেপত্রে যে ব্যক্তির ঐকান্তিক আগ্রহ, পরিশ্রম ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় তিনি না বাঙালি, না ভারতীয় এবং না হিন্দু, না মুসলমান। তিনি ইংরেজ—পি জে হারটগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ভাইস চ্যান্সেলর বা উপাচার্য। তিনিও বেকার ছিলেন না। হয়ত ছিলেন ভারতীয় শিক্ষা সারভিস বা আই.ই.এস-এর অভিজ্ঞ এবং উচ্চতর সদস্য। কিন্তু ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি, তার সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, আইন—সকল বিভাগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক অন্বেষণের যে প্রচেষ্টা হারটগ সাহেব চালিয়েছিলেন, সেটি তাঁকে একজন যথার্থ কর্মী, জ্ঞানী, এবং উদ্যোগী সংগঠক হিসেবে প্রমাণিত করে। আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্তৃপক্ষের উচিত সেই গোড়াকার সকল প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মধ্যে যাঁরা ছিলেন, পি জে হারটগ এবং তাঁর অন্য সহকর্মীদের পরিচয় বিবরণী সংগ্রহ করে প্রকাশ করা।

শুধু বিজ্ঞাপনের জবাবে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে নিয়োগপত্র দেয়ার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার সংগঠন, বিশেষ করে ভাইস চ্যান্সেলর হারটগ সাহেবের কাজ সীমাবদ্ধ ছিলো না। হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথির কিছুটা মাত্র এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরতান কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে। তা নাড়াচাড়া করতে গিয়েই দেখলাম, ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসেও কলকাতা শহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের ক্যাম্প-অফিস চালু রয়েছে। আর সেখান থেকে ২৯ জানুয়ারি (১৯২১) তারিখে হারটগ সাহেব হরিদাস ভট্টাচার্যকে তাঁর কলকাতার ৩৬ নম্বর আমহারস্ট রোডের ঠিকানায় ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে লিখছেন :

"Dear Mr. Bhattacharyya,
I am authorized by His Excellency the chancellor to offer you the post of Reader in philosophy in the University of Dacca at an initial salary of Rs. 500/- per mensem rising by annual increments of Rs. 50/- per mensem of a maximum which has not yet been fixed, but which I hope will be fixed shortly. I should be glad to hear from you at your early convenience that you will accept the post. It will be necessary for you to join the University not later that 13th June in order to complete the arrangements preparatory to the beginning of the session on July the 1st ...."

হরিদাস ভট্টাচার্য তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিলসফি এ্যান্ড একসপেরিমেন্টাল সাইকোলজির' লেকচারার। তিনি অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রফেসর' পদের জন্যই একটি আবেদন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হারটগ সাহেবের এই পত্রের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, 'রিডার'-এর পদ গ্রহণেও তাঁর আপত্তি নেই। হরিদাসবাবুর বাংলা হস্তাক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া ভার। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত নথিতে শুরু থেকে, অর্থাৎ ১৯২১-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত রক্ষিত নথিতে (১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ের নথির খোঁজ আমি পাই নি) তাঁর নিজের অত্যাশ্চর্য ইংরেজি হস্তাক্ষর এবং ইংরেজিতে লেখা সাবলীল পত্রাদির কোনো অভাব নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইস চ্যান্সেলর হারটগ সাহেবের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে স্যার আশুতোষ মুখার্জির উল্লেখ দেখা যায় : "But before putting into your hands the formal letter of acceptance I think I ought to see the President to the Post-Graduate Department, Sir Ashutosh Mukherjee. I wish you could have told him that you wanted me just as he did to Dr. Urquhart. It is always so very delicate to touch upon the subject of resignation and departure before one with whom I am on cordial terms and who during the last month made me a paper-setter in B.A. philosophy (Pass and Honours) unasked."

স্যার হারটগের পক্ষে এমন অনুরোধ রক্ষা করার তেমন কোনো বাধ্যতা ছিলো না। কিন্তু হরিদাস ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত নথিতে রক্ষিত পত্রাদির মধ্য দিয়েও বোঝা যায় স্যার হারটগ (পদবিসহ যাঁর নাম ছিলো Sir P. J. Hartog Kt. CIE LLD, M.A, B.Sc) যথার্থই ভদ্র এবং দক্ষ সংগঠক ছিলেন। হরিদাসবাবুর সঙ্কোচের কারণটি তিনি বুঝেছিলেন এবং যথার্থই স্যার আশুতোষকে হরিদাসবাবু সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন।

এরপরে স্যার হারটগকে যে দীর্ঘ পত্র হরিদাসবাবু লিখেছিলেন তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন কিনা সে প্রসঙ্গটি বেশ উল্লেখযোগ্য :

... (2) The facility for research and freedom in teaching. It has been hinted to me that the freedom and leisure for study that I enjoy here may be denied me there. Personally I do not put much credence in these statements but I should like to be assured that I shall not be unnecessarily dictated to by the professor or by anybody else in matters of study and teaching. There must certainly be consultation and mutual arrangement and agreement but that should be all. I have already told you that here I am absolutely free to teach as I like and have to report only at the end of the year what and how much I have taught. I have never abused that privilege, in fact, both at Scottish Churche's College and at the University. I have taken extra classes on my own initiative, and I shall justify your confidence in me on that point there too...."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরিতে স্থায়ী হতে কত দিন লাগবে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের কি সুযোগ পাওয়া যাবে, থাকার ব্যবস্থা কি হবে প্রভৃতি সব বিষয়েই তিনি ভি.সি-র কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন এবং এতদিন পরে একজন গবেষককে যা চমৎকৃত করবে সে হচ্ছে ভি.সি স্যার হারটগও বিস্তারিতভাবে হরিদাস ভট্টাচার্যের সকল প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন।

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ তারিখে স্যার হারটগ হরিদাসবাবুকে লিখলেন :

"Dear Mr. Bhattacharyya,

Many thanks for your letter of February 7. As you will learn from my letter no. 89/C dated the 7th February, 1921, I have already written to Sir Ashutosh Mukherji in regard to your appointment. I now deal with your various queries: (1) with a record like your own I anticipate that confirmation after the Probationary period would be merely normal. However I will put your points before the Chancellor. (2) The University will enter into a written contract with you and will be obliged to carry out the obligations of the contract. This is required under the Dacca University Act.

(3) One of the main objects of the University is to provide every facility for research and freedom in teaching. If you will consult the Dacca University Act, you will see what a large space the teachers will occupy in the management of the University. The post of Reader would be one of dignity and importance and your letter seems to me to indicate the exact spirit in which the department should be conducted. Mutual arrangement and agreement are of course necessary, but you ought certainly not be hampered in any way in your teaching....".

হরিদাসবাবু নিজে স্যার হারটগকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার গোড়াতেই দেখা যায়, তিনি ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তেমনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে, খুব সম্ভব ১৯১৭ সাল পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হরিদাসবাবুর নথিতে কোনো আবেদনপত্র এবং তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে তাঁর জীবনের কোনো বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু স্যার হারটগের সঙ্গে এই পত্রালাপের উল্লেখে মনে হয়, হরিদাসবাবুর জন্ম হয়ত ১৮৯০ কি ৯১ সালে। হরিদাসবাবু শিক্ষাগতভাবে ছিলেন এম.এ.বি.এল। অর্থাৎ এম.এ পাস করে হয়ত তিনি দু'বছর ল' পড়েছিলেন এবং আনুমানিক হিসেবে ১৫ বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ১৯০৫-এর দিকে এম.এ পাস করেছেন। তারপরে ল' শেষ করে হয়ত স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন।

হরিদাসবাবু কলকাতায় বসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগদানের পত্র পাঠান এবং দর্শন বিভাগে আর কোন উপযুক্ত সহকর্মীকে গ্রহণ করা যায় এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগারের জন্য কি যন্ত্রপাতি কিংবা দর্শনের জন্য কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করা যায় তার প্রচেষ্টাতে নিজেকে অবিলম্বে নিযুক্ত করেন।

হরিদাসবাবু তখন তরুণ অধ্যাপক। কিন্তু স্যার আশুতোষের মতই স্যার হারটগও যে নির্বাচনে ভুল করেন নি তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকের যে-কোন দলিলপত্র বা প্রকাশনা ওল্টালেই বোঝা যায়। নিজের দাবিদাওয়া আদায়ের ব্যাপারে হরিদাসবাবু যে 'দার্শনিক রকমের' নিরাসক্ত ছিলেন, তা নয়। তিনি তাঁর প্রাপ্য আদায় করতে জানতেন। কিন্তু তাঁর পত্রালাপ বা দাবি উত্থাপনের মধ্যে যুক্তির জোর এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশের চিহ্ন স্পষ্ট। বস্তুত প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালেই কেবল দর্শন বিভাগের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অরডিন্যান্স ও রেগুলেশনসমূহ সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব পড়ে হরিদাসবাবুর ওপর। ১৯২৪ সালের একটি পত্রে দেখা যায়, হরিদাসবাবু ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট একটি দাবি জানিয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অরডিন্যান্সসমূহ সম্পাদনাতে তাঁর যে কষ্টকর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেজন্য তাঁর কিছু প্রাপ্য হওয়া উচিত। এবং পরবর্তী সময়ে একসিকিউটিভ কাউন্সিল হরিদাসবাবুকে এ পরিশ্রমের জন্য পাঁচশ টাকার একটি সম্মানী প্রস্তাব করে মঞ্জুর করে।

হরিদাসবাবু দর্শন বিভাগের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। কিন্তু গোড়াতে তিনি দর্শন বিভাগের হেড ছিলেন না। হেড ছিলেন অধ্যাপক জি.এইচ. ল্যাংলী এবং তিনি যখন ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে ছুটিতে যান তখন মাত্র হরিদাসবাবু বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন।

এই সময়কার চিঠিপত্র পাঠ করতে গিয়ে একটি বিষয়ে আমার বেশ আমোদ লেগেছে। ঢাকায় আসার পূর্বে হরিদাসবাবু ভিসি হারটগ সাহেবকে চিঠিতে ঢাকার মশার আতঙ্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন। হারটগ সাহেব তার জবাবে লিখেছিলেন : "I am told that although there are mosquitoes in Ramna, there is no malaria and many people

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

who have lived here for years had never had an attack. The situation is open and healthy." অর্থাৎ ঢাকার মশা তোমাকে কামড়াবে বটে কিন্তু ম্যালেরিয়ার রুগী করবে না। ঢাকার মশা ভদ্র এবং রসিক। সে গুণ তার এখনো আছে। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের নিবাসস্থল ভাটপাড়ার টিকিধারী তরুণ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হারটগ সাহেবের এই অভয়তে ঢাকা এসেছিলেন। তাছাড়া হারটগ সাহেবের আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত ব্যক্তিগত পত্রালাপ এবং ঢাকাতে আগমনে ইচ্ছুক একজন তরুণ শিক্ষকের সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে দেবার প্রয়াসও নিশ্চয়ই কম আকর্ষণীয় ছিলো না।

কিন্তু বাদুড়ের উৎপাতের কথা তরুণ অধ্যাপক বাইরে থেকে আঁচ করতে পারেন নি।। আজকের ঢাকাবাসীরা যদিও মশাকে ভালোভাবেই চেনেন তবে বানর আর বাদুড়কে তাঁরা তেমন জানেন না। কিন্তু হরিদাসবাবু খুবই বিব্রত হয়েছিলেন বাদুড়ের উৎপাতে, যখন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিকটবর্তী 'চামেরী হাউস' ভবনটি থাকার জন্য দেওয়া হয়। এই 'চামেরী হাউস' থেকে ১৯২৪ সনের দিকে হরিদাসবাবু ভি.সিকে লিখলেন :

"My dear Sir,
I am afraid; I shall have to think seriously of vacating University Quarters next session. The unbearable stench of bat's excreta returned with the summer heat in spite of last year's renovation of the ceiling cloth and the P.W.D. people practically told me that they would be unable to drive the bats away."

এ রকম ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা উল্লেখ করে কোনো শিক্ষক আজকের দিনের একজন ভিসিকে পত্র দিলে তিনি তার জবাব ব্যক্তিগতভাবে এবং লিখিতভাবে দেবেন কিনা এবং কি জবাব দেবেন তা আমি নিশ্চিত জানিনে। তবে হারটগ সাহেব অবিলম্বে কেবল যে হরিদাসবাবুকে জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন তাই নয়, তিনি নিজে পি.ডব্লিউ ডি'র ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি লিখে বললেন :

"My dear Stein,
Mr. Haridas Bhattacharyya who lives in the Chummery tells me that the stench of the bats in the house is so unbearable that he wishes to leave it. Is it not possible to keep the bats out of the house? At one time they used to come into this house

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

but since wire-netting has been put in the holes through which the electric wires pass. they have been kept out completely. I know that the Chummer' is differently constructed, but it is difficult to believe that it is impossible to keep bats from entering above the ceiling cloth."

হরিদাসবাবু কেবল যে বিভাগের অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন, ল্যাংলী সাহেবের পরে দর্শন বিভাগের প্রধান হয়েছেন, তাই নয়। একাধিকবার তিনি ডেপুটি রেজিস্টার বা রেজিস্টারের দায়িত্বও পালন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সেদিনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে হরিদাসবাবু একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব হিসেবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের কিছুকালের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিলেন।

'হরিদাস ভট্টাচার্য, এম.এ, বি.এল, পি.আর.এস, দর্শন সাগর। পি.আর.এস বা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার' তো আমাদের নিকট আতঙ্কজনক ব্যাপার ছিলো। যিনি এই বৃত্তির অধিকারী হন তিনি অবশ্যই মহাপণ্ডিত। তার ওপর 'দর্শন সাগর'! এবং অপ্রতিরোধ্য এক ব্যক্তিত্ব। এসবই সেই কিশোরকালের আমাকে চল্লিশের দশকে মুগ্ধ করেছিলো। বৃহত্তর বিশ্ব, কোলকাতাতে লেখাপড়া করতে না যাওয়ার জন্য আমার কোনো আফসোস ছিলো না। কিন্তু হরিদাসবাবুর টিকি এবং উপবীত বা পৈতা (পৈতা অবশ্য বার থেকে দেখা যেতো না) আমাকে বিস্মিত করেছিলো। দর্শন বলতে তো জিজ্ঞাসা আর সংশয়কে বোঝায়। হরিদাসবাবুর দরাজ বক্তৃতাতেও দর্শনের এই অর্থই আমি উপলব্ধি করেছিলাম। তাহলে এই 'জিজ্ঞাসা এবং সংশয়ের' সঙ্গে দার্শনিক হরিদাসবাবুর 'টিকি এবং পৈতা'র সঙ্গতি কোথায়? এ প্রশ্ন সেদিনও আমার মনে জেগেছিলো। কিন্তু এমন প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় নি। অসঙ্গতি কেবল এ ক্ষেত্রে নয়। অসঙ্গতি এখানেও যে, হরিদাসবাবু বাড়ির বাইরে অপর কারুর পাক করা অন্ন গ্রহণ করতেন না। শুনেছি বাইরে কোথাও গেলে তিনি নিজেই রান্না করে খেতেন। একেই বোধ হয় বলে 'স্বপাক ব্রাহ্মণ'। কিন্তু এই হরিদাসবাবুর বাড়িতে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অধ্যাপক হুমায়ুন কবির যখনি ঢাকা এসেছেন কোনো পরীক্ষা কার্য ব্যপদেশে, তখন তাঁর স্থান হয়েছে। অপর কোথাও তাঁকে তিনি থাকতে দেন নি। এও কম বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলো না আমাদের কাছে। আসলে হরিদাসবাবু শুধু দর্শনের ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন না। ছিলেন মনোবিজ্ঞানেরও। আর তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, 'যে ব্যক্তিকে তোমরা বইরে থেকে আস্ত কিংবা অখণ্ড দেখ, সে আসলে আস্ত কিংবা অখণ্ড কোনো সত্তা নয়। নানা খণ্ডিত, পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ বিশ্বাস, অবিশ্বাস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণ, সংস্কারের টুকরো নিয়ে বাহ্যত অখণ্ড ব্যক্তির সৃষ্টি। এই পরস্পর বিরোধী সত্তাতেই ব্যক্তির মধ্যকার অসঙ্গতি আর দ্বন্দ্ব। এটা যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য। কেবল এই পরস্পরবিরোধী সত্তাগুলো যখন এমন তীব্রতাপ্রাপ্ত হয় যে ব্যক্তির সর্বমোট নিয়ন্ত্রণটা নষ্ট হয়ে যায়, তখনি আমরা এমন ব্যক্তিকে 'এ্যাবনরম্যাল' বা মানসিক রোগী বলে আখ্যায়িত করি।' এমন শিক্ষা এবং সত্যকেই বোধ হয় হরিদাসবাবু সচেতনে নিজের মধ্যে ধারণ করতেন। তাই তাঁর ব্যক্তিগত নথি ওল্টাতে ওল্টাতে যখন দেখলাম, কলকাতায় বালিগঞ্জে তৈরি নতুন বাড়ির 'গৃহপ্রবেশ' অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ছুটির আবেদন করে ৫-১১-৩১ তারিখে তিনি লিখেছেন

: ... "The earliest possible date is the 11th instant. The only other date is 20th instant. The astrologers consulted have vetoed these two dates after consulting my horoscope and in the matter I am absolutely in their hands." তখন আর বিস্মিত হই নি। 'জ্যোতিষীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারা আমার কুষ্টি দেখে বলেছে ১১ কিংবা ২০ তারিখে গৃহপ্রবেশ করা চলবে না। এ ব্যাপারে আমি একেবারেই তাদের হাতে বন্দী।' দর্শন সাগর হরিদাস ভট্টাচার্য এমন সত্য স্বীকারে কোনো অস্বস্তি বোধ করেন না। কারণ, ব্যক্তি তো অখণ্ড সত্তা নয়, খণ্ডিত সত্তাসমূহেরই সমন্বিত প্রকাশ।

হরিদাসবাবু বাগ্মী হিসেবে সেদিনকার সারা-ভারতেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষাতে বিরামহীনভাবে বক্তৃতাদানের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে যেমন ছাত্র, সহকর্মী এবং দেশবাসী সকলের নিকট প্রিয় করেছিলো, তেমনি বোধ হয় সে কারণেই রীতিসিদ্ধ গবেষণাকর্মে বা একাধিক গ্রন্থ রচনাতে তিনি নিবন্ধ থাকতে পারেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সেদিনকার সমাজের নানা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বে তিনি ব্যাপৃত রয়েছেন। এক সময়ে তিনি 'বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক' নামক একটি ব্যাঙ্কের অন্যতম ডাইরেক্টর নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের বাইরে বলে তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

হরিদাসবাবু একবার লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছিলেন সেখানে 'ফিলসফির প্রফেসর' হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য। তাঁর নথিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ল্যাংলী সাহেব হরিদাসবাবুর যোগ্যতার প্রশংসা করে তাঁর সে আবেদন লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়েছিলেন, এ তথ্য পাওয়া যায়। এটা ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা।

হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথিতে তাঁর সম্পর্কে ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের একটি প্রশংসাপত্র রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগদানের পর হরিদাসবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে এই প্রশংসাপত্রের একটি কপি পাঠিয়েছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন।

"On perusing certain portions of my scientific work, The Evolution of individuality and of my philosophical work, The Principle of Activism, Dr. Brojendra Nath Seal under whom I had the honour of serving in the Philosophy Department of the Calcutta University for about three years has sent a certificate ..."

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রশংসাপত্র পাওয়া একজন ছাত্র কিংবা শিক্ষকের পক্ষে অবশ্যই গর্বের বিষয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। সেখান থেকে ৭ আগস্ট ১৯২২ তারিখে তিনি হরিদাসবাবুকে নিম্নোক্ত প্রশংসাপত্রটি পাঠিয়েছিলেন :

Mysore

7th August, 1922.

I have known Professors Haridas Bhattacharyya for the last eight years in various capacities and I have had ample opportunities of judging his personal worth, his mental calibre and his attainments in philosophy. He has a full mind, a rapid sweep of thought which does not however miss the significant details in the ensemble and a marked gift of lucid and interesting exposition. He has studied with great profit the foundations of recent philosophical thought in physical and biological sciences and kept himself abreast of the modern developments of experimental and comparative psychology. I have no hesitation in stating that alike by his metaphysical acumen and his strenuous thinking, by his clearness of ideas, his knowledge of the principles and methods of physical and biological sciences and his gift of exposition he is exceptionally fitted to occupy the chair of professor of Philosophy in any Indian University.

Brojendra Nath Seal

Vice Chancellor,
Mysore University.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিদাসবাবুর বৃহৎ আকারের গ্রন্থের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে আছে তাঁর Foundations of Living Faiths। এছাড়া ১৯২৭ সনের ২৯ এপ্রিল তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে হরিদাসবাবুর শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দেন তাতে নিম্নোক্ত কথা ক'টি অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়:

"(1) Teaching Experience: that Mr. Bhattacharyya was professor of Philosophy in the Scottish Churche's College, Calcutta and Lecrtuer in Philosophy and Experimental Psychology, Calcutta University before entering the service of the Dacca University in 1921 .... "হরিদাস বাবুর নথির মধ্যে Inferiority Complex নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের কপি রক্ষিত হতে দেখা যায়। ঐ প্রবন্ধটি ব্যক্তির হীনম্মন্যতা বোধ, তার প্রকাশ প্রভৃতির ওপর মনোহর ইংরেজিতে লিখিত একটি আকর্ষণীয় রচনা। প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিলো ১৯২৭ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের 'সাইকোলজি সেকশনে' এবং 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯২৭ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। লেখাটির প্রাঞ্জল-উপস্থাপনায় যথার্থই মুগ্ধ হতে হয়। আমাদের দর্শন বিভাগ তাঁদের কোনো মুখপত্র বা বার্ষিক প্রকাশনায় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি পত্রিকায় আজো লেখাটি হরিদাসবাবুর নথি থেকে উদ্ধার করে পুনর্মুদ্রণ করলে আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং পাঠকসাধারণ একটি সুন্দর রচনা পাঠে উপকৃত বোধ করবেন।

Foundations Of Living Faiths-এর প্রথম খণ্ডের একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এখনো রক্ষিত আছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা তা আমার জানা নেই। এ গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশকাল ১৯৩৮। গ্রন্থখানির নাম পৃষ্ঠাটি ছিলো নিম্নরূপ। এই নাম পৃষ্ঠায় তিনি যে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট সে কথারও উল্লেখ দেখা যায়:

STEPHANOS NIRMALENDU GHOSH LECTURES
THE FOUNDATIONS OF LIVING FAITHS
(An Introduction to Comprative Religion)
by
HARIDAS BHATTACHARYYA
Provost, Jagannath Hall
and Head of the Department of Philosopohy

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

University of Dacca
First Volume
Published by the University of Calcutta
1938

গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পিতার নামে। উৎসর্গ বাক্যটিতেই হরিদাসবাবুর পিতার নাম পাওয়া যায় :

"To the sacred memory of my father,
Pandit Ramprasanna Sruti Ratna Battacharyya
whose life has ever been to mean ideal and an inspiration"

এই গ্রন্থ মূলত ছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি বক্তৃতামালার ভিত্তিতে রচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত 'স্টিফানোস নির্মলেন্দু ঘোষ লেকচার্স' সেকালের একটি মর্যাদাবান বক্তৃতা ছিলো। এ বক্তৃতাদানের আহ্বান যখন ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের নিকট আসে তখন তাঁর বয়স হয়ত ৪২ বছর। কিন্তু সে বয়সের জন্যও এমন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাদানের আহ্বান একটি সম্মানের বিষয় ছিলো। এই বক্তৃতাদানের জন্য তাঁকে সম্মানী দেওয়া হয়েছিলো ৯০০০ টাকা, আজকের মূল্যমান হিসেব করলে নিশ্চয়ই এটিকে লক্ষ টাকা বলে উল্লেখ করা যায়।

Foundations of Living Faiths বা 'জীবন্ত ধর্মসমূহের ভিত্তি'। বিষয়টি হরিদাসবাবুর বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার সঙ্গে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। আগ্রহী গবেষক বা পাঠক এই গ্রন্থখানার সঙ্গে প্রাথমিকভাবেও পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করলে একদিকে যেমন মুগ্ধ হবেন হরিদাসবাবুর সকল ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের বিস্তার এবং গভীরতা দেখে, তেমনি চমৎকৃত হবেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা তাঁর উদারতা এবং পারদর্শিতা দেখে।

'স্টিফানোস বক্তৃতা' দানকে হরিদাসবাবু নিজেও বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে বিবেচনা করেছিলেন। সেই বোধেরই প্রকাশ দেখা যায় তাঁর এই গ্রন্থের 'প্রিফেস'-এর মধ্যে।

I am much flattered to think that the distinction of a fairly orthodox Brahimn being appointed to a christain endowment during the regime of a Muslim Vice-Chancellor should have falten first on me. By a curious coincidence I had the unique privilege of being born in one of the greatest strongholds of Sanskrit learning and Hindu orthodoxy in Bengal, of being

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

educated in one of the oldest Missionary colleges of Calcutta and of spending the greater part of my teaching career at one of the most important centres of Muslim Culture in India. ..." (P. Viii, Foundations of Living Faiths.)

এই প্রিফেস-এর মধ্যেই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমতের উল্লেখ করতে গিয়ে হরিদাসবাবু বলেছেন :

"... I have also made no secret of my belief that most, if not all, religions fight ignorance half heartedly for fear lest a widespread culture should mean the disowning of all spiritual obligations and a gradual loss of influence of those new in spiritual power over the uneducated masses. I have not subscribed, however, to the view that religion as a distinctive attitude towards life and reality is ultimately destined to pass away with the growth of education and the development of industry..... (ঐ P. IX)

'প্রিফেস-এর এই মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য যে বক্তৃতাগুলো তিনি লিখিতভাবে পাঠ করেন নি, উপস্থিত বক্তৃতা হিসেবে দিয়েছেন। .... Following my usual practice, I delivered the entire series of lectures extempore in order to be better able to adjust my discourse to the actual audience of the day..." (ঐ P. IX) . এও তাঁর স্বভাবসুলভ। আমার ছাত্রজীবনের এমন কোনো দিনকে স্মরণ করতে পারিনে যেদিন হরিদাসবাবু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত বাগ্মিতা বাদ দিয়ে লিখিত কোনো কিছু আমাদের পাঠ করে শুনিয়েছেন।

ইসলাম ধর্মকে সুবিস্তারিতভাবে যে তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায় এ থেকে যে 'গড ইন ইসলাম' এই শিরোনামের প্রায় ৬৫ পৃষ্ঠাব্যাপী অধ্যায়তে। তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগের শক্তিসমূহ থেকে শুরু করে 'ইসলামের রহস্যবাদ ও হিন্দু সর্বেশ্বরবাদ' শিরোনামে বিভিন্ন উপ-অধ্যায়সমূহে যে আলোচনা করেছেন সে উপ-অধ্যায়গুলোর সংখ্যা হচ্ছে চৌষট্টিটি। এই উপ-অধ্যায়গুলোর আকার যে বৃহৎ, তা নয়। কিন্তু এতে ইসলাম ধর্মের এবং মুসলিম দর্শনের যে সমস্যাসমূহের তিনি আলোচনা করেছেন তার মাঝেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় মেলে। হরিদাসবাবুর আলোচিত সমস্যাগুলোর মধ্যে।

'Pre-Islamic Religious Forces', 'The Quranic Revelation', 'The Last Prophet', 'Christ and Muhammad as rival Prophets', 'Muhammad's miracles', 'Islam as the universal religion',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'The Nature of Islamic Toleration', The Quran and the Bible', 'The Quranic view of God', 'The Mutazilite view of God', 'The ninety nine names of Allah', 'Divine Will and Human Destiny', 'Human Freedom', 'Divine Forgiveness', 'Divine Mercy', 'The orthodox and Mutazilite views', 'Al-Asharis opinion', 'Islmaic mysticims', 'Islamic mysticism and Hindu Polytheism'– প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। এ গ্রন্থটিকেও পুর্নমুদ্রিত আকারে বাংলাদেশের আজকের ছাত্র, শিক্ষক এবং পাঠক-সাধারণের কাছে পৌঁছাবার দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার দর্শন বিভাগের পালন করা উচিত। হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথিটি তাঁর মনোহর হস্তাক্ষরে লিখিত নানা মন্তব্য, স্লিপ, পত্র, স্মারক ইত্যাদিতে পূর্ণ। হয়ত হস্তাক্ষর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো তাঁর ছুটির আবেদনে। তার সংখ্যাধিক্যে এই নথিটির পাঠকের মনে হতে পারে যে হরিদাসবাবু অসংখ্যবার ছুটি নিয়েছেন। আসলে ব্যাপারটি তা নয়। কিন্তু অসংখ্য এই ছুটির আবেদনের যে বৈশিষ্ট্যটি আমাকে বিমোহিত করেছে সে হচ্ছে তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা এবং দায়িত্ব পালনে নিয়মনিষ্ঠা। নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে না পারলে অবশ্যই পদাধিকারীকে নিয়মমাফিক সকারণ ছুটির আবেদন করতে হবে এবং ছুটি এ্যালাউ করতে হবে। 'ফ্রেঞ্চ লিভ' বলে ইংরেজিতে একটি কথা আছে। সেটি শব্দগতভাবে আমরা যতো না ব্যবহার করি, কার্যগতভাবে তার অধিক যে তাকে ব্যবহার করি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু হরিদাসবাবু নিশ্চয়ই 'ফ্রেঞ্চ লিভ' ব্যাপারটি সম্পর্কে চরিত্রগতভাবে জ্ঞাত ছিলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অফিসও হয়ত হরিদাসবাবুর এমন নিয়মনিষ্ঠায় কিছুটা বিব্রত হয়েছিলো। তাই হরিদাসবাবুর যখন একদিনের ছুটির আবেদন করে একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন তখন দেখা গেল রেজিস্ট্রার সাহেবের অফিসে এক সহকারী হরিদাসবাবুকে লিখে পাঠাচ্ছেন : 'V.C. says that you do not really require the leave.' কিন্তু এর উত্তরে হরিদাসবাবু লিখে পাঠালেন : ' I was obliged to cut two classes from 10-30 to 12-30. So formal leave would still be required'. এই মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায় আর একটি চিঠিতে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সিকে তিনি চিঠি লিখে বলেছেন : (১.৩.৩৫) :

"Dear Mr. Vice-Chancellor,

As I was detained too long at the Court to be able to take my class, I pray that duty leave for this day only be granted to me...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিস্মৃত তথ্য হিসেবে এখানে একটি কথা বলা যায়। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, সে সিন্ডিকেটে বা ভিসি যিনিই হোন, তিনি নিয়োগকারী, এমপ্লয়ার এবং শিক্ষক হচ্ছেন এমপ্লয়ী। সেদিন অর্থাৎ বিশের বা ত্রিশের দশকে অন্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কি ছিলো তা জানিনে। কিন্তু শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি 'ইউ আর এ্যাপয়েন্টেড' বলে কোনো নিয়োগপত্র দিতেন না।

শিক্ষক আর বিশ্ববিদ্যালয় এরা উভয় ছিলো দু'টি পক্ষ, সমপক্ষ। তাদের মধ্যে চুক্তি হতো। উভয়পক্ষের জন্য চুক্তির শর্ত উল্লেখ থাকত। এবং উল্লেখ থাকত যে, একে পক্ষ চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে অপর পক্ষ তার প্রতিবিধানের কি পথ গ্রহণ করতে পারবে। আজো অবশ্য পক্ষ দু'টি। তবু সেদিন 'চুক্তির' পদ্ধতিতে আজকের প্রভু-ভৃত্যের দিকটি এত প্রকট হয়ে চোখকে বিদ্ধ করতো না।

একেবারে গোড়াতে অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এমন চুক্তিপত্রও শিক্ষকদের জন্য তৈরি হয়েছিলো না। ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৩ সালের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উভয় পক্ষে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হতে শুরু করে এবং এরূপ চুক্তিপত্রে মাহিনার শর্তে যে গোড়াকার প্রতিশ্রুতির পরিবর্তন ঘটেছিলো তার আভাস পাওয়া যায় হরিদাসবাবু ১৯২৩ সালে রেজিস্টারকে যে প্রতিবাদপত্র লিখেছিলেন, তা থেকে। হরিদাসবাবুর নিকট প্রেরিত চুক্তিপত্রের গোড়াতে ছিলো :

'Where as the Executive Coucil of the Dacca University in exercise of the powers conferred on them by the Dacca University Act have engaged the party of the first part (Mr. Haridas Bhattachayya) to serve as a Reader in Philosophy in the University of Dacca till he attains the age of fifty and subject to the conditions and agreements herein contained....

3. That from the first of July nineteen hundred and twentyfour the University will pay him, so long as he shall remain in the said service and actually perform his duties, a salary at the rate of Rupees 700/- Seven hundred (fixed) per mensem.

'৭০০' টাকা নির্দিষ্ট মাহিনার এই শর্তের প্রতিবাদে হরিদাসবাবু রেজিস্টারকে লিখেছিলেন : (১৮.১২.১৯২৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"This is the first official intimation that I have received from the university that the maximum has been reduc from Rs 1200/- to Rs 700/- in the case of Readers... ... ... Taking all the facts together the matter comes to this that intead of a maximum of 1200/- pay and 120\- -as P.F. contribution of the University I am being offered now practically half of what was in the original offer and this inspite of the fact that I wanted a definite assurance from the Vice-Chancellor that the maximum offered would not be varied from ...."

আমার স্মরণমতে হরিদাসবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রিডার' হিসেবেই অবসর গ্রহণ করেন ১৯৪৫ সালে। অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫২ বছর। (সে হিসেবেও হরিদাসবাবুর জন্ম সাল নির্দিষ্ট করা যায় ১৮৯০ সাল।) এই দীর্ঘ সময়ে অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পঁচিশ বছর কার্যকালে তাঁর মাহিনার সেই নির্দিষ্ট ৭০০ টাকার কোনো পরিবর্তন ঘটেছিলো কিনা, আমার জানা নেই।

বাংলাদেশের যেমন রাজনীতি আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও তেমনি রাজনীতি আছে। ইংরেজিতে আমরা বলি 'ইউনিভার্সিটি পলিটিক্স'। এটি নিশ্চয়ই কোনো আধুনিক উপাদান নয়। এটি সেকালেও ছিলো। তবে একালের মত হয়তো সেকালে এত প্রকট বা পোশাক-আশাকবিহীন ছিলো না।

এই রাজনীতির আভাসই পাওয়া যায় হরিদাসবাবুর জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একসিকিউটিভ কাউন্সিলের ১০.২.১৯৩৭ তারিখের কার্যবিবরণী থেকে।

হরিদাসবাবু ১৯৩৫ সালে কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলে জগন্নাথ হলের জন্য নতুন প্রভোস্ট নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এতদিন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। সেকালে হলের প্রভোস্ট পদও স্থায়ী চাকরি বলে গণ্য হতো এবং সেই হিসেবেই প্রভোস্ট নিযুক্ত হতেন।

উল্লিখিত তারিখে একসিকিউটিভ কাউন্সিলে বিষয়টিকে আলোচ্য বিষয় করা হয়। সভার কার্যবিবরণীটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে সেকালের বিশ্ববিদ্যালয় পলিটিকস-এর পরিচায়ক হিসেবে। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উদ্যোগী এবং কর্মীপুরুষ হরিদাস ভট্টাচার্য যে অজাতশত্রু ছিলেন, এমন মনে করা যায় না। তবে তাঁর গুণগ্রাহীরও অভাব ছিলো না। তাই দেখা যায়, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভার শুরুতে হরিদাস ভট্টাচার্যকে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট পদে নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন ড. এন.এম. বসু এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। কিন্তু এ প্রস্তাবের বিরোধিতা আসে জনাব এস.এ. সেলিম এবং সুলতান উদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে।

তাঁরা কয়েকটি নামের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করে সেই কমিটির কাছে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রেরণ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যাঁদের নিয়ে এই কমিটি গঠনের প্রস্তাব হয় তাঁর মধ্যে পি.এন. রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় এবং মূল প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় :

"Original motion was put to vote and carried, eight members voting for it and three members against. Messrs Fazlur Rahman, Sultan uddin Ahmed and S.A. Salim voted against the motion."

এই সভারই শেষে অবশ্য ফজলুর রহমান এবং সেলিম সাহেবও হরিদাসবাবুর প্রভোস্ট নিয়োগে সম্মত হয়েছিলেন।

একসিকিউটিভ কাউন্সিলের এই প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার হরিদাসবাবুর নিকট ১০.২.৩৭ তারিখে প্রেরণ করে লিখেছিলেন :

Dear Sir,

I am directed to communicate to you the following resolution of the Executive Council adopted at its meeting 10th February, 1937 :

"That Mr. H. D. Bhattacharyya, M.A.B.L Head of the Department of Philosophy, be appointed Provost of the Jahannath Hall on an allowance of Rs. 150/- per mensem and free quarters for a period of two years in the first instance, with effect from the 11th February, 1937 and that with approved service the appointment may be renewed up to the end of the session in which he will attain the age of 55 years."

১৯৪৫ সালে হরিদাসবাবুর চুক্তি মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের রীডার হিসেবে অবসরগ্রহণ করে কলকাতা চলে যান। পঞ্চান্ন বছর তখন তাঁর বয়স। সে বয়স কর্মক্ষম থাকার বয়স।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিদাস ভট্টাচার্যের জন্য অবসর গ্রহণের বয়স ছিলো না। হরিদাসবাবু কি তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কোনো আবেদন বা চেষ্টা করেছিলেন? সেদিনকার গোবেচারী ছাত্র আমার তা জানা নেই। হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথিটিও '৩৭ সালের পর থেকে নিরুদ্দিষ্ট। হয়তো চেয়েছিলেন, কিংবা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার তিক্ততায় তার ভরসা পান নি। যেমন ভরসা পান নি বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনিও তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়সের পূর্তি বা তার পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন, কারণ আচার-আচরণে যথার্থ দার্শনিক অধ্যাপক বসু তাঁর চারপাশে গুঞ্জন শুনছিলেন। সে গুঞ্জনের প্রধান উৎস ছিলেন করিৎকর্মা মুসলমান রাজনীতিক জনাব ফজলুর রহমান। তিনিই সরবে দাবি তুলেছিলেন, 'আমাদের একজন মুসলমান পদার্থবিজ্ঞানী আবশ্যক। সত্যেন্দ্রনাথ বসু হিন্দু।' অবশ্য অধ্যাপক বসুকে আরো কিছুদিন রাখারও যে প্রচেষ্টা চলে নি তা নয়। কিন্তু অধ্যাপক বসু চান নি তাঁকে নিয়ে এপক্ষে-ওপক্ষে টানা-হ্যাঁচড়া হোক। তাই তেমন প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাদেরও নিবৃত্ত করে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন।

হরিদাস ভট্টাচার্যের আলেখ্য একটি প্রবন্ধে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। এ কেবল তাঁকে স্মরণ করার প্রয়াস। হরিদাসবাবু ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সেই কালের একটি কৌতূকজনক তথ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম হিসেবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান বলে তালিকাভুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯২১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ছাত্রদের, বিশেষ করে হিন্দু ছাত্রদের কেবল হিন্দু বলে শ্রেণীভুক্ত করা হয় নি। তাদেরকে ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণ বলেও ভাগ করা হয়েছে। এই তথ্যটি কালের নির্দেশক হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্র বিবরণীর চার্টটি তাই তুলে দেওয়া গেল :

AMARBOI.COM

RACE OR CREED OF PASSED SCHOLARS	HONS BA	PASS BA
Europeans & Anglo Indians	X	X
Indian Christians	X	X
Hindus : Brahmans	5	12
Non-Brahmans	21	69
Muhammmedans	11	20

হরিদাসবাবু সম্পর্কে এই আলোচনাটি ব্যক্তিগত একটি বিষয়ের উল্লেখে শেষ করা যায়। হরিদাস ভট্টাচার্য আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র ছিলেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অকৃপণভাবে তাঁর পরিশ্রমী, ধীমান ছাত্র হরিদাস ভট্টাচার্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। অধ্যয়ন শেষে শিক্ষক তথা বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করা ছাত্রদের পক্ষে একটি বোধ্য প্রয়াস। হরিদাসবাবু সম্পর্কে তাঁর ছাত্র হিসেবে আমার এই স্মৃতিটি আনন্দের এবং অনুপ্রেরণার যে, তিনি ঢাকা থেকে চলে যাবার পরেও ১৯৪৭ সালে তাঁর কলকাতার বাড়ি থেকে নিজের টাইপ মেসিনটিতে নিজের হাতে টাইপ করে তাঁর সেই পরিচিত 'এইচ ডি, ভট্টাচারিয়ার' স্বাক্ষরে আমাকে একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। সে প্রশংসাপত্র পেয়ে আমি যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছি, তেমনি তাঁর প্রশংসাবাচক উক্তির উপযুক্ত নই বলে বিব্রত বোধ করেছি। এমন প্রশংসাপত্র ব্যবহার বা বিক্রি করে কোনো জাগতিক উন্নতি লাভ করতে আমি সঙ্কোচ বোধ করেছি। কিন্তু প্রশংসাপত্রটি তার মূল কাগজ খণ্ডটিতে রক্ষা করতে পেরে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। এ প্রশংসাপত্র টিকিধারী ব্রাহ্মণ দার্শনিক অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য যে তাঁর স্নেহভাজন একটি কিশোর ছাত্রের প্রশংসায় তাঁরই শিক্ষক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতোই অকৃপণ এবং উদার ছিলেন সেই সাক্ষ্যই বহন করছে আমার নিজের কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর নয়। ইতিহাসের বিষয় বলেই তাঁর কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"Apart from his intellectual briliance, Mr. Sardar has been a steadying froce in the Department. Genial by temperament and social to a fault, Mr. Sardar has proved a cementing froce among various sections of students, belonging to different halls of the university and I can testify from personal knowledge to his popularity as a student of the university. He was also noted for his social service and his sympathy for the poor and the needy. His teachers are all praise for him and justifiably so."

দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এমন প্রশংসাপত্রের পুরো উদ্ধৃতিতে প্রায় চল্লিশ বছর পরে আজো আমি সঙ্কুচিত। তবে এতে মনোবিজ্ঞানী হরিদাস ভট্টাচার্যের এমন প্রত্যয়টিও ধরা পড়ে যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রশংসা করেই মাত্র স্নেহভাজনকে প্রশংসার যোগ্য হওয়ার প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

হরিদাস ভট্টাচার্য আজ বেঁচে নেই। কবে তিনি প্রয়াত হয়েছেন, তার তারিখ বিনা অনুসন্ধানে বার করা ঢাকায় তাঁর পুরাতন ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৯৫৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর হরিদাস ভট্টাচার্যের মৃত্যুর তারিখটি সেদিনের পাকিস্তানভূক্ত ঢাকার কোনো কাগজে সংবাদ হয়েছিলো কি না, আমার জনা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা দর্শন বিভাগ প্রতিষ্ঠানগতভাবে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠাকালের অন্যতম সংগঠক শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্যকে স্মরণ করেছিলো কিনা সেটিও আমার অজ্ঞাত। জগন্নাথ হলের বর্তমান প্রাধ্যক্ষ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রঙ্গলাল সেন অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন, তখনকার ঢাক-জগন্নাথ হলের যুক্ত ছাত্রাবাসের প্রভোস্ট এবং ছাত্রগণ একটি শোকসভায় মিলিত হয়ে হরিদাস ভট্টাচার্যকে সেদিন স্মরণ করেছিলেন। ইতিহাসকে বিস্মরণের প্রবাহে তাঁরা সেদিন অন্তত একটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, হরিদাসবাবুর একজন ছাত্র হিসেবে এজন্য জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

মিস. এ. জি. স্টকের স্মৃতিকথা

শুনলাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের এক সময়কার ইংরেজ অধ্যাপিকা মিস এ.জি. স্টক কয়েকদিনের জন্য আবার ঢাকায় বেড়াতে এসেছেন। আমি নিজে তাঁর নিকট পরিচিত নই। তাহলে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আসতাম। ইংরেজি বিভাগ থেকে, শুনেছি, একটি সংবর্ধনা জানানো হবে। তাতে জোর করে উপস্থিত হওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু সেটি বড় কথা নয়। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় অপরিচয় বড় নয়।

মিস স্টকের নামের সঙ্গে আমি সেই '৪৭ সালের দিকেই পরিচিত হয়েছিলাম। অবশ্য তিনি যখন ভারত বিভাগের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে এসে যোগ দেন, তখন একদিকে যেমন আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে, তেমনি অপরদিকে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছে। পুলিশের দৃষ্টি আমার ওপর পড়তে শুরু করেছে। এর ফলেই ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি আমি নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাই। আর তারপরে ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে গ্রেফতার হওয়া থেকে আমার দীর্ঘ বন্দীজীবনের শুরু হয়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মিস স্টকের সাহচর্যে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু যে সাহচর্য আমি সাক্ষাৎভাবে লাভ করি নি সেটিই পেয়েছিলাম আজ থেকে বছরখানেক আগে তাঁর ঢাকার স্মৃতিচারণমূলক 'নাইনটি ফরটি সেভেন টু ফিফটিওয়ান মেমেয়েরস অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি' শিরোনামে বইখানি যখন পড়ি। তাঁর এই স্মৃতিচারণের মধ্যে মিস স্টক একজন দরদী ও জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে কেবল প্রকাশিত হন নি, তিনি পূর্ব বাংলার সে সময়কার ছাত্র-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষক-মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল ভাষা-সংস্কৃতির আন্দোলনের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বইখানা প্রথমে যখন পড়ি তখন আমার খুবই ভাল লেগেছিলো। এর প্রধান কারণ, ১৯৪৭-৫১—এই সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকে জানার আমারও একটি আগ্রহ আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি ছাত্র ছিলাম। কিছুকাল এর শিক্ষকও ছিলাম। আজ আবার এর সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে জড়িত হয়েছি। অধ্যাপিকা মিস স্টকের সরস ও সুন্দর অর্থময় উক্তিপূর্ণ স্মৃতিচারণ আমাকে সেই সময়কার জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতায় ঋদ্ধ এবং সে কারণে এই স্মৃতিচারণ পাঠে একটা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবোধ আমার মনকে পূর্ণ করে তুলেছিলো। রোজনামচার আকারে লিখিত এ স্মৃতিচারণে অধ্যাপিকা স্টক তাঁর সেই বিলেত থেকে ঢাকা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি গ্রহণ করা থেকে ১৯৫১ সালের শেষে পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তান সরকারের নির্বোধ আচরণের ফলে ক্রমাধিক পরিমাণে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক হত্যা এবং রাজনৈতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ঢাকা ত্যাগের সময় পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। কেমন করে ধীরে ধীরে তিনি পরিচিত হয়েছেন পূর্ববঙ্গের জীবনের সঙ্গে। তার আবহাওয়া-রাস্তাঘাট-মানুষের সঙ্গে। কেমন করে হৃদ্যতা তৈরি হয়েছে তাঁর বিশ্বস্ত বাবুর্চি আবদুল থেকে ছাত্র, শিক্ষক সম্প্রদায়ের বুদ্ধিমান, সমাজসচেতন চরিত্রসমূহের সঙ্গে। মুনীর চৌধুরী, সারওয়ার মুর্শিদ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. পি. সি চক্রবর্তী, কবি জসিমউদ্‌দীন, ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাহমুদ হাসান এঁরা সবাই অন্তরঙ্গ রেখাচিত্র হিসেবে তাঁর রোজনামচায় ফুটে উঠেছেন। রচনার সমগ্রটিতে একজন দরদী সুহৃদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপিকা মিস স্টকের এ রচনা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের হলেও এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন সেটি তিনি কখনো বিস্মৃত হন নি। তাঁর সেই অকৃত্রিম সম্পর্কের টানেই তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার ঢাকা এসেছিলেন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। তখনি তিনি এই পাণ্ডুলিপিটি ঢাকার গ্রীন বুক হাউজের রুচিবান প্রকাশক মাহমুদ সাহেবের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। গ্রন্থে লেখিকা তাঁর মূল রচনার পরবর্তীকালের ঘটনাবলির আভাসও তাঁর ভূমিকাতে দিয়েছেন। সে ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

...I had reached the language riot of nineteeen fortyeight when the war brokeout in march 1971 and the present came horryfyingly to life on secreen, radio and the newsprint

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

smothering memories. It was months before I learnt anything of the fate of my friends lyotirmony guha thakurta was killed in the presence of his students, Munir Chowdhury, with his gallantry and gaiety was a body among many bodies in the brickfield.....

আমার স্মৃতিচারণে আমি ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে যখন পৌঁছি তখন ১৯৭১-এর মার্চে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এবার অতীতকে আচ্ছন্ন করে মর্মান্তিক বর্তমান আমার সামনে এসে হাজির হলো। ছবিতে দৃষ্ট সে দৃশ্য, বেতারে শ্রুত আর কাহিনী আর নিউজপ্রিন্টে মুদ্রিত তার বিবরণ আমার অতীতের স্মৃতিকে একেবারে রুদ্ধ করে দিল। কিন্তু বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আমি জানতে পারলাম না আমার সেদিনের বন্ধুদের কার ভাগ্যে কি ঘটেছে। অবশেষে জানলাম জ্যোর্তিময় গুহঠাকুর তাকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর ছাত্রদেরই সামনে। সদাহাস্য মুনীর চৌধুরী একটা ইটের ভাটিখানায় বহু মৃতদেহের একটি মৃতদেহে পর্যবসিত হয়েছেন....

মিস এ জি স্টকের এই স্মৃতিচারণ একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। সাহিত্যপত্র এবং সাহিত্যিক মহলে বইখানির আলোচনা হওয়া উচিত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের যেমন এ একটি উত্তম সৃষ্টি, তেমনি পূর্ববাংলার ১৯৪৭-৫১ সময়কালের জীবন ও নানা চরিত্রের অন্তরঙ্গ আলেখ্যে এ গ্রন্থ অনন্য। বাংলা অনুবাদে মিস স্টকের প্রকাশ মাধুর্য হয়ত রক্ষিত হবে না, তবু ১৯৪৭ থেকে '৫১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের একখানি অনুপ্রেরণাদায়ক অন্তরঙ্গ ইতিহাস হিসেবে এর অনুবাদ হওয়া প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়।

সানাউল হক : চল্লিশের দশকের অন্যতম সাথী

প্রায় ১২ বছর আগে, '৮১ সালের জানুয়ারি মাসের এক রাতে আকস্মিকভাবে টেলিভিশনের আওয়াজে শুনেছিলাম সৈয়দ নুরুদ্দিনের প্রয়াণের কথা। ১২ বছর পরে '৯৩-এর ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে টেলিভিশনের শেষ সংবাদ পাঠিকার কণ্ঠে খবর পেয়ে চমকে উঠলাম : আমাদের চল্লিশের দশকের অন্যতম সুহৃদ, সাথী, কবি সানাউল হকও চলে গেছেন।

সানাউল হক অসুস্থ ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখনো তিনি আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলছিলেন। বাংলা একাডেমির তিনি সভাপতি ছিলেন। বোধ হয় একুশের এক বক্তৃতায় তিনি অপ্রত্যাশিত সাহসী বক্তব্য উপস্থিত করে আমাদের চমকে দিয়েছিলেন। আমার নিজের সাংসারিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের নানা সঙ্কট ও সীমাবদ্ধতার কারণে মনের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সানাউলের কাছে গিয়ে বসতে পারি নি। অথচ নিজের মনে তার সঙ্গে কখনো আমার অন্তরের কথা বন্ধ হয় নি।

সানাউল, নুরুদ্দিন : দু'জন বোধ হয় একই বয়সের ছিলেন। বয়সে আমার জ্যেষ্ঠ। কিন্তু সম্পর্কে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কখনো বয়সের কোনো প্রশ্ন আসে নি। আসলে আমরা সেদিন, সেই রূপকথার যুগে, জানতামই না আমাদের কার বয়স কত। আমরা কেই কারুর চাইতে ছোট কিংবা বড় ছিলাম না। সকলেই সকলের সমান। নুরুদ্দিন তো বটেই, সানাউল হকের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ছিলো পরস্পরের 'তুমি' সম্পর্ক। কেমন করে আমরা সেদিনই, এই পূর্ববঙ্গের উত্তর-পশ্চিম পূর্বদক্ষিণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশ্রমে' এসে মিলিত হয়েছিলাম তার কোনো হদিস আজ চেষ্টা করেও আমি বার করতে পারছিনে। জল যেমন নিঃশব্দে জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়, নদী যেমন পূর্ণতার টানে সাগরে মেশে, আমরাও সেদিন জল আর নদীর মতো নিজেদের অজান্তেই পরস্পরের অন্বেষণে ছিলাম এবং সেই অন্বেষণে পরস্পরকে লাভ করেছিলাম। আর তাতেই তৈরি হয়ে উঠেছিলো নতুন জীবন ও স্বপ্নের বোধে উদ্বুদ্ধ সুহৃদ ও সাথীর একটি গোত্র। সেই গোত্রের পরস্পরের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা আর হৃদ্যতার কথা একালের তরুণ-তরুণী, এমন কি বয়স্কদেরও বুঝিয়ে বলা, লিখে জানানো একেবারে অসম্ভব। আর তাই আমি যখন সানাউলের বাড়িতে গিয়েছি, কিংবা টলস্টয়ের জন্মের ১৫০ তম বার্ষিকীতে একই মঞ্চে যে যার ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি, তখন আমাদের পারস্পরিক দৃষ্টিতে যে প্রীতি ও স্মৃতির আবেগ উদ্ভাসিত হতো, তা অপর কারুর পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব হতো না।

পূর্ববঙ্গের এমন অঞ্চল আছে যে অঞ্চলের দুই সুহৃদ একান্তভাবে পরস্পর সংলাপে রত হলে অপর অঞ্চলের মানুষের পক্ষে তার মর্মার্থ অনুধাবন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তেমনি আমাদের অবস্থা হতো যখন সানাউল, নুরুদ্দিন, মতিন, মুনীর, কামাল, নুরুল ইসলাম, বাহাদুর একালেও মিলিত হতাম এবং একে অপরকে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতাম। তখন একালের পারিপার্শ্বিক যেন অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের চোখে ভেসে উঠত জিজ্ঞাসা, এরা কারা, এদের এমন গভীর প্রেম আর প্রীতির রহস্য কি?

নুরুদ্দিন চলে যাওয়ার পরের দিনও আমার এই কথাগুলো মনে হয়েছিলো। আজ ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে সানাউলের জানাজায় শরিক হয়ে মসজিদ থেকে নেমে আনমনে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে কথাগুলোই মনে পড়ছে। ক্রমান্বয়ে একটা সঙ্গীহীনতার অসহায়তা যে বৃদ্ধি না পাচ্ছে, তা নয়। যথার্থই ক্রমান্বয়ে সঙ্গীহীন হয়ে পড়ার একটা অসহায় এবং অনিবার্যতার বোধ মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, দিনক্ষণ মনে করতে পারছিনে। আনন্দে বিষাদে সঙ্কটে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ফললুল হক হলের বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে, যুদ্ধের মধ্যে লাভ করা আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের সৈনিকদের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শের 'কমরেডদের' সঙ্গে সাহিত্যের আসরে, কিংবা তাদের উদ্যোগে ক্যান্টনমেন্টের সেনাছাউনিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে সংগঠিত বিতর্কে আমরা কে কি বলেছি তা স্মরণ করতে পারছিনে। এমন কি '৪৬ সালের কলকাতার গণহত্যার খবরে উদ্বেগে অস্থির হয়ে আমরা কেমন করে ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে চক-ইসলামপুর-পাটুয়াটুলি-নবাবপুরের মধ্য দিয়ে যে শান্তি মিছিল সংগঠিত করেছিলাম, তাতে সানাউল আমার সামনে কিংবা পেছনে ছিলো তা কেমন করে বলব? কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক সমগ্র উদ্যোগ ও আয়োজনে যে সানাউল থাকত, থাকত, মুনীর, নুরুদ্দিন, মতিন : এতে কোনো সন্দেহ নেই।

একটা কথা ভাবতে আমার অবাক লাগে। কোনো বর্তমানই সদস্যা ও সঙ্কটমুক্ত নয়। তাই কোনো বর্তমানের মানুষই নিজেকে নিশ্চিন্ত আর সুখী বোধ করতে পারে না। কিন্তু চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে তার সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনে লালিত-পালিত হচ্ছিলাম যে আমরা, তারা রাজনৈতিক সঙ্গটে উদ্বিগ্ন ও চিন্হিত হলেও, নতুন স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ আমরা নিজেদের সেই জীবনকে মনে করতাম ভাগ্যবান জীবন। মানুষের মুক্তির তত্ত্বের সন্ধান লাভে আমরা ভাগ্যবান ছিলাম। সোমেনকে লাভ করার আমাদের ভাগ্য হয়েছিলো। আশ্রম-সম বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে আমাদের তথা সানাউলের, নুরুদ্দিনের, মুনীরের, মতিনের, নাজমুল করিমের, মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর, আমার ভাগ্য হয়েছিলো বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুকে লাভ করার, ভাগ্য হয়েছিলো জ্ঞানতাপস ড. শহীদুল্লাহর স্নেহ সাহচর্যে ধন্য হওয়ার, ভাগ্য হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমগ্র বঙ্গদেশ এবং ভারতের প্রগতিপন্থী চিন্তাধারার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়ার। এ কেবল স্মৃতির কথা নয়। এ আমাদের সকলেরই সেইকালেরই সচেতন বোধের ব্যাপার ছিলো।

আর সে কারণেই অসুস্থ শরীরে সানাউলের মন যখন ভেঙে পড়ল, যখন তার একটি প্রকাশিত কবিতার প্রধান অনুরণন ছিলো, 'আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি', তখন সে কবিতা পাঠ করে বন্ধুবর মতিনের মতো আমার মনও বেদনায় ভরে উঠেছিলো। একথা জানতাম, সেই অসুস্থ অবস্থায় সানাউল হকের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা বা আশার কথা বলা নিরর্থক ছিলো। তবু সানাউল তথা আমরা, সেই চল্লিশের দশকের সুহৃদরা, সাথীরা তাদের স্বপ্ন ও বিশ্বাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রে কি নিঃশেষ তার ব্যর্থ হয়ে গেছি? শরীর দুর্বল হলে অনিবার্যভাবে মনও আমাদের দুর্বল হয়ে পড়ে। তবু সেই অসুস্থ শরীরের হাহাকার এবং আফসোস কি একদিনকার আশাবাদী তরুণ সানাউলদের নিষ্ঠা, আদর্শ ও স্বপ্নের অবদানকে মিথ্যে করে দিতে পারে? যদি আমার সাধ্য থাকত তবে আমি সেই কবিতাটি পাঠ করার পরে সানাউলকে গিয়ে বলতাম, না, তুমি নিঃশেষ হয়ে যাও নি, তুমি ব্যর্থ হয়ে যাও নি। তুমি মানেই আমরা, আমরা মানেই তুমি। আমি নিজে সেদিন সানাউলের কাছে যেতে পারি নি। এই না পারার অক্ষমতার দুঃখই আজ সানাউলের মৃত্যুর খবর হঠাৎ ৪ তারিখে শুনে আমার মনে বড় হয়ে বাজল।

এই রোজনামচাটি শেষ করার মুহূর্তে হাসনাতের কাছ থেকে ১৯৯০ সালে নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে প্রকাশিত সানাউল হকের 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য' বইখানা পেলাম। বইখানাকে সানাউল উৎসর্গ করেছেন একালের মননশীল সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল হাসনাত ও সংস্কৃতিবান কর্মী আফজাল হোসেনকে। এই উৎসর্গটিতে কবি সানাউল হকের প্রিয়জনদের জন্য স্নেহ ও মমতার একটি অনাবিল প্রকাশ ঘটেছে।

AMARBOI.COM

আমার আফসোস, সানাউলের জীবনকালে এই গ্রন্থখানির আমি খবর রাখতে পারি নি। তাঁর ছেলেবেলার কাহিনী বেরিয়েছিলো, তা আমি জানতাম। কিন্তু সানাউল তার সেই চল্লিশের দশকের তারুণ্যে, কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে, দিনের পর দিন জীবনের নানাদিকের ওপর তার চিন্তাপূর্ণ মন নিয়ে সুন্দর, কাব্যময় গদ্যে দিনলিপি রচনা করে যে ভবিষ্যৎকালের জন্য রক্ষা করেছেন, তা আমি জানতাম না। তাঁর এ দিনলিপি সমগ্র বাংলাসাহিত্যে একটি মূল্যবান ও তাৎপর্যময় সংযোজন বিশেষ। সানাউলের এই দিনলিপি নিয়ে উপযুক্তভাবে কি ঢাকার সাহিত্যিক মহল আলোচনা করেছেন? আমি তেমন আলোচনা সম্পর্কে জ্ঞাত নই।

আমি এখনো সানাউলের দিনলিপি পাঠ শেষ করতে পারি নি। তবু তার মধ্যে থেকে ১০ বৈশাখ ১৩৫০ তথা ১৯৪৩ সালে লিখিত এবং ২৪.৭.১৯৪৩ তারিখে লিখিত দু'টি দিনলিপির পাঠ মুহূর্তে আমার এই পৌঢ়ত্ব থেকে ৫০ বছর ছেঁটে ফেলে আমাকে পৌঁছে দিল একেবারে কিশোর তারুণ্যে।

'বৈশাখ দশ, ১৩৫০, সাতগাঁও

ভারতের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। বর্তমান শতকে এমন বহুধাবিভক্ত আর দুর্দশাগ্রস্ত দেশ হয়তো একটিও নেই। পৃথিবীর আর সব দেশ যখন নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রয়োগে. নব নব সম্ভাবনাকে রূপ দিচ্ছে তাদের কর্মে ও চিন্তায়, ভারত তখন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান, এই দোটানায় পড়ে পড়ে দিন দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্জীব ও শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। তার অখণ্ডত্বের ও দ্বিখণ্ডত্বের মধ্যে দর কষাকষি হচ্ছে বিস্তর, অথচ যাকে নিয়ে এ তোলপাড় তার দিকে নজর নেই কারো—এ যেনো মার্কামারা থান কাপড়ের মতো। তাকে ছেঁটেকেটে টুকরো করলেও যা, আস্ত রেখে ফরাশ পাতলেও তা। যে ব্যবহার করবে, তার রুচিতেই নির্ধারিত হবে সব কিছু, যাকে ব্যবহার করা তার 'জো হুজুর' করা ছাড়া যেনো নিস্তার নেই। ধর্ম ও সংস্কার তীক্ষ্ণ কাঁচির মতো হাঁ করে আছে কার হাতে শিকার পড়বে, শুধু এই ভাবনা। জিন্না ও সাভারকর, দুই ভিন্ন স্বার্থের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন। একজন কথার তুবড়িতে আর একনজকে উড়িয়ে দেন—দলের লোক চেঁচিয়ে বলে, শাবাশ নওজোয়ান জিতে রাহো। সাগর পাড়ের মুরুব্বিরা আশ্বস্ত হয়ে, একের অগোচরে অন্যকে উৎসাহ দেন।'

আবার ২৪.৭.৪৩ তারিখের দিনলিপিতে সানাউল আমাদের নিয়ে যান সেকালের প্রতিক্রিয়া ও রক্ষণশীল শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সানাউল ও তার 'কমরেডদের' সাহসী উদ্যম উৎসাহ, প্রয়াস-প্রচেষ্টার জমিনটিতে।

২৪.৭.১৯৪৩

'আমাদের হলের জনৈক বিলাত-ফেরত উচ্চশিক্ষিত (?) হাউজ টিউটর আমাদের কমরেড রবিগুহ ও প্রত্যক্ষ দত্তের হলের প্রবেশাধিকার নিয়ে যে তুমুল হৈ হৈ করে আমাকে ধমকালেন, তা শালীনতা, ভদ্রতা ও ভব্যতার বাইরে। তার কথাগুলো এতো জ্বালামীয় যে তা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য হলাম। মানুষের চরমতম নিচাশয়তার পরিচয় জীবনে আমি বহুবার দেখেছি, কিন্তু তাতে মনে এতোটা বাজে নি। কিন্তু আজ যখন হিন্দু-মুসলমান উভয়ের শিক্ষাদান-কর্তব্যে নিযুক্ত এই শিক্ষক এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই দু'টি ছাত্রের হলের আগমন নিয়ে এমন কাণ্ড বাধালেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তথা শিক্ষাগার সম্বন্ধে আমি ঘোর সন্দিহান হয়ে উঠতে বাধ্য হলাম। আমাদের আজ বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুধু বিধর্মী হলেই মানুষ মানুষের শত্রু নয়, অন্যপক্ষে এক ধর্মাবলম্বী মানুষই পরস্পরের বন্ধু নয়।'

সানাউলের সংযত রুচিপূর্ণ বাকভঙ্গিটি চোখের সামনে আজ ভেসে উঠছে। আমি যেন আমার সদ্যপ্রাপ্ত তাঁর 'তারুণ্যের দিনলিপি' নিয়ে তাঁকে অবাক করে দেওয়ার জন্য রহস্য করে বলছি, দেখতো, এই লেখকটিকে তুমি কি চিনতে পারো?

সানাউল অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দপূর্ণ আবেগে অসুস্থ শরীরেও হেসে ওঠার চেষ্টা করে বলছেন, আরে সরদার! এ বই তুমি কোথায় পেলে? তোমাকে দেব বলে ভেবেছি। কিন্তু দেওয়া তো হয় নি।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সানাউলকে বলছি, তাতে আমার কোনো অভিমান নেই। তোমার এ বই নিয়ে আমাদের অবশ্যই আলোচনা করতে হবে।.....

আমার আফসোস এজন্য আরো যে, সানাউল বেঁচে থাকার সময়ে আমি তাঁর ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বিরতিবিহীন'-এর উৎসর্গপত্রটি দেখি নি যেখানে তিনি তাঁর চল্লিশের দশকের সতীর্থদের উল্লেখ করে বলেছেন :

'কবীর চৌধুরী
ওয়াদুদুল হক
সরদার ফজলুল করিম
চল্লিশের দশকের সহমর্মিতার বন্ধুত্রয়—'

৭.২.৯৩

ওজনের বেলা করিও না হেলা

'ওজনের বেলা করিও না হেলা,
মাপকাঠি তব রাখিও সমান...'

শুধু এই বয়াতটিই আমার মনে আছে। সেই ছোটকাল থেকে। তখন আরো বয়াত আমার মুখস্থ ছিলো। কোরানের সুরা 'আর রহমান'-এর বোধ হয় একখানি কাব্যিক অনুবাদ মিয়াভাই সাহেব এনে দিয়েছিলেন। সে বইয়ের সবটাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। বাড়ির সকলে ডেকে ডেকে আমাকে বলতেন, তুমি পড়োত একটু সেই বইখানা। কিন্তু বড় হয়ে, সব ভুলে গেছি তার পদ। কেবল মনে আছে এই দু'টি ছত্র। 'ওজনের বেলা করিও না হেলা, মাপকাঠি তব রাখিও সমান।' কথাটি সুন্দর। মনকে উদ্বুদ্ধ করে। ওজনের বেলা সতর্ক থেকো। দেখো, যেন সেখানে কোনো এদিক—ওদিক না হয়। যার যা প্রাপ্য তাকে তা ঠিকমতো দিবে।'

জীবনের জন্য এ এক মৌলিক নির্দেশ। আর এই নির্দেশ পালনেই আমাদের যত ব্যর্থতা। মিয়াভাই সাহেব নিশ্চয়ই আজো জানেন, কোরানের এই কবিতার অনুবাদের অনুবাদক কে? এ বই কি এখন পাওয়া যায়! গতকালের (১৩.৭.৮৩) সাক্ষাতে তাঁকে প্রশ্নটি করেছিলাম। আমার প্রশ্নে মিয়াভাই খুশি হলেন। বললেন, 'মীর ফজলে আলী অনুবাদ করেছিলেন। কেবল সুরা আর রহমান নয়। আরো বেশ কিছু সুরা। তাই নিয়ে বই বার করেছিলেন। নাম 'কোরানকণিকা'। বইখানি এখন আবার ছাপা হয়েছে। ইসলামী বইয়ের দোকানে তুমি পাবে। আমারও বোধ হয় আছে একখানা। কোথায় আছে ঠিক নেই। পেলে তোমাকে আমি দিয়ে দেবো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইখানাকে খোঁজ করে দেখতে হবে, পাই কিনা। বইখানি আবার আমার পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে।

বরিশাল শহর থেকে আট মাইল পশ্চিমে রহমতপুর। রহমতপুরে আমার বড় ভাই সাবরেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৯৩৪-৩৫ সালের কথা। জমিদারবাড়ির কাছে হাই স্কুল। বেশির ভাগ ছেলেই হিন্দু। মুসলমান কম। হেডমাস্টার উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন। সেকালের হেডমাস্টাররা সবাই প্রায় বড় ছিলেন। আজকাল তেমন বড় হেডমাস্টার খুব পাওয়া যায় না।

কিন্তু রহমতপুর স্কুলকে আমার যে কারণে স্মরণ হয় তার একটি: যে বাড়িটিতে আমরা থাকতাম সেই বাড়িটির কারণে। আর দ্বিতীয়টি আমার ক্লাসের বন্ধু কানাইয়ের কারণে। গ্রামের মধ্যে আমাদের সেই বাড়িটি, অর্থাৎ বড় ভাই-এর অফিস-কাম-বাসা বাড়িটি ছিলো সুন্দর দোতলা দালান। সেকালে এমন বড় দোতলা দালান হিন্দু পাড়া ব্যতীত কোনো মুসলমান পাড়া বা বাড়িতে ছিলো না। কিন্তু এই বাড়িটি ছিলো বরিশালের ওয়াহাব খান সাহেবের বাবার। ওয়াহাব খান বরিশালের উকিল ছিলেন। আরো পরবর্তীকালে তিনি হক সাহেবের দলের নেতা ছিলেন এবং ১৯৫৬-৫৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের স্পিকার হয়েছিলেন। তাঁদের বাড়িটি, আমি যেকালের কথা বলছি, সেকালে প্রায় পোড়োবাড়ি হয়েছিলো। কারণ এ রকম কথা শুনেছিলাম যে, পারিবারিক কোনো বিবাদের কারণে ওয়াহাব সাহেবদের কোনো নিকটজন এই বাড়িতে নিহত হয়েছিলেন। সামনে বাঁধানো ঘাটের বড় পুকুর। পেছনে আম-সুপারির বড় বাগান। পেছনে আর একটি বাঁধানো ঘাটের পুকুর। মেয়েদের জন্য। চারদিকে দেয়ালঘেরা। মোটকথা, জমিদারের এক বাগানবাড়ি-প্রায়। বাড়ির সামনে পাকা দোতলা মসজিদ।

কিন্তু মারাত্মক ঐ ঘটনার পর থেকে বাড়িটি খালি পড়েছিলো। ওয়াহাব খান সাহেবের পরিবার-পরিজন গ্রাম ছেড়ে ৭/৮ মাইল দূরে বরিশাল শহরে স্থায়ীভাবে উঠে গেলেন। পরে সরকারের তরফ থেকে বাড়িটিতে রেজিস্ট্রেশন অফিস বসানো হলো। দোতলা দালানের নিচতলাতে অফিস। ওপরের তলাতে সাবরেজিস্ট্রারের বাসা। এ বাড়িটা কেবল পোড়ো এবং ভূতুড়ে ছিলো না। সত্যি এতে ভূত ছিলো। কোনো সাবরেজিস্ট্রার এখানে বদলি হয়ে আসতে চাইতেন না। এলেও বেশিদিন থাকতেন না। আমার বড় ভাই ধার্মিক পরহেজগার মানুষ। ভূতে বিশ্বাস করেন না। বাড়ির বদনাম সত্ত্বেও তিনি আগ্রহ করে বদলি হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি এসে ভূত তাড়িয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন রাতে, দোতলাতে আমি এবং আমার বোন ঘুমাতাম যে ঘরে এবং যে ঘরের পাশে বড় ভাই থাকতেন, সেই ঘরের সামনে বারান্দায় একটি ভূতকে চক্রবন্দী করা হয়েছিলো। চকের রেখা দিয়ে, ভূত আমাদের পড়শি যে যুবকটির ওপর ভর করেছিলো, সেই যুবকটির চারদিকে মন্ত্রপূত খড়ির রেখার চক্র কেটে তাকে আটক করে এক জবরদস্ত দরবেশ তাকে জেরা করছিলো। জেরায় সে নানা অদ্ভুত কথা বলেছিলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত দরবেশের দাবড়ানিতে তাকে কথা দিতে হয়েছিলো যে, সে আমাদের এই বাড়ির চারপাশে আর থাকবে না। তার যাওয়ার চিহ্ন হিসেবে দক্ষিণ পাশের আমগাছের একটা ডাল সে ভেঙে দিয়ে যাবে। সেদিন এই পুরো অনুষ্ঠানটির পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে কিশোর মনে যতো না ভয় বা বিশ্বাস জন্মেছিলো, তার চাইতে বেশি কৌতুক আর কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিলো।

কিন্তু রহমতপুরকে মনে রাখার বা মনে পড়ার এটা বড় কারণ নয়। রহমতপুরের হিন্দু একটি পরিবারের এক পুত্র-শোকাতুরা মা, যে আমার ধর্মভক্ত বড় ভাইকে একেবারে সন্তানের মতো গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই পরিবারের আম-তেঁতুলের আচারে আমার এবং আমার সহপাঠিনী মেজ বোনের যে অবাধ অধিকার ছিলো, স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা-ভরা সেই স্মৃতি আমাকে রহমতপুরকে ভুলতে দেয় না।

এবং আমাকে ভুলতে দেয় না আমার অন্তরঙ্গ কিশোর বন্ধু কানাই। এক কিশোরের আর এক কিশোর বন্ধু। কানাইয়ের পুরো নাম ছিলো ফণীভূষণ কাঞ্জিলাল। কানাইদের হিন্দুপাড়াটি ছিলো আমাদের রেজিস্ট্রি অফিসের বাসার মুসলমান পাড়ার একেবারে পার্শ্ববর্তী। কিন্তু কানাই সম্পর্কে আমার স্মৃতির মধ্যে একটি বেদনার ভাব আছে। কানাই যখন স্কুলে আসত তখন ওর কাছে ওদের গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখের কাহিনী শুনতাম। কিন্তু কেবল দুঃখের নয়, গর্বেরও। কানাই গর্ব করে বলত, 'জানিস আজ আমার 'ডেটিনিউ' দাদার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি।' 'ডেটিনিউ', 'রাজবন্দী', 'ইন্টারনড', 'অন্তরীণাবদ্ধ' রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এই শব্দগুলো সেই কিশোর বয়সে আমি কানাইয়ের কাছ থেকেই শুনেছিলাম। কানাইয়ের এক ভাই ব্রিটিশ সরকার দ্বারা কোথাও 'ইন্টারনড' বা রাজনৈতিকভাবে 'অন্তরীণবন্দী' ছিলো। কানাইয়ের কাছ থেকে একথা শুনে আমার দুঃখ হতো। কানাইয়ের পরিবারটিকে আর পাঁচটি পরিবার থেকে ভিন্ন মনে হতো। সেদিনও আমি জানি নি, আজো জানিনে কানাইয়ের দাদার বয়স কত ছিলো, কোন দলের সে কর্মী ছিলো এবং কবে সে মুক্তি পেয়েছিলো। কিন্তু সেই নিষিদ্ধ রাজনীতির রোমান্টিক একটি আকর্ষণ যে আমার সেই কিশোর বয়সের জীবনেই অনুপ্রবেশ করেছিলো, সে কথাটির উল্লেখ করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ক্লাস সিক্সের পরেই রহমতপুর থেকে চলে আসি। কারণ আমার বড় ভাই তার পরেই রহমতপুর থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ বরিশালের গলাচিপাতে।

কানাইয়ের মা আমাকে কোনোদিন সঙ্কোচ করেন নি। মুসলমান বলে পর মনে করেন নি। ছেলের বন্ধু। ছেলে সাথে করে নিয়ে গেলেই ঘরে তুলে পুজোর নাড়ু, মুড়কি, মোয়া বার করে দিয়েছেন। আমার কোনো সঙ্কোচ, আপত্তি মানেন নি। আমাকে খেতে হয়েছে।

জীবনের স্রোতে কানাই কোথায় ভেসে গেছে, তা আমি জানিনে। একদিন যে হিন্দু পাড়াগুলো সাজানোগোছানো ছোট ছোট শহরের মতো ছিলো, আজ সেগুলো পোড়ামাটির ভিটে। ঘরবাড়ির সব উৎসাদিত। ইট-কাঠ-টিনের চিহ্নমাত্র নেই। কোনোদিন যে এমন পাড়া সুন্দর লোকালয় ছিলো, তা বোঝাও সহজ নয়।

আসলে মানুষের জীবনে, সামাজিক রাজনৈতিক আলোড়নে এক একটা লোকবসতি যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, সে কথা আমি আমার কিশোরকালের পরিচিত হিন্দু বন্ধু এবং পরিচিতজনদের বাসের জায়গাগুলো স্মৃতির টানে আবার দেখতে না গেলে এত মর্মান্তিকভাবে বুঝতেই পারতাম না।

১৪.৭.১৯৮৩

AMARBOI.COM

আমার মিয়াভাই

'৮৩ সালের জুলাই মাস। তখনো আমার বড় ভাই, যাঁকে আমি 'মিয়াভাই' বলে সম্বোধন করতাম, তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের রোজনামচা হিসেবে নিচের লেখাটি তুলে দিচ্ছি।

গুলশান বড় ভাগ্নের বাড়ি থেকে বনানী। মাইলখানেক পথ। ছোট ছেলে তিতুকে সাথে করে মিয়াভাই সাহেবের বনানীর বাড়িটিতে এলাম ঈদের আগের দিন : ১১ জুলাই, '৮৩। মিয়াভাই সাহেবের দেখা পাবো কি পাবো না, এই এক চিন্তা ছিলো। আজকাল প্রায়ই তিনি তবলিগে যান। তাঁর ভাষায় 'জামাতের দাওয়াতে' যেতে হয়। ৪০ দিন ৪৫ দিন বাসার বাইরে থাকেন। মসজিদে মসজিদে। সঙ্গে দলের আরো মুসল্লি, মোয়াল্লাম থাকেন। খাবারের চিন্তা করেন না। যে যেখানে যা দেয়, তাই খান। সাধারণ কিছু জামাকাপড় সাথে রাখেন। আর কিছু নয়। সবার সঙ্গে নরম হয়ে কথা বলেন। এই তবলিগের মসজিদ আছে কাকরাইলে। বছরে একবার টঙ্গীতে আন্তর্জাতিক জামাত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক তাতে জমায়েত হয়। সুশৃঙ্খলভাবে তাদের খাওয়া-দাওয়া, ধোয়া-মোছার কাছ পরিচালিত হয়। বড় ভাবী আজ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। দু'বছর আগে তিনি মারা যান। কিন্তু তিনি থাকতেও মিয়াভাই এভাবে তবলিগে বার হয়ে যেতেন। আমাদের 'ধর্মের পুনরুত্থান' জাতীয় একটা ব্যাপার চলছে। জাতীয় আন্তর্জাতিক নানা শক্তি এতে যোগান দিচ্ছে। আমার বড় ভাই সরল মানুষ। ধর্মপ্রাণ তো বটেই। ধর্মের আচার-আচরণ সেই তাঁর শৈশব জীবন থেকেই পালন করে এসেছেন। যুবক বয়স থেকে মুখে দাড়ি রেখেছেন। সেও ধর্মীয় নিয়ম বলেই। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারে, বিশেষ করে ছোট ভাই আমার সঙ্গে তাঁর বিনয়নম্র ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছে। আমার অভিভাবক হিসেবে ছোটকালে তম্বি করেছেন। পড়াশোনায় অবহেলা দেখলে দণ্ড দিয়েছেন। এমন কি বড় হয়ে কলেজে পড়ার সময় থেকে আমার যখন কিছুটা সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ও ঘটনাতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপার ঘটে, তখনো তিনি আমার ওপর রাগ করেছেন, কড়া নসিহত করেছেন। কিন্তু সবসময়ই স্নেহ বোধ করেছেন। দীর্ঘদিন যখন কারাগারে ছিলাম তখন দু'এক সময়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জেলখানায় গিয়ে আমাকে দেখে এসেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাঁর এই তবলিগের দিকটি নজরে পড়েছে। এখন আর আমার সঙ্গে কখনো রাগ করে কথা বলেন না। এখনো নসিহত করেন। কিন্তু সে এক মিশনারি বা ধর্মপ্রচারকারীর বিনয়নম্র মনোভাব থেকে। আজো যখন দেখা হলো এবং জানলেন, রোযা রাখি নি, তখন বললেন রোযা রাখতে পার নি বুঝি। কিন্তু নামাযটা আদায় করো। তুমি তো কত জান। কিন্তু একথা তো মানবে যে, দুনিয়ার শেষ থাকলেও আখেরাতের শেষ নেই। সেই আখেরাতে আমাদের সকলেরই তো জবাব দিতে হবে।

আজ আমি মিয়াভাই সাহেবের সঙ্গে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই দেখা করতে এসেছি। তাঁর বয়স হয়েছে। এখন তিনি বৃদ্ধ। অবশ্য এই বয়সেও তিনি যেরূপ চলাচলতি করেন, তাতে আমাদের অবাক হতে হয়। হাঁটতে পারলে রিকশা নেবেন না। দূরের পথে ভিড়ের মধ্যেও বাসে যাবেন। গ্রামের সঙ্গে আমাদের যেখানে নিশ্চিদ্র বিচ্ছেদ ঘটেছে, সেখানে তিনি এখনো গ্রামের বাড়িতে যান। নিজেদের বাড়িতে সকল জ্ঞাতি ভাই কিংবা ভাইয়ের ছেলেদের সাংসারিক অবস্থা খারাপ। যে-বাড়িতে এককালে উঠোনে ধানের স্তূপ জমে উঠত, সেখানে অনেক ঘরেরই রোজকার খাবার জোটে না। যারা একটু লেখাপড়া শিখেছি তারা তাদের ছেলেমেয়েসহ প্রবাসী হয়েছি, শহরবাসী হয়েছি। কিন্তু মিয়াভাই ব্যতিক্রম। তিনি গ্রামে যান। বাড়িতে নিজের আগ্রহে বাবা-মার কবর দু'টিকে বাঁধাই করেছেন। নিজে নানাভাবে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে টিনের মসজিদখানিকে পাকা দালানে পরিণত করেছেন। বাড়ির দরজাতে একটি মাদ্রাসা তৈরি করেছেন। তার জন্য পাকা দালানও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠিয়েছেন। একবার হজ করে এসেছেন। গ্রামে সকলে চেনে। 'ডেপুটি সাহেব' নামেই তিনি পরিচিত। এই মাদ্রাসার এ্যাফিলিয়েশন, তার জন্য অর্থ সাহায্য ইত্যাদি সংগ্রহে সর্বক্ষণই ব্যস্ত থাকেন। এই ব্যস্ততার কারণেই মনে অপর কোনো চিন্তা প্রবেশ করতে পারে না। তাই বয়সের তুলনাতে তিনি ভাল আছেন এবং একথা ভাবতে আমার বেশ ভালো লাগে।

তিনি যখন ধর্মের কথা তুলে আমাকে নসিহত করেন তখন আজো আমি নীরবে নতমস্তক হয়ে থাকি। তিনি মুরুব্বি মানুষ। তাঁর সঙ্গে তর্ক চলে না। তা ছাড়া ধর্ম নিয়ে আদপেই কোনো তর্ক চলে না। আজো যখন তিনি আমার মঙ্গলের জন্য নামায-রোযা পালনের কথা বললেন, তখন আমি স্মিতমুখে চুপ করে রইলাম। তারপরে বললাম, মিয়াভাই, আপনার এখন বয়স কত?

আমার প্রশ্নটিতে তিনি একটু চকিত হলেন। হয়ত বুঝলেন, আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চাচ্ছি। তাই হাসিমুখে বললেন, তা ৭৯ চলছে....

তাঁর বয়স হয়েছে জানতাম। কিন্তু তিনি যে ৭৯ বছরের মানুষ এটি আমি কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এখনো তাঁর শরীরের ঋজুতা সে কথা বিশ্বাসে আনতে দিতে চায় না। বললেন, ১৯০৫-এ জন্ম। তারপর হিসেব করে দেখ। ১৯২৩-এ ম্যাট্রিক পাস করলাম। বি.এম স্কুল থেকে। ১৯২৫-এ আই.এ পাস করলাম আর ১৯২৭-এ বি.এ পাস করে ঢাকা এলাম এম.এ পড়তে।

আমি বললাম আপনি ইংরেজিতে এম.এ নিলেন। এত সুন্দর আপনার ইংরেজির হাত। কিন্তু শেষ করলেন না কেন?

নতুন করে জানা নয়। যথার্থই আমি এসব কথা জানতাম না। আজ দেখছি, এ তথ্যগুলোর একটা তাৎপর্য আছে। আমার ভাইয়ের লেখাপড়া তথা সেদিনকার হাইস্কুলে পড়া মানে একটি মুসলিম গরিব কৃষক পরিবারে প্রথমবারের মতো আধুনিককালের শিক্ষার প্রবেশ ঘটা। সেই পরিবারের এই ছেলেটি কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেছে। আই.এ এবং বি.এ পাস করে ঢাকা এসেছে এম.এ পড়তে, এটার মধ্যে একটা সামাজিক রূপান্তরের আভাস আছে। শুধু একজন ব্যক্তির জীবনযাপন নয়। যুগ পরিবর্তিত হচ্ছিল, একথা সত্য। তাই এই শতকের গোড়ার দিক থেকেই মধ্যবিত্ত এবং গরিব ঘরের কৃষকের ছেলেও শুধু মক্তব নয়, হাইস্কুল আর কলেজে আসছিলো, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য।

মিয়াভাই সাহেব তাঁর এই পাসের কথায় দুঃখ করে বললেন, কলেজে তো আমাকে সকল প্রফেসররা অসম্ভব স্নেহ করতেন। সলিল চৌধুরী, তিনি পরীক্ষার পরে আমার খাতা দেখে বলেছিলেন, 'ইওরস ইজ দি বেস্ট।' তবু তো রেজাল্ট ভালো হলো না। এক নম্বরের জন্য সেকেন্ড ক্লাস পেলাম না। অথচ প্রফেসরদের কাছে শুনেছিলাম আমার খাতায় 'হাই সেকেন্ড ক্লাস' উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এর কারণ কি?

মিয়াভাই বললেন, কারণ, মুসলমান ছেলে ভালো কেন করবে?

মিয়াভাইয়ের এমন অভিযোগের কথাতেও বিস্ময়বোধ ছিলো। আমি বললাম, কিন্তু আপনার গুণের কারণে হিন্দু শিক্ষকরা তো আপনাকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

একথা তিনি স্বীকার করলেন। মনে করে বললেন, বি.এম স্কুলের হেডমাস্টার অমৃতলাল দাশগুপ্ত, নিজের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন আমাকে।

ধর্মপরায়ণ মিয়াভাইয়ের এই আর একটি দিক। একদিকে যেমন হিন্দুরা মুসলমানদের ছোট ভেবেছে, তাদের হেয় জ্ঞান করেছে, এ অভিযোগ তিনি বিভিন্ন সময়েই করেছেন এবং এর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, তেমনি এরূপ ধর্মপরায়ণ, আচার-আচরণ লেবাসে মুসল্লি মুসলমান একজন তরুণের যে হিন্দু অভিভাবক থাকতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না। অথচ আমার ছোটকালের রহমতপুরের সে ছবি তো আমি আজো ভুলতে পারি নি।

১৯৩৩-এর দিকে মিয়াভাই বদলি হয়ে এলেন রহমতপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে সাবরেজিস্টার হিসেবে, নাজিরপুর থেকে।

রহমতপুর ছিলো একটি হিন্দু-প্রধান এলাকা। রহমতপুর বাজার বসত সে এলাকার জমিদারবাড়ির দরজায়। তার কাছের স্কুলে আমি এবং আমার বড় বোন একসঙ্গে পড়তাম। তখন আমার ক্লাস ফাইভ এবং সিক্স। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত বোধ হয় বড় ভাই ছিলেন রহমতপুরে।

এই রহমতপুরের জমিদারবাড়ির এক জমিদারের নাম ছিলো বোধ হয় কালু বাবু। কালু বাবুর স্ত্রী আমার বড় ভাইকে নিজের ছেলে বলে ডাকতেন। এই বাড়িতে আমাদের যাতায়াত কেবল যে অবাধ ছিলো, তাই নয়। এদের কোনো অনুষ্ঠান আমাদের বাদে হতো না।

এই বাড়ির কথা মনে হলেই আমার চোখে যে ছবিটি ভেসে ওঠে সে হচ্ছেঃ কালু বাবুর বাড়িতে মিয়াভাই বেড়াতে গেছেন। সন্ধ্যায় পুজার ঘণ্টা বাজছে এক ঘরে। এদিকে মগরেবের নামাযেরও সময় হয়েছে। মিয়াভাই তাঁর 'মাকে' বললেন, মা একখানা ধোয়া কাপড় দিন। আমি পাশের ঘরে নামাযটা আদায় করে নিই। মা স্নেহে এবং আগ্রহে ধোয়া কাপড় বার করে দিয়েছেন। তাঁর মুসলমান 'পুত্র' একঘরে মগরেবের নামায পড়ছে এবং আর একঘরে সন্ধ্যা আহ্নিকের আয়োজন হচ্ছে। এ এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। আমার কিশোর মনকে ঘটনাটির এই সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির দিকটি সেদিনও অভিভূত করেছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু একথা ঠিক যে ত্রিশের এবং চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক দ্বেষই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন প্রীতির সম্পর্ক বিরল হয়ে আসছিলো। কিন্তু মিয়াভাই সাহেব একদিকে যেমন কোনোদিন হিন্দু সমাজের যারা তাকে স্নেহপ্রীতি দিয়েছেন তাদের কথা ভুলতে পারেন নি, তেমনি সমাজে সাধারণভাবে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিলো এবং সাধারণভাবে হিন্দু-প্রধানরা যে মুসলমান সমাজ, এমন কি তার বিকাশমান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অংশকেও বৈরী দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই অনুভবটি নিজের মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

তাই নিজের বি.এ পরীক্ষার ফলাফলে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবটি যে কাজ করেছিলো সে সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপারটি খুবই সম্ভব বলে আমারও মনে হলো। যখন বললাম, কিন্তু হিন্দু অধ্যাপকরা তো আপনাকে ভালো ছেলে বলে জানতেন, তখন তিনি বললেন, আমার কলেজের প্রফেসররা জানলে কি হবে। তখন তো খাতার ওপর পরীক্ষার্থীর নাম লেখা থাকতো। আর তা থেকেই ধরা যেত কোন খাতা হিন্দু-ছাত্রের এবং কোন খাতা মুসলমান ছাত্রের। আর এ কারণেই মুসলমান ছাত্রের পক্ষে সেদিন ভাল করা ছিলো প্রায় অসম্ভব।

সেকালের কথা ভালো করে আমি জানিনে। কিন্তু মিয়াভাইয়ের এ ব্যাখ্যায় যুক্তি আছে।

সে যা হোক। তবু তিনি ঢাকায় পড়তে এসেছিলেন এম.এ, ইংরেজিতে। ইংরেজিতে তাঁর দক্ষতা ছিলো এবং এখনো আছে। এখনো তিনি যেমন দ্রুতগতিতে সুন্দর শব্দরাজি দিয়ে ইংরেজিতে নিজের মনের ভাব, বিশেষ করে লিখিতভাবে প্রকাশ করেন, তাতে আমার মনে বিস্ময় আর ঈর্ষার সঞ্চার হয়। আহা, আমি যদি এমন করে ইংরেজিতে লিখতে পারতাম!

ঢাকায় এসে তিনি ইংরেজির অধ্যাপক এস এন রায়ের স্নেহ পেয়েছিলেন। ড. হাসানও তাঁকে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু গরিব কৃষকের ঘর থেকে একেবারে নিজের উদ্যোগে যে ছেলেটি স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলো সে যখন ১৯২৮ কিংবা ২৯-এর দিকে একটি চাকরির সুযোগ পেল তখন আর সে চাকরিকে গ্রহণ না করার দুঃসাহস দেখাতে পারল না। কারণ তার ওপর নির্ভর করছে গরিব বাবা, মা, ছোট ভাই আর বোনেরা।

আমি একটু সমাজতাত্ত্বিক ভাব থেকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এম. এ পড়ার জন্য কলকাতা না গিয়ে ঢাকা কেন এলেন? বরিশাল থেকে তো কলকাতা যেতে পারতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিয়াভাই বললেন, ১৯২১ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো। তারপর থেকে পূর্ববঙ্গের আমাদের কাছে, বিশেষ করে অর্থের দিক থেকে যারা কম সচ্ছল, তাদের ঢাকা আসার দিকেই বেশি ঝোঁক ছিলো। আমিও সে কারণেই ঢাকাতে পড়তে এসেছিলাম।

মিয়াভাইয়ের কাছ থেকে আরো অনেক কথা জানার আছে। কিন্তু এদিনের সাক্ষাতে অন্য কথা আর তুললাম না। মিয়াভাই সাহেবের কাছে আমরা যারা ছোট ভাইবোন, তাদের ঋণের শেষ নেই। একথা সচেতনভাবে আমি সবসময়ই মনে করেছি। এখন তাঁর নিজেরই বৃহৎ সংসার। তাঁর সন্তানরাও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানা পথঘাট ঘুরে আমিও সংসার জীবনে থিতু হয়ে বসেছি। আমারও ছেলেমেয়ে আছে। সংসারের দায়দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালনের আর্থিক অক্ষমতা জীবনের সমস্যাকে রোজকে রোজ কঠিনতর করে তুলছে। মিয়াভাই সাহেবের ঋণের কোনো পরিশোধ হতে পারে না। তিনি সেদিন না পড়ালে আমার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এসে পৌঁছাও সম্ভব হতো না। কিন্তু এ ঋণের কথা মুখে প্রকাশ করা যায় না। শব্দের কৃত্রিমতায় তা লঘু হয়ে দেখা দেয়। আজো তার কাছে কৃতজ্ঞতার কথা মুখে বললাম না। কিন্তু উঠে আসার সময়ে তিনি যেন মনে কিসের ভার অনুভব করে বললেন, তোমাদের কারুর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ জানেন, আমি সারা জীবন আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি....

আমি বললাম, আমাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ থাকা যে কত স্বাভাবিক তা আমি জানি। তবু যে আপনি কোনো অভিযোগ রাখছেন না, সেও আপনার গুন, আমাদের নয়।....

মিয়াভাই সাহেবকে সালাম করে ছোট ছেলেকে সাথে করে চলে এলাম।

তাঁর যে এদিন দেখা পেয়েছিলাম, আর অতীত নিয়ে একটু আলাপ করতে পেরেছিলাম, তাতে নিজের মনটা আনন্দে বেশ ভরে উঠেছিলো।

গ্রামে নির্বাসন : পিতামাতার কাছে প্রত্যাবর্তন

সে এক পাগলামিই বটে। '৪৬ সালে এম.এ পাস শেষ হলো। সেকালের ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর একালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আকাশ-পাতাল পৃথক। আমার জীবনের এ এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। প্রাচীনকালের জ্ঞানের আশ্রমের কথা শুনেছি। গুরুগৃহে, গুরুর সাহচর্যে, নৈকট্যে শিষ্যের বাস। শিষ্যের সাধনা। চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার জীবনে প্রায় তাই ছিলো। ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে আমি আমার নিজের বাড়িতে রূপান্তরিত করে ফেলেছিলাম। গুরুদের নৈকট্য পেয়েছি। তাঁদের স্নেহ এবং সাহচর্যে ধন্য হয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শনের ছাত্র। দর্শন বিভাগে সর্বমোট ৫টি কিংবা ৬টি ছাত্রছাত্রী। ছাত্রী বোধ হয় অনার্সে ছিলো দু'টি। একটির নাম ছিলো উষা পৈত। ওদের বাসা ছিলো পুরোন ঢাকার পাতলা খান গলিতে। এখানেই বাসা ছিলো সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স এবং এম.এ-র অন্যতম জনপ্রিয় কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী রবি গুহের। রবিগুহ আর নাজমুল করিম, এঁরা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। ইউনিভার্সিটির ভাষার 'সিনিয়র'। কিন্তু আমাদের এই তিনজনের ক্ষেত্রে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠতা বা বয়োকনিষ্ঠতার ব্যাপার ছিলো না। আমরা পরস্পরের নিকট ছিলাম আত্মীয়সম। রবি গুহকে আমি নাম ধরে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতাম। কিন্তু সে 'আপনি'তে সমীহের চাইতে প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিলো অধিক। রবি গুহও আমাকে 'তুমি'-র বদলে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু সে 'আপনি' স্নেহ মমতায় 'তুমি'রও অধিক ছিলো। রবি ইউনিভার্সিটির হলে থাকতেন না। থাকতেন বাসায়। ঐ পাতলা খান লেনেই বোধ হয়। তাঁর দিদি এবং ভগ্নিপতির সঙ্গে। তাঁদের সে বাসাও আমার নিজের বাসায় পরিণত হয়েছিলো। তাঁদের কোনো পারিবারিক আতিথেয়তা ও অনুষ্ঠান আমাকে বাদ দিয়ে হতে পারতো না।

অনার্স এবং এম.এ-তে যে ভালো ফল হলো, এতে আমার চাইতে নাজমুল করিম আর রবি গুহের আনন্দই অধিক। আমি যতো বলি, স্যাররা খাতির করে নম্বর দিয়েছেন। আমি এর যোগ্য নই। তাঁরা ততো বলেন, এরকম খাতির স্যাররা আমাদের কেন করেন না?

অনার্স আর এম.এ-তে ভাইভা পরীক্ষা শেষ করে বেরিয়ে আসতে মূল পরীক্ষক প্রখ্যাত দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বললেন, ভালো করেছ। এখন কি করবে? আমি সবিনয়ে হেসে বললাম, 'মাস্টারি করা ছাড়া আর কি করব স্যার?' তিনি তখন বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতা চলে গেছেন। দর্শন বিভাগের হেড তখন ড. বিনয় রায়। বিনয় রায় ইংরেজি বিভাগের তখনকার হেড এস.এন. রায়ের ছোট ভাই ছিলেন। উভয়েরই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সহাস্য স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ইউনিভার্সিটির সর্বমহলে পরিচিত ছিলো।

চাকরির দরখাস্তের ভিত্তিতে নয়। বিনয়বাবু বললেন, ফজলুল করিম, কাল থেকে তুমি ক্লাস নিতে শুরু করো।

তখনো ছাত্রদের সংখ্যা কম। ক্লাস নিতে গেলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক হিসেবে গণ্য করার চাইতে তাদের সঙ্গেই পাঠরত আর একটি ছাত্র বলেই বিবেচনা করেছে বেশি। ভাবতে আজ মজা লাগছে।

ভালোই লাগছিলো এই মাস্টারি। '৪৭-এর শেষ আর '৪৮-এর প্রথমে। কিন্তু দেশে সামাজিক, রাজনৈতিকহ সঙ্কট বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাকিস্তান হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। ভারত বিভক্ত হয়েছে। আগে যা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ দাঙ্গা হিসেবে সংঘটিত হয়েছে, তা এখন ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের রূপ গ্রহণ করেছে। '৪৬-এর ১৬ আগস্ট হলো 'ক্যালকাটা কিলিং'। তার প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি, বিহারের হত্যাকাণ্ড। '৪৭-এর বিভাগের কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। ফলে সাধারণ মানুষের অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতা। লক্ষ লক্ষ নরনারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এপার থেকে ওপার গমন।

এর আঘাত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও এসে লাগল। দাঙ্গার আকারে নয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রখ্যাত শিক্ষকদের ঢাকা থেকে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে গমন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন শিক্ষকদের তখন অভাব। একটা দায়িত্ববোধ থেকেই দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেছিলাম। কিন্তু চাকরির বাইরে রাজনৈতিক একটা দায়িত্ব বহন এবং আদেশ পালনেরও একটা ব্যাপার ইতোমধ্যে ঘটে গেছে। কমিউনিস্ট সংগঠনের আমি একজন অনুগত কর্মী। সে সংগঠনেও সামাজিকভাবে দেশত্যাগের আঘাতে কর্মীর অভাবে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সংগঠন তাই বলল, তোমার অধ্যাপনার চাকরি ছাড়তে হবে। তার প্রধান কারণ, গুপ্ত পুলিশের দৃষ্টির খরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মীশূন্য মাঠে আমি তাদের কাছে পূর্বের মতো আর 'ফেলনা' রইলাম না। আমাকে তারা অন্বেষণ করে বেড়াতে শুরু করল।

পার্টি বলল। তুমি চাকরি ছাড় এবং আত্মগোপন কর। আমি তাই করলাম। কোনো অসুবিধা হলো না সিদ্ধান্ত গ্রহণে। আমার বিভাগের হেড বিনয়বাবুকে গিয়ে দরখাস্ত দিয়ে বললাম, স্যার, আমি আর চাকরি করব না।

তিনি প্রথমে অবাক হলেন। ব্যাপারটার আকস্মিকতায়। বিশ্বাস করতে চাইলেন না। রাগ করে বললেন, তোমার পদত্যাগপত্র আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব।

আমি বললাম, স্যার, আপনি তো আমাকে নিজের সন্তানের মতো জানেন। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। একে তো আর বদল করা যাবে না।

স্যার আমাকে চার বছর ধরে দেখে আসছেন। তাঁর বাসায় আমার যাতায়াত ছিলো অবাধ। আমাকে তিনি আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁর স্নেহ-সম্ভাষণ থেকে নিস্কৃতি পেয়ে আত্মগোপনে চলে গেলাম।

চাকরি থেকে পদত্যাগ করার কথা শুধু বিভাগে আলোচ্য বিষয় হলো না। সরকারি মহলেও আলোচিত হলো। আমার সেই '৪৮ সনের চাকরির নথি খুললে এখনো তার মধ্যে রেজিস্টারের কাছে লেখা স্বরাষ্ট্র তথা পুলিশ বিভাগের কর্তাদের কৈফিয়ত তলবমূলক বার্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কেন ফজলুল করিম সরদার চাকরি ছেড়েছে এবং তার আস্তানা, অধিষ্ঠান, 'হোয়েয়ারঅ্যাবাউটস'} কোথায়, তা সরকারকে অবগত করা হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে আমার আস্তানা-অধিষ্ঠানের কোনো নিশ্চয়তা ছিলো না। দুর্বল সংগঠন। আমি পাতলা আর কৃশ দেহের ক্ষুদ্রকায় জীব হলেও আমার নামটা ভারি ছিলো। সে নামকে ছেঁটে ফেলেও রেহাই পাওয়া দায় হয়ে উঠলো। নাম পাল্টালাম। নামের শরীর থেকে ভারি অংশ 'সরদার'কে বিদায় করলাম। ওজনে হালকা হল বটে, তবু নিঃশঙ্ক হওয়া গেল না। শহরে নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব। পার্টি দেখল, আমি তাদের বিদ্যমান অবস্থায় সম্পদের চাইতে বোঝা বেশি। কোথায় রাখবে আমাকে।

অবশেষে বলল, ঢাকা জেলার মনোহরদি-চালাকচর এলাকায় কৃষকদের মধ্যে আমাদের কিছু প্রভাব আছে। তুমি সেখানে গিয়ে থাকো। কৃষকদের মধ্যে থাকবে। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করবে।

তাই সই। আমাকে কোনো কর্মী-বন্ধু পৌঁছে দিলেন চালাকচরে। চালাকচরে তখনো আন্দামানের নির্বাসন-ফেরত বিখ্যাত কৃষক নেতা অন্নদা পাল হয়তো ছিলেন। এলাকার প্রবাদপুরুষ। চালাকচর, পীরপুর, শরীফপুর, মনোহরদি, পোরাদিয়া, হাতিরদিয়া, এই নামগুলো এখনো মনে ভেসে উঠছে। কারণ এই গ্রামগুলোতে '৪৮-৪৯ সালে প্রায় এক বছর আমি আত্মগোপন করেছিলাম। পীরপুরের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক আখতারুজ্জামানের হাসিমুখ চেহারাটি এখনো চোখের সামনে অমলিন। তাঁর এলাকার সম্মানিত শিক্ষক এবং গ্রামীণ নেতা। কমিউনিস্ট সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি আমাকে স্বনামেই জানতেন। কিন্তু তিনি অন্য লোকের কাছে আমাকে ভিন্ন নামে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আখতারুজ্জামান হয়তো আজ আর বেঁচে নেই। পীরপুরের পাশেই ছিলো শরীফপুর। শরীফপুর ছিলো প্রধানত পানের বরজ বা পানচাষীদের এলাকা। হরেন সিং, সুরেশ সিং, এরূপ নাম মনে ভেসে উঠছে। তাদের বাড়িঘর ছিলো গ্রামের অন্য, বিশেষ করে মুসলিম-প্রধান এলাকা থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট। ঘরের সঙ্গে ঘর লাগানো। উঁচু দাওয়া। সুন্দর নিকোনো, ধোয়া-মোছা উঠোন। টিনের ঘরই বেশি। প্রত্যেক বাড়ির পাশে পানের বাগান বা বরজ। বাঁশ আর পাটকাঠি দিয়ে পানের লতার সাড়ি দেওয়া মাচান। কী সুন্দর পরিচ্ছন্নতায় রক্ষণাবেক্ষণ। তাঁরা যেদিন তোলাপান বিক্রির জন্য হাঁটে যেত সেদিন সকালে পানের বরজে ঢুকে আমিও পানলতা থেকে কচি পান তুলে এনে তাঁদের সাহায্য করতাম। ....

এমন আত্মগোপনের জীবনে ঘটনার আধিক্য ছিলো না। তাই ঘটনার কোনো স্মৃতি নেই। তবু এই একটা বছর গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনযাপনই একটা ঘটনা হিসেবে আমার জীবনে অমোচনীয় এক আনন্দকর স্মৃতির পলি রেখে গেছে। গরিব কৃষকের এলাকা। জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে কাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাবে গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরের অর্ধাহারে-অনাহারে সঙ্কট বৃদ্ধি পেত। কিন্তু এলাকায় কাঁঠাল হতো প্রচুর। প্রত্যেক বাড়িতেই কাঁঠাল গাছ ছিলো। আমি অনেক সময়ে ভাতের বদলে কাঁঠাল খেয়ে দিন কাটিয়েছি। ভাত পেলে ভাতের সঙ্গে কোনো ডাল-তরকারি নয়। একটি শুঁটটি-পুটি পাটকাঠির মুখে আগুন ধরিয়ে তাকে পুড়িয়ে ভাতের সঙ্গে মেখে খেয়েছি .....

হিন্দু পান কৃষকদের বাড়িতে হিন্দু নাম নিয়ে থেকেছি। আখতারুজ্জামানই নিয়ে গেছেন এলাকাতে। আমাকে অশোক কিংবা আশীষ নাম দিয়ে অন্দরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মেয়েরা তাঁদের দূরসম্পর্কীয় দেবর কিংবা মাসতুতো, পিসতুতো ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সেই একটি বছরের এমন প্রাপ্ত জীবনকে আমি একটা সৌভাগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। সেই কবে শিশু বয়সে আমার অভিভাবক বড় ভাইয়ের কাঁধে চড়ে নিজের গ্রাম ছেড়ে এসেছিলাম। প্রায় পঁচিশ বছর পরে আবার যেন আমার সেই নিজগ্রামে প্রত্যাবর্তন ঘটল, বাবা, মা, চাচা-চাচী, ভাইবোনের কাছে প্রত্যাবর্তন।

সেই জীবনের স্মৃতি এখনো টানে, এই প্রৌঢ় বয়সে । ইচ্ছে হয় আবার ফিরে যাই সেই চালাকচর, পীরপুর, শরীফপুর, পোড়াদিয়া, হাতিরদিয়া আর মনোহরদিতে।....

AMARBOI.COM

২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ : চল্লিশের দশকের শেষ

শতকই বলি, আর দশকই বলি, এগুলো প্রচলিত, তবু কৃত্রিম হিসাব। সময়ের হিসাব। সময়ের গতি এবং তার এরূপ শুরু, শেষের হিসাব সবার জীবনে এক নয়। মহাকবি শেকসপীয়র নাকি বলেছিলেন, প্রেমিকের জন্য সময়ের গতি একরকম, আর ফাঁসির আসামীর জন্য আর এক রকম। প্রেমিকের প্রতীক্ষার মুহূর্ত ঘণ্টাতেও শেষ হয় না। ফাঁসির আসামীর ঘণ্টা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়।

'চল্লিশের দশকের ঢাকায়' আমার যা একটু বোধ-বুদ্ধির বিকাশ, তার শেষ হয়ে গেল আকস্মিকভাবে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে। '৫০ পর্যন্ত আর আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না।

যথার্থই কি ২৫ ডিসেম্বর '৪৯? ২৫ ডিসেম্বর অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কিন্তু সেটি আমার জীবনেও যে একটি পর্যায়ন্তরের সূচনা ঘটাবে তা সেদিন বুঝি নি।

আসলে তারিখটা ২৫ ছিলো কিনা তা যাচাই করার জন্য আমার বন্ধু, প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক দৈনিক 'সংবাদ'-এ কর্মরত সন্তোষ গুপ্তের কাছে গেলাম। সন্তোষ গুপ্তকে আমি প্রীতির সম্বোধনে শুধু 'সন্তোষ' বলে ডাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি' বলি। সন্তোষ আমাকে 'আপনি' বলে। সে বয়সের কারণে কিনা জানিনে। কিন্তু সন্তোষের সঙ্গে সেই '৪৯ সালে একদিনের যে পরিচয় ঘটেছিলো, সেটিই আজীবনের পরিচয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে সন্তোষের এক পরিচয় অনন্য এক স্মৃতিধর হিসেবে। কম্প্যুটারের যুগ আসার পূর্ব থেকে সন্তোষের মস্তিষ্ক কম্প্যুটারে পরিণত হয়েছিলো নিশ্চয়ই। স্মৃতি, তথ্য, সংখ্যা আর তারিখের কম্প্যুটার। সে কিছুই বিস্মৃত হয় না। এবং তার স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই সে ইতিহাসের মোকাবেলা করতে পারে। তাঁর সে পরিচয় সাম্প্রতিককালেও আমরা পাচ্ছি। সন্তোষের বয়স কত, এটি তাঁকে জিগ্যেস করতে হবে। দেখতে আমার চাইতেও পাতলা-দুবলা। বিরামহীনভাবে সিগারেট পান করে। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলি, তোমাকে না সিগারেট খেতে নিষেধ করেছি। সে তার কাব্যিক চরণ উচ্চারণ করে বলে, 'আয়ু নয় তো, বায়ু। সিগারেটের ধূম্রের সঙ্গে সে যদি উড়ে যায়, তো যাক না। তাতে আফসোস কি?

আমি তাঁকে বলি, 'কম্প্যুটার' সন্তোষ। সেদিন খোঁজ করে সাক্ষাৎ করে বললাম, সন্তোষ, তুমি-আমি সেই '৪৯ সালে কোন তারিখে এ্যারেস্ট হয়েছিলাম?

সন্তোষ নিশ্চিন্তে বলে দিল, ২৫ ডিসেম্বর, দুপুরে খাওয়ার পরে।

: কে কে সেদিন তোমার বাসা থেকে গ্রেফতার হয়েছিলাম?

: আপনি, আমি, আমার মা, বারি সাহেব, রানু চ্যাটার্জি ... আর যেন কে?

: জ্ঞানদা, জ্ঞান চক্রবর্তী কি সেদিন গ্রেফতার হয়েছিলেন?

সন্তোষ বলল : না। জ্ঞানদা বোধ হয় তার আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন।...

যাক, বোঝা গেল, সন্তোষ সন্দেহের উর্ধ্বে। আমরা গ্রেফতার হয়েছিলাম সন্তোষের বাসা থেকে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে।

ঘটনার স্মৃতি নয়। স্মৃতির পলি। স্মরণের কাঠি দিয়ে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। আজো এতদিন পরে। পুরো চুয়াল্লিশ বছর পরে। সন্তোষ দিনরাত 'কলাম' লেখা নিয়ে ব্যস্ত। তার সময় নেই এসব নিয়ে আলাপ করার। গল্প করার। চেপে ধরলে বলে, আর কি হবে বাল্যকালের বালখিল্য সেসব ব্যাপারকে খুঁটিয়ে তুলে?

একথা রাজনৈতিক বিশ্লেষণে সন্তোষ বলতে পারে। সে বলে, সেকালের আদর্শ, বিশ্বাস-নির্যাতন ভোগ, ত্যাগ সবই ছিলো ভুল।

এজন্য সন্তোষের ওপর আমার কোনো মান-অভিমান নেই। সন্তোষের বর্তমানে 'সব্যসাচীর' কলম এবং 'কলাম্‌ন' আছে। আমার যে ৪৪ বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগের স্মৃতির পলি বাদে আর কিছু নেই। আরো পাঁচ বছর যদি বাঁচতে হয়, তবে আমি বাঁচি কি নিয়ে।

তাই বাল্যকালের বালখিল্যতায় আমার আফসোস নয়, রোমাঞ্চ লাগে। এ রোমাঞ্চের কথা অপরকে লিখে বা বলে বোঝানো মুশকিল।

সন্তোষের বাসা। ঢাকার তাঁতিবাজারে। পুরনো একতলা একটি দালানে। ঢাকা কোর্টের পেছনের পশ্চিম দিকের এলাকা। বাসা নয়, তাকে আমরা জানতাম 'ডেন' বলে। নিষিদ্ধ প্রায় গোপন কমিউনিস্ট পার্টির অভিযানের টেকনিক্যাল শব্দ 'ডেন'। শব্দটা ভয়ঙ্কর। অর্থ : গুহা, গহ্বর ইত্যাদি। শুধু শব্দটা ভয়ঙ্কর নয়। ব্যাপারটাই ভয়ঙ্কর ছিলো। কত যে ভয়ঙ্কর তা নিরীহ সদ্য এম.এ পাস করা, রোমান্টিকতার আবেগে আবিষ্ট, হাতের মোয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের শিক্ষকতার চাকরিতে রিজাইন দেওয়া আমি বুঝতাম না। আসলে আমাদের সে জীবনে 'ভয়' শব্দটার অর্থই আমি বুঝতাম না। রাতের অন্ধকারে নিম্নস্বরে আশ্রয়দাতার বিভিন্ন বাড়িতে আলোচনা বসেছে। দেশের অবস্থা নিয়ে জেলা কমিটির মিটিং বসেছে। 'ডাকাতি'র প্রোগ্রাম নয়। পরিস্থিতি নাজুক। সে বিষয়ে আলোচনা। ইতোমধ্যে গ্রেফতার হয়ে গেছে অনেক কমরেড। যারা আছি, দায়িত্ব বহন করতে হবে তাদের। জনতার মধ্যে থাকতে হবে। বিবেক-বুদ্ধি মত যা পারি সেটুকুই করতে হবে। বলতে হবে, বর্তমানই শেষ নয়। মৃত্যুর পরেও জীবন থাকে। থাকবে। দেশ থাকবে। ইতিহাস থাকবে। ইতিহাস তৈরি হবে। ইতিহাস আমাদের পক্ষে। সমাজ বদলাবে। বিপ্লব অনিবার্য। বিপ্লব মানুষের জীবনে, সমাজের জীবনে সংঘটিত হবে।

আমার তো মনে হয় কথাগুলো সাংঘাতিক কোনো খারাপ কথা নয়। ভয়ঙ্কর কথা নয়। কিন্তু সেদিনের এবং এদিনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা তাকে তাই মনে করে। কেউ এ রকম কথা ভাবছে, বা বলছে, মনে মনে কিংবা কানে কানে, এমন আভাস পেলেই তাকে 'জননিরাপত্তা' আইনে গ্রেফতার করে 'নিরাপদ' জেলখানাতে আবদ্ধ করেছে।

কাজেই এমন যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাতে সন্তোষ কিভাবে জড়িত হয়েছিলো, একথাটা আজো আমার জানা হয় নি। আর তা জানাও যাবে না। সন্তোষ আর তা বলবে না।

অথচ যথার্থই কী ভয়ঙ্কর, কী বিপজ্জনক! বিধবা মা। আমরা ডাকতাম 'মাসিমা' বলে। তাঁকে নিয়ে বাসা করেছে। নিজে চাকরি করে পূর্ববঙ্গের কারা-প্রধান তথা 'ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস্'-এর অফিসে তারই গোপন সহকারী। 'কনফিডেনস্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট'। অফিস ঢাকা জেলেরই ভেতরে। আর তাঁতিবাজারের বাসায় কমিউনিস্ট ডেন। 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'। সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের অন্ধকারে আসেন কমিউনিস্ট নেতা ফণী গুহ, অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী, আবদুল বারি, রওশন শেখ, মনু মিয়া এরা। আসেন সংগঠনের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে। রাতের আঁধারে আসেন। দিনের বেলা থাকতে হলেও অন্ধকারেই থাকেন। আবার আঁধার হলে যার যেখানে যাওয়ার চলে যান সেখানে। সন্তোষের বাসায় ছিলেন কৃষকনেতা অজিত চ্যাটার্জির স্ত্রী রানু চ্যাটার্জিও।

এই 'ডেনে'র বিষয়ে আর একটু জিজ্ঞেস করতে সন্তোষ স্বল্পতম দৈর্ঘ্যের দু'একটি বাক্যে বলল, আসলে ডেনটা আরো আগে তুলে দেওয়া উচিত ছিলো। আমার বাসায় ঢোকার মুখেই কিছুদিন আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন ফণী গুহ। কাজেই বাড়িটার ওপর সরকারের আই.বি তথা গুপ্ত পুলিশের 'ওয়াচ' অবশ্যই ছিলো। কিন্তু পার্টি প্রয়োজনীয় সময়ে উপযুক্ত ডিসিশন নিতে পারে নি।

আমি এত সবের কিছুই জানতাম না। আমি ছিলাম নির্বাসনে। ঢাকা জেলার মনোহরদি থানার চালাকচর-পীরপুর-শরীফপুর অঞ্চলে আত্মগুপ্ত অবস্থায়। আমার চাকরিতে রিজাইন করে 'আন্ডারগ্রাউন্ড' চলে যাওয়ার পর থেকেই হয়ত বা '৪৮ সালের মধ্য কিংবা শেষ দিক থেকেই। সেখানে আমার চলছিল ভালোই। জালের মধ্যে মাছের যেমন। কাঁঠাল আর শুঁটকি-পুঁটির পোড়া খেয়ে।

কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোট্ট খামে হুকুম গেল : তোমাকে ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় আসতে হবে সাংগঠনিক আলোচনার জন্য। 'কোরিয়ার' গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে। তুমি রেডি থেকো।

আমি রেডি ছিলাম। আর 'কোরিয়ার' আমাকে রাতের আঁধারে প্রায় চোখ বাঁধার মতো করে অপরিচিত একটি এলাকার অপরিচিত একটি বাড়িতে নিয়ে এসে রেখে গেল। সেখানেই আলোচনাটি বসেছিলো। সকালের সেশন শেষ হয়েছে। হয়ত পাঁচ-ছ' জনের বৈঠক। দুপুরে বিরাম। খাওয়া-দাওয়ার জন্য। উচ্চকণ্ঠে কোনো কথা নয়। হাসিও নয়। কাশিও নয়। এবাড়িতে কোনো লোক আছে, তা কেউ আন্দাজ করবে কি করে?

কিন্তু যাদের শ্বাপদ-চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল নিরীহ কেসেমের লোকগুলোকে, তারা ঠিকই আন্দাজ পেয়েছিলো।

তাই দুপুরের শেষে, অন্ধকারের অপেক্ষা না করেই তারা আক্রমণ করল। বাড়িটা ঘিরে ফেলল। পেছনের দরজায় দমাদম আঘাত পড়ল। আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না, কি ঘটতে যাচ্ছে।

বিকেল বোধ হয় চারটে। পালাবার কোনো পথ নেই। তবু একটা দরজা দিয়ে দেয়াল টপকে পাশের বাড়িতে পড়লাম। সাথে তখন আর কে যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলো। চারপাশের বাড়ির ছাদেই মানুষজন উঠে গেছে। তারা হয়ত ভাবছে, পুলিশ ডাকাত ধরছে। আমরা এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করতেই চারদিকে থেকে শব্দ উঠছে 'ঐ যায়, ঐ যায়।' এখন ভাবতে মজাই লাগছে। কিন্তু সেদিন?

পুলিশ সন্তোষের পায়ে হাত তুলেছিলো। হয়ত লাঠি মেরেছিলো। মাসিমা সহ্য করতে পারেন নি। চুলোর পাশ থেকে লাকড়ি তুলে তিনিও তাগ করেছিলেন পুলিশের দিকে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে অপারেশন শেষ। সন্তোষ, মাসিমা, রানু চ্যাটার্জিসহ আমাদের সবাইকে ধরে একটা জায়গায় জড়ো করে নিয়ে এলো পাশের কোতোয়ালী থানায়। বসিয়ে রাখল এক গারদে। কিছু পরে দেখলাম আই বি মানে গুপ্ত পুলিশ নানা জায়গা থেকে খবর পেয়ে ছুটে আসছে। সবাইকে দেখছে। কার কি নাম, জেনে নিচ্ছে। আমার নাম শুনে অবাক হলো। চেহারার দিকে চেয়ে পছন্দ হলো না। ক্ষুদ্র দেহে ভারি নাম। এই নামের পেছনে তারা এখানে ওখানে এতদিন ছুটে বেড়িয়েছে! জেরার সময়ে আপ্যায়ন যে আরো কিছু না জুটেছিলো তা নয়। কিন্তু সে কথা স্মরণ করে কি হবে? রাতটা থানায় রাখল। পরের দিন পাঠিয়ে দিল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। জেলের গেটে নাম-পরিচয় লিখে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো নানা জনকে নানা জায়গাতে। আমার সঙ্গে ছিলেন বোধ হয় সন্তোষ আর রেলশ্রমিক নেতা বারি সাহেব।

জেলখানার অফিস থেকে ভেতরে 'এসকর্ট' করে নিয়ে গিয়েছিলো নিরাপত্তা বন্দীদের খবরদারি করতো যে জাঁদরেল জমাদার, সেই নাজির জমাদার। গোড়াতে ছিলো বোধ হয় বিহারি। কিন্তু বাংলাদেশে থাকতে থাকতে 'বাংলা-বিহারিতে' পরিণত হয়ে গেছিলো। দশাসই চেহারা। ভারি আওয়াজ। নিয়ে গেল আমাদের 'ফাঁসির সেল' তথা খুপরিতে। আট ডিগ্রিতে। পাশাপাশি আটটা খুপরি। সামনে পাশে উঁচু দেয়াল। ফাঁসির ডিগ্রিতে ঢোকাতে ঢোকাতে নাজির জমাদার আওয়াজ দিল, 'যাইয়ে' হিঁয়াছে আর যানে নেহি সাকতা। এখান থেকে আর বেরুতে হবে না।' সেদিনের পরিবেশে হুঙ্কারটা মিথ্যে ছিলো না।

আমি এখনো জানিনে, সেই সেকালে, আমাদের গ্রেফতারের খবর অন্তত 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় ২৬ ডিসেম্বর কিংবা তার কাছাকাছি কোনো তারিখে কিভাবে উঠেছিলো।....

কথা শুরু করেছিলাম 'চল্লিশের দশক' নিয়ে। সেই ৪০ সালে বরিশালের একটি নিরীহ 'পোলা' কিশোর বালকের ঢাকা আগমনের কথা বলে।

সম্প্রতি জাতীয় জাদুঘরের উদ্যোগী একজন কর্মী আবদুল মোতালেব আমাকে দিয়ে জন্ম থেকে অর্থাৎ ২৫ থেকে '৯৩ পর্যন্ত জীবনের কাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি 'আউটলাইন' বারবার অনুরোধ করে বলিয়ে তাঁর শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরে রাখলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটা অনুভূতি জেগেছিলো। তাঁকে বলেছিলাম, আমার জীবনের আবার কথা কি? তবু বলতে গিয়ে দেখলাম কথা কথাকে টেনে তুলছে। ঘটনা ঘটনাকে। তার পরিমাণে নিজেই একটু বিস্মিত হয়ে গেলাম। দ্বিধায়-সঙ্কোচে পূর্ণ সেই 'পোলার' মনে জমা কথার পরিমাণ আজ দেখছি খুব কম নয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নয়। কোনো ঘটনার বিস্তারিত স্মৃতি নেই।

আজ এখানেও এই নতুন পর্যায়ের কোনো বিস্তারিত বিবরণ নয়। এ প্রসঙ্গের উত্থাপন কেবল এই কতা বলতে যে, চল্লিশের দশকের যবনিকা ঘটল আমার জীবনে সেই ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সাল।

এরপরের পর্যায় জেলের পর্যায়। রাজবন্দীর পর্যায়। এই পর্যায়ের দৈর্ঘ্য কয়েক কিস্তিতে প্রায় এগারো বছর। এই এগারো বছরেই বাইরের পৃথিবীতে, পূর্ববঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রথম পর্যায়ে বন্দী ছিলাম '৪৯ থেকে '৫৫ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

এই প্রথম পর্যায়েই ঘটেছিলো ঢাকা জেলের প্রায় একশ' রাজবন্দীর দীর্ঘ ৫৮ দিনের অনশন সংগ্রাম। জেলের ভেতর মানবেতর অবস্থা থেকে রাজবন্দীদের একটু মানুষের মতো মর্যাদা আদায় করার সংগ্রাম। এই অনশন ধর্মঘটের মাঝখানেই আমরা গ্রেফতার হয়েছিলাম। আর গ্রেফতার হওয়ার পরদিন থেকে অনশন সংগ্রাম আমরাও শুরু করেছিলাম। অন্য বন্ধুদের যদি ৫৮ দিন হয়েছিলো তো মাঝখান থেকে আমাদের অর্থাৎ আমার, সন্তোষ, বারি সাহেব, এদের অন্তত ৩৩ দিন অনশন হয়েছিলো। কিন্তু তার মর্মান্তিক কাহিনী সংক্ষেপে বলা যায় না। অপর দু'একটি উপলক্ষে কিছু স্মৃতির টুকরোতে হয়ত এর আভাস দেবার চেষ্টা করেছি।

এই অনশনের দশ দিনের দিন ঘটেছিলো বন্দী, কুষ্টিয়ার শ্রমিক নেতা শিবেন রায়ের হত্যাকাণ্ড। 'ফোর্সড্ ফিডিং' বা জোর করে নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দুধ বা জলীয় কিছু ঢেলে দেওয়ার সময়ে শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করার মর্মান্তিক ঘটনা।

আমার আফসোস পূর্ববঙ্গের রাজবন্দীদের বছরের পর বছর বন্দিদশার কাহিনী, তাদের নির্যাতনভোগ, নিহত হওয়া এবং সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেদের রাজনৈতিক মনোবল রক্ষার অবিশ্বাস্য চেষ্টার কাহিনী আজ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে রচিত হয় নি। এবং সে কাহিনী বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম এবং তার প্রগতিশীল সংগ্রামী কর্মীদের কাছে অজ্ঞাত। অথচ কারাগারের অন্তরালে সেদিনের শত শত কমিউনিস্ট রাজবন্দীর মরণপণ সংগ্রাম কারাগারের বাইরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করে জঙ্গী ও সংগ্রামী করে তুলেছিলো। আবার বাইরের সংগ্রামী জীবনের বিস্তার ও বিকাশ কারাগারের ভেতরের মুমূর্ষু রাজবন্দীদের জীবনকে আশার আলো দিয়ে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলো।

অনশন ধর্মঘটের বিস্তার ঘটেছিলো রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে এবং সিলেটের জেলেও। সিলেটের জেলে '৫০ সালে স্থানান্তরিত হয়ে জেনেছিলাম সিলেট জেলের সাথীদের ওপর প্রৌঢ়, প্রবীণ আর কিশোর বন্দীদের ওপর অবিশ্বাস্য অত্যাচারের কথা।

এই '৫০ সালেই ঘটেছিলো রাজশাহীর রাজবন্দীদের ওপর ২৪ এপ্রিল খাপড়া ওয়ার্ডে নির্বিচার গুলিবর্ষণ। আর তাতে নিহত হয়েছিলেন সাতজন রাজবন্দী, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলনের নেতা হানিফ শেখ, বিজন সেন, সুধীনধর, কম্পরাম সিং, আনোয়ার হোসেন, দেলোয়ার হোসেন এবং হানিফ শেখ, বিজন সেন, সুধীনধর, কম্পরাম সিং, আনোয়ার হোসেন, দেলোয়ার হোসেন এবং সুখেন ভট্টাচার্য। আহত হয়েছিলেন আরো অনেকে।

এই '৪৯-৫০ সালেই সাঁওতাল আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ইলামিত্র এবং সাঁওতাল কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে এসেছিলেন। গ্রেফতারের মুহূর্ত থেকে থানার হাজতে ইলা মিত্রের ওপর সংঘটিত হয়েছিলো অবিশ্বাস্য পাশবিক নির্যাতন। সংখ্যাহীন সাঁওতাল বন্দী থানায় এবং জেলখানায় অত্যাচারিত হয়ে নিহত হয়েছিলেন।....

দশকের হিসেব হয়ত কালের বুকে সামান্য সময়ের হিসেব। তবু এই সামান্য সময়ের অসামান্য ঘটনাসমূহই রচনা করেছিলো পূর্ববঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী বিবর্তন ও বিকাশের ভিত্তিভূমি।

২৪.৯.১৯৯৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন জয়ী হবে

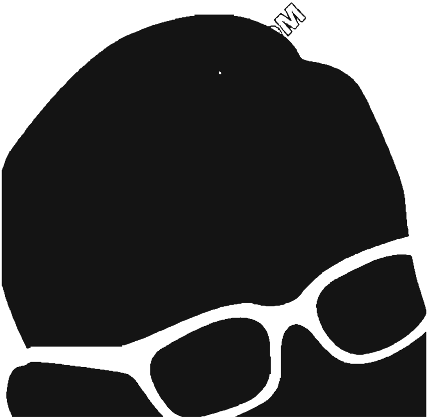

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলিটিক্স কোথায় যে টানবে!

৬ নভেম্বর ২০০২

সরদার ফজলুল করিমের সাথে আলাপচারিতা শুরুর আজ প্রথম দিন। এরপর মাসের পর মাস আমাদের আলাপ চলেছে। আসলে আলাপ নয়—চেষ্টা করেছি কোন একটা প্রসঙ্গ ধরিয়ে দেয়ার। ঐটুকুই আমাদের কাজ—এর পর দু'টো যন্ত্র যার যার মত করে কাজ করেছে। সরদার ফজলুল করিম নামের মানব যন্ত্রটির গুণে-মানে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আশি বছরের পুরোনো যন্ত্র, কিন্তু কি যে ভালো! তাঁর স্মৃতি, শব্দ চয়ন, রসবোধ থেকে শুরু করে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ইতিহাসের পেছনের ইতিহাস ব্যাখ্যার পারঙ্গমতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, সর্বোপরি চির সচল এক বর্ণাঢ্য জীবনাভিজ্ঞতা বর্ণনার অসাধারণত্ব পাঠক মাত্রই টের পাবেন—আশা রাখি। আমাদের মধ্যে মৌনভাবে হলেও ফাঁকিবাজির একটা চেষ্টা বোধ হয় ছিলো। আমরা বোধ হয় চেয়েছিলাম, এখান থেকে ওখান থেকে শুরু করে কিছু একটা দাঁড় করাতে—যাতে করে তাঁর জীবনের আকর্ষণীয় অংশগুলোর (আমাদের ধারণায়) একটা বিবরণ দাঁড় করানো যায়। কিন্তু তা হয়নি। তিনি শুরু থেকেই করেছেন। পরে বুঝতে পেরেছি যে, অজান্তেই বড় একটা লাভ হয়েছে। শুরু থেকে শুরু করার ফলে পরের অংশগুলো বুঝতে সুবিধা হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাদের এ কথাটা মনে করিয়ে দিতেন যে, কোন একজন ব্যক্তিকে বা কোন একটা বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে জানার বা বোঝার চেষ্টাটা ভুল। সেজন্যই প্রথম দিনের আলাপ শুরুর জন্য দ্বিতীয় যন্ত্রটি অর্থাৎ শব্দ ধারন যন্ত্রটি চালু করার আগে আমরা স্যারের শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিকাহিনী শোনার আকাঙ্খা প্রকাশ করি। তিনি সম্মতি প্রকাশ করেন। এবং কথা শুরু করেন অনেকটা ওস্তাদ সঙ্গীত শিল্পীর ঢংয়ে, অর্থাৎ ঝপ করে কোন একটা জায়গা থেকে—কিন্তু আলাপের শেষে পুরো একটা রাগ শ্রবণের আরাম দেয়। যতদিন আলাপ চলেছে আমরা শুধু শব্দ ধারণ যন্ত্রটি খুলে রেখেছি আর মাঝে-মধ্যে স্যারকে উসকে কথা বের করার চেষ্টা করেছি। কখনো কখনো যুক্তিতে না পেরে বিতর্কে হেরে কুতর্কে জড়িয়েছি। তিনি রাগ করেননি। একটা বিষয় উল্লেখ্য, স্যার যা বলেছেন সেগুলোর একটা লিখিত রূপ দেয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। তবে তাঁর কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনার অভিজ্ঞতাটা আলাদা। প্রমিত-আঞ্চলিক বাংলার মাঝে মাঝে ইংরেজি ঢুকিয়ে যে আকর্ষণীয় উপস্থাপনা, যার সাথে আরো যুক্ত হয় শব্দ প্রক্ষেপণের অসাধারণ কুশলতা এবং প্রয়োজন মাফিক কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন। এলো সব মিলে সরদার ফজলুল করিম শ্রোতার কান ও মগজ হয়ে মনে ঢুকে পড়েন শ্রোতার অজান্তে। শৈশবে বরিশালের স্কুলে পড়ার সময় সেখান থেকে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে স্যার কথা শুরু করেন।

—আমার গ্রামের বাড়ি ছিলো বরিশাল শহর থেকে প্রায় পনেরো-ষোল মাইল তফাতে। রহমতপুর, দোয়ারিকা, শিকারপুর। তিনটা খেয়া পার হয়ে আমাকে যেতে হতো।

—সে আমলে আমার বরিশাল থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তায় ছিলো একটা শ্মশানঘাট। মাঝে-মধ্যে আমি শেষরাতে সে পথ ধরে বাড়ির দিকে রওয়ানা হতাম। আমার বড় ভগ্নীপতি, মাস্টার মানুষ খুব কড়া মানুষ, তিনি আমাকে বলতেন, তোর ভয় করে না! শ্মশানঘাটে ভূত আছে তুই জানোস না? আমি আবার বলতাম, আমি ভূতেরে ভয় পাই না, এই বইলা আমি যাত্রা করতাম শেষে হয়তো সকাল আটটা না বাজতেই বাড়িতে পৌঁছে মা' রে ডাক দিতাম মা বইলা। মা সাংঘাতিক অবাক হয়ে বলতেন, পাগল তুই কেমন করে এত সকালে এত দূর থেকে আসলি।

আমরা স্যারের মা-বাবা সহ পরিবারের কথা একটু শুনতে চাইলে তন্ময় হয়ে শুরু করলেন, বাবা ছিলেন খুব নির্বাক মানুষ। কথা বলতেন না। আমার মা তার কোন নাম ছিলো না। সবাই তারে ডাকতো মউজ আলীর মা। মউজ আলী তার বড় ছেলে। এই সেই দিন আমার মেজ বোন যে এখন প্রায় স্মৃতিভ্রষ্ট, তার কাছ থেকে মায়ের নাম জানলাম। সে নাম এখানে বলে লাভ নাই। কারণ তার নাম তো কেউ বলতো না।

মা ছিলো ভীষণ considerate। আমাদের গ্রামের বাড়ির ঘরামী ছিলেন এক হিন্দু শিডিউল কাস্ট। মা তারে নিজের থালে করে ভাত খাওয়াইছেন। তো এইরকম কৃষক ঘরের মেয়ে খুব কম পাওয়া যায়। আমি কখনো কখনো বাবার নাম নিয়েছি—কফিলউদ্দিন সরদার। কিন্তু মায়ের নাম আমি লিখতে পারি না।

—মায়ের নাম প্রসঙ্গে এসে পড়ে মেজবোন মেহেরুন্নেছা প্রসঙ্গ। চাপা কষ্ট থেকে তিনি বললেন :

—তোমরা তো কোন খোঁজ করতে চাও না, কষ্ট করতে চাও না। বরিশালের রহমতপুর হাই স্কুলে আমি আর সে একই ক্লাসে পড়তাম। আমাদের সাথে হিন্দু জমিদারবাড়ির কয়েকটা মেয়েও পড়তো। তারপর তো তার নানা কাহিনী। মেজ বোনটার একটা ট্র্যাজিক লাইফ আর কি। একাত্তরের শহীদের তালিকায় আমার বোনের পরিবারটাকে তোমরা তো খুঁজেও পাও না! আমার মেজবোনটা ছিলো ভীষণ জেদী। শাড়ি পছন্দ না হইলে পুড়াইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলার মত ব্যাপার আর কি। তার একটা ডাক নাম ছিলো—ছোট্ট। নামটা আমার বড় ভাই দিয়েছিলেন। এই সেই বড় ভাই যিনি আমাকে মেরেছেন, কাঁধে করে ঘুরিয়েছেন, আমাকে মানুষ করেছেন। আবার পরবর্তীকালে জেলখানায় যেয়ে আমার সাথে দেখা করেছেন। বড় ভাই আমাদের বড় এবং মেজবোনের বিয়ে ঠিক করেছিলেন। আমার বড় বোনের বিয়ে হয়েছিলো স্কুল শিক্ষক ওফাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের সাথে। তিনি তৎকালে এলাকায় খুব বিখ্যাত লোক ছিলেন। মেজ বোনের বিয়ে দিলেন নিজের সহপাঠি আশরাফ আলী খানের সাথে। সোজা কথা বড় ভাই তার পছন্দ মত মানুষ জোগাড় করে বোনদের বিয়ে দিয়েছিলেন। আশরাফ আলী খানও by nature সাহিত্যিক ধরনের ছিলেন। ইনি কবি আহসান হাবীবের বড় ভাইয়ের মত ছিলেন। আহসান হাবীব তো সেভাবে তেমন পড়ালেখা করেন নি। মেট্রিক পাশ করার পর তিনি বরিশাল এলে আমার মেজো ভগ্নিপতি তাকে আশ্রয় দিলেন। নিজের বাসায় রাখলেন। আমি যখন ক্লাশ ফাইভে সিক্সে পড়ি তখন আহসান হাবীবের সাথে আমার পরিচয়। আশরাফ আলী খানের সাথে আমার বোনের বিয়ের সময় সেই কালের নিয়ম অনুসারে আহসান হাবীব আমার বোনের উদ্দেশ্যে কবিতাও লিখেছে। সেই কবিতা দেয়ালে বাঁধাই করে আমার মেজবোন অনেক দিন যত্নে রেখেছে। অবশ্য পরে আহসান হাবীব অনেক বড় হয়েছেন। আমার মেজবোন ঢাকায় থাকলেও আহসান হাবীব খুব একটা যোগাযোগ রক্ষা করতেন না। মেজ ভগ্নিপতি পিডব্লিউডি'র একজন সিনিয়র ক্লার্ক ছিলেন। অবশ্য পার্টিশানের আগে তিনি ঢাকাতেও কাজ করেছেন।

আমরা চেষ্টা করলাম স্যারকে তাঁর শৈশব-কৈশোরে ফিরিয়ে নিতে। স্যার বলেন :

—হ্যাঁ ঐ সময় বড় ভাই বোনদের বিয়ে দিলেন। পরে যিনি মেজ ভগ্নীপতি হলেন আমি বরিশালে একটা সময় তার সাথে মেসে থেকেছি। বড় ভগ্নীপতিও বরিশালে থাকতেন। উভয়ে আমাকে ভীষণ আদর করতেন। এখন ধরো এই হচ্ছে ব্যাপার। ঐ সময়ের আর কি পাইতে চাও? এটুকু বলা যায় যে, ঐ সময় একটা মুসলিম মধ্যবিত্ত কিছু পরিমাণে ডেভেলপ করছে। আমার পরিবারের মধ্যেই দেখো, আমার ভগ্নীপতিদের একজন শিক্ষক। আরেকজন সরকারি অফিসের ক্লার্ক। ধরো বরিশালে স্কুলে আমি একজন মুসলমান ছাত্র। আমার মত আরো কিছু মুসলমান ছাত্র ছিলো। বুঝতেই পারছো, হিন্দুদের চেয়ে বেশি নয়।

এ প্রসঙ্গে আমরা একটা প্রশ্ন উত্থাপন করি। রেকর্ডার চালু করার আগে আপনি বলছিলেন যে, হিন্দু ছাত্ররা পলিটিক্যাল ছিলো কিন্তু দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমান ছাত্ররা নয়। মুসলিম ছাত্রদের পলিটিকসে আকর্ষণ ছিলো না কেন? এ পর্যায়ে আলোচনা জমে যায়। স্যার বলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—পলিটিকস কোথায় যে টানবে! পলিটিকস থাকলে তো টানবে।

কেন তখন তো কংগ্রেস ছিলো, মুসলিম লীগ ছিলো। কংগ্রেসে না যাক মুসলিম লীগে যাবে।

—(দৃঢ় আপত্তি জানিয়ে) না, সমান কইরো না। কংগ্রেস আছে মুসলিম লীগ আছে বললে পরে তো সব সমান হয়ে যায়। তোমরা তো এমনভাবে বলো যেন দুটোই সমান আছে। কংগ্রেসে হইছে সেই কবে এইটিন এইট্টিস আর মুসলিম লীগ হচ্ছে ১৯০৬ সালে। এটা কি সাধারণ ব্যাপার বলবা। এই সময়ের ব্যাবধানটা?

কিন্তু আপনি দেখেন, আমরা যে সময়ের কথা আলাপ করছি ততদিনে মুসলিম লীগ অনেক পরিণত।

—অনেকটুকু কি matured হইছে ঘোড়ার ডিম! সব তো উপর তলার কতগুলা লোক। যারা প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের স্বার্থ দেখেনি। এবং they were communalizing the community. They were using the capital. তুমি দেখো জিন্নাদের অবস্থা দেখো। তুমি দেখো কয়জন মুসলিম লীডার ততদিন পর্যন্ত বরিশালে আসছে। হ্যাঁ, বরিশালেও ভালো ভালো মুসলিম লীডার ছিলেন—হাশেম আলী খান, আজীজ উদ্দীন সাহেব, জমিদার ইসমাইল চৌধুরী, ওহাব খান এরা ছিলেন, এরা সবাই তো মুসলিম লীগই ছিলেন। তাই বলে এটা বলা যাবে না যে বরিশালের মুসলিম লীগও ১৯০৬ সালে হয়েছিলো। ব্যাপারটাকে এভাবেই বুঝতে হবে। তোমাদের এও বুঝতে হবে, যে বরিশালের মুসলিম লীগের নেতারাও কিন্তু মোছলমান পোলাপানদের approach করে নাই। তারা approach করছে আর পাঁচটা উকিলরে। আর পাঁচটা তালুকদাররে। এদের approach করার পেছনে central assembly-তে ভোটের ব্যাপার আছে। joint electorate হলে পরে ভোট পাইতে সুবিধা হবে এসব বিবেচনা ছিলো। এদের সাথে যে আমি যাবো আমার কাছে তো তাদের আসতে হবে। তারা তো ছাত্রদের কাছে যান নাই।

মুসলিম লীগ সংক্রান্ত আলোচনায় সুবিধা করতে না পেরে আমরা তৎকালীন কংগ্রেস প্রসঙ্গে স্যারের অনুভূতি জানতে চাইলাম।

—কংগ্রেস আর কি? ঐ এক সুভাষ বসুরে দেখলাম। কংগ্রেস তো আর আমার কাছে আসে নাই। আরএসপি (রেভ্যুল্যশানারি সোসালিস্ট পার্টি) আসছে। কংগ্রেসের আমার কাছে আসার দরকার পড়ে নাই। কংগ্রেসের তো হিন্দু ক্লায়েন্ট আছে। তার যাওয়ার অনেক জায়গা আছে—লীডার আছে। মাতবর আছে, হেডমাস্টার, স্কুল টিচার সব আছে। নির্দিষ্ট এলাকা আছে, তাহলে সে আমার কাছে কেন আসবে?

তার মানে কি এই যে, মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস যারা আগে আসতো আপনি তাদের সাথেই যেতেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আহা! আসলে তো যাবো! ওরা কেউ তো আসে নাই। কেউ ডাকলে আমি না করবো বা হ্যাঁ করবো, এই তো ব্যাপার। আগে আসলেই যে একেবারে তার দিকে ঢলে পড়বো এমন তো না। সে তো আমাকে এমনভাবে ভালোবাসতে হবে যেন আমি তার কাছে যাই। কংগ্রেস বলো, মুসলিম লীগ বলো কেউ তেমনটা করে নাই। তোমাদের মুশকিল হলো তোমরা সবকিছু কেতাবে পড়ো, আর পড়ে এসব কথা বলো, The book cannot give you the time. সেজন্যই একই বিষয়ের উপরে পাঁচটা পাঁচ রকমের বই হয়। আর তোমরা পাঁচটা মিলায়ে একটা কিছু বের করার চেষ্টা করো। এখন তোমরা আদর্শ মনে কর নবাব সলিমুল্লারে। এই নবাব সলিমুল্লাটা কেডা?

প্রথম দিনের আলাপে স্যারের শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিচারণ শুনতে চাইছিলাম। কিন্তু ঐ যে বলে কথা হলো লতা। স্যার আলাপ অন্যদিকে ভাসিয়েছেন। আমরাও স্যারের কথার স্রোতে ভাসতে থাকলাম। মনে করিয়ে দিলাম যে উনি একটু আগে বলেছিলেন আরএসপি ওনার কাছে এসেছিলো। আরএসপি প্রসঙ্গে জানতে চাইলাম।

—আমি আরএসপিকে কোন অর্গানাইজেশান হিসাবে দেখতামই না। আমি আমার বন্ধু মোজাম্মেলকে চিনতাম। সে আরএসপি'র সাথে জড়িত ছিলো। ওরা আমারে কোন মিটিংয়েও নেয় নাই, আরএসপি কারে বলে তাও জানতাম না। তারা কোন পাবলিক মিটিং করতো বলে মনে পড়ে না। RSP was inside the Congress. তখন তো আরএসপি, কম্যুনিস্ট, স্যোসালিস্ট ব্লক সবই ছিলো ইনসাইড দি কংগ্রেস। পরবর্তীকালে এরা আলাদা হয়। এদের অনেকে আন্দামানেও গেছে। তাহলেও এরা এত বড় ছিলো না যে খুব বড় করে পাবলিকলি আসবে। আসলে তখন আমার কাছে আসল ব্যাপার ছিলো মোজাম্মেল। তার সঙ্গে একটা কৈশোর প্রেম ছিলো বলে আমার মনে পড়ছে। বরিশালে এরকম প্রেম আর কারু সঙ্গে ছিলো বলে মনে পড়ে না। গলাচিপাতে ছিলো। সেখানে সুনীল আর সুশীল কর আমার দু'জন বন্ধু ছিলো। মোজাম্মেল নামে ১৯৬৫ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়।

হোস্টেল জীবন প্রসঙ্গে এবার স্মৃতিচারণ করলেন।

—আমাদের হোস্টেলে সুপারিনটেনডেন্টের হুকুমে রাত দশটার সময় ইলেকট্রিক বাতি নিবাইয়ে দিতো। তারপরে আমি কি করবো? আমি বইপত্র বগলে করে হোস্টেলের পাশে ডিস্ট্রিক বোর্ডের গ্রীল পার হয়ে বরিশাল স্টীমার ঘাটে চলে যেতাম। খুব সুন্দর ছিলো স্টীমার ঘাটটা। নানান জায়গার জাহাজ চলাচল করতো। আমি যাত্রীদের চলাচলের জন্য যে বোর্ড ছিলো তার গায়ে হেলান দিয়ে লাইটের আলোতে বই পড়তাম। একবার কোন একটা জাহাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারেং বা তেমন কিছু হবে—তার নজরে পড়ে যাই। তিনি আমারে স্টীমারের ভেতরে নিয়ে সুন্দর আলোতে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

—কি ধরনের বই পড়তেন?

গলাচিপায় থাকতে ডিটেকটিভ বই পড়তাম। বরিশালে এসে লাল ইশতেহার পড়েছি। আর পথের দাবী। আমি তখন ক্রমান্বয়ে শরৎ সাহিত্যের প্রভাবে এসে যাই। তখন বসুমতী সাহিত্য মন্দির সস্তায় শরৎ সাহিত্য তৈরি করতো। আমি পুরো সেট কিনেছিলাম। আমার বড় ভাই লক্ষ্য করলেন যে অন্য ভাইদের তুলনায় আমি একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছি। আমার সেই বড় ভাই আমারে কত আদর করতেন। তার কথা আমি বলতে পারি না। বলতে গেল আবেগ আসে। আবেগ আসলে কথা বলা যায় না। মনে পড়ছে—বড় ভাই তখনও অবিবাহিত। পিরোজপুর সাবডিভিশনে কোন একটা জায়গার সাব রেজিস্ট্রার। একবার বাড়ি আসলে আমি তার সাথে যাওয়ার তাল ধরলাম। কারু নিষেধই শুনলাম না। মিয়াভাই তখন মেনে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা আমার লগে উজিরপুর পর্যন্ত যাউক। উজিরপুর থেইকা তো ওরা আসবে। ওগো লগে দিয়া দিমু।' ওরা মানে আমাদের জ্ঞাতি বা আত্মীয়-স্বজনদের কেউ হয়তো উজিরপুরের দিকে গিয়েছিলো। ওখান থেকে বাড়ির দিকে আসার পথে আমাকে তাদের সাথে ধরিয়ে দেবেন, এই ছিলো মিয়াভাইর প্ল্যান। কিন্তু উজিরপুর যাওয়ার পরও আমাকে ছাড়ানো গেলো না। তখন ভাইয়ের চাপরাশী আমাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে চললো। তারপর তো এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমার এখনও মনে আছে—হলুদপুরের মাঠ বলে বিশাল এক মাঠে পথ ভুলে সারারাত ঘুরে ঘুরে ভোরবেলা বানারীপাড়া পৌঁছি স্টীমারে চড়লাম। সেই আমার প্রথম স্টীমার চড়া। পরে ভাইয়ের কর্মস্থলে পৌঁছি। তো এসব আলাপ আর কি শুনবা? বরং অন্যকোন সামাজিক বিষয় যদি জানতে চাও জিজ্ঞেস করো। ধরো একটা কৃষক পরিবার। কৃষক পরিবারটার মধ্যে এডুকেশান ঢুকছে। not madrasa education. ঢুকছে ইংলিশ এডুকেশন। ইংলিশ এডুকেশান ঢোকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই পরিবারের বড় ছেলে তার পরিবারটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। এই বড় ছেলের অর্থাৎ আমার বড় ভাইয়ের ধর্মভীরুতা যেমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো তেমনি তার অসাম্প্রদায়িকতাও একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিলো। He was very much popular. রহমতপুরে চাকরি করার সময় একটা হিন্দু জমিদার পরিবারের সঙ্গে তার সাংঘাতিক একটা ঘনিষ্ঠতা ডেভেলাপ করে। এসব কথা আমার 'সেই সে কাল' বইতেও আছে। সেখানে আমি একটা লেখার নাম দিয়েছি মোসলমান ছেলের হিন্দু মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আমার চারপাশে সবাই কম্যুনিস্ট

২০ নভেম্বর ২০০২

আজকের আলাপের একটা বৈশিষ্ট্য হলো স্যার প্রায় সারাদিনই আমাদের সাথে ছিলেন। এবং দীর্ঘ একটা সময়ের উপর আলো ফেলেছেন। গত দিনের আলাপের সূত্র ধরেই আমরা এগুনোর মনস্থ করি। অর্থাৎ শৈশব-কৈশোরের কিছু স্মৃতি চারণ সে সাথে স্যারের বরিশাল জীবন। জেনেছি যে তিনি ১৯৪০ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশান সমাপ্ত করেছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে তার যোগাযোগের কিছু আভাসও দিয়েছেন। স্বভাবতই এর পরে স্যারের ঢাকা আগমন এবং এতদ্বপ্রসঙ্গে কিছু শুনতে চাওয়াটা আমরা যৌক্তিক মনে করলাম। কেননা ঢাকা আগমনের পূর্বের জীবনের অবদান স্বীকার করে নিলেও বলা যায় বরিশালের সরদার ফজলুল করিম আসলে আজকের সরদার ফজলুল করিম হয়ে উঠতে শুরু করেন ঢাকা আগমনের পর থেকে। আমরা স্যারের কাছে বরিশালের পাট চুকিয়ে ঢাকা আগমন এবং সম্পর্কিত বিষয়াদি জানতে চাইলাম।

—এখন তুমি যে বললা ১৯৪১-এ কোথায় ছিলেন? এই কথাটাই আমি মনে ভেবেছিলাম। তুমি বললা, আপনি '৪০ এ মেট্রিক পাশ করলেন। আপনি '৪১ সালে কোথায় ছিলেন। এখন ধরো '৪১ সালে আমি কোথাও ডুব দিয়েছিলাম তা না। আসলে তোমাকে বুঝতে হবে '৪০ সাল '৪১ সাল সবই হচ্ছে কানেকটেড। '৪১-এর আগস্ট সেপ্টেম্বরে আমার রেজাল্ট বেরুলো। তখন একটা প্রসেস চললো। আমার বড় ভাই, তিনি আমার পিতার মত, আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দিলেন। ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য। এই যে প্রসেসটা—আমি কারু সঙ্গে ঢাকা আসলাম। যার সঙ্গে আসলাম, বড় ভাই তাকে অনুরোধ করলেন, তিনি আমাকে ঢাকার একটা রেপুটেড কোন গভর্মেন্ট কলেজে ভর্তি করে দিতে পারেন কি না। তো ধরো এই একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। সব মিলিয়ে দাঁড়ালো আর '৪০-এ মেট্রিক পাশ করলাম। '৪১-এ ঢাকা গর্ভমেন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্টারমেডিয়েট কলেজে ভর্তি হলাম এবং ১৯৪২-এ ফাইনাল পরীক্ষা হলো। তা রেজাল্ট বেরুতে তো সময় লাগে। আজকের দিনের মতই সময় লাগে। আমি অবশ্য রেজাল্টের জন্য ঢাকায় অপেক্ষা করিনি।

এবার আমাদের একটু সুবিধা হলো। আমরা তাঁর ইন্টারমেডিয়েট স্টুডেন্ট লাইফ সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। রাজনীতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বড় শহরে আসবার অনুভূতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ হচ্ছিলো। দেখা গেলো, স্যার এ বিষয়ে বলতে আগ্রহী। তিনি শুরু করলেন :

—অফ কোর্স। অফ কোর্স। এগুলো আসবে। অটোমেটিক্যালি আসবে। ধরো আমার যে বুজুম ফ্রেন্ড মোজাম্মেল হকের কথা আগের দিন তোমাদের বলেছি সে কিন্তু ঢাকাতে পড়তে এলো না। ও বরিশালে কি পড়ছে না পড়ছে আমি ভালো জানতাম না। তবে সে রাজনৈতিক ছিলো। ঐ '৪১-'৪২ সালেও সে মাঝে-মধ্যে ঢাকায় এসেছে। আমাকে খুঁজে বের করেছে। আলাপ করেছে। আবার ফিরে যাওয়ার সময় আমি মোজাম্মেলকে বাদামতলী ঘাটে সি অফ করেছি। এ সমস্ত প্রেমময় স্মৃতি আছে। এখন ধরো, '৪১-'৪২ ব্যাপারটা, আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। তোমাদের তো কোন স্মৃতি নেই। আমার আছে আমি বলছি। তখন ঢাকা গভর্মেন্ট ইন্টারমেডিয়েট কলেজ বাই ইটসেলফ, বিল্ডিং ওয়াইজ ও যদি ধরো একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাপার ছিলো। It continued to be the same building which was made for Curzon. The same building. এখনো আছে, ঐ যে ডিপিআই অফিস তার পাশে দেখবা একটা অদ্ভুত ধরনের গেইট আছে। এই গেইটটা ভাঙে নাই। কিন্তু এইটা কেউ দেখেও না। আর এইটা সম্পর্কে কিছু মনেও রাখে না। এই গেইট দিয়া ভেতরে ঢুকলে বড় ডোমওয়ালা একটা বিল্ডিং এখনো পাবা। এইটা ছিলো বলা চলে একটা সেকেন্ড কপি অফ কোলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। এই বিল্ডিংটা এখন বোধ হয় ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ব্যবহার করে। কাউকে ঢুকতে দেয় না। এটা জাদুঘরের কোন মাল না এবং এটাতে তোমরাও যাও না। আমিও যেতে পারবো না। ঢুকতে এলাউ করা হবে না। ঐ বিল্ডিংয়ের স্টেয়ার কেইসটা একটা রাজসিক ব্যাপার ছিলো। দোতলাতে একটা ড্যান্সিং হল ছিলো কাঠের। এগুলো আমার স্মৃতিতে আছে। আমাদের ক্লাশরুমগুলোও ছিলো বড় বড়। ঐ বিল্ডিংয়ের দুটো উইং ছিলো এবং দুটো উইংয়ের মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটা ব্রীজ ছিলো। ঢাকা কলেজ তখন ছিলো মূলত আর্টস পড়াশোনার জায়গায়। কমার্সও বোধ হয় ছিলো। আমি যখন ভর্তি হই তখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ড. মমতাজ উদ্দীন আহমেদ। তিনি ফিলসফির লোক ছিলেন। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিসি হন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর বড় অবদান আছে। হি ওয়াজ অলমোস্ট ফাউন্ডার। তোমরা জানো এসব?

আমরা আর দশটা প্রশ্নের মত এ প্রশ্নের উত্তরও জানা নেই বলে স্যারকে জানাই। স্যার তখন জানালেন যে মমতাজ উদ্দীন সাহেবের বিষয়ে এতসব তিনিও জানতেন না। কেননা মমতাজ সাহেব সরকারি চাকুরে ছিলেন বিধায় ঢাকা কলেজ থেকে পরে কোথায় গেছেন সেসব খবর রাখা হয়নি। কিন্তু স্যার পরে খবর বের করেছেন। জেনেছেন। সে কথাই তিনি আমাদের জানালেন। আমরা খানিকটা বুঝে নিলাম, স্যার যে বারবার আনআর্থ করার কথা বলেন এই আনআর্থ করা জিনিসটা কি। সেটা একজন মমতাজ সাহেব হোন বা অন্য কেউ হোন। আমাদের যে বা যা কিছু মহান সেগুলোকে খুঁজে খুঁজে, খুঁড়ে খুঁড়ে বের করে আনা। স্মৃতির অতলে যেতে না দেয়া। সরদার ফজলুল করিম এ সবের জন্যই রোদন করেন। স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রক্রিয়ায় বলে যেতে থাকলেন :

—এই মমতাজ উদ্দীন সাহেব ইংরেজি, হিস্ট্রি এসবই পড়াতেন। আমার সাবজেক্ট কম্বিনেশন ছিলো লজিক, সিভিকস এবং হিস্ট্রি। ঐ সময় আমাদের একজন ইংরেজি প্রফেসর ছিলেন। তিনি হলেন জালাল উদ্দীন সাহেব। ঢাকা কলেজ যখন নিউমার্কেটের ঐ দিকে যায় তখন তিনি প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন।

ঢাকা কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় স্যার কোথায় থাকতেন, কিভাবে থাকতেন এগুলোও আমরা জানতে চাই। পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে স্যার যেন পুরোনো দিনেই বিচরণ করছিলেন :

—তুমি নোট রাখো যে আমি ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে ভর্তি হলাম। ফজলুল হক হল এবং ঢাকা হল, এখন যেটা শহীদুল্লাহ হল, এই হল দু'টোর মাঝখানে একটা পুকুর ছিলো, এখনো আছে। দু'পাড়ে দু'টো ঘাট ছিলো। আমি থাকতাম পুব সাইডে। তখন নাম ছিলো ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট হোস্টেল। এই হোস্টেলের একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো। এখানে রিলিজিয়াস কোন ব্যাপার ছিলো না। ইট ওয়াজ কসমোপলিট্যান। ভাগ ছিলো এটুকুই যে এক সাইডে হিন্দু ছেলেরা অন্য সাইডে মুসলিম ছেলেরা থাকতো। তাদের রান্নাবান্না আলাদা হতো। এই পর্যন্তই। সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন দু'জন। একজন হিন্দু আরেকজন মুসলিম। সব মিলিয়ে হলটা আমাদের খুব ভালো লাগতো। আমরা লেখাপড়া করতাম, গল্প করতাম, ঘাটে বসতাম।

আমাদের আগ্রহ ছিলো স্যারের পলিটিক্যাল ইনভলমেন্ট বিষয়ে জানার। আরেকটা দিক, অর্থাৎ তখন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিলো, সে যুদ্ধটাকে স্যার কিভাবে দেখেছিলেন। আমাদের উভয় আগ্রহের জায়গাকে একসাথে বেঁধে নিয়ে স্যার বলতে শুরু করলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমি '৪১ সালে ঢাকা আসছি। তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের ইমপ্যাক্টটা গ্র্যাজুলি ঢাকার উপরে সেভাবে পড়েনি। যুদ্ধের ফ্রন্টটা ছিলো ইস্টে। বার্মা, সিঙ্গাপুর এসব দিকে। জাপান সাংঘাতিক আক্রমণ করছে। তারা এমনকি আমেরিকার পার্ল হারবারেও আক্রমণ চালাচ্ছে। এই যে ভয়ানক যুদ্ধটা চলছে, এর যা আনুষঙ্গিক—অর্থাৎ আহত হয়, নিহত হয়, হাসপাতালে নিতে হয় এসব ব্যাপার তো রয়েছেই। এসবের প্রভাব ঢাকার উপরে পড়েছিলো। তখন সলিমুল্লাহ হলকে মিলিটারী হসপিটালে পরিণত করা হয়। এটা '৪২ সালের দিকের ঘটনা। এছাড়াও এখন যেটা ঢাকা মেডিক্যাল তার একটা অংশও মিলিটারী হসপিটাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তখন অবশ্য এটা মেডিক্যাল কলেজ হয়নি। ঐ পুরো এলাকায় একমাত্র সলিমুল্লাহ হল ছাড়া বাকি সবগুলো স্থাপনাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীতে নতুন রাজধানীর প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর কালক্রমে এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দেয়া হয়। সলিমুল্লাহ হল আলাদা করে তৈরি হয়েছিলো। সেসব যাই হোক। তোমরা যা জানতে চাইছো সেদিকে আসি। আমি কলেজে ভর্তি হলাম। ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ হোস্টেলে থাকছি। পড়ালেখা করছি। '৪২-এর মাঝামাঝি সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। ততদিনে আমার বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব হয়েছে। খুবই ইন্টিমেস্ট বন্ধু-বান্ধব। ধরো, নাসির উদ্দীন। নাসির উদ্দীন আমার বুজুম ফ্রেন্ড হয়। ও বোধ হয় হিস্ট্রিতেই ছিলো। তার কোন রাজনীতি ছিলো না। কিন্তু তার একটা এফেকশান ছিলো। আমি তখন ছুটিছাটায় বাড়ি না যেয়ে বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতাম। নাসির উদ্দীনের বাবা আব্দুল গফুর সাহেব ছিলেন চাঁদপুরের এসডিও। আমি সেখানেও গেছি। নাসির উদ্দীনের ছোট ভাই বাচ্চু অর্থাৎ '৭১-এ শহীদ ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গিয়াস উদ্দীন তখন মাত্র ক্লাশ এইটের ছাত্র। তার সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সে আমাকে খুবই পছন্দ করতো। চিঠি লিখতো। তার পরে ধরো আবদুল মতিন। 'জেনেভায় বঙ্গবন্ধু' বইয়ের লেখক। আমরা চেনানোর জন্য বলি জেনেভায় বঙ্গবন্ধুর মতিন, সেও আমার ভীষণ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। মতিনের বাবার নাম ছিলো আবদুছ সোবহান। দারুণ অমায়িক মানুষ। আমি মতিনের সাথে নোয়াখালীতে তার বাবার কর্মস্থলে গেছি। তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে কাজ করতেন। তাদের গ্রামের বাড়িও গেছি। মতিন 'পাঁচ অধ্যায়' নামের আত্মজীবনীতে এগুলো লিখেছেও। পলিটিশিয়ান রাজিয়া খান মতিন যিনি একসময় এমপি হয়েছিলেন, সে হলো আবদুল মতিনের ছোট বোন আর মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মতিন চৌধুরী সাহেবের ওয়াইফ। আমার আরো বন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলো। যেমন ধরো নূরুল ইসলাম চৌধুরী। সে পরবর্তী জীবনে এ্যাম্বাসেডার হয়। এখন রিটায়ার্ড। সে তেমন একটা পলিটিক্যাল ছিলো না। পাবনার পাকশীতে নূরুল ইসলামের বাড়ি এবং রাজশাহী চারঘাটে তার মামাবাড়ি। দু'জায়গাতেই আমি গিয়েছি। ও এখনো আমার সাথে যোগাযোগ রাখে। এবার নাম বলবো হিস্ট্রির মাযহার উদ্দীনের। ওর বাবা ছিলো মাদারীপুরের উকিল। এই ছেলেটা ছিলো ভীষণ অদ্ভুত। মুসলমান হয়েও অমুসলিম ধার্মিক ছিলো। সে ধ্যান করতো, বেদ পড়তো। আর সাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে সে জানতো না। মাযহার উদ্দীন এখন জীবিত নেই। নাসির উদ্দীনও এখন জীবিত নেই। আমার আরেকজন বন্ধু ছিলো আবুল কাসেম। সে এখনো তেঁজগা কলেজে পড়ায়। তার মত নন-কম্যুনাল লোক খুব কম পাইবা। সে ইংলিশ এবং জিওগ্রাফীতে এম.এ। তার কাছে যেয়ে কথা বলো, অনেক কিছু জানতে পারবা। তোমরা তো কোথাও যাইবা না। এখন হাতের কাছে পাইছো আমারে—ধরে খালি টানাটানি করো। আমার আরো বন্ধুর নাম শুনতে চাইলে বলতে পারি। যেমন ধরো, রবিউল ইসলাম চৌধুরী, লুৎফুল করিম। লুৎফুল করিম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলো। এখন রিটায়ার্ড। এর বড় একটা পরিচয় হলো সে হচ্ছে younger brother of নাজমুল করিম। নাম শুনেছো? নাজমুল করিম হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। এই যে রঙ্গলাল সেন, সাদ উদ্দীন, আফসার উদ্দীন, সৈয়দ আহমদ এরা সবাই নাজমুল করিমকে দেখেছেন, তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। নাজমুল করিমদের খুবই শিক্ষিত পরিবার। আরো কিছু বন্ধু-বান্ধবের নাম আসবে পরে। সেটা অনার্স ক্লাশে পড়ার সময়। ইন্টারমেডিয়েট পড়ার সময় তেমন কোন হিন্দু বন্ধুর নাম মনে পড়ছে না। সেটা পাবে পরে—যেমন ধরো রবি গুহ। তার সাথে আমার দারুণ বন্ধুত্ব ছিলো এবং এটা রাজনৈতিক বন্ধুত্বও ছিলো। যাই হোক, '৪২ সালে যে আমি ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা দিলাম সে পরীক্ষায় আশ্চর্যজনকভাবে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি সেকেন্ড স্ট্যান্ড করলাম।

আমরা আবারো সে সময়টাতে স্যারের রাজনীতি সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

—আমার রাজনীতি না। সে সময়ের রাজনীতিটা আগে তোমাকে জানতে হবে। তারপরে আমার কথা জানতে চাও। আমি তো পলিটিকস তৈরি করি নাই। আমি পলিটিকসের সঙ্গে জড়িত হয়েছি। এটা একটু খেয়াল রেখো। other wise এটা একটা personal ব্যাপার হয়ে যায়। লাহোর প্রস্তাব, ক্রীপস মিশন এগুলো জানতে বই পড়তে যাও। আমি কিছু বলতে পারবো না। কয়েকটা ঘটনার কথা হয়তো বলতে পারবো। যেমন বলছি যে, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ার সময়ে ঢাকা কলেজে একটা রাজনৈতিক গণ্ডগোল সংঘঠিত হয়েছিলো। And you get the politics—সেই '৪১ সালের দিকে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে পাকিস্তানবাদ develop করতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে শ্যামা-হক মন্ত্রী সভার বিরোধিতার কথা বলতে পারি। আমার কথা বলতে গেলে, ঢাকা কলেজে আমার কিছু লিবারেল ফ্রেন্ডস দাঁড়িয়ে যায়—নট ডেডিকেটেড কম্যুনাল। যাদের নাম আমি একটু আগেই বলেছি। আমরা বই পড়তাম, ম্যাগাজিন বের করতাম, লাইব্রেরি তৈরি করতাম। আবার মুকুল সিনেমা হলে সারারাত জেগে সিনেমা দেখতাম। আমার একটা লেখার নামই আছে—'সিনেমা বিশারদ'। এক একটা পার্বন উপলক্ষ্যে, ধরো কালী পূজায়, এক টিকেটে সারারাত তিন-চারটা সিনেমা দেখতাম। একবার সারারাত সিনেমা দেখে ভোরবেলা হোস্টেলে ঢোকার সময় সুপারিন্টেনডেন্ট অলিউল্যাহ সাহেবের কাছে ধরা পড়লে বন্ধুরা সব দোষ আমার উপরে চাপিয়ে দেয় আর কি! এ নিয়ে আমাকে শাস্তিও পেতে হয়েছিলো। সে যাই হোক, আমাদের একটা লিবারেল গ্রুপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো—যে গ্রুপটা একটু সাহিত্য চর্চা করতো। এই গ্রুপটাই পরে শ্যামা-হক মন্ত্রী সভার সাপোর্ট এবং অপোজের ব্যাপারে ইনভলভ হয়েছিলো। সে সময় মুসলিম লীগের ছাত্ররা হক সাহেবের ঢাকা সফরের সময় তাঁর বিরুদ্ধে ডেমোন্সট্রেশনের সিদ্ধান্ত নেয়। আমাদের গ্রুপটাকে এতে যোগ দিতে বলে। তারা জানতো যে আমরা মুসলিম হলেও মুসলিম লীগার না, সাম্প্রদায়িক না। বরং একটু জাতীয়তাবাদী। আমরা যাবো কি যাবো না সেটা আমাদের ব্যাপার বলে আমরা পাশ কাটানোর চেষ্টা করি। পরে তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। মারধর করে। ডাইনিং হলে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন আমি কিছুদিনের জন্য ঢাকা ছেড়ে নলছিটিতে বড় ভাইর কাছে চলে যেতে বাধ্য হই এবং সেখানে বসেই ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকি। পরে পরিস্থিতি শান্ত হলে হোস্টেলে এসে পরীক্ষায় বসি। ঢাকা কলেজে আমি যে খুব একটা ভালো ছাত্র ছিলাম তা নয়। আমি এবং আমার বন্ধুরা ছিলাম ব্যাক বেঞ্চার। ফার্স্ট বেঞ্চে থাকতো সৈয়দ আলী আশরাফ, অজিত দে-এরা ছিলো একেবারে ফরমালি ভালো ছেলে আর কি। আসলে ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমার কখনো পড়ালেখা করা হয়নি। আমি বরং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গটাই এনজয় করতাম। এখনো মনে আছে, আমি কখনো সামনে বসলে বন্ধু কামাল আমাকে টেনে পেছনে নিয়ে আসতো। বলতো, তোর জায়গা আমাদের সাথে পেছনে। তুই আমাদের পড়াবি। এত স্নেহের সম্পর্ক আমাদের ছিলো। আসলে ভালো করার জন্য পড়া হয়নি। এমনকি পরীক্ষার পর বড় ভাইকে বলেছিলাম যে পরীক্ষা হইছে আর কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটামুটি। কিন্তু রেজাল্টে দেখা গেলো যে, আমি সেকেন্ড প্লেস করেছি। এটা তো বড় একটা ব্যাপার। ফার্স্ট প্লেস করতো বরাবরই জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা যারা মূলত হিন্দু। জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হওয়া গেলেও মুসলিম ছাত্ররা ঢাকা কলেজেই বেশি ভর্তি হতো। যেমন আমি। যাই হোক, রেজাল্টের ফলে বড় ভাই'র মনোভাব বদলে গেলো। মাঝে তিনি ভেবেছিলেন যে আমি বখে যাচ্ছি।

আমরা আবারো স্যারের রাজনীতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলাম। বরিশালে থাকার সময় আরএসপি'র সাথে পরোক্ষভাবে যেটুকু সম্পর্ক হয়েছিলো সেটা ঢাকায় এসেও ছিলো কিনা জানতে চাইলাম। তিনি না বোধক উত্তর করেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে সোমেন চন্দের খুন হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তবে বিস্ত ারিত কিছু বললেন না। এছাড়াও জানান যে, ঢাকা কলেজে পড়া অবস্থায়ও সরাসরি রাজনীতির সংস্পর্শে তেমন একটা আসেন নি। সেটা শুরু হয় আরো পরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ফজলুল হক হলে ওঠার পর। এ সময় নাজমুল করিমের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। এছাড়াও রবি গুহ, হেশাম উদ্দীনের নাম উল্লেখ করেন। নতুন ছাত্র থাকা অবস্থায়ই একটা অনুষ্ঠানকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনাতে সাম্প্রদায়িকতার খানিক মহড়া হয়। ঘটনাটা শুরু হয়েছিলো ঢাকা হলের বসন্ত উৎসব বা এ জাতীয় কোন একটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। কার্জন হলের অডিটোরিয়ামে মেয়েরা উৎসব উপলক্ষ্যে নাচ-গান করার সময় উপরের তলার ফজলুল হক বা সলিমুল্লাহ হলের কিছু ছাত্র হয়তো খানিকটা বখামী করেছিলো। এবং ঢাকা হলের হিন্দু ছাত্ররা অপমানিত বোধ করে মুসলিম ছাত্রদের মারধোর করে। পরদিন ফজলুল হক হলের মুসলিম ছাত্ররা ক্লাশ চলাকালে হিন্দু ছাত্রদের আক্রমণ করে। দু'পক্ষের সংঘাতের সময় নাজির আহমেদ নামে একজন ছাত্র ছুরিকাহত হয় পরে মারা যায়। স্যার বলেন, সে সময় কোন কোন হিন্দু ছাত্রের ছুরি চালানো সম্পর্কে কুখ্যাতি ছিলো। এ সংঘর্ষ চলাকালে নাজমুল করিম, রবি গুহ, হেশামউদ্দীনরা হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সরদার ফজলুল করিম চিকেন পক্সে আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালে থাকলেও তাঁকে শোকজ করা হয়েছিলো। তখনকার দিনেও এখনকার মত রাজনৈতিক নষ্টামীর খবর শুনে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর অন্য একটা ঘটনায় প্রভাবিত হওয়ার কথা স্যার আমাদের জানালেন। চুয়াল্লিশ সালের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অনেক বিদেশী সৈন্য বিশেষতঃ আমেরিকান সৈন্য ঢাকায় আসে। যার ফলে ঢাকা হঠাৎ করেই কিছুদিনের জন্য আন্তর্জাতিক শহরে পরিণত হয়ে যায়। স্যার বলেন, প্রগতিশীল কিছু আমেরিকান সৈন্যের সাথে হৃদ্যতা তৈরি হওয়ায় আমরা খানিকটা লাইম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইটে চলে আসি। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে ভারতের কম্যুনিস্টরা অবস্থা পরিবর্তন করে মিত্রশক্তির পক্ষ নেয়। স্বাধীনতার দাবিও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ইংরেজরা তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা না দিতে চাইলেও আমেরিকানরা এর পক্ষ নেয়। সৈন্যদের মধ্যে এসব নিয়ে বিতর্ক হতো। আমরা সেসব বিতর্ক শুনতে যেতাম। এ সময়টাতে হিন্দু ছাত্রদের সাথে সাথে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যেও রাজনীতি সচেতনতা বাড়তে থাকে এবং তারা যুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে। কম্যুনিস্ট ছাত্ররা এই অবস্থানকে capitalize করতে সচেষ্ট হয়। স্যারের মতে, তখন কম্যুনিস্ট ছাত্ররা became anti-facist more than anti-imperialist. এ সময় আরএসপি ফরোয়ার্ড ব্লকের মত মিলিট্যান্ট গ্রুপসহ কংগ্রেসের অনেক হিন্দুরাও কম্যুনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলতে শুরু করে। এমনকি রনেশ দাশগুপ্তকেও তখন ছুরি মারা হয়েছিলো। তখন ঢাকার কম্যুনিস্টরা মুসলমান ছাত্রদের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালায়। '৪৪-এর দিকে মুসলিম প্রগতিশীল ছাত্রদের সাথে কম্যুনিস্ট প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে আগে উল্লেখিত বন্ধুরা ছাড়াও সানাউল হক, আবদুল মতিন, সৈয়দ নূরুদ্দীন, মুনীর চৌধুরী এঁরা ছিলেন। সে সময় প্রগতি লেখক সংঘের মধ্যে ছিলেন রনেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সরলানন্দ সেন, কিরণশংকর সেনগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে সরদার ফজলুল করিমের কম্যুনিস্ট রাজনীতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। এ সময়ই অন্য অনেক বন্ধুর মত প্রো-কম্যুনিস্ট না থেকে তিনি এ্যাকটিভ কম্যুনিস্ট কর্মীর ন্যায় কাজকর্মে জড়িয়ে যান। এ সময় আবার সৈয়দ আলী আশরাফদের নেতৃত্বে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ দাঁড়িয়ে যায়। সাহিত্য সংসদ যাতে পুরোপুরি মুসলিম লীগের খপ্পরে না চলে যায় সেজন্য কম্যুনিস্টরা এর ভেতরে ঢুকে যায়। সরদার ফজলুল করিমসহ আরো অনেকে সাহিত্য সংসদে আসা যাওয়ার মাধ্যমে একে কৌশলে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে হাসান হাফিজুর রহমানদের মত প্রগতিশীল লোকদের হাতে সাহিত্য সংসদের নেতৃত্ব চলে আসে। এসব প্রসঙ্গে স্যার আমাদেরকে ইতিহাস না জানার অভিযোগে অভিযুক্ত করে বলেন, তোমরা তো জানো না যে কাজী মোতাহার হোসেন, নাসিরুদ্দীন সাহেব, নূরজাহান বেগম বা রোকনুজ্জামানের মত লোকেরা সাহিত্য সংসদে বিভিন্নভাবে জড়িত থাকলেও এরা মূলত ছিলেন কম্যুনিস্টদের লোক।

এসব আলাপ চলার সময় আমরা জানতে চাইলাম, আপনি কি ততদিনে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমাকে ওরা খুব ভালোবাসতো। রেগুলার মেম্বার করতে চাইতো। তবে তখন পার্টির মেম্বার হওয়া অনেক শক্ত ছিলো। আর আমার একটা সাইকোলজি কাজ করতো যে, আমি দ্বিতীয় বর্ষে পড়া একটা ছাত্র মাত্র তখনো পার্টির মেম্বার হওয়ারই উপযুক্ত হই নাই।

কিন্তু আপনার মনের অবস্থা কি ছিলো?

—আমার মন তো ততদিনে কম্যুনিস্ট হয়েই গেছে। অন্য আর কোন ইচ্ছাতো ছিলো না। কোন অলটারনেটিভ ছিলো না। বিশেষতঃ যুদ্ধ নিয়ে আমার যে এক্সপেরিয়েন্স আর অ্যাকশন, তারপর তো আমার জন্য প্যারালাল টু কম্যুনিস্ট অন্য কিছু ভাবার ব্যাপার ছিলো না। Not that I choose to be communist but that I had to be communist. এক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল রেখো, আমাদের যে কম্যুনিস্ট গ্রুপটা ছিলো they were the best students of the university.

উপমহাদেশের রাজনীতিতে তখন যে ভয়ংকর দোলাচল চলছিলো সে ব্যাপারে আপনাদের যুক্ততা বা ভূমিকা কি ছিলো?

—তখনো পর্যন্ত আমি ঢাকা বেইসড রাজনীতি করছি। এমনকি বেঙ্গল বেইসডও নয়। আমাদের কম্যুনিস্ট গ্রুপটার লক্ষ্য ছিলো ঢাকার রাজনীতিটাকে যাতে কেউ communalized না করে ফেলতে পারে। সেজন্য আমরা হিন্দু-মুসলিম unity টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। কোথাও একটা Killing হলে তার প্রভাবে এখানে যাতে কিছু শুরু না হয়ে যায় সে চেষ্টা করেছি। ধরো একটা শান্তি মিছিল বের করে শহর ঘুরে আসা এরকম অনেক ব্যাপার। শাহ আজিজ, ফরিদ আহমদ যে এক সময় কম্যুনিস্টদের সাথে জড়িত থাকলেও পরে নেজাম-ই-ইসলামে যোগ দেয়, এরকম লোকগুলারে পর্যন্ত আমরা শান্তি মিছিলে ঢুকিয়ে শহর ঘুরতে বাধ্য করছি। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবকেও ব্যবহার করেছি। আসলে সে সময় আমাদের ভূমিকা অনেকটা জাতীয়তাবাদীর একথা বলতে পারি। তবে আমরা কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন করি নাই। নাজমুল করিম যদি কিছু করেও থাকেন অতি সামান্য। হেশাম উদ্দীন তো কম্যুনিস্ট লীডারই। তবে স্বীকার করছি যে, main current ছিলাম না। main current ছিলো মুসলিম current সে সময় তারা আমাদের, অর্থাৎ Communist দের আক্রমণ করছে।

পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে আপনাদের ভাষ্য কি ছিলো?

—আমাদের ভাষ্য ছিলো national minority প্রশ্নটা আগে solve করতে হবে। যে কথাটা বললাম, আমাদের কম্যুনিস্ট গ্রুপটা তো তেমন বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুপ না। তাহলে তো মুসলিম লীগরে শেষ করে দিতে পারতাম। তখন মুসলিম লীগই বড় গ্রুপ। It is becoming bigger and bigger. এটা তখন লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের দিকে এগুচ্ছে। আর আমরা তখন ক্রমশই আমাদের অবস্থান হারিয়ে ফেলছি।

আপনাদের আদৌ কি কোন অবস্থান ছিলো? আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্যারকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি তেঁতে উঠে বললেন :

—একেবারে ওভাবে বোলো না। মনে করে দেখো সে সময়ের নৌ বিদ্রোহ, আশি দিনের ট্রাম ধর্মঘট এগুলোর কথা। যা দেখে both Congress and the British, they got frightened because of the evolving strength of a third force. অর্থাৎ কম্যুনিস্ট ফোর্স, ওয়াকার্স ফোর্স, পিসেন্ট ফোর্স। তারপরে ভাবো আমাদের তেভাগা আন্দোলনের কথা। জানো তোমরা মুসলিম লীগ কি পরিমাণে oppose করেছিলো? একটা বিষয় তোমাদের বুঝতে হবে যে তখন সর্বভারতীয় হিসাবে ধরলে কম্যুনিস্টরা একটা বড় শক্তি ছিলো। Communist flag was flown. নৌ বিদ্রোহের সময় জাহাজের মাস্তুলে নাবিকরা তিনটা পতাকা উড়িয়ে ছিলো—কংগ্রেস, মুসলিম লীগের পতাকার সাথে কম্যুনিস্ট পতাকাও সেখানে উড়েছিলো। এগুলো একটা symbolic ব্যাপার আর কি। একটা নতুন force develop করছিলো। যে ফোর্সটাকে গান্ধীজিও উঠতে দিতে চাচ্ছেন না। তবে গান্ধী প্রসঙ্গে আমি বলবো যে গান্ধীজির দুর্বলতা ছিলো। ঐ যে ধর্মের ব্যাপারটা। কিন্তু এখানে এটাও উল্লেখ করবো যে, তিনি ধর্মকে বিক্রি করেন নাই। বলতে পারো ধর্মই তার আদর্শ। এখন ধর্ম বিক্রি হচ্ছে, ব্যবসা করছে। But Gandhi didn't do that এমন নজীরও আছে যে কোরান পড়তে না দেয়ার প্রতিবাদে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন। যা হোক, তোমাদের আগ্রহের জায়গাটার সূত্র ধরে বলি—ঢাকায় আমাদের চেষ্টাটা ছিলো, এখানে যেন কোলকাতার মত communalism-টা develop না করে। এজন্য আমরা জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছি। ঢাকায় জ্ঞান চক্রবর্তী, ফনিগুহ, অনিল মুখার্জীসহ অনেকে কাজ করেছেন। ঢাকার বাইরেও অনেকে ছিলেন। যেমন বগুড়ায় ডাক্তার কাদের। আবার ওদিকে মনিকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন। বর্তমান কম্যুনিস্টদের দুর্বলতা কি জানো? এরা নিজেদের ঐতিহ্যটা সম্পর্কে সচেতন না। এরা যদি কোন চরিত্রাভিধান তৈরি করে থাকতো তাহলে যে কথা তুমি আমার কাছে জানতে চাইছো, আমি বলতে পারতাম যে কম্যুনিস্ট পার্টির চরিত্রাভিধানটা পড়ো।

কথা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এসে পড়ে। কেমন ছিলো তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অনেক ভালো ভালো শিক্ষক ছিলো। যেমন ধরো, প্রফেসর রাজ্জাক। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রফেসর রাজ্জাক became professor Razzaqe because of Rabi Guha, Sarder Fazlul Karim-এর মতো ছাত্রদের জন্য। আমাকে একবার হল ইলেকশানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। সেবারই প্রথম ইলেকট্রিক মাইক্রোফোন ব্যবহার করে আমরা সভা করি। একদিন ক্লাশ নেয়া অবস্থায় আমার বক্তৃতা তাঁর কানে ঢুকলে নিজের বক্তৃতা থামিয়ে ছাত্রদের আমার বক্তৃতা শুনতে বলেন। ভাবতে পারো, কি কাণ্ড! যাই হোক কম্যুনিস্ট হওয়ার কারণে আমি নির্বাচনে হেরে যাই। তবে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে গাল না দেয়ার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতাম। হেরে যাওয়ার পর আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমাদের প্যান্ডেলে বক্তৃতা দেয়ার জন্য ডেকেছিলাম। আমার সম্পর্কে বিরোধী দল বলতো যে, ওর সঙ্গে কোন argument এ যাওয়া যাবে না। মারবি যখন মারবি। শিক্ষকদের মধ্যে আরো ছিলেন মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। He was pro-communist. তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ organ পিপলস ওয়ার, জনযুদ্ধ এসব পত্রিকা পর্যন্ত বিক্রি করতেন। পরে এই পত্রিকার আলোকেই তিনি এবং নৃপেন চক্রবর্তীরা মিলে স্বাধীনতা পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুসলমান শিক্ষকদের মধ্যে কম্যুনিস্টদের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলো এমন আরেকটা নাম শহীদুল্লাহ সাহেব অর্থাৎ ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

তাহলে আপনি কম্যুনিস্ট হয়ে গেলেন? আগের প্রশ্নটা আবারো আমরা উত্থাপন করি।

—এটা তুমি কি বলতে চাও? আমি তো দেখি যে তখন আমার চারদিকে সবাই কম্যুনিস্ট। আমাদের পলিসি ছিলো কাউকে hostile না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো দখল করে নেয়া। যেমন ধরো, মুসলিম লীগের নেতা আবুল হাশিম-বন্ধু, মান্যবর। আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। তাঁকেও আমরা ডিল করেছি কম্যুনিস্টের জায়গা থেকে। পার্টি আমাদেরকে হুকুম করছে, তোমরা হাশিম সাহেবের কাছে কাছে থাকবা। যা সাহায্য লাগে করবা। এই রকম হুকুমই করা ছিলো। হুকুমের চোটে আবার ধরো দুই একজন নষ্টও হয়ে গেছে। যেমন ধরো শামসুদ্দীন। আবুল হাশিম সাহেবকে সামলানোর জন্য তাকেও পাঠানো হয়েছিলো। সে এমনি সামলায় যে নিজেই পাকিস্তানপন্থী হয়ে যায়। পরে পাকিস্তানেই চলে যায়। সেখানেই মারা যায়। কথা হলো যে সব প্রচেষ্টাই যে সফল হবে এমন কোন কথা নেই। শামসুদ্দীন নষ্ট হইছে কিন্তু তবু তো আমি আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি। তোমরা বাঁচিয়ে রাখছো বলে বেঁচে আছি। আমার নিজের কোন বাহাদুরী নাই। কিন্তু এই বেঁচে থাকাটা I am enjoing and you also should enjoy. আমার একমাত্র রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে, যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি না তো তোমাদেরকে জানতে হবে। আমার আফসোস হচ্ছে you do not know your noble heritage. মানুষ হিসাবে যে গৌরবজনক ঐতিহ্য তোমার আছে সেটা না জেনে তুমি মানুষ হতে পারবে না। এটাই আজকের দিনের পলিটিকসেরও সমস্যা। শেখ হাসিনা কি এসব জানে? Even her father; তিনিও এসব ব্যাপারে তেমন একটা কেয়ার করেন নাই। Pakistanism কি জিনিস, এটা কি মুজিব যথার্থই বুঝতে পারছিলেন? যেমন পেরেছিলো কম্যুনিস্টরা। বুঝতে পারে নাই বলেই মুজিব বাংলাদেশ তৈরি করেছে কিন্তু anti-Pakistanism তৈরি করতে পারে নাই। এটা একটু খেয়াল করতে হবে। এখানেই গৌরব উজ্জ্বল ঐতিহ্য বুঝতে পারার গুরুত্ব। Pakistanism-এর ধারণার বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টদের যে অবস্থান ছিলো সেটাই গুরুত্বের সাথে বোঝার ব্যাপার আছে। Anyway আমাদের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থানটাকে এভাবে বলতে পারি যে, তখন আমরা কম্যুনিস্টরা Nill ছিলাম না আবার Full-ও ছিলাম না। Full control-এ থাকতে পারলে তো ইতিহাস অন্যরকম হতো। আমরা দেশভাগও হতে দিতাম না। সেই সময়ে আমাদের ভূমিকা যে একেবারে কম ছিলো না এটা তোমাদের আত্যন্তিকভাবে জানতে হবে। এটা বই পড়ে হবে না। Not by reading books but by unearthing যত তুমি unearth করতে পারবা ততই ভালো। সোমেন চন্দকে জানতে চেষ্টা করো। কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো বারবার পড়ো। গ্রামশী পড়ো। পিপলকে বোঝার চেষ্টা করো বেশি বেশি আমেরিকা, বিলাত যাওয়া বন্ধ করো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম জেল জীবন

৩১ জানুয়ারি ২০০৩

দু'মাসেরও বেশি বিরতির পর আজ আবার আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা স্যারের সামনে বসেছি। শেষ আলাপের সূত্রটুকু মনে করিয়ে দেয়ার পর আমরা নির্দিষ্ট করে দেশভাগের সময়ে স্যারদের অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের অবস্থা কেমন ছিলো জানতে চাইলাম। স্যার কথা বলতে শুরু করেন।

—ঠিক আছে। তোমাকে আমি অনেকদিন মিস্ করেছিলাম। আমার কাছের লোক না থাকলে আমি বড় অসহায় বোধ করি। তোমাদের যেহেতু আগ্রহ আছে সেহেতু আমার স্মৃতি তোমাদেরকে একটু দেয়ার দরকার আছে। আমি পুরো দেশ নিয়ে নয়, এমনকি ঢাকা জেলা নিয়ে নয় বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা শহরে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা বলতে পারি। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব বড় রকমের না হলেও কম্যুনিস্ট কর্মীদের একটা ভালো অবস্থান ছিলো। তোমাদের সাথে আলাপের একটা সমস্যা হলো যে সে সময়টা তোমাদের পক্ষে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। কারণ হচ্ছে সময় তো একটা স্রোতস্বিনী নদীর মত। সময় তো প্রবাহিত হয়ে যায়। যে সময় অতীত হয়ে গেছে সে সময় বর্তমানের কাছে তুলে ধরা খুব ডিফিকাল্ট। আরেকটা ব্যাপার হলো সবকিছু তো আমার স্মৃতিতেও এখন আর নেই। কাজেই আমরা নির্দিষ্ট সময়ের উপর কিছু পাঠ করে, কিছু শুনে, ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে একটু জোড়াতালি দিয়ে সময়টা ধরার চেষ্টা করতে পারি মাত্র। তোমাদের প্রশ্নে ফিরে আসি। সে সময়ে আমরা কম্যুনিস্টরা অন্য একাধিক প্রবল আদর্শের সাথে একটা দ্বন্দ্বমান আদর্শ হিসাবে কাজ করেছি। সে সময়ে মূল আদর্শ হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ হবে। একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, হিন্দু এবং মুসলমানের ভিত্তিতে যারা ভাগ করছে তারা কিন্তু জাতিগত বিশ্বাসগত বা সাংস্কৃতিক মাইনরটির ব্যাপারটা হিসাবে ধরছে না। একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টির ভেতরেই এই চিন্তাটা ছিলো। আবার পাকিস্তান আন্দোলনকে কিভাবে দেখা হবে এ বিষয়ে কম্যুনিস্টদের একটা সমস্যা দাঁড়ায়। কেননা তত্ত্বগতভাবে পাকিস্তানবাদ স্বীকার না করলেও এর বাস্তব দিকটা অস্বীকার করা যাচ্ছিলো না। এর মধ্যে একটা element of

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

truth আছে। তা হলো question of national minorities হ্যাঁ ঠিক আছে, মুসলিম লীগ এটাকে ধর্মের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এই যে পাকিস্তানিজমের চিন্তাটা, এটা যেহেতু মূল স্রোত একে hostile করে কি হবে? এটা হলো এক ধরনের চিন্তার কাঠামো। এখন এই চিন্তার যে ভ্রান্তি তাকে তো জোর করে কথার মাধ্যমে শেষ করে ফেলা যাবে না। আমাকে তার কাছে যেতে হবে, তাকে ম্যানেজ করে ফেলতে হবে এ প্রসঙ্গে হাশিম সাহেবের প্রসঙ্গ চলে আসে। মনে রাখবে জাতীয়তাবাদী পরিবারগুলো অন্যতম একটি পরিবার থেকে হাশিম সাহেব এসেছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি নিজের আন্দোলনই মনে করেছেন। কিন্তু তাহলে পরেও বুঝতে হবে যে, খাজা নাজিমুদ্দীন বা অন্যান্য সামন্তবাদী নেতা পাকিস্তান আন্দোলনকে যেভাবে দেখাতে চান তিনি সেভাবে দেখাতে চান না। এখানে এইটাই বড় কথা যে, খাজা নাজিমুদ্দীন আর আবুল হাশিম সাহেব এক না। এমনকি সোহারাওয়ার্দীও এক না। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সে সময়ে আমাদের গ্রুপটা বেশ সক্রিয় ছিলো এবং এটা পরিচালিত হতো under the guidence of the communist organizations, communist party. আমরা বিভিন্নভাবে কাজ করতাম। যেমন ধরো, প্রগতি লেখক সংঘ ছিলো। এছাড়াও জনযুদ্ধ, স্বাধীনতা, পিপলস ওয়ারের মত প্রো-কম্যুনিস্ট পত্রিকাগুলোকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের মধ্যে পুশ সেল করতাম। তুমি এখন শুনলে আশ্চর্য হবে, বুঝবে যে আমাদের দৌড়টা কদ্দূর পর্যন্ত ছিলো। এই যে মরহুম মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী যিনি স্বাধীনতার পর ভিসি হয়েছিলেন, তিনি তখন টীচার নাকি সিনিয়র স্টুডেন্ট ছিলেন এখন মনে নাই, সেই মোজাফফর আহমদ চৌধুরীও আমাদের সাথে পত্রিকা বিক্রির স্কোয়াডে থাকতেন। এসব বলে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, দেশভাগের সময় কম্যুনিস্টরা একটা কারেন্ট ছিলো। হয়তো প্রধান কারেন্ট না। তবে মুসলিম লীগ এটা কাউন্ট করতো। প্রমাণ হিসাবে বলতে পারি, '৪৭ বা '৪৮ সালের দিকে দেশের পরিস্থিতি আলোচনার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশে আমি, মুনীর চৌধুরীসহ কয়েকজন যখন সদরঘাটে লেডিজ পার্কে একটা সভার আয়োজন করি। সে সভা আক্রমণের শিকার হয়। সুলতান যে পরবর্তীতে বিচারপতি হয়, শাহ আজিজ এদের যে গ্রুপটা ছিলো তারা আমাদের আক্রমণ করে এবং সভা পণ্ড করে দেয়। এগুলো প্রমাণ করে যে, কম্যুনিস্ট গ্রুপটাকে মুসলিম জঙ্গীরা পছন্দ করছে না। তারা এই গ্রুপটাকে কথা বলতে দিতে চায় না। আমাদের পজিশনটা ছিলো আক্রান্ত হওয়ার পজিশন। আক্রান্ত কে হয়? যে আক্রান্ত হওয়ার গুরুত্ব রাখে সে। আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস আরো আছে। পার্টিশানের পরপরই কমরেড মোজাফফর আহমদ'র রথখোলার National

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Book Agency আক্রমণ করে তছনছ করে ফেলা হয়। এগুলো কোনটাই কিন্তু কম্যুনিস্টদের দুর্বলতার পরিচয় নয় বরং সবলতার পরিচয়। ঐ রকম কাছাকাছি সময়েই সলিমুল্লাহ হলে মুনীর চৌধুরীর কক্ষ আক্রমণ করা হয়।

আলাপের এ পর্যায়ে এসে ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯'র মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সম্পর্কে জানতে চাই। এরকমভাবে সময় বিভাজনের কারণ হলো ১৯৪৯ সাল থেকে সরদার ফজলুল করিমের জেলজীবন শুরু হয়। এবং স্যারের জেলজীবন সম্পর্কে ব্যাপক কৌতূহলের কারণে বিষয়টা সম্পর্কে আলাদাভাবে আলাপের মনস্থ করি। সেজন্যই এর আগের বিষয়াবলী স্পষ্ট হওয়াটা একটু প্রয়োজনীয় বলে মনে হলো।

—এখন ধরো আমি '৪৬ সালে এমএ পাশ করলাম। তারপর কিছুদিন ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে টীচার হিসাবে জড়িত ছিলাম। আরেকটা বিষয় মনে রাখো যে, এসময় আমার কম্যুনিস্ট এসোশিয়েসনটা ক্রমান্বয়ে গভীর হচ্ছিলো। একটা সময়ে এসে under the order of the party আমি টীচারশীপ থেকে রিজাইন করি। সে সময়ে একটা crisis period চলছিলো। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে হিন্দু কমরেডরা চলে যাচ্ছিলেন। তখন আমি সহ আরো কয়েকজন পুলিশ এবং ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কাছে বেশি লক্ষযোগ্য হয়ে পড়ি। এসব আমি বলছি '৪৮ সালের শেষ দিককার কথা। তুমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিং থেকে পুরোনো ফাইল ঘেঁটে বের করতে পারো, অবশ্য যদি এখনো সংরক্ষিত থাকে, তাহলে দেখবা যে আমার নামেও একটা ফাইল আছে। সেখানে দেখবা যে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে এই মর্মে চিঠি দেয়া হয়েছে যে, explain-why Sarder Fazlul Karim has resigned and where is his where abouts? তার আস্তানা কোথায়-এসব আর কি? আমার ব্যাপারটা ছিলো এরকম যে, আমার কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলো না, resign দিলে কি হবে এসব ভাবনায় আসে নি। কোন পারিবারিক দায়িত্বও ছিলো না। ফ্যামিলি যখন খবরটা শুনলো একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো—কি ব্যাপার? এর আগে কমনওয়েলথ বৃত্তির অধীনে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ বাদ দেয়ার ব্যাপারটা ছিলো।

আর পার্টি? প্রশ্ন রাখি।

—রিজাইন করার পর পার্টি আমাকে আন্ডার গ্রাউন্ডে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ঢাকায় সে সময় গোপন আশ্রয় লাভের জায়গাগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। এমন অবস্থায় পার্টি আমাকে ঢাকা জেলার চালাকচর বলে একটা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানে আন্দামান ফেরত অন্নদা পাল, প্রাইমারী শিক্ষক ও পার্টি সদস্য আখতারুজ্জামান সহ শরীফপুর, পীরপুর অঞ্চলের কয়েকজন পান চাষী আমাকে আশ্রয় দেন। বেশ কয় মাস পরে একটা গোপন মিটিংয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগদানের জন্য ঢাকায় ডেকে পাঠানো হয়। সন্তোষ গুপ্তের বাড়িতে মিটিং করার সময় আমরা গ্রেপ্তার হই। তারিখটা খুব সম্ভব ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯।

এবারে আমরা সরদার ফজলুল করিমের প্রথম জেল জীবনের কাহিনী শোনার প্রস্তুতি নেই। জেলখানার জীবন, সহযোদ্ধাদের সাথে স্মৃতিগুলো, বিশেষ কোন ঘটনা, সে সময়ের চিন্তাভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে বলার জন্য আমরা স্যারকে অনুরোধ করি।

—ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যেভাবে বললে অর্থাৎ আপনার জেলজীবন সম্পর্কে কিছু বলেন তাতে করে মনে হয় যে আমি একটা ব্যক্তি, এই ব্যক্তি জেলে গেলাম এবং এই জেলটা আমার এবং এই জেলে ঘটে যাওয়া সব কিছুই আমি কেন্দ্রিক। তা কিন্তু না। তোমরা যারা নতুন প্রজন্ম তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে এই জেলের ব্যাপারটা সামগ্রিকতার মধ্যে ধরে বিচার না করলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা যাই বলো না কেন, এসব ব্যাপারগুলো স্পষ্ট হবে না। সে সময় আমি, সন্তোষ এরাই যে শুধু এ্যারেস্ট হলাম তা নয়। তখন একজন দু'জন নয় hundreds of communists were arrested and put into jail. দেশের সব জেলে। কে কোন জেলে ছিলো তা খুঁজে বের করো। তোমাদেরই তো রাষ্ট্র, জেলখানা। কর্তৃপক্ষের কাছে যাও তাদের পুরোনো ফাইলপত্র দেখাতে বলো। এটা করতে না পারলে একটা পুরো চিত্র তুমি পাবে না। আমার কিছু কথাই শুধু জানতে পারবে। যা হোক, আমাদের যখন ঢাকা জেলে ঢোকানো হয় সেখানে তখন allready একশ কি দুইশ কম্যুনিস্ট বন্দী আগে থেকেই আছেন। এবং বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে জেলের ভেতরে হাঙ্গার স্ট্রাইক চলছে। হাঙ্গার স্ট্রাইক ছাড়া তখন আর কোন উপায় ছিলো না। রাজবন্দীদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশ আমল থেকে চালু ছিলো পাকিস্তানী এ্যাডমিনিস্ট্রেশান সেগুলো সব কেটে দিলো। আর জেলের ভেতরে সাধারণ কয়েদীদের লেলিয়ে দিলো এই বলে যে, এই যে সব কম্যুনিস্টগুলো-এরা সব পাকিস্তানের শত্রু, এদের যেভাবে পারো শেষ করো। সে যাই হোক, এখন সুযোগ-সুবিধা কেটে দিলো বললে তো সব কিছু বোঝায় না। জেলখানায় না গেলে তো তুমি বুঝবা না কেটে দেয়ার মানেটা কি? আমাদের নতুন প্রজন্মের অসুবিধা হলো, এরা জেল শব্দটাই শুনেছে জেলের ভেতরে তো ঢোকে নাই। আর এখন যারা ঢোকে তারা কিভাবে ঢোকে, কেন ঢোকে সেগুলো আলাদা রিসার্চের ব্যাপার আর কি। যা হোক যা বলছিলাম, ঐ হাঙ্গার স্ট্রাইকটা যতদূর মনে পড়ে আটান্ন দিন চলে। এটা তো খেলার কথা না। আমার মত দুর্বল মানুষও এতে যোগ দিয়েছিলাম। আমরা শুধু লবণ মেশানো পানি খেতাম। ওরা খাবার দিয়ে যেতো আমরা খেতাম না। ছয়দিনের মাথায় আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কারা কর্তৃপক্ষ এ পর্যায়ে force

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

feeding শুরু করে। অর্থাৎ জোর করে খাওয়ানো। তারা অনশনরত কয়েদীদের জোর করে ধরে শুইয়ে ফেলে নাকের ভেতরে রবারের নল ঢুকিয়ে তরল দুধ খাওয়াতো। এরকম অত্যাচারে কুষ্টিয়ার কটন মিলের একজন নেতা শিবেন রায় শ্বাসনালীতে তরল ঢুকে মারা যায়। আটান্ন দিনের মাথায় সরকারের তরফ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর অঙ্গীকার করা হয়। তখন ঢাকা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ফনি গুহের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা শেষে কম্যুনিস্টরা অনশন ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা আর বেশি দিন চললে সেটা হতো আত্মহত্যার শামিল। কিন্তু আমরা আত্মহত্যার জন্য সেখানে যাই নাই। দুঃখের ব্যাপার কি জানো—এখনকার কম্যুনিস্টরা ফনি গুহের নাম জানেও না বলেও না।

আপনি আমরা বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন? শুধু কম্যুনিস্টদের?

—মেজর অংশ তো কম্যুনিস্টরাই ছিলো। শতাধিক। এর বাইরে ধরো, কংগ্রেসের প্রগতিশীলদের একটা অংশ কম্যুনিস্টদের সাথে ছিলো। তারা কে কে ছিলেন কতজন ছিলেন এসব আমি বলতে পারবো না। ৫০'র গোড়ার দিকে কর্তৃপক্ষ করলো কি যারা অনশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে একসাথে রাখা বিপজ্জনক মনে করে বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দিতে শুরু করলো। আমাকে পাঠানো হলো সিলেট জেলে। জেলের ভেতরে থেকেই খাপড়া ওয়ার্ডের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনি। সিলেট জেলেও অনশন হয়েছিলো। সেটা বোধ হয় আমি যাবার আগে। সেখানে বন্দীদের উপর নিদারুণ নির্যাতন হয়েছে। সিলেট জেলে অজয় ভট্টাচার্য ছিলেন। 'নানকার বিদ্রোহ' নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। তিনি অবশ্য পরবর্তীতে কোন কম্যুনিস্ট গ্রুপের সাথে থাকেননি। কিন্তু আজীবন কম্যুনিস্ট ছিলেন। '৫০ সালের শেষের দিকে আমাকে রাজশাহী জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম। রাজশাহী জেল থেকেই ভাষা আন্দোলনের খবর জানতে পারি। কিভাবে আমাদের জন্য বরাদ্দ সংবাদপত্রের সেন্সরশীপের মাত্রা ক্রমশই বাড়তে থাকার সাথে ভাষা আন্দোলনের সফলতার যোগসূত্র আবিষ্কার করি সে কাহিনী বোধ হয় তুমি জানো। এ বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ে লিখেছি।

—'৫৩ সালে আমাকে পাঠানো হয় কুমিল্লা জেলে। কতদিন ছিলাম মনে নেই।

'৫৪ সালের বিভিন্ন জেলে যাদের সাথে ছিলেন তাদের নামগুলো শুনতে চাইলাম। কিন্তু স্যার রাজী হন নি। কেননা এসব মহৎ নামগুলো খুঁজে বের করাটা আমাদের দায়িত্ব হিসাবে উল্লেখ করলেন। নাম শোনার আশা বাদ দিয়ে আমরা প্রাদেশিক নির্বাচন সম্পর্কে জানতে চাই। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের সময়ও তিনি কুমিল্লা জেলে। বেশ কয়েক মাস পর, সেপ্টেম্বর মাসে পঁচিশ তারিখে কথায় কথায় কিছু নাম জেনে নিই যারা স্যারের সাথে বিভিন্ন জেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। যাঁদের নাম তিনি মনে করতে পেরেছেন তাঁরা হলেন ঃ সিলেট জেল-শফিউদ্দীন, গোপেশ মালাকার, বিজয় পুরকায়স্থ, সত্যব্রত দাশ, অজয় ভট্টাচার্য, লালা শ দিন্দু দে, বরুন রায়। রাজশাহী জেল—বগুড়ার নেতা আবু (মাজহারুল ইসলাম), প্রিয়ব্রত দাশ। কুমিল্লা জেল—অজয় ভট্টাচার্য, সত্যেন সেন।

ঐ নির্বাচনে তো আপনি জয়লাভ করেছিলেন। সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

—কি বলবো? তোমরা শুধু এটুকুই জানো যে ঐ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ হেরে ছিলো আর যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেছিলো। কিন্তু ঐ যুক্তফ্রন্ট কাদের প্রচেষ্টার ফসল? সাধারণভাবে মনে হবে আওয়ামী লীগের কিন্তু আওয়ামী লীগের ভেতরে থেকে কারা কাজটা করেছিলো? এ কাজটা করেছিলো আওয়ামী লীগের ভেতরে থাকা কম্যুনিস্টরা। তখনকার ইস্ট পাকিস্তান এ্যাসেম্বলিতে ত্রিশ জনেরও বেশি কম্যুনিস্ট ছিলেন। এরাই প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের জন্যে যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারটা সংগঠিত করে। নির্বাচনের পরে '৫৫ সালে আমি মুক্তি পাই। সেটাই স্বাভাবিক ছিলো। কেননা রাজবন্দীদের মুক্তিদান যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদা ছিলো।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটির শুরুর দিক থেকেই আপনাকে জেলে থাকতে হচ্ছে। এবং পরবর্তী কয়েক বছরে সংগঠিত অনেকগুলো বড় বড় রাজনৈতিক ইভেন্টে আপনি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কিন্তু যেটুকু শুনেছি তা হলো জেলখানার ভেতরেও আপনাদের রাজনীতি চর্চা থেমে থাকেনি। জেলখানার ভেতরে রাজনীতি চর্চা, পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্তৃপক্ষের ব্যবহার এসব নিয়ে কিছু বলুন।

—এক কথায় তো এসব বলা যাবে না। এটুকু বলা যায় যে জেলের ভেতরেও কম্যুনিস্টরা একটা organized life lead করার চেষ্টা করছে। সবাইকে তো এক জায়গায় রাখা হতো না। ধরো কিছু বন্দীকে রাখা হতো ওয়ার্ডে আবার যাদেরকে বিপজ্জনক মনে করতো তাদেরকে রাখতো সেলে। তথাপি যেখানে যে কয়জন থাকতো তারা অর্গানাইজড থাকার চেষ্টা করতো। জেলের ভেতরেই তারা নানা রকমের কমিটি তৈরি করতো। এমনকি প্রশাসনের সাথে দেনদরবার করার জন্য কমিটি গঠনেরও নজীর আছে। এই ব্যাপারটাকে সাধারণত একটা টেকনিক্যাল টার্ম ব্যবহারের মাধ্যমে বোঝানো হতো। টার্মটা হচ্ছে Communist cosolidation. কম্যুনিস্ট বন্দীরা এসেছিলো সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে। কেউ কৃষক শ্রেণী থেকে, কেউ তেভাগা আন্দোলনের কর্মী, কেউ হাইস্কুলের ছাত্র, শ্রমিক শ্রেণী থেকেও কেউ কেউ এসেছে। অর্থাৎ একটা মিক্সড আপ। সবাই তো আর এ রকম না। জেলের ভেতরে আমাদের লক্ষ্য ছিলো সবার মনোবলটা ঠিক রাখা। এলক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কিছু করতাম। যেমন কাঁটা-ছেড়া করা সংবাদপত্র যা আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেতাম সেটা থেকে লেখা তৈরির জন্য কোন একজন কমরেডকে দায়িত্ব দেয়া হতো। এটা আবার নির্দিষ্ট দিনে সবার সামনে উপস্থাপন করা হতো। এছাড়াও সেন্সার হওয়া সংবাদপত্র খুঁজে যেটুকু খবর পেতাম তা থেকেই সবাই বুঝ পাওয়ার চেষ্টা করতাম যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সে আভাষ দেখা যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটছে। এসব আমরা করতাম। তারপর আবার মাঝে-মধ্যে সবাই একটু ভালো খাওয়া দাওয়ার চেষ্টা করেছি। খেলাধুলা করেছি। অর্থাৎ এসবই আমরা করতাম কম্যুনিস্টদের মনোবল অটুট রাখার জন্য।

স্যার জেলখানার ভেতরে তো আপনারা তথ্য ঘাটতিতে থাকতেন। তাহলে এই যে একটু আগে বললেন মনোবল অটুট রাখার জন্য আপনারা অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে বলে একে অপরকে ধারণা দিতেন, এটা কিসের ভিত্তিতে করতেন?

—দুইভাবে। কাঁটা-ছেড়া যাই হোক কিছু সংবাদপত্র আমরা পেতাম। আর আমাদের চেষ্টা থাকতো এমন একটা সিমপ্যাথেটিক সেপাই জোগাড় করা যে আমাদের একটা স্লিপ বাইরে নিয়ে যাবে। জায়গামত পৌঁছে দেবে এবং কিছু খবরাখবর নিয়ে আসবে। এই পদ্ধতিতে পার্টি আমাদের কাছে অনেক গোপন তথ্য, ডকুমেন্ট, নির্দেশ পাঠিয়েছে। সেগুলো আবার হাতে নকল করে জেলখানার ভেতরে বিভিন্ন অংশে বন্দীদের দেয়া হতো। এগুলো নিয়ে আলোচনা হতো। যত সহজ মনে করছো অত সহজ বিষয় এগুলো ছিলো না। ভীষণ ডেঞ্জারাস আর কি। নির্যাতনের ভয় ছিলো। কোন সেপাই ধরা পড়লে চাকরি চলে যেতো। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করবো। আমরা কিন্তু জেলে সিমপ্যাথেটিক লোক ঠিকই পেয়ে যেতাম। সেপাইরা আমাদের ভালোবাসতো। কম্যুনিস্টদের মত লোক তো সমাজে কম যে কিনা একজন সেপাইকেও কাছে টেনে মমতা ভরে তার বাড়ি ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করতে পারে।

জেলখানায় থাকাকালীন সময়ে আপনার পরিবারের সাথে কি যোগাযোগ ছিলো? তারা ব্যাপারটাকে কিভাবে নিয়েছিলেন?

—আমার বড় ভাই সরকারি চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে জেলে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। সঙ্গতভাবেই তিনি রাগ করেছিলেন। খুব রাগ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি এসব কি আরম্ভ করেছ? কার জন্য করছ? এই সব আর কি। কারা কর্তৃপক্ষ ভাইকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আমাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বণ্ড দিয়ে বের করে নেয়ার জন্য। যাই হোক সেগুলো হয়নি। আমি আছি। আছি আর কি। বড় ভাই রাগ করে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন আরো একটা ভালো ছেলেও এরকম নষ্ট হয়ে গেছে—সে হলো আবদুস শহীদ। এই শহীদকে তোমরা চেনো না। কেউ হয়তো পরে কখনো তাকে রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বই বেঁচতে দেখেছে। কিন্তু তার আসল কাহিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়জন জানে? শহীদ একটা রিলিজিয়াস ফ্যামিলির ছেলে। সে হলো শর্ষিণার পীরের পরিবারের লোক। অথচ এই শহীদ কম্যুনিস্ট লাইনে আসে। খাপড়া ওয়ার্ডের ঘটনার সময় শহীদ সেখানে ছিলো। পরে জেল থেকে বেরিয়ে সে আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। আমি জেলে থাকার সময়ে বড় ভাই ছাড়া বাবা-মা কারু সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ হয়নি। তাঁরা গ্রামে থাকতেন। বড় ভাই মাঝে-মধ্যেই রাগ করে চিঠি-টিঠি লিখতেন এই বলে যে, তোমার জন্য কি আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে নাকি?

এবারে আপনার নিজের অনুভূতির কথা কিছু বলুন। কম সময় তো নয়। প্রথমবারেই আপনি প্রায় অর্ধযুগ জেলখানায়।

—কি রকম আর মনে হবে। তোমাদের ভাষা ধার করে বলতে পারি যে, আমি তখন একটু ভাবুক টাইপের ছিলাম। এরকম না হলে তো জেলখানায় নিজেকে ম্যানেজ করাটা সমস্যা হতো, বুঝতেই পার।

জেলজীবন সংক্রান্ত আলোচনার রেশ আমরা আরেকটু ধরে রাখতে চাইলাম। এ কারণেই জেলখানায় থাকাকালীন স্যারের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা আবারো জানতে চাইলাম।

—তেমন আর কি বলবো। একটা ব্যাপার ধরো যে, আমি খুব বেশি কান্নাকাটি করি নাই। যদিও কান্নাকাটি করাটাই স্বাভাবিক। একটা লোক জেলে আসছে, তার কারণে একটা পরিবার ডুবতে বসছে—এসব যে কি মর্মান্তিক ব্যাপার তা তোমরা বুঝতে পারবা না। আমার ব্যাপার হলো এই যে আমি তো পরিবারের কোন কাজে আসি নি। পরিবারের কথা ভাবি নি। স্বাভাবিক যে পরিবার আমার উপরে প্রীত ছিলো না। কিন্তু জেলখানায় আমি এত প্রীতি এত ভালবাসা পেয়েছি যা বলবার মত নয়। এগুলো আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ। জেলখানার ভেতরে আমার চমৎকার একটা জগৎ ছিলো। জেলের ভেতরে বন্ধুরা ভালোবেসে আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালনের চেষ্টা করেছি। সাধারণ ঘর থেকে আসা কম্যুনিস্ট বন্দীদের মনোবল টিকিয়ে রাখার জন্য জেলখানায় আমরা কি করতাম সে সবের কিছু বর্ণনা আমি গত দিন তোমাকে দিয়েছি। একবার আমার উপর এক হাজার পৃষ্ঠার এক বই কমরেডদের পড়ে শোনানোর দায়িত্ব পড়লো। যদ্দূর মনে পড়ছে বইটার নাম ছিলো Diplomat আর লেখক জেমস অ্যালড্রিজ। কুর্দীদের একটা দল স্ট্যালিনের সাথে দেখা করবে এবং কুর্দীদের সাহায্য করার ব্যাপারে তাকে রাজী করাবে—এই হচ্ছে কাহিনীটা। সে এক অসাধারণ ব্যাপার। প্রতিদিন দুপুরে কমরেডরা আমাকে ডেকে নিতো এই বলে, এই বাহে আপনি ঘুমান ক্যানে? আপনি আমাদের পড়ে শুনাবেন না? তোমাকে এসব কথা বলতেও আমার ভীষণ আবেগ এসে যাচ্ছে। আমি সেই বই খানিকটা ইংরেজিতে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে অংশটাই আবার অনুবাদ করে শোনাতাম। এসব কাজ পরবর্তীতে অনেক ফল দিয়েছিলো। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর এই লোকগুলো কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলা, যুক্তফ্রন্ট গঠন করা এসব ব্যাপারে দারুণ ভূমিকা রেখেছিলো। এই যে নেজামী ইসলামী, ভাসানী, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী এরা একসাথে এসেছিলো—এই কৃতিত্ব কার? আমি বলছি। এই কৃতিত্ব কম্যুনিস্টদের। তোমরা তো এসব কিছুই জানো না। গতদিনও আমি বোধ হয় এ বিষয়ে কিছুটা বলেছি।

জেলখানায় বসে কি আপনার কখনো দোদুল্যমানতা এসেছিলো? কখনো কি মনে হয়েছিলো যে এটা কি করলাম! এত ব্রাইট রেজাল্ট, ক্যারিয়ার এইসব—

-Repentance for the loss of career বলতে যা বোঝায় এটা আমার কখনো আসে নি। আমার অমুক ছিলো তমুক ছিলো অমুক হইতে পারতাম এই রকম ভাবনা আমার আসে নাই। আমার একটা লেখায়ও বলেছি যে আমি হলাম most non-ambitious person. ছোটবেলায় বড় ভাই একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, বড় হয়ে তুই কি হবি? আমি কুলী হতে চেয়েছিলাম। আমার স্মৃতিতে ছিলো বরিশাল লঞ্চঘাট। সেখানে কুলীরা কি সুন্দর কাজ করছে। অন্যের মাল তুলছে। এসব তখন আমার কাছে সাংঘাতিক আকর্ষণীয় ব্যাপার। পরবর্তীতেও আমার কোন ambition develop করেনি। চাকরি করা, ফরেন যাওয়া, মাস্টারী করা কোনটা নিয়েই তেমন কোন ambition কাজ করেনি। মাস্টারী তো পেয়েছিলাম। তা আবার ছেড়েও দিয়েছিলাম। এভাবে তোমাকে বুঝতে হবে যে, এটা হয়। সব লোক তো এক রকম না। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আবারো বলছি, জেলখানায় বসে কখনো আমার মনে হয়নি যে একটা ভুল করলাম। আমি নিজের সম্পর্কে বলি যে, আমার জীবনে ভুল বলে কোন কথা নাই। আমার জীবনে লোকসান বলে কিছু নাই। যে কাজ করতে আমি বাধ্য ছিলাম তাকে আমি ভুল বলি কেমন করে? অনুশোচনা, আফশোস, লজ্জা এগুলো আমার আসে নি। কেন আসে নি বলতে পারবো না। তবে একটা ব্যাপার, আমার এই সব কর্মকাণ্ডের জন্য আমার পরিবার রাগ করেছে বটে কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ করেনি। আমার উপর থেকে ভালোবাসা withdraw করেনি। এটা একটা পারিবারিক দান। তারা আমাকে ভালোবেসেছে। আমি তাদেরকে তা ফিরিয়ে দিতে পারি নি। কিন্তু তাদের ভালোবাসা দিয়ে আমি অপরের ভালোবাসা জয় করার চেষ্টা করেছি। তো আমি হলাম এই রকম। আমি কি করতে পারি! One cannot be other than what he is.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেটো এবং মার্কসে দ্বন্দ্ব নেই

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

গত আলোচনাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলার চেষ্টা করেছিলাম। আজ আলোচনার শুরুতেই স্যারকে সে কথা মনে করিয়ে দিলাম। এবং প্রশ্ন উত্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। কিন্তু এই সময়ের ধারাবাহিকতার প্রসঙ্গটাই স্যার টেনে নিলেন। আনুষ্ঠানিক কোন প্রশ্ন উত্থাপনের আগেই স্যার কথা বলতে শুরু করলেন।

—এই যে তোমরা আমাকে রিসিভ করো আমাকে খাওয়াও, এসব দেখে প্রত্যেকদিন ফিরে যাওয়ার সময় নিজেকে বলি আমারই বরং খাওয়ানো দরকার। যাই হোক। এই যে তোমরা আমাকে পাঁচটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো—আপনি কবে কি করলেন, কেন করলেন এসবই হচ্ছে historical details. every man is history. অথচ আমরা প্রায় সময়ই এ সত্যটা মিস্ করি। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন একজন বড় ব্যক্তিই আমাদের কাছে ইতিহাস হয়ে ওঠে। এরকম হওয়াটা উচিৎ নয়। এজন্যই দেখা যাচ্ছে যে, আমরা আমাদের ইতিহাসকে রক্ষা করতে জানি না। এবং সেজন্যই আমরা আমাদের প্রো-পিপল ইতিহাস লিখতে পারি না।

এ প্রসঙ্গে স্যার অ্যালেক্স হ্যালির 'দ্য রুটস' এর কথা উল্লেখ করলেন। ইতিহাস কিভাবে খুঁড়ে বের করতে হয় তার একটা অনন্য নজীর হিসাবে রুটস উপন্যাসের কথা বললেন। উপন্যাসটি নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছার কথা জানালেন। আমাদের দেশে ইতিহাস চর্চার সংকট প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই জানালেন যে, মূলে না যাওয়ার প্রবণতাই হলো প্রধান সমস্যা। মূলে প্রবেশ না করে ইতিহাস এবং চলমানতাকে ব্যাখ্যা করার ফলে বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। এর ফলে কোন ঘটনার উপরিতলটুকুই শুধু ব্যাখ্যা হয়। যার দরুণ অনেক বড় বড় ঘটনা বা বাস্তবতা থেকেও আমরা অনুপ্রেরণা লাভে ব্যর্থ হই। স্যার দীর্ঘক্ষণ ধরে এই ব্যাপারগুলোই আমাদের মাথায় ঢোকাতে চাচ্ছেন বলে মনে হলো। অনুপ্রেরণাহীনতার ফলে কি হয় সে ব্যাপারেও কিছু মন্তব্য করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এর ফলে হয় কি, তোমাদের মত পোলাপানদের মুখে কেবল একটা কথাই শুনি। তোমরা খালি বলতে থাক, স্যার কি খারাপ অবস্থা। সংকট, সংকট, এইসব। আমাদের মত বুড়া দু'একজন যা আছে তাদের কাছে তোমরা এ সবের একটা রেডিমেড জবাব চাও। কিন্তু এসবের তো কোন রেডিমেড জবাব নাই। সেজন্যই তোমাদের জিজ্ঞেস করি, এত সংকট ভাবনা মাথায় নিয়ে তোমরা মানসিকভাবে কতদিন বাঁচো?

আমরা বলি, তরুণ প্রজন্মের সংকট-ম্যানিয়া নিয়ে আপনি যাই বলুন না কেন, আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চলমান সংকটকে আপনিও স্বীকার করে নিচ্ছেন। আমরা তো সংকটকে সংকটই বলছি। সংকটকে সম্ভাবনা বলতে যাবো কেন?

—এটা তো ঠিকই যে সংকট বাদে জীবন হয় না। কিন্তু আসল বিষয় হলো আমি কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংকটকে দেখি। এটাই তোমার সাথে আমার পার্থক্য। ক্রাইসিস, প্রবলেম এসব সম্পর্কে আমার সাথে তোমার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। তুমি একভাবে দেখ আমি আরেকভাবে দেখি। আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, আদর্শের রাজনীতি কি শেষ হয়ে গেলো? আরে এরকম হতাশ প্রশ্নের মানে কি? হতাশার নিবাস কোথায়? কোথায় হতাশা! হতাশা যদি কোথাও থাকে সেটা তোমার মনের মধ্যে। তুমি তো ভয় পাচ্ছো। যেমন ধরো বুশকে, এই ধ্বংসকারীকে ভয় পাচ্ছো। যারা জীবনের ধ্বংসকারী যারা আদর্শহীন তাদেরকে ভয় পাচ্ছো। এই ভয় থেকেই তোমার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে হতাশা। আমি মানবতার দর্শনে বিশ্বাস করি। সেজন্য আমার ভয় নাই হতাশা নাই।

আপনার সাথে আলোচনার একটা সমস্যা হলো আপনি পুরো জিনিসটা দার্শনিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন।

—তাই তো। দার্শনিকতাই আসল। কিন্তু তোমরা তো সেদিকে যাবা না। তোমার কথার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে আপনি ঐ দিকে যাইয়েন না। আপনি বাস্তবে থাকেন।

আমরা সাধারণ মানুষরা বাস্তবে থাকতে চাইবো এটাই তো স্বাভাবিক। একটা দার্শনিক স্তরে পৌঁছে তারপর সংকট বোঝার ক্ষমতা সবার নাও থাকতে পারে। আপনি আমাদের বলেন, এ মুহূর্তের সংকটগুলো কি? এগুলো চিহ্নিত করাটাকে কি আপনি জরুরি মনে করেন না?

—সাধারণ মানুষ আমরা, এসব শব্দ ব্যবহার আপাতত বাদ দেও। তুমি সংকট বলতে কি বোঝা তাই আমারে বোঝাও। তোমার সংকটটা কি? তুমি বইপত্র পড়া লোক। তোমার কাছেও ছাত্র-ছাত্রীরা আসে। তুমি নিশ্চয় তাদেরকে কিছু না কিছু বোঝাও। কিন্তু তুমি আমাকে বোঝাও, তোমার লাইফ-ফোর্সটা কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ব্যাপারে কখনো গভীরভাবে ভাবা হয়নি বলতেই স্যার রেগে গেলেন। আমরা যে দুই-আড়াই বছরের শিশু না একথাও মনে করিয়ে দিলেন। তাঁর মত হলো, সংকট আদিতে ছিলো, এখন আছে, অন্তেও থাকবে। এবং এ ব্যাপারেও একমত হলেন যে, সংকটগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। স্যার মনে করেন, আমাদের প্রধান সংকট হচ্ছে জীবন বোধের সংকট, সাংস্কৃতিক সংকট। অথচ এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হলো আমরা ভয় পাচ্ছি। ভয়ের চোটে মনে করছি যে আমাদের কোন সংস্কৃতি নাই। ছুটাছুটি করছি এখানে সেখানে।

আমরা জিজ্ঞেস করি, ধরুন বর্তমান দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে যদি ভাবি তাহলে আমেরিকানিজমকে কি আপনি সংকট মনে করেন?

—এই যে আমেরিকানিজমকে সংকট বলছো এটাও বলছো ভয়ের চোখে। তোমরা যদি ভয় না পেয়ে আমেরিকানিজমকে একটা মেকানিজম হিসাবে বিবেচনা করতে শিখতে, তাহলে ভালো হতো। আমেরিকানিজম জিনিসটা আসলে কি? এটা তো মানবিকতার সংকট। এই সংকট চলবে। কিন্তু তাই বলে মানুষকে কি মেরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে? আরে সামান্য পিঁপড়ার কথা ভাবো। এত মেরেও কি এদের তুমি নিশ্চিহ্ন করতে পারছ?

এতো আপনি বলছেন একটা প্রজাতির বিনাশের কথা। কিন্তু একজন মানুষ বা একটি পিঁপড়ার মৃত্যুকেই বা তুচ্ছ ব্যাপার মনে করবেন কেন? আর এভাবে দেখতে থাকলে তো পুরো ব্যাপারটাই বিমূর্ত হয়ে যায়।

—এটা তুচ্ছ মনে করা না করার ব্যাপার না। ধরো আমার বাবা একজন ব্যক্তি। তিনি আজকে নাই। মারা গেছেন। কিন্তু তার জন্য আমি দুঃখ পাই না। আমি ব্যক্তি মানুষকে মনুষ্য প্রজাতির অংশমাত্র মনে করি। আমার বাপ ও দুঃখ পায় নাই। সে তার পোলারে জ্যাতা রাইখা গেছে। পোলার জন্য তালগাছ লাগাইয়া দিয়া গেছে। তোমাকে তো স্বীকার করতে হবে যে জীবনের জন্ম হয় মৃত্যুর জন্য। ব্যক্তির কথা ভুলে যাও। তুমি মাথায় রাখবে প্রজাতির কথা। এভাবে যদি দেখতে পারো তখন আসবে জীবন বনাম মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব হলো প্রজাতির জীবন এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে জীবনই জয়ী হয়। আর এই যে বললে বিমূর্ত হয়ে যায়—এর মানে কি! মূর্ত থেকেই বিমূর্ত তৈরি হয়। পাঁচটা মূর্ত মানুষ দেখার পরই একটা সাধারণীকরণ করা যায়। বলা যায় যে আসলে মানুষ হচ্ছে এরকম।

কথা হচ্ছে যে, আপনার মত বুদ্ধিবৃত্তির উঁচু স্তরে যারা অবস্থান করে তাদের সাথে সাধারণ মানুষের ভাবনার পার্থক্যটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। যেমন এই মুহূর্তে আমাদের ভাবনার সাথে আপনার ভাবনার মিল খুঁজে পাচ্ছি না—মন্তব্য করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এখন তুমি যদি নিজে একটা গ্যাপ তৈরি করো কিংবা গ্যাপ থাকলে সেটা অতিক্রম করতে না চাও তাহলে বলার কিছু নাই। তোমাকে শুধু একথাই বলতে পারি যে, জীবনটাকে আশার দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা কর। এই যে এখন তোমরা আমেরিকার কার্যকলাপে হতাশ হয়ে পড়ে যাচ্ছো এর তো কোন অর্থ নেই। আমেরিকা তো অখণ্ড কোন বিষয় নয়। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব মার্কিন সৈন্যদের সাথে ঢাকা শহরে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিলো তারাও তো আমেরিকা। এখন যে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে ইরাক আগ্রাসনের নিন্দা জানাচ্ছে এটাও তো আমেরিকা। সেজন্যই বলছিলাম যে, জীবনটাকে একটা আশার দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করো। কেন হতাশা হতাশা বলে চিৎকার করবে? তোমাদের এখন পশুশক্তি আমেরিকাকে হত্যা করবো বলে শ্লোগান দেয়ার কথা। তা না করে তোমরা মৃদু ভাষায় অমুক অমুক কিসব বলে পাশ কাটাচ্ছো। তুমি মানসিকভাবেই আমেরিকাকে তোমার চাইতে বড় মনে করছো। যদি আমেরিকাকে নেগেটিভ ফোর্স মনে কর আর নিজেদের পজেটিভ ফোর্স মনে কর তাহলে নেগেটিভ ফোর্সকে কেন পজেটিভ ফোর্সের চেয়ে বড় ভাবছো! নেগেটিভকে নেগেটিভভাবেই দেখো। এই দু'য়ের দ্বন্দ্ব চিরকালীন। মানুষ এই দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই আজকের অবস্থানে এসেছে।

সরদার স্যার হতাশা নামক ব্যাধিকে এভাবেই নাশ করতে চান। তাঁর আরাধ্য দেবতা মানুষ। তিনি মানুষকে মহাকালের সাথে লড়াই-সংগ্রামে বিজয়ী এক গৌরবান্বিত প্রজাতি হিসাবে দেখেন। সেই কোন কাল থেকে মানুষ মরে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে, হেরে যাচ্ছে। এই মানুষই আবার ভেসে উঠছে, টিকে থাকছে, জিতে যাচ্ছে। মানুষের এই অনিঃশেষ জীবনীশক্তি সরদার ফজলুল করিমকে অভিভূত করে। সেজন্যই তিনি জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে ফেলে ইতিবাচক হয়ে ওঠার জন্য নিরন্তর পরামর্শ ফেরি করে চলছেন। আর এর জন্য চাই সাহস। সাহসী মানুষের বড় বেশি প্রয়োজন আজ। যে মানুষ আমেরিকার একচ্ছত্র ঔদ্ধত্য দেখে ভয়ে মুহ্যমান হয়ে যাবে না। প্রতিরোধ-প্রস্তুতি বাদ দিয়ে হতাশাকে আঁকড়ে ধরবে না। সরদার ফজলুল করিম এই জাতেরই মানুষ যিনি বুঝতে পারেন না পশুরা যদি যূথবদ্ধ থাকতে পারে তাহলে মানুষ কেন সমাজবদ্ধ থাকতে পারবে না? মানুষ কেন সংঘবদ্ধভাবে পশু শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে না? বুঝতে পারেন না বলেই তাঁর অনেক বাক্যই নির্মিত হয় প্রশ্নবোধক আকারে। তিনি বুঝতে পারেন না, কেন আজকের তরুণ প্রজন্ম প্রজাতি মানুষের পরিবর্তে ব্যক্তি মানুষের ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ প্রসঙ্গে আমরা এই মর্মে প্রশ্ন করিঃ তাহলে কি একজন ব্যক্তি মানুষের পরাজয় বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কোনই গুরুত্ব নেই?

—আরে এটা বোঝার চেষ্টা করো যে কিছুই তো নিশ্চিহ্ন হয় না। আমার বাপও তো নিশ্চিহ্ন হয় নাই। আমি তাকে যে কবরে শোওয়াইয়া রাখছি সে কবরের মাটিকে তো সে সরস করে দিয়েছে।

এটা কি আপনি স্বীকার করেন যে মৃত্যু হচ্ছে সকল সম্ভাবনার বিনাশ?

—ধ্বংস, নিশ্চিহ্ন এগুলা ডিকশনারির শব্দ। এগুলা তোমরা বাদ দেও। বিনাশ বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও? মৃত্যু মানে তো একটা বস্তুর মৃত্যু। যে মরে সে কি একটা বস্তু না?

কিন্তু মানুষ তো আর দশটা বস্তুর মত না। তার মধ্যে তো অনুভূতি বলে একটা ব্যাপার আছে।

—সেটা পরের কথা। আগে এটা স্বীকার কর মানুষ বস্তু কিনা? যদি বস্তু বলে স্বীকার কর তাহলে বস্তুর ধর্ম কি তা বোঝার চেষ্টা কর। বস্তুর রূপান্তর ঘটে কিন্তু বস্তুর অস্তিত্বহীনতা ঘটে না। আসলে সমস্যা হলো আমরা সসীম মানুষ অসীম জ্ঞান লাভ করতে পারি না। এটা সম্ভব না। তুমি যে আমার কথাগুলো ধরতে পারছো না একমত হতে পারছো না এটা তোমার একার সমস্যা নয় আমারও সমস্যা। আমি কি সবকিছু বুঝতে পারি? তাতো নয়। তবে ব্যাপার হলো, যে কথাগুলো তোমাকে এতক্ষণ বললাম আমি ঠিক সেভাবেই ফিল করি। একটা মৌলিক ব্যাপার বুঝতে পারি যে every life wants to live. সে লাইফ মানুষ হোক আর অন্য কিছু হোক। যে জীবন বাঁচতে চায় না সে জীবন কোন জীবন না। আমি এটা বুঝতে পারি না, তোমরা হতাশ-হতাশ বলে এত চিৎকার করতে পার কিন্তু আশা-আশা বলে চিৎকার করতে কেন পার না! হতাশাকে তো অন্বেষণ করতে হয় না।

স্যারকে একটু থামিয়ে আমরা বললাম, এই যে আপনি বললেন সকল প্রাণই বাঁচতে চায় এর সাথে আমরা একমত। কিন্তু চারদিকে যেসব হতাশ প্রাণের আর্তনাদ দেখে আপনি সব গেলো গেলো বলে শোর তুলছেন তার সাথে একমত হতে পারছি না। এমনও তো হতে পারে, যে সব প্রাণ আজ হতাশার গভীরে নিমজ্জিত বলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে তারা আসলে গভীর বিচারে ভয়ংকর আশাবাদী। তারা জীবনের কাছে অনেক অনেক বেশি কিছু আশা করে বলেই চারদিকের বিশৃঙ্খলায় হতাশ।

—ধরে নিলাম তোমার কথা ঠিক। কিন্তু ঐ সব প্রাণগুলোকে প্রথমতঃ বস্তু হিসাবে দেখা শিখতে হবে। বস্তুর উপরে আমাদের চিন্তাটাই হচ্ছে ভাব। আর এই ভাবটা তো কোথাও এক জায়গায় বসে নেই। আমি একটা বস্তু অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মধ্যে বাঁচার ইচ্ছা থাকবে না তবুও আমি বাঁচার বস্তু হবো এটা কেমন করে হয় আমি জানি না। আমি এটা কল্পনা করতে পারি না। আরে তোমরা সবাই তো একেকজন আশার বাহক। কি অধিকার তোমাদের আছে এ কথা বলার যে আমরা হতাশায় মরে যাচ্ছি। তোমারে হতাশায় মরে যাওয়ার জন্য তোমার বাপ-মা জন্ম দিয়েছে?

অতঃপর বর্তমান তরুণ প্রজন্মের হতাশা ব্যাধিকে সরদার ফজলুল করিম জন্ম-ঋণ শোধ প্রচেষ্টার অস্বীকার হিসাবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, আমরা অমুক-তমুক কবি, বই পড়ি-লিখি, ডক্টরেট করি কিন্তু আসল কাজটাই করি না। একবারও ভাবি না যে বাবা-মা যদি আমাদের জন্ম না দিতো তাহলে কোথায় থাকতো এসব হতাশ হওয়া-টওয়া। এখানেই হচ্ছে জীবনবোধের ব্যাপার। জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়াটা একান্তই জরুরি। তা না হলে পরে অপরজন কিভাবে আমার কাছ থেকে উদ্বুদ্ধ হবে? মানুষ পরস্পর একসাথে বাস করে অপরের কাছ থেকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আশায়। হাট থেকে বাড়ি ফেরার সময় মানুষ যখন অন্ধকারকে ভয় পায় তখন পাঁচজনা মানুষ মিলে একসঙ্গে যায়। এটাই তো আসল ব্যাপার। এই মানুষগুলো পরস্পরের কাছে আশা চায়। সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার। মানুষ মানুষের কাছে আশা চায়। এভাবেই স্যার খণ্ডন করলেন আমাদের উত্থাপিত যুক্তি। তিনি যেন একটাই বোঝাতে চাইলেন যে আশাবাদী থাকাটা শুধু ব্যক্তির জন্যই জরুরি তা নয়, বরং সমাজ-দেহে বাস করার নিমিত্তে তার উপর আরোপিত শর্তও বটে।

—মানুষের মত অসহায় প্রাণী আর নেই। মানুষ পিঁপড়ার চেয়েও অসহায়। খেয়াল করে দেখো, মানুষ মানুষকে যেমন করে মারে পিঁপড়া পিঁপড়াকে, হাতি হাতিকে তেমন করে মেরে ফেলে না। খেয়ে ফেলে না। আমি বুঝে উঠতে পারি না, কেন আমরা পোলাপানরা বাপরেও বলতে পারবে না যে চিন্তা কোরো না আমি তো আছি। আমি এটাও বুঝতে পারি না, কেন তোমরা একথা বুঝতে চাও না যে বুশ-ক্লিনটনরা তোমাদের ভয় পায় বলেই এখানে আসে। তাহলে তোমরা কেন তাদের রেড-কার্পেট দাও? তোমরা দাসস্য-দাস বলেই নিজেদেরকে চূড়ান্ত অপমান করে তাদের রেড-কার্পেট দাও। ভুল করে ভয় পাও বলেই রেড-কার্পেট দাও। এই ভুল ভাবনাটাই এখনকার প্রধান সংকট। মানুষকে তো মানুষ করে তুলতে হবে। অথচ কি হচ্ছে? একদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি-টুন্নতি করে মানুষরে মরতে দিবা না আবার বাঁচতেও দিবা না। তারে তোমরা খাইতেও দিবা না আবার মরতেও দিবা না। একটা এ্যাবসার্ড সিচুয়েশান। এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতর দিয়ে আমরা এরকম অবস্থা থেকে উত্তরণের স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেটা টিকে নাই। কিন্তু তবুও আমি স্বপ্ন দেখি। কেন আমি স্বপ্ন দেখবো না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শুনতে শুনতে আমাদের মনে হয়েছিলো—সত্যই তো তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন না দেখে পারে না বলেই স্বপ্ন দেখে। অনেক স্বপ্নই পূরণ হবে না জেনেও স্বপ্ন দেখে। আসলে স্বপ্ন পূরণের স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। স্যার এরকম কিছু একটাই বোঝাতে চান বলে মনে হলো। ঘোর সংকটের কাল চলছে বটে কিন্তু সংকট অতিক্রমের স্বপ্ন তো দেখতে হবে। সাঁতার না জানা জলে পড়া মানুষ হাত-পা ছোঁড়ে কেন? স্বপ্ন দেখে বলেই ছোঁড়ে। বাঁচার স্বপ্ন। স্যার বক্তব্য এগিয়ে নিয়ে চলেন।

—আমি বুঝি যে এখন ঘোর কলিকাল। কত হাজার বছরে এই সংকট কাল শেষ হবে আমি জানি না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে জীবন জয়ী হবে এবং মৃত্যু পরাজিত হবে। তবে এটা হবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে। জীবন লড়াই করবে মৃত্যুর সাথে। এবং মৃত্যু পরাজিত হবে। এবং জীবন প্রবহমান থাকবে। জীবন বেঁচে থাকবে এবং মৃত্যুর মৃত্যু ঘটবে—এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকাটা একান্ত আবশ্যকীয়। আমি তোমাদের কেমন করে বোঝাবো? তোমরা তো প্লেটো পড় না।

প্লেটোর নাম উচ্চারণের সাথে সাথেই আমরা একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের একটা জিজ্ঞাসা ছিলো। বিভিন্ন সময়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছি। তিনি কখনোই বিস্তারিতভাবে বলতে চাননি। আজকে আলোচনার ধারাবাহিকতায় কিছু কথা বেরিয়ে আসতে পারে বলে আশা করলাম। আমাদের প্রশ্নটা ছিলো এরকমের—আপনার প্লেটোপ্রীতি সর্বজনবিদিত। সেই ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকে দেখে আসছি, মাসের পর মাস আপনি প্লেটো বোঝানোর পেছনে ব্যয় করেছেন। তার তত্ত্বের মহত্ত্ব তুলে ধরেছেন। প্লেটোর রিপাবলিকের তুলনাহীন অনুবাদও আপনার হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়েছে। সে অনুবাদের যে ভূমিকা আপনি লিখেছেন তা বাংলা ভাষাভাষীদের অমূল্য সম্পদ বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু আপনার সারা জীবনের রাজনীতি অর্থাৎ কম্যুনিস্ট রাজনীতির সাথে এই প্রগাঢ় প্লেটোপ্রীতি কি মেলানো যায়? প্লেটো যেখানে সামাজিক বিভক্তি টিকিয়ে রাখতে চান মার্কস সেখানে বিভক্তির দেয়াল তুলে ফেলে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেন। এ দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শকে আপনি কিভাবে নিজের ভেতরে লালন করেন? এটা কিভাবে সম্ভব?

এত দীর্ঘ নিজস্ব বক্তব্য আগে কখনো স্যারের সামনে নিয়ে আসা হয় নি। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝার জন্য অনেকের মধ্যেই কৌতূহল আছে জানি বলেই একটু বিস্তারিতভাবে প্রসঙ্গটি স্যারের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। অনেকটা সওয়াল-জবাব ধাঁচে। তিনি আবারো আগের মতই এ প্রসঙ্গ বাদ দিতে চাইলেন। এবং তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, তাঁর কমিটমেন্ট এসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়কে একেবারেই মূল্যহীন বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আমরা তারপরেও কিছু বক্তব্য শুনতে চাইলে স্যার বললেন :

—প্লেটোর এত সরল পাঠ করেছো দেখে আমি অবাক হচ্ছি। বর্বরকে আমি কেমন করে প্লেটো বোঝাবো? কেমন করে জ্ঞানদান করবো? তুমি বরং প্লেটো বোঝাটা তোমার জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নিতে পারো।

অসুবিধার কিছুই নাই। বর্বরকে আপনিই জ্ঞানদান করুন। এবং বলুন প্লেটোর সাথে মার্কসের সংযোগটা আপনি কিভাবে করেন?

—এখন তুমি আমারে এমন শিক্ষক বানাইলা যে আমি কথায় কথায় ধমকাতে পারি। তোমাকে এই সংযোগ বিষয়ে কিছু বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার শুরুর দিক থেকেই আমার মধ্যে কিছু প্রশ্ন জন্ম নিতে শুরু করে : সত্য কি মিথ্যা কি, জীবনের সাথে দর্শনের সম্পর্ক কি—এসব। এক পর্যায়ে আমি অনার্স বিষয় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেই। এবং ইংরেজি বিভাগ থেকে দর্শন বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য হরিদাস ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হই। তিনি খানিক ধমক-টমক দিয়ে রাজী হলেন। আসলে আমি জীবনে কি হবো না হবো এসব নিয়ে কখনোই সিরিয়াসলি ভাবিনি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে, সবাই তো একরকম হয় না। সে যাই হোক। দর্শন পড়তে এসে আমি সত্য-মিথ্যার রাজ্যে এলাম। দর্শন বিভাগে তখন এসব বিষয়ে মৌলিক আলোচনা হতো। সত্য-মিথ্যার জগতে এসে আমার দারুণ লাভ হয়। দর্শন না পড়লে এটা বুঝতে পারতাম না যে nothing is unrelated with anything else. এটা মার্কসীয় দর্শনের ব্যাপার কি? এছাড়াও মহান শিক্ষকদের হাত ধরে ইল্যুশান এন্ড রিয়েলিটি, নলেজ, সাইকেলিজি, কনশাস, আনকনশাস, সাবকনশাস ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে চেষ্টা করি। আগে থেকেও অভ্যাসটা ছিলো এ পর্যায়ে এসে বই পড়াটা আরো ব্যাপকভাবে আমার অভ্যাসে পরিণত হয়। এখন প্লেটো প্রসঙ্গে বলি। দর্শন বিভাগে ভর্তি, পাঠাভ্যাস, রাজনীতি—এই সবগুলোই কিন্তু আমাকে প্লেটোর মধ্যে ঢুকিয়েছে। সক্রেটিসের মধ্যে ঢুকিয়েছে। পরে বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করার সময় এ বিষয়গুলো নিয়ে কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

আমি মনে করি যে, প্লেটো এবং মার্কসের মধ্যে কোন কন্ট্রাডিকশান নেই। একটা সাধারণ কন্ট্রাডিকশান আছে। তা হলো প্লেটো হচ্ছেন আইডিয়ালিস্ট আর মার্কস হচ্ছেন রিয়ালিস্ট। কিন্তু গভীরে ঢুকলে উভয়ের সাদৃশ্যই পরিস্ফুট হয়। মার্কস প্লেটোকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আইডিয়ালিস্ট ফিলোসফার মনে করেন। শব্দ ধরে ধরে এ দুজনের মধ্যে পার্থক্য তুলে বের করার দরকার নেই। দু'জনের মধ্যে সময়গত ব্যবধানটা খেয়াল রেখো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্রেটিসের জবানীতে প্লেটো যখন বলেন যে আমি জানি যে আমি জানি না, ওরা জানে না যে ওরা জানে না। কিংবা প্লেটো যখন বলেন যে, যার যা করা উচিৎ তা করাই হচ্ছে জাস্টিস—এগুলো তো মহা অমূল্য কথা। এগুলো আর কোথায় পাবা! মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট একজন লোক হয়েও এগুলোকে ধারণ করায় আমার কোন অসুবিধা হয় না। কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোটা না পড়লে পড়। পড়ে থাকলে আবার পড়। কাজে দেবে। একটি বিষয়কে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাটা মার্কসিজম আমাকে শেখায় নাই। মার্কসবাদে প্লেটোকে গ্রেটেস্ট আইডিয়ালিস্ট বলা হয়েছে গ্রেটেস্ট রাফিয়ান বলা হয় নাই। ফাইটটা হচ্ছে আইডিয়ালিজম এবং মেটেরিয়ালিজমের মধ্যে। প্লেটোর পরে অ্যারিস্টটলে এসে একটু অগ্রসরমানতা পাই। অ্যারিস্টটল এ দু'য়ের মধ্যে একটা মিক্স-আপ করার চেষ্টা করছেন।

অনেকক্ষণ পরে এসে আমরা একটু কথা বললাম। আমরা বললাম যে আপনি বৈপরীত্য খুঁজে পান না ভালো কথা। কিন্তু প্লেটো এবং মার্কসের মধ্যে কার পক্ষাবলম্বন করেন?

—এভাবে জানতে চেয়ে কোন লাভ হবে না। এরা একজন আরেকজন থেকে বাদ না। প্লেটোর মধ্যে ও রিয়ালিজম আছে। বাস্তবতাবোধ থেকেই প্লেটো নিজের মত করে দার্শনিক রাজা বা আদর্শ রাষ্ট্রের আইডিয়ালিস্ট ধারণা দাঁড় করান। সবকিছুই তো রিলেটিভ। প্লেটো এবং মার্কসকে সরাসরি বিপরীত অবস্থানে দাঁড় করানো ঠিক না। একটা কথা হলো, ভাব বা আইডিয়ার ব্যাপারটা বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ম্যাটারের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে আইডিয়া। ম্যাটার সংক্রান্ত যে চিন্তাটা সেটাই আইডিয়া। আইডিয়া বলে বস্তুর বাইরে কিছু নাই। মার্কসের মহত্ত্ব হচ্ছে এই যে সে এক ঝটকায় কোন কিছুর অনস্তিত্ব বা অকার্যকারিতা ঘোষণা করে নাই। সে সবকিছুকে দ্বান্দ্বিকভাবে বিশ্লেষণ করেছে। মার্কসের নাম যখন বলি তখন এঙ্গেলসকেও স্মরণ রাখবে।

আজকের আলোচনা এভাবে শেষ হয়েছিলো। পরবর্তী এক আলোচনায়, অর্থাৎ ৮ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কথোপকথনের এক পর্যায়ে এসে আমরা কম্যুনিস্ট, কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে একজন ব্যক্তি কম্যুনিস্টের সম্পর্কের ধরন কেমন হতে পারে এসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ সরদার ফজলুল করিম স্বয়ং। সাধারণ্যে তাঁর পরিচিতি একজন আজীবন কম্যুনিস্টের। আবার কোন কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে তিনি জড়িত আছেন এরকম আমাদের জানা নেই। ব্যাপারটা আমাদের জন্য কৌতূহলের। লেখার সময় পাঠের সুবিধার্থে ৮ এপ্রিলের আলোচনার একটি অংশ আজকের আলোচনার শেষে যুক্ত করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কম্যুনিস্ট, কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে আমার বক্তব্য এ রকমের : আমি তো কম্যুনিস্ট পার্টির কেউ ছিলাম না। I was a communist by myself. Iwas not a communist by membership. এখানে একটা পার্থক্য আছে। আমি মনে করি আগে কম্যুনিস্ট হওয়ার ব্যাপার তারপরে আসবে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের প্রসঙ্গ। কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েও কম্যুনিস্ট হওয়ার গ্যারান্টি নাই। আগে conception about humanity, conception about man এগুলো। পার্টি কর্তৃক চেতনা জাগ্রত করার কথা তুমি বলেছো। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। পার্টি যেটা পারে তা হলো ব্যক্তির মধ্যেকার যে conception সেটাকে প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা। সুতরাং পার্টির ব্যাপারটা আসবে conception'র পরে। যখন মার্কস কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো লেখার জন্য এত পরিশ্রম করে তখন কি তিনি পার্টির মেম্বার ছিলেন? যারা বিত্তহীন, অসহায় তাদের জন্য মার্কসের যে বোধ সেটাই আগের কথা। বোধ স্পষ্ট না থাকলে পরে একটা সংগঠন যদি ভেঙে যায়, তখন সংগঠনের সদস্য মনে করে যে তার আদর্শই ভেঙে গেছে! কতগুলো পার্টি গড়ে উঠলো বা ভেঙে পড়লো তার সাথে কম্যুনিস্ট থাকা না থাকার ব্যাপারটা জড়িত থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। একজন কম্যুনিস্ট তার বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই কম্যুনিস্ট। এটা মনের ব্যাপার, কিভাবে জগতটাকে দেখি সেটা হচ্ছে ব্যাপার। অর্গানাইজেশান নিশ্চয় সাহায্য করে। যাদের মধ্যে খানিক আগ্রহ আছে, পার্টি তাদেরকেই আরো বেশি করে আগ্রহী করে তুলতে পারে। উৎসাহ যদি একেবারেই না থাকে, ইচ্ছা যদি একেবারেই না থাকে, নিজেকে নৈতিক প্রাণী মনে করার বোধই যদি না থাকে তাহলে পার্টি কি করতে পারে? একজন ডাকাতে আর ডাক্তারে তফাৎ কি? ডাকাত জীবন নেয় আর ডাক্তার জীবন রক্ষা করে। ডাক্তার ব্যর্থ হতে পারে তাই বলে তাকে ফাঁসি দেয়া হয় না। কিন্তু ডাকাতকে ফাঁসি দেয়া হয়। প্রশ্ন হচ্ছে আমি নিজেকে কোন ভাবে ভাবি? ডাক্তার নাকি ডাকাত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তির হতাশা থেকে হতাশার মহামারি হয়

৫ মার্চ ২০০৩

সারা বিশ্ব আতঙ্কিত প্রহর গুনছে। যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে ইরাক আক্রান্ত হতে যাচ্ছে। সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ, জাতিসংঘসহ সব জায়গা থেকেই রব উঠছে 'যুদ্ধ নয়'। কিন্তু ক্ষমতা মদমত্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং তার দোসর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কোন যুক্তি-তর্কের ধার ধারতেই রাজী নয়। সাদ্দাম একনায়ক হোক যাই হোক, তাকে অপসারণের দায়িত্ব ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নয়। সে দায়িত্ব ইরাকী জনগণের। একনায়ক সরিয়ে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রচলনে সাহায্য করতে পারে একমাত্র জাতিসংঘ। এক্ষেত্রে গায়ের জোরে অন্য কারো হস্তক্ষেপ অবশ্যই অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। এই সরল কথাগুলোই মানতে রাজী নয় আমেরিকা। আসল কথা হলো সন্ত্রাস, জীবাণু অস্ত্র, একনায়কত্ব ইত্যাদি অভিযোগ সামনে খাড়া রেখে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল ভান্ডারটি লুটেপুটে নেয়া। কিন্তু মানুষ যুদ্ধ চায় না। প্রাণহানি চায় না। সম্পদ বিনাশ চায় না। তাই তারা আজ সোচ্চার। এমনকি ধনী দেশেরও লক্ষ লক্ষ মানুষ নেমে এসেছে রাজপথে। যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? সামরিক শক্তিতে বলিয়ান পক্ষ যুদ্ধকে অমোঘ করে তুলেছে। শান্তিকামী মানুষ কি পারছে যুদ্ধের দামামা স্তব্ধ করতে? কয়েক সপ্তাহ আগে পৃথিবীর ছয়শটি শহরে একযোগে যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। কোটি মানুষ কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছে—যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। ঢাকায় আজ বিকেলে, প্রগতিশীল রাজনৈতিক মহলের উদ্যোগে বড় আকারের যুদ্ধ বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। টেপ রেকর্ডার চালু করার আগে থেকেই বিদ্যমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে স্যারের মধ্যে ক্ষোভ এবং উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেলো। স্যার আমাদের জানালেন যে, তিনি এই সমাবেশে যোগ দিতে ইচ্ছুক। বিকেলের সমাবেশে যোগদানের কয়েক ঘণ্টা আগে আমরা তার কাছে প্রশ্ন রাখলাম : শান্তিকামী মানুষের ক্ষমতা কতটুকু? আদৌ কি তারা পারবে বর্বর যুদ্ধবাজের উন্মাদনা থামাতে? এমতাবস্থায় যদি আমরা হতাশায় আক্রান্ত হই তা কি অস্বাভাবিক? নিন্দা-বিক্ষোভ প্রদর্শনে কিছু কি এসে যায়? শান্তির কোন সম্ভাবনা কি আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বুঝতেই পারছো এই ব্যাপারগুলো দিন-রাত্র আমাকে নাড়া দেয়। তবে কথা হলো আমরা এ ধরনের ব্যাপারগুলোকে সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ গ্লোব-ওয়াইজ ভাবতে ব্যর্থ হচ্ছি। এটা আমাদের সীমাবদ্ধতা। আমরা অমুক জিন্দাবাদ তমুক মুর্দাবাদের ঘেরাটোপে আটকে আছি। এ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার ফলেই অনুধাবনের সমস্যা হচ্ছে। আমাদেরকে এভাবে ভাবতে হবে যে, আমি যেমন গ্লোবের মধ্যে আছি গ্লোবও তেমনি আমার মধ্যে আছে। আমার সমস্ত অসহায়তা নিয়েই বলতে চাই যে, without me there is no globe. এভাবে ভাবতে পারলে একটু সাহস পাওয়া যায়। তুমি হয়তো ব্যঙ্গ করতে পার এই বলে যে, ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সরদার! হোক না। আমার ঢাল-তলোয়ার না থাকুক তথাপি আমি নিধিরাম সরদার। সরদার তো। আমি বুড়া মানুষটা এভাবে ভাবতে পারি অথচ আমার তরুণ প্রজন্ম সারাক্ষণই গেলামরে, গেলামরে করছে। তারা খালি বলে, আমরা কি করতে পারি? আমাদের কি শক্তি আছে! দুইটা বোমা মারলেই তো আমরা শ্যাষ হয়ে যাবো। সোভিয়েত ইউনিয়নরে খাইছে, ইরাকরে খাওয়া আর কিইবা এমন ব্যাপার। তাদের কাছে গ্লোবালাইজেশান মানে হলো মনো পাওয়ার। আমেরিকা ছাড়া আর কিছু নাই। আমার চারিদিকে হতাশার সর্বগ্রাসী একটা ব্যাপার দেখি। হতাশাবোধ হচ্ছে এক সংক্রামক ব্যাধি। ব্যক্তির হতাশা থেকে হতাশার মহামারি হয়। জীবনের মধ্যে হতাশাকে অন্বেষণ করতে হয় না। জীবনের মধ্যে আশার বীজ অন্বেষণ করতে হয়। জীবনপথের স্বর্ণখণ্ডকে চিনতে না পারলে এবং চিনে তাকে হাতে তুলে না নিলে স্বর্ণখণ্ড নিজে এসে তোমাকে বলবে না যে, এই দ্যাখো আমি তোমার জীবনের স্বর্ণখণ্ড। আমি তোমাকে একথাটা বলতে চাই যে হতাশার বিবরে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। অনেককে বলেছি আবারও বলছি : কোথায় মৃত্যু দেখলে? আমি তো জীবন ছাড়া আর কিছু দেখি না। গোর্কির কথাই আমাদের জীবন-দর্শন হোক—'মানুষ ছাড়া কোন দেবতা নাই।' এই আমি যখন মানুষকে দেখি, আমি দেখি যে, কত লক্ষ-হাজার বছর ধরে মানুষ লাইন ধরে জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। সে এগুচ্ছে আর এগুচ্ছে জীবনের সড়কে। প্রতি মুহূর্তে তারা জীবনের খাদে-খন্দে পড়ছে আর মরছে। আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। আবার চলছে। এই দৃশ্য আমাকে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধায় অভিসিক্ত করে। আমাকেও অমর শক্তিতে পরিণত করে। আদর্শ বা বিশ্বাস যাই বলি, তার সংকট আমাদের বাইরে নয়। আমাদের ভেতরে। আদর্শ ব্যক্তির অবশ্যই কোন বিকল্প নাই। আদর্শ ব্যক্তি হওয়ার আকাঙ্খার এবং আশার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি আদর্শ হয়ে ওঠে। জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী শিখার বাহক হয়ে ওঠে। জীবনের প্রতীকে পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়—ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন হয়ে দেখা দেয়। শেক মুজিব জীবনের সংগ্রামের ডাক দিতে দিতে জীবনকে দান করে। জীবনকে যদি এভাবে দেখি, তাহলে হতাশা কোথায়? বর্তমান বিশ্ব সংকট নিরসনে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সরকার, অসরকার, বেসরকার, নাসরকার যা খুশি বল সবার সামনেই একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ। আমাদের এখানে যারা নিজেদের শান্তির স্বপক্ষ শক্তি মনে করে তারা যদি এই সুযোগটা কাজে লাগাতে না পারে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এই সুযোগ আজ সারা পৃথিবীর সকল শান্তিকামী মানুষের সামনে এসে হাজির হয়েছে। এই সুযোগ শত্রুর বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধ'র সুযোগ। আজ বিকেল বেলা শহীদ মিনারে ইরাক আক্রমণ-বিরোধী গণপ্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি সেখানে যাবো। জনগণের উদ্দেশে যে কথাগুলো আমি বলবো বলে ঠিক করেছি সেগুলো এখন একবার বলছি। আমি সমাগত জনতাকে বলবো যে, জর্জ বুশের আসল নাম আপনারা জানেন না। বুশের আসল নাম হচ্ছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। আরো বলবো যে, শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড এসো মোরা মিলি একসাথ।

সরদার ফজলুল করিম বারবার একটা কথাই যেন আমাদের বুঝিয়ে চললেন যে, সবাই মিলে একসাথে দাঁড়ানোর যে সুযোগ বিশ্ব সভ্যতার সামনে এসেছে তা যেন ধরে রাখা যায়। যেন তিনি আরো বলতে চাইলেন এই কথাটি যে, বিশ্ব মানবতার সম্মিলিত প্রতিরোধ-প্রতিবাদের মুখে পশু শক্তির পরাজয় অনিবার্য। এখন হতাশায় আক্রান্ত হয়ে থাকার সময় নয়। এখন প্রবল সাহসী হয়ে রুখে দাঁড়ানোর সময়। তিনি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিচের কথাগুলো বললেন :

আরে মরছি তো আমরা মরছি। আমরা তো রোজই মরছি। কিন্তু বুশ একথাটা বুঝতে চাচ্ছে না যে, আমাদেরকে মেরে শেষ করতে পারবে না। ব্যক্তি মানুষকে মারতে পারে। কিন্তু প্রজাতি মানুষকে কি মেরে শেষ করতে পারবে? এই সত্য যখন বিরাজমান তখন হতাশার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? আমাদেরকে মহৎ মানুষ হিসেবে তৈরি হতে হবে। কোন দায়িত্ব নেবো না, কেবল আমি ভোগই করবো, সারাক্ষণ খালি অন্যকে দোষী করবো এবং চারিদিকে আশা ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও হতাশায় ভেসে যাবো—এটা হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি আত্মবিরোধী এবং আত্মহত্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। বুশ ডলার কোথায় পায়? আমার রক্ত দিয়ে বুশ ডলার বানায়। বুশের ডলার খাই বলেই একেবারে বুশের দাসস্য দাস হয়ে যাবো? আমার মত পুরোনো আমলের লোকের কাছে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি অচিন্ত্যনীয়। বুশকে ধন্যবাদ এজন্য যে সে সারা পৃথিবীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে একটা তার ভাগ একটা আমার ভাগ। আমি নিশ্চিত যে তার ভাগের তুলনায় আমার ভাগ অনেক বেশি শক্তিশালী। এই মূর্খতা বুঝতে পারছে বলেই ভয় পাচ্ছে। এটা বুশের একার কৃতিত্ব নয়। বুশেরও বাপ ছিলো, তারও বাপ ছিলো। এই বাপেরা ১৯২০ সাল থেকে এই ব্লু-প্রিন্টটা শুরু করেছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের তাৎপর্য ছিলো নতুন মানুষ নতুন সমাজ তৈরি করা। প্যারি কমিউনকে প্রথম ধরলে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব হলো দ্বিতীয় প্যারি কমিউন। এটা ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংসের জন্য তারা ক্রুশেভ, গর্বাচেভ, ইয়েলেৎসিন এসব তৈরি করেছে। যেহেতু যে কোন সমাজই প্রতিষ্ঠিত হয় অপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সেহেতু এই ধ্বংসকে বিপর্যয় কেন বলছো? এটা তো ন্যাচারাল ব্যাপার। আমি নতুন প্যারি কমিউনের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। একটা সময় দুর্বল কণ্ঠে আমরা যুদ্ধ নয় শান্তি শ্লোগান দিয়েছি। অথচ আজ কত ব্যাপক-সর্বগ্রাসী শ্লোগানে উচ্চারিত হচ্ছে যুদ্ধ নয় শান্তি। যুদ্ধ নয় শান্তি। আর কি চাই আমাদের!

আজকের আলোচনার নির্যাসটুকু বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আবারো ভাবনা শুরু করতে আমাদের বাধ্য করায়। আমাদের এ প্রশ্নটি ভাবতে বাধ্য করে যে কেন এই স্থবিরতা? যে অংশটি সমাজকে নেতৃত্ব দেবে, মুক্তি দেবে সে অংশটি কেন যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছুক? ইরাকের উপর আক্রমণ কি আমাদের উপর আক্রমণ নয়? তাহলে কোথায় সে রকম প্রতিরোধ পর্ব? সমাজের অগ্রসর অংশটি কেন ব্যক্তি স্বার্থের চিন্তায় এত ব্যতিব্যস্ত থাকছে? পল্টন মোড় আর শহীদ মিনারের বক্তৃতা, পত্রিকার পাতায় গরম গরম কলাম লেখা আর টিভি পর্দার সামনে বসে যুদ্ধ-বিনোদন উপভোগেই কি দায়িত্ব শেষ? সরদার ফজলুল করিমের বচন শুনে মনে হয় এগুলো সে অর্থে দায়িত্ব পালন নয়। দায়িত্ব পালনের ছল করে নিজেকে স্তোক দেয়া। তবে একই সাথে আমরা এও মনে রাখলাম যে, যতই সীমাবদ্ধতা থাক, স্বার্থ চিন্তা থাক তবুও সারা পৃথিবীর মত বাংলাদেশেও লক্ষ-কোটি কণ্ঠস্বরে আওয়াজ উঠছে, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। কিন্তু আমাদের সন্দেহ সে আওয়াজ কি মার্কিন যুদ্ধবাজদের আদৌ সংযত করতে পারছে? তাহলে এই যুদ্ধবাজী ঠেকানোর কার্যকর কোন উপায় আদৌ আছে কি—আমরা প্রশ্ন রাখি।

—মৃত্যু দিয়ে মৃতুকে ঠেকাবা। আবার কি! আর কোন সোজা রাস্তা কেন খোঁজ? তুমি বাঁচতে চাইলে একটা গর্ত খুঁড়ে ঢুকে পড়। ইতিহাস খুঁজে দেখো পালিয়ে থেকে নয় নির্যাতিত মানুষ নির্যাতিত হতে হতে মরতে মরতে সভ্যতাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে সহায়হীন নিরস্ত্র মানুষ মরতে মরতে দুষ্টের বিবেকবোধ জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করবে? আমাদের প্রশ্ন।

—কে সহায়হীন! কে নিরস্ত্র! আরে আমার বুকের আশাটাই তো বড় অস্ত্র। অস্ত্র বলতে খালি ক্ষেপণাস্ত্র, স্টেনগান বোঝ কেন? যে আশার মধ্যে তুমি বেঁচে আছ মোকাবেলা করছ সেটাকে কেন অস্ত্র ভাবতে পার না? এটা বোঝা চাই যে মৃত্যু জীবনকে খায়। কিন্তু জীবন মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে—দ্বান্দ্বিক ব্যাপার।

এত ব্যাখ্যা শোনার পরও আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আবার প্রশ্ন করি : করণীয় কি? শান্তিকামী মানুষের করণীয় কি?

—যারা শান্তি বিনষ্ট করার তারা শান্তি বিনষ্ট করবেই। কিন্তু বাড়িতে ডাকাত পড়লে লাঠি-সোঁটা যাই থাকুক তাই দিয়ে প্রতিরোধে নামতে হবে। শান্তিবাদী মানুষ মরেও অমর হবে এই বোধে আস্থা রেখে সে যেটুকু সামর্থ্য আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধে নামাটাই বিধেয়। যে বাঁচার চেষ্টায় নেমে মরছে সেই হচ্ছে জীবন। আর যে মারতে নেমেছে সে মেরেও মৃত্যুর বাড়া। তোমরা এসব কিছু বোঝ না বা বুঝতে চাও না। তোমরা ইংল্যান্ড আমেরিকা যাও-কিসব শিখে আস কে জানে! এখানে মাস্টারি কর অথচ একজন ছাত্রছাত্রীকেও এভাবে ভাবতে উৎসাহিত করা না! তোমাদের কোন কমিটমেন্ট নাই, স্যাক্রিফাইস নাই সেজন্যই অন্যকে উৎসাহিত করার নৈতিক অবস্থানও নাই। আর শাসক শ্রেণীর কথা কি বলবো? এরা তো বুশের সার্টিফিকেট আর মন্ত্রী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু চিন্তাও করতে পারে না। আসলে কথা হচ্ছে দার্শনিকবোধ সম্পন্ন হতে হবে, কম্যুনিস্ট হতে হবে। কম্যুনিস্ট হওয়া বলতে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া বোঝাচ্ছি না। একজন কম্যুনিস্ট কোন একটা কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার নাও হতে পারে। আবার কম্যুনিস্ট পার্টির একজন মেম্বার প্রকৃত বিচারে কম্যুনিস্ট নাও হতে পারে। এই দ্বান্দ্বিকতা বুঝতে হবে। আমরা আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি সেটাকে সরলভাবে দেখো না। অনেক দ্বান্দ্বিকতা পেরিয়ে এখানে এসেছি। এটা বিনা চিন্তা, বিনা আকাঙ্খা, বিনা স্বপ্নে, বিনা আশায় ঘটেনি। সোজা কথা। তাহলে করণীয় কি এমন প্রশ্ন করার আর কি থাকে? সব চাইতে বড় মীমাংসা তো এই যে তুমি আছো। আমি আছি। এটাইতো বড় সত্য। জীবনকে ভোগ কর। সচেতনভাবে ভোগ কর। জীবনকে বোঝাই হলো জীবনকে ভোগ করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় জেল জীবন এবং বন্ডদানে মুক্তি

২ এপ্রিল ২০০৩

মাঝখানে কয়েক সপ্তাহ স্যারের কথা শোনার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বসা হয়নি। যদিও অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় কোন ছেদ পড়েনি। আমরা শুরু থেকে যেভাবে সময় ধরে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, ইরাক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার কারণে আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় একটু ছেদ পড়েছিলো স্বাভাবিকভাবেই। আজ আবার পূর্বের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসতে চাইলাম। একারণেই প্রথম এবং দ্বিতীয় জেল জীবনের মাঝখানের সময়টুকু সম্পর্কে জানতে চেয়ে আজকের আলোচনার সূত্রপাত করতে চাইলাম।

—১৯৪৯ সালের শেষে জেলখানায় ঢুকে ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে আমি মুক্তি পেলাম। আমি নয় আমরা মুক্তি পেলাম। অর্থাৎ অন্যদের সাথে আমিও মুক্তি পেলাম। মুক্তির পাওয়ার কারণ হলো ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে বিজয়ীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলো কম্যুনিস্ট অথবা কম্যুনিস্ট মাইন্ডেড। যদিও মুসলমান পরিবার থেকে আসা কম্যুনিস্ট নিজেদের কম্যুনিস্ট হিসাবে উল্লেখ করতো না। সমস্যা ছিলো কম্যুনিস্টদের প্রধান সংযোগ ছিলো আওয়ামী লীগের সাথে। ঐ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের প্রধান ভিত্তি ছিলো কম্যুনিস্ট কর্মীরা। কেন যেন ১৯৫৪ পরবর্তী প্রজন্মের যে সব লোক কম্যুনিজম করে তারা এ কথাটা বলার উৎসাহ রাখে না যদিও তৎকালে কম্যুনিস্টরা আওয়ামী লীগকে জয়ী করার জন্য শ্রম-মেধা ব্যয় করেছে তবুও অন্তত ত্রিশজন গোপন কম্যুনিস্টকে তুমি পাবে যারা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন। এরা কম্যুনিস্ট পরিচয় গোপন রাখতেন কিন্তু শেখ মুজিব এদেরকে জানতেন। তো সে সময় সম্পর্কে কি বলবো? সে সময় অনেকগুলো ঘটনা দ্রুতই ঘটেছিলো। যুক্তফ্রন্টের বিজয়, সরকার গঠন, আবার সরকার ভেঙে দেয়া এবং ১৯৫৮ সারে এসে সামরিক শাসনের সূচনা।

যাদেরকে গোপন কম্যুনিস্ট বলছেন তাদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

—কেমন করে বলবো, সব নাম তো এখন আর মনে নাই। তুমি যদি ঐ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট থেকে বিজয়ী সদস্যদের একটা তালিকা আমাকে দাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে আমি নামের পাশে টিক দিয়ে বলতে পারবো এইটা একটা কম্যুনিস্ট ওইটা একটা কম্যুনিস্ট। এ মুহূর্তে দু'এক জনের নাম মনে পড়ছে। যেমন চাঁটগা'র চৌধুরী হারুনুর রশীদ, সিলেটের পীর হাবিবুর রহমান, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, পাবনার সেলিনা বেগম ও তাঁর স্বামী। আর আমার নিজের ব্যাপারটা হলো এরকম যে তখনও আমি সব সময়ের মতই যতটা না অর্গানাইজার তার চেয়ে বেশি অবজারভার ছিলাম। এ কারণেই বোধ হয় আমার উপরে তেমন কোন গুরুতর দায়িত্ব আসে নি।

এ প্রশ্নটা কি করতে পারি যে দায়িত্ব দেয়া হয়নি নাকি দায়িত্ব নিতে চান নি?

—আমি তো বলছিই যে আমি পর্যবেক্ষণকারী হিসেবেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তবুও কখনো কখনো দায়িত্ব পেয়েছি। যেমন বরিশালের নলিন দাস আমাকে বক্তৃতা করার জন্য নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও মুসলিম কমরেডরা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতো। আসলে I was very much beloved boy of the Communist Party. সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, জ্ঞান চক্রবর্তী, ফনি গুহ কতজনের ভালোবাসার কথা আমি বলবো। আমার অপার ভাগ্য যে আমি তাদের পেয়েছিলাম। সেজন্যই আমি শাহ আজিজুর রহমান না হয়ে সরদার ফজলুল করিম হয়েছি।

আপনার পজিশন যদি এতই নির্বিষ হয় যেমনটা আপনি বলছেন, অর্থাৎ আপনার ভূমিকা হলো পর্যবেক্ষকের তাহলে পুলিশ ঘুরেফিরে আপনারে ধরে কেন?

—ঘুরে ঘুরে তো শুধু আমারে ধরছে না। যারা ধরে তাদেরতো একটা বড় লিস্ট থাকে। সেই লিস্ট অনুযায়ী, যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়ার পরের কথা বলছি, তারা যখন জাল ফেললো তখন একসাথে সব ধরা পড়ে গেলো। এমনকি আশি বছরের বুড়া কবিয়াল রমেশ শীলও ধরা পড়লো। আমারে ধরে ঠিক আছে ধরে। কিন্তু প্রশ্ন করো যে রমেশ শীলকে কেন ধরে? আসলে যারা ধরে বা ধরার ক্ষমতা রাখে তারা কার মধ্যে কতখানি বীজ লুকিয়ে আছে সেটা আগে থেকে আঁচ করে নেয়। এটাকেই বলে সিস্টেম। ঐ সিস্টেম মনে করেছে আমাকে ধরা উচিৎ, তাই ধরেছে। ওরা ভেবেছে, এই ব্যাটারে উনপঞ্চাশ সালেও একবার জেলে ঢুকানো হইছিলো। তার মানে এই লোকের নিশ্চয় কোন গড়বড় আছে। সে সময়ের ব্যাপারে আরো কিছু জানতে চাইলে আমি বলবো যে, ১৯৫৪ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠান করাটা মুসলিম লীগের একটা অবদান। তারা এটা নাও করতে পারতো। গুণ্ডা লাগিয়ে দিতে পারতো। তারা তা করে নাই। নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যালঘু রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। অন্য কেউ না বললেও আমি মুসলিম লীগের এই অবদান স্বীকার করতে চাই। কেননা আমি পুরো ব্যাপারটাকে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখতে চাই। কোন নেগেটিভকেই পুরোপুরি নেগেটিভ মনে করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় না। কোন পজেটিভকেই পুরোপুরি পজেটিভ মনে করা যায় না। নেগেটিভেরও পজেটিভ থাকে আবার পজেটিভেরও নেগেটিভ থাকে। মুসলিম লীগ যে চুয়ান্ন সালেই মার্শাল ল' জারী করানোর মত অবস্থা তৈরি করলো না—এটা একটা বড় ব্যাপার। মার্শাল ল আসলো আটান্ন সালে। মাঝখানের সময়টাতে অবশ্য মুসলিম লীগ মার্শাল ল'র কথা বলতো। আমি কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে যেয়েও শুনছি। তখন ভাবতাম ব্যাটারা হুমকি দিচ্ছে। ওরা বোঝে নাই যে হুমকিটা যতক্ষণ হুমকি থাকে ততক্ষণই হচ্ছে কাজের। হুমকিটা যখন রিয়ালিটি হয়ে যায় তখন তো তার হাতে আর কিছু অবশেষে রইলো না। যেমন ধরো সে সময়ের একটা চলতি হুমকি ছিলো—বাঙালিরা যদি ওয়ান ইউনিট না মানে তাহলে মার্শাল ল হয়ে যাবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও এই অস্ত্রের ভয়ই বাঙালিদের দেখাতেন।

স্যার এখন আপনি আমাদের বলেন সামরিক শাসন আসার পরে কি পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করলেন? তখন তো আপনার দ্বিতীয় জেল জীবনেরও শুরু।

—সামরিক শাসন আসলো এবং আমাদের গ্রেফতার করা হলো। আটান্ন'র শেষ দিক থেকে বাষট্টির ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত আমি জেলের ভেতরে। সামরিক শাসন সম্পর্ক আমার মন্তব্য শুনে কি হবে? যারা বাইরে ছিলো তাদের জিজ্ঞেস কর। আমি নিজের ব্যাপারে বলতে পারি। বাষট্টির ডিসেম্বরে আমি ছাড়া পাই। এ ব্যাপারে আমার পরিবারের ভূমিকা ছিলো। আরেকটা ব্যাপার হলো জেলে ঢোকানোর আগে সাতান্ন সালে আমি সংসার পেতেছি। নতুন সংসার জীবনের মাথায় জেলে চলে গেলাম। জেলে বসে আমি নিজের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনি। কম্যুনিস্ট সংগঠনের কোন দায়িত্বে না থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

এ পর্যায়ে এসে দ্বিতীয় পর্যায়ের জেলজীবন সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হলো। প্রথম জেলজীবনের স্মৃতিচারণের সময় জেলের ভেতরকার পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনাই শুধু নয় সহবন্দীদের মানসিকভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, পাঠচক্র, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বন্দীদের চিন্তাভাবনা ইত্যাদি কিছু মিলিয়ে যে ঋণ পরিবেশনা পেয়েছিলাম তাই আমরা পেতে চাইলাম দ্বিতীয় জেলজীবনের কাহিনীটা শোনার সময়।

—প্রথম বারের জেলজীবন সম্পর্কে যা বলেছি এখানেও তাই, অর্থাৎ Communist elements wanted to remain political inside the jail also. কম্যুনিস্টদের বড় গুণটা ছিলো এই যে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ-সভ্যতা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তার যে বোধ, যে বিশ্বাস, তা কখনোই মন্ত্রী হওয়া না হওয়ার সাথে মিশিয়ে ফেলেনি। জেলখানার ভেতরে বসেও কম্যুনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা এই বোধের চর্চা অব্যাহত রাখতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলখানার ভেতরে দীর্ঘ সময় থাকার পরে কম্যুনিস্ট ক্যাডারদের মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?

—এখানেই আসলে চর্চার ব্যাপার আর কি। বোধগুলো লালন করার ব্যাপার আর কি। আমি তোমাকে বলতে পারি যে, জেলখানার ভেতরে যেহেতু কম্যুনিস্টদের মধ্যে কম্যুনিস্ট থাকার চেষ্টা অব্যাহত থাকতো সেহেতু গণহারে নন-কম্যুনিস্ট বা এ্যান্টিকম্যুনিস্ট হয়ে যাওয়ার নজীর পাওয়া যায় না—যেটা পরবর্তীকালে হয়েছে।

সরদার ফজলুল করিমের জীবনের একটা অস্পষ্ট অংশে আলোচনাটা হাজির হয়েছে বলে মনে হলো। বাষট্টির শেষে এসে তিনি যেভাবে জেল থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং রাজনৈতিক সংগঠন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেন তা নিয়ে কথাবার্তা হওয়া প্রয়োজন—আমরা অনুমান করি। এ বিষয়টি নিয়ে কারু কারু মধ্যে ক্ষোভ, হতাশা রয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যারা সরদার ফজলুল করিম বিষয়ে আগ্রহী তাদের মধ্যে রয়েছে প্রশ্ন : কেন তিনি এমন করলেন? আমরা স্যারকে জানালাম যে বিষয়টা নিয়ে তিনি কথা বললে অস্পষ্টতার নিরসন ঘটতে পারে। তিনি রাজী হলেন। উদ্দেশ্য মোতাবেক আমরা এগুতে থাকলাম। শুরুতে দ্বিতীয় জেলজীবনের কাহিনী শুনতে চাইলাম।

—তেমন কোন কাহিনী নাই। প্রথমবারের মতই জেলের ভেতরে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করেছি। যদ্দূর মনে পড়ে ঢাকা, রাজশাহী এবং কুমিল্লা জেলে ছিলাম। এখানে একটা কথা উল্লেখ করবো যে, প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার জেলজীবনে একটু হিউম্যান কন্ডিশনে ছিলাম। জেলখানার ভেতরের পরিবেশ আগের চেয়ে খানিকটা ভালো পেয়েছিলাম। চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হওয়ায় এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিলো। যদিও সামরিক শাসনামলে আমরা জেলে ছিলাম। এবং অনেক আগেই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়া হয়েছে তথাপি সামরিক সরকার যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা মাথায় রাখতে বাধ্য ছিলো। উনপঞ্চাশ সালের যে রকম বিপুল হারে কম্যুনিস্টদের জেলখানায় ঢোকানো হয়েছিলো এবার ততটা হয়নি। তবে প্রধান টার্গেট কম্যুনিস্টরাই ছিলো।

আমরা প্রশ্ন রাখলাম, ততদিনে তো আওয়ামী লীগ বড় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাহলে তাদেরকে টার্গেট না করে কম্যুনিস্টদের প্রধান টার্গেট করতে যাবে কেন?

—আওয়ামী লীগ বড় রাজনৈতিক দল কিন্তু সরকার না। সরকার আওয়ামী লীগের ভেতরে যারা আসল অর্থাৎ কম্যুনিস্ট ইলিমেন্টগুলোকে প্রধান টার্গেট করেছিলো। পার্টিগতভাবে দেখলে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর আগের রমরমাটা কমে যাচ্ছিলো। এটা একান্তই আমার অভিমত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারে আমরা আসল জায়গাটা ধরতে চাইলাম। অর্থাৎ কেন তিনি সংগঠন থেকে দূরে চলে যেতে থাকলেন? কেন তিনি বন্ড দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসলেন? এগুলোকে যদি কেউ নেতিবাচক মনে করে থাকে তাহলে তাঁর বক্তব্য কি?

—তুমি যা বললা এর মধ্যে কোন মিথ্যা নাই। ধর আমি হচ্ছি এককালের কম্যুনিস্ট। বাষট্টি'র ডিসেম্বরে আমি পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় জেল থেকে বেরিয়ে আসি। গভর্মেন্ট বলছে ওরে বাইর করতে হইলে আন্ডারটেকিং দিতে হবে। তখনকার আমলে আন্ডারটেকিংকে বলতো বন্ড। বন্ড শব্দটা খারাপ শব্দ। যে বন্ড দেয় সে সরকারের দালাল ছাড়া আর কি! জেলের ভেতরে থাকার সময় থেকেই কম্যুনিস্ট সহবন্দীরা আমার পরিবর্তনটা টের পাচ্ছিলেন। তারা টের পাচ্ছিলেন যে সরদার যেন একটু গা-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আগের মত অত ইন্টিম্যাটলি পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের অনুমানে ভুল ছিলো না। তখন আমি নিজের সম্পর্কে একটা রিয়েলাইজেশান ডেভেলপ করছিলাম। আমি সাতান্ন সালে পরিবার গঠন করি। জেলে আসার সময় ছয় মাস বয়সের একটা বাচ্চা রেখে এসেছি। আমার ওয়াইফ একজন শিক্ষক। তার কান্নাকাটি আমাকে স্পর্শ করে। এমন একটা অবস্থায়, আমার মধ্যে যে বোধটা বেড়ে ওঠে তা হলো আমার পরিবারের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ। এই বোধ থেকেই আমি বন্ড দিয়ে বেরিয়ে আসতে রাজী হই। তা না হলে কারু পক্ষে আমাকে বন্ড দিয়ে বেরিয়ে আসায় রাজী করানো সম্ভব ছিলো না। বলতে পার, এটা আমার একটা নীতিগত পরিবর্তন যা শুরু হয়েছে জেলের ভেতর থেকেই। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম যে, জেল থেকে বেরিয়ে আমি আর রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত থাকলাম না। আবার একেবারে যে নিষ্ক্রিয় থাকলাম তাও নয়। আমি পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নিলাম। কিন্তু তাই বলে আমাকে যারা ভালোবাসতেন, যারা আমার আদর্শ ছিলেন তারা আমার উপর থেকে ভালোবাসা প্রত্যাহার করে নিলেন না। আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন না। শত্রু মনে করলেন না। আমি তখন পরিবারটিকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে এমনকি ল'কলেজেও ভর্তি হলাম। পরে তেষট্টির ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমিতে যোগদান করলাম।

তখন কিন্তু এ অঞ্চলে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। সামরিক শাসনের প্রাথমিক ভীতি কাটিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হওয়া শুরু হচ্ছে। দীর্ঘ সময় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকলেন। জীবনের অনেক প্রলোভন উপেক্ষা করলেন। নির্যাতন ভোগ করলেন। অতপর যখন আপনার মত একজনকে ভীষণ প্রয়োজন তখন আপনি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন। এই যে পরিবর্তনটা এটা অন্যদের সমালোচনার কথা বাদ থাক আপনার নিজের মধ্যে কি কোন অনুশোচনা জন্ম দেয় নি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অনুশোচনা বা কন্ট্রাডিকশন কোনটাই জন্ম নেয় নি। আমি হয়তো মুভমেন্টে যোগ দিচ্ছি না, মুভ করছি না। কিন্তু কম্যুনিজম সম্পর্কে আমরা যে ভাবনা, মানুষকে যেভাবে দেখি, সমাজকে যেভাবে দেখি সেগুলোর সাথে তো কন্ট্রাডিক্ট করি নি বা সেগুলো রিফিউজ করার দরকার পড়েনি।

কিন্তু এক সময়ে এই জনপদের আন্দোলন সংগ্রামে শরীক ছিলেন এবং আত্যন্তি কভাবেই ছিলেন—একথা আপনি নিজেই আমাদের বলেছেন। অথচ এখন থাকছেন না এই ব্যাপারটা সহজভাবে বুঝতে পারছি না। আপনাদের প্রজন্মের কেউ কেউ বোধ হয় আপনার এই অবস্থান পরিবর্তনকে এ্যাপ্রিশিয়েট করেন না। বিব্রতকর হলেও স্যারকে এ কথাটা বললাম।

—কথা হচ্ছে, আমার যেটা ক্ষমতা নাই সেটা আমি কেমন করে করবো? এক সময় আমি জেল খেটেছি, আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম সবই ঠিক আছে। কিন্তু যখনকার কথা বলছো তখন তো এগুলো আমার পক্ষে আর সম্ভব না। আমার বাচ্চা আছে, পরিবার আছে। যাদের ফেলে আমি যেতে চাই না। এটা হলো সচেতনভাবেই চলমান প্রক্রিয়ার বাইরে থাকা। আমার নীতি, আদর্শ, দর্শন কিছুই কিন্তু আমি বাদ দেই নি। কিন্তু একটা লোক সব কাজ নাও করতে পারে। সে অর্গানাইজার নাও হতে পারে। এবার আসি এ্যাপ্রিশিয়েট করা না করার ব্যাপারটায়। খুবই স্বাভাবিক। তুমি একজনকে যে কাঙ্খিত অবস্থানে দেখতে চাও সেখানে যদি না দেখতে পাও তাহলে তো ঐ লোকের প্রতি তোমার ভালোবাসা একটু কমবেই। অনেক আগে যখন আমি গণপরিষদের সদস্য ছিলাম একটা ঘটনা হয়েছিলো। ফরেন পলিসি সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে যখন আমি আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেই তখন কম্যুনিস্ট পার্টি আমাকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি শুভাকাঙ্খী মারফত খবরটা জেনে বলেছিলাম, পার্টি ঠিক কাজ করেছে। কেননা আমি পার্টির ইচ্ছা-বিরুদ্ধে কাজ করেছিলাম। একইভাবে বাষট্টি সালের পর আমার পরিবর্তিত অবস্থানে যারা খুশি হতে পারেন নি তারা তাদের জায়গা থেকে ঠিক কাজই করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তেষট্টি সাল থেকে আপনি বাংলা একাডেমির চাকুরি করছেন। এবং পারিবারিক জীবন-যাপন করছেন। এবং পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করছেন। আপনার এই পর্যবেক্ষণ কাদের কাজে লাগছিলো?

—হ্যাঁ। পারিবারিক জীবন-যাপন করছিলাম এবং রাজনীতির পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করছিলাম। কারু কাজে লাগুক না লাগুক আমার কাজে লাগছিলো। আমি দেখছিলাম যে সমাজটা পাল্টাচ্ছে। পাল্টানোর ফলে কোথায় যাবে আমি জানি না। কিন্তু আমি তো দেখছি। ভূমিকা পাল্টানোর ব্যাপারে তোমার প্রশ্ন? মুনির চৌধুরীর কথা ধরো—যে আমার ভীষণ ঘনিষ্ঠ। সে রাজনীতির সংগঠন বাদ দিয়ে শিক্ষকতার ভূমিকা নিলো। আমি বাংলা একাডেমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকুরির রোল নিলাম—ক্ষতি কি? এখানে মুনিরের কথা একটু বলি। আমি যতখানি গভীরভাবে রাজনীতি পর্যবেক্ষক ছিলাম মুনীর ততটা নয়। মুনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতিতে যুক্ত হয়। প্রফেসর আবদুল হাই সাহেবের সাথে যুক্ত হয়। এক সময় দেখতে পেলাম যে, আমার ব্যাপারে ওর একটা অপছন্দ ডেভেলপ করে। বলেনি কখনো। কিন্তু-ভাবে-ভঙ্গিতে বোঝা যায়।

এসব আলাপ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, যিনি সরদার স্যারের যে কোন আলাপে অবধারিতভাবে স্থান পেয়ে থাকেন, তাঁর কথা এসে পড়ে। আপাতভাবে কিছুটা বিষয় বহির্ভূতভাবেই স্যার বলতে থাকলেন :

—আমার ব্যাপারে মুনীরের এক ধরনের জড়তা তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু প্রফেসর রাজ্জাকের মধ্যে তেমনি কিছু হয় নি। সেই যে বিয়াল্লিশ সাল থেকে আমারে ধরছেন আর ছাড়েন নি। বাংলা একাডেমিতে কাজ করার সময়ও তিনি কোন কাজে ওদিকে গেলে আমাকে না দেখে আসেন নি। ছাত্রজীবনের পরবর্তী সময়ে রাজ্জাক সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন ছিলো এ প্রশ্ন তুমি এক সময় করেছো। উত্তরে বলি, যোগাযোগ ছিলো। তবে যেমন ধরো, বাংলা একাডেমীতে যোগদানের ব্যাপারে ওনার তেমন কোন ভূমিকা ছিলো না। আমার বড় একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন। এখানে একটা কথা বলি-মুনীর চৌধুরী আমার পক্ষে কোন কথা বলেছেন এমন খবর আমি পাই নি। অবশ্য আমার পক্ষে নেয়া অতটা নিরাপদ ছিলো না। আমার ব্যাপারে তাঁর আড়ষ্টতার প্রমাণটা আমি পেয়েছি। কারণ একটা এমনও হতে পারে যে আমার স্ত্রীর তুলনায় ওর স্ত্রী অনেক বেশি অ্যান্টি-পলিটিক্যাল ছিলেন। আমার কারণে আমার স্ত্রীকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে কিন্তু কখনো সে অ্যান্টি-পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড নেয় নি।

আমরা স্যারকে মূল বিষয়ে টেনে আনতে চাইলাম। বললাম, ধরুন আপনার যে কাহিনী সেটা অন্য একজন ব্যক্তির কাহিনী। যে ব্যক্তি সুদীর্ঘ সময় ধরে আত্মত্যাগ করেছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, মানুষের মুক্তির রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। তারপর একটা সময়ে এসে বলেছেন যে আমি আর একেবারেই রাজনীতির সাথে নাই। আমি এখন পর্যবেক্ষক। আপনাকে যদি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলি আপনি কি মন্তব্য করবেন?

—একেবারেই রাজনীতির সাথে নাই এমনভাবে বললে হবে না। বলো যে ততটা থাকছেন না। একেবারে খারিজ করে দিলে তো হবে না। ঠিক আছে, তোমার লাইন ধরেই যাই—একজন বন্ধু যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি এই কারবারটা কি করলা? সারাজীবন এত কিছু করে শেষে আইসা সব ছাইড়া দিলা! এই তো প্রশ্ন? এর একটা উত্তর হলো : One man does not

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

remain one man throughout his life. আমরা এটা সহজে চিন্তা করতে পারি না। একটা মানুষকে নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তার নানান পরিবর্তন সংগঠিত হয়। তুমি দেখতে চাচ্ছো তার যেন পরিবর্তন না হয়। তুমি চাচ্ছো তাকে দশ বছর আগে যে রকম কম্যুনিস্ট দেখেছো সে রকম কম্যুনিস্ট হিসাবে দেখতে। একটু অবজেকটিভলি একটু সায়েন্টিফিক্যালি যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবা যে কেউই অপরিবর্তনীয় থাকে না। এই পরিবর্তনকে ভালো বা খারাপ বা কম ভালো বা কম খারাপ বলতে পারো। কিন্তু পরিবর্তনশীলতাকে তোমার স্বীকার করতেই হবে।

তাহলে আপনার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ঘটেছিলো তাকে আপনি কি বলবেন? আপনার কম্যুনিস্ট বন্ধুরা যদি আপনাকে নেতিবাচকভাবে দেখেন তাহলে কি আপনি মাইন্ড করবেন?

—আমি বলবো যে আমি পরিবর্তন করলাম। আমি অর্গানাইজেশানের জন্য খুব একটা হেলফফুল থাকলাম না। আর বন্ধুরা নেতিবাচকভাবে দেখলে আপত্তি করবো কেন? তারা তা সঠিকভাবেই করবেন। তবে কতটা নেগেটিভলি করবেন সেটা হচ্ছে কথা (উচ্চ হাসি হাসলেন, আমরাও যোগ দিলাম)। কিন্তু একটা কথা বলছি যে, সবাই কিন্তু আমাকে নেতিবাচকভাবে নেয় নি। যেমন ধরো, অনিল মুখার্জী। চেনো তাকে? নাম জানো? তার বই পড়েছো? পড়লে আবার পড়। ভীষণ নীতিবোধসম্পন্ন লোক। এই লোক আমার নন-ইনভলমেন্ট'র ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমার উপর থেকে তাঁর যে স্নেহ-ভালোবাসা তা প্রত্যাহার করলেন না। এবং তিনি একটা কাজ করেছিলেন সচেতনভাবে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পার্টির কোন সমস্যা নিয়ে আমার সাথে কথা বলেন নি। আর আমিও তাঁকে এ বিষয়ে কখনো কোন প্রশ্ন করিনি। তিনি আমার বাসায় আসতেন। পুরো পরিবারকে ভীষণ আদর করতেন।

বারবার একই প্রশ্ন করে হয়তো আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি। তবু শেষ একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। কত ঘটনাই তো আপনার চোখের সামনে ঘটছিলো। ছয়দফা। গণঅভ্যুত্থান। নির্বাচন। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধ। একজন রাজনৈতিক কর্মী না হোক একজন রাজনীতির পর্যবেক্ষক হিসাবে আপনি তখন কি ভাবছিলেন?

—এখন এসব বিষয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে কথা বলা ছাড়া তো উপায় নাই। পেছনের দিকে তাকিয়ে বললেও বলবো, ভাবছিলাম এই কথাই যে দেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, আমরা যে স্বপ্ন দেখতাম সে স্বপ্নের মধ্যে এ্যান্টি-হিউম্যান অর্থে এ্যান্টি-পাকিস্তানী হওয়ার ব্যাপ্যার ছিলো না। Pakistan was also a land of people. আমরা সেজন্য পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি তৈরি করেছি। আমরা পাকিস্তানের গণতন্ত্রায়ন চেয়েছি। এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রক্রিয়াটার মধ্যে ডেমোক্রেটিক ইলিমেন্টগুলোকে যুক্ত করতে চেয়েছি। এসব নিয়ে অনেক কথা আছে। যেমন ধরো, মুজিব মণি সিংহকে বলছে, দাদা এবার লাগাইয়া দেই? মণি সিংহ বলেছেন, একটু ধৈর্য ধর। অস্থির হয়ো না। আসলে কম্যুনিস্টরা লং-টার্মে চিন্তা করে। তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার টার্মে চিন্তা করেনি। সেসব যাই হোক—আমি একটা সময়ে এসে এটাই ভাবছিলাম যে যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। পিপল মুভ করছে। দেশ গণঅভ্যুত্থানের পর্যায়ে যাচ্ছে। আসাদকে হত্যার ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিন আমি সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম।

এবারে আপনার কাছে একটু তাত্ত্বিক জবাব আশা করি। জাতীয়তাবাদের রাজনীতির কাছে কম্যুনিস্ট রাজনীতি কেন পিছিয়ে পড়েছিলো? আপনি হয়তো বলবেন যে আওয়ামী লীগের ভেতরে কম্যুনিস্টরা ছিলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো রাজনৈতিক দল হিসাবে কম্যুনিস্ট পার্টি কেন আওয়ামী লীগের তুলনায় পিছিয়ে থাকলো? কিংবা ব্যক্তি হিসাবে ধরলে শেখ মুজিবের তুলনায় পিছিয়ে থাকলো? কিংবা ব্যক্তি হিসাবে ধরলে শেখ মুজিবের তুলনায় মাওলানা ভাসানী কেন ঝাপসা হয়ে গেলেন?

—কিভাবে এক কথায় উত্তর দেই! এটা একটা দ্বান্দ্বিক ব্যাপার, হেগেলিয়ান ব্যাপার। হয়তো বলতে পারি যে যা হওয়ার তাই হইছে। তবে আসল কথা হচ্ছে যে ব্যাপারটা এত সোজা না। কম্যুনিস্ট নামটা অত সহজে সামনে আসতে পারে না। এর জন্য ইতিহাসের পর্ব অতিক্রম করে আসতে হয়। তোমার প্রশ্নের উত্তরে, বলতে পারি যে এটাকে আমি কম্যুনিস্টদের ব্যর্থতা মনে করি না। কম্যুনিস্টদের অত শক্তি কোথায় যে ব্যর্থতার প্রশ্ন আসে! একটা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টকে ডেমোক্রেটিক রাখার চেষ্টা করেছে এটাই তো বড় কথা। আরেকটা ব্যাপার হলো কম্যুনিস্টরা হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। হঠকারিতার ফল ভালো হয় না। খাপড়া ওয়ার্ডের ঘটনাটার কথা বলি। অনেকে হয়তো একমত হবে না কিন্তু আমার দৃষ্টিতে খাপড়া ওয়ার্ডের ঘটনায় আবদুল হকদের হঠকারিতা ছিলো। ফল কি হলো? কতগুলো অমূল্য জীবন ঝরে পড়লো আর কম্যুনিস্টদের সাফল্য-ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বলি, কম্যুনিস্টরা কিভাবে মানুষকে মুক্তি দেবে? যার মুক্তি তাকেই অর্জন করতে হয়। এটা সক্রেটিসের কথা। কম্যুনিস্টরা যা পারে তা হচ্ছে মুক্তির অর্জনের ব্যাপারে সাহায্য করা। আরেকটা ব্যাপার হলো, কম্যুনিস্টরা একটা সমন্বিত সমাজ, মানুষের সমাজ তৈরি করতে চেয়েছে। কিন্তু বিপক্ষ শক্তি যারা তারা তো বোকা নয়, দুর্বল নয়। তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে কম্যুনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে এবং করবে। পাকিস্তান আমলেও কম্যুনিস্টদের এসব বাধা-বিঘ্নের ভেতরেই কাজ করতে হয়েছে। সুতরাং কম্যুনিস্টরা ব্যর্থ হয়েছে এটা আমি মনে করি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ : দস্তখত দিলাম তবু গ্রেফতার হলাম

৮ এপ্রিল ২০০৩

আজকের বিষয়বস্তু ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। শুধু মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস নয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গোড়া থেকেই শুরু হওয়া রাজনৈতিক ঘটনাবলী, মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময়টা—এসবই আজকের আলোচনার উপজীব্য। একজন পর্যবেক্ষক অর্থাৎ সরদার ফজলুল করিম ঘটনাগুলোকে কিভাবে দেখছিলেন? এছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থা, ভাবনা-চিন্তা, সর্বোপরি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কি ধরনের চিন্তা তৈরি হচ্ছিলো সেগুলো জানার আগ্রহও আমাদের থাকলো।

—এসব কথা বলার আগে আমি অনুরোধ করবো তোমরা ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এসব বিষয়গুলো মাথায় রাখো। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এটা প্রয়োজন। অনেক ঘটনাই মনে পড়ছে। যেমন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে হত্যার ঘটনা। তারপরে শেখ মুজিব যেদিন ছাড়া পেলেন সেদিনের ঘটনা। মুজিব ছাড়া পেয়েছেন এটা আমার কাছে অনেক বড় ঘটনা ছিলো। হাজার হাজার মানুষের মত আমিও তাঁর ধানমন্ডির বাড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু জনতার এত ভীড় ছিলো যে, আমি খুব বেশি অগ্রসর হতে পারি নি। বাড়ি ফিরে আমি ডায়েরীতে লিখলাম যে, শেখ মুজিব মানে হচ্ছে জনতা সুতরাং আমি জনতাকে দেখে আসলাম। এসব কথা বলছি ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য। কালের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য।

'৭১-এর কথা যদি জানতে চাও আমি শুরু করবো ৭ মার্চ থেকে। আমি ৭ মার্চ দেখেছি। আমি দেখেছি যে জনগণের মধ্যে পাকিস্তান সম্পর্কে একটা বড় রকমের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন চলে এসেছে। তখন আবার পশ্চিম পাকিস্তানীরা আলোচনা বা আলোচনার ধাপ্পাবাজী শুরু করেছে। আসলে ইয়াহিয়া খান যেদিন পার্লামেন্ট অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেন অর্থাৎ মার্চের ১ তারিখে সেদিন থেকে পুরো দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। অধিবেশন বসার কথা ছিলো ৩ তারিখে। ১ তারিখে শেখ মুজিব বাংলা একাডেমিতে একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার মাঝখানেই ইয়াহিয়ার ঘোষণা জানাজানি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলো। মুজিব তাড়াতাড়ি বাংলা একাডেমি ত্যাগ করে চলে গেলেন। তখন থেকেই টেনশান ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলো। আমাদের বাংলা একাডেমির পরিবেশটাও বেশ পাল্টে গেলো। সেখানে দু'একজন ছিলো যারা চলমান ঘটনাবলী পছন্দ করছিলেন না। এদেরকে এজেন্ট বলা যেতে পারে। পরবর্তীতে এদের মাধ্যমেই রেডিও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি তৈরি করে দস্তখত কালেকশান করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিলো। তখন কবির চৌধুরী সাহেবও বাংলা একাডেমীতে ছিলেন। তিনি দস্তখত দেন নি। আমি দিয়েছিলাম।

এটা কি ধরনের বিবৃতি ছিলো যে কবির চৌধুরী সাহেব দস্তখত দেননি এবং আপনি দিয়েছিলেন? আমরা জানতে চাইলাম।

Situation at Dhaka is normal-এ বক্তব্যটা গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলো। রেডিও পাকিস্তানের হেমায়েত নামের এক লোকের মাধ্যমে এ বক্তব্যের সপক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে দস্তখত সংগ্রহ করা হয়। ঐ সময়ের হলিডে পত্রিকা দেখলে তুমি এগুলো ভালোভাবে জানতে পারবে। মার্চের শেষ দিকে এবং এপ্রিলের প্রথম দিকে সরকার এ উদ্যোগটা নিয়েছিলো। কারণ তখন গণহত্যা, ধ্বংসলীলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভীষণ আলোড়ন চলছিলো। সুতরাং ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক আছে এ রকম একটা ব্যাপার প্রতিষ্ঠা করা সরকারের পক্ষে ভীষণ জরুরি হয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু ঢাকার পরিস্থিতি তখন স্বাভাবিক ছিলো না। এটা সবাই জানে। কিন্তু আপনি সরকারের পক্ষে দস্তখত দিলেন। কেন এই মিথ্যাচারের পক্ষে আপনি দস্তখত দিলেন?

—আমার ব্যক্তিগত রূপান্তরের কথা তোমাকে আগের আলোচনায় বলেছি। দস্তখত প্রসঙ্গে বলি, হেমায়েত আমাকে বললো যে স্যার দস্তখত না দিলে কি হবে এটা আপনি তো বোঝেন। কাজেই ডিশিসানটা আপনাকে নিতে হবে। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, আমি যদি কথামত কাজ না করি তাহলে তারা রিপোর্ট করবে যে Sardar Fazlul Karim has refused to sign the statement. ফল হবে এই যে, আমার বাসা আক্রমণ হবে, আমাকে হয়তো আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে। আর ঢাকায় থাকতে হলে আমাকে দস্তখতটা করতে হবে।

এই ভীতিটা তো কবির চৌধুরী সাহেবের জন্যও প্রযোজ্য ছিলো? আমাদের প্রশ্ন।

—না, কবির চৌধুরী সাহেব এবং সরদার ফজলুল করিম এক না। এটা তোমাকে বুঝতে হবে। তোমরা ইয়াংম্যানরা বুঝতে চাও না। কবীর চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের অনেক যোগাযোগ ছিলো। আর্মিতে তাদের কাছের লোকজন অফিসার পদেও ছিলেন। কাজেই তিনি যা করতে পারেন আমি সরদার ফজলুল করিম সে কাজ করতে পারি না। এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব কৈফিয়ৎ। দস্তখত না দেওয়াটা সরদার ফজলুল করিমের সাহসে কুলায় নাই।

আপনি পারিবারিক কারণ দেখাচ্ছেন, কানেকশান না থাকার কথা বলছেন। অথচ সে সময়ই অসংখ্য মানুষ জানবাজি রেখে লড়াই করছে। এখন আপনি নিজেই নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করুন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেই এটা জরুরি বলে মনে হচ্ছে।

—আমার নিজের সম্পর্কে মন্তব্য হচ্ছে I have to remain by the side of my family. এই বিবেচনা থেকেই আমি সব কিছু করেছি। আরো জেনে রাখো যে, ২৭ মার্চ থেকে শুরু করে ৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ গ্রেফতার হওয়ার দিন পর্যন্ত নিয়মিত অফিস করেছি এবং অফিস থেকে বাসার দিকে গেছি।

জাতি কি আপনার কাছে এরকম প্রত্যাশা করেছিলো? আপনি একটা সিম্বল। আন্দোলন, সংগ্রাম, গ্রেফতার বরণের মধ্যে দিয়ে একটা সময়ে আপনার যে অবস্থান তার সাথে কি এসব ব্যাপার মেলানো যায়?

-সিম্বল মানে কি? একটু দ্বান্দ্বিক ভাবো। যদি তুমি বুঝতে না চাও তাহলে তো অসুবিধা। আমি তো আগেও বলেছি যে, আমার এক সময়কার যে রাজনৈতিক যুক্ততা পরবর্তীকালে ঠিক সে রকমভাবে আমি আর থাকি নি। একটা ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা ব্যক্তি না। আর জাতির প্রত্যাশা বলতে কি বোঝাচ্ছে এটা বুঝতে পারছি না। পুরো জাতি বলে যে শব্দটা ব্যবহার হয় সেটা একটু বাড়াবাড়ি। পুরো জাতি বলে কোন ব্যাপার কারু সামনে থাকে না। তার সামনে থাকে তার জীবনটা।

তাহলে কিছু লোক যে বলে, আমার জীবন বাঁচানোর তাগিদে রাজাকার বা শান্তিবাহিনীর মেম্বার হইছি তাদেরকেই বা কি বলার আছে?

—তাদের সাথে কিভাবে তর্ক করবা সেটা তোমার ব্যাপার। আমি শুধু বলতে পারি যে, একটা ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক না। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। আমিও নিয়েছি। তুমি বা অন্য একজন যে কোন উপসংহারে আসতে পারে। আমাকে সংশোধনবাদী, কাওয়ার্ড বলতে পারে আবার নাও বলতে পারে। জাতি, জাতির প্রতীক এগুলো বিমূর্ত ব্যাপার। কংক্রীট ব্যাপার হলো এই যে, সরদার ফজলুল করিম মনোযোগ দিয়ে বাংলা একাডেমীতে চাকুরি করে এবং সরকারের কথামত দস্তখত দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। সেপ্টেম্বরে সে গ্রেফতার হলো। যারা আমার দস্তখত দেয়া, চাকুরি করা ব্যাপারগুলো পছন্দ করেনি তারা আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলাবোরেটর বলেছে। তাদের যা মনে হয়েছে তা বলেছে। আমি কি করতে পারি! তারা অতি সহজে বলতে পেরেছে যে সরদারের দস্তখত না দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু না দেয়ার যে ফল তা থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য কেউ ছিলো না। সত্যি যে আমার সীমাবদ্ধতা ছিলো। আমি পিছু হঠেছি। সিগনেচার দিয়েছি। কিন্তু তবুও আমাকে গ্রেফতার করা হলো। এটা কেন হলো? আমার সীমাবদ্ধতা নিয়ে তুমি কথা বলছো কিন্তু কেন গ্রেফতার করা হলো সে ব্যাপারে কেন কিছু বলছো না! আমার অনুরোধ একজন ব্যক্তিকে দেখবে তার পজিটিভে-নেগেটিভে, তার সাহসে-অসাহসে। সব জায়গাগুলো ধরার চেষ্টা করতে হবে। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত সাহসী হতে পারি নি। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। কুমিল্লা থেকে আগরতলা যাওয়া কোন ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু তিনি যান নি। তিনি যা পেরেছেন আমি তা পারিনি। সাধারণ মানুষের মতই আমার মধ্যে সাহস এবং ভীরুতা উভয়ই আছে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গীতা'র বাণী উদ্ধৃত করেছিলেন। বলেছিলেন, নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য যে ব্যক্তি নিজের জীবন দান করে সেটা দান নয়—গ্রহণ। সেখানেই তার সম্পূর্ণতা। এই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের খবর তোমরা রাখো না। তিনি জানতেন যে ঘাতকরা আসবে। তিনি স্বজনদের আহাজারি করতে বারণ করেছিলেন। ঘাতকরা ঠিকই এসেছিলো। এবং তাঁকে হত্যা করেছিলো। এই একটা লোক যিনি নিজেকে দেখেছেন মানুষের সমাজের সাথে নিজেকে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেঁধে। এই লোকটা একটা সম্মিলিত সমাজ তৈরি করতে চেয়েছিলো। এমন সমাজ যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে। মানুষ মানুষের সাথে থাকবে। শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার নমস্য। আবার ধরো অগ্নিযুগের বিপ্লবী চট্টগ্রামের পূর্ণেন্দু দস্তিদার। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় স্থান ত্যাগ করেছেন। জীবন বাঁচাতে চেয়েছেন। পারেন নি। পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলেন। বাঁচতে চাওয়াটা কোন পাপের ব্যাপার না। একটা আঘাতের সামনে জীবন রক্ষা করা একজন ব্যক্তির জন্য কোন পাপের ব্যাপার নয়। সে জীবনটা কিভাবে ব্যবহার করলো সেখানে হচ্ছে বিচারের প্রশ্ন।

তাহলে সাহসিকতা, আদর্শ, আদর্শের জন্য জীবন বিসর্জন দেয়া এসব কি শুধুই কথার কথা?

—কথার কথা কেন হবে? শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখো। কথার কথা হচ্ছে, যারা কথার কথা বলে অথচ কাজ করে না। একটা লোক সিগনেচার দেয় আবার জেলেও যায়—এভাবে সম্পূর্ণভাবে একটা ব্যক্তিকে তোমার বুঝতে হবে। সে শুধুই সিগনেচার দেয় না জেলেও যায়। লোকটাকে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যায়ন করতে চাও তাহলে তার দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করাই বড় কথা না। তাকে ভালোবাসা যায় এমন পয়েন্টগুলোও খুঁজে বের করতে হবে। তার মধ্যে যদি অনুপ্রেরণাদায়ী কিছু থাকে সেগুলো খুঁজে বের করাই বড় কথা।

বেশ কিছু সময় সরদার ফজলুল করিমকে কাঁটা-ছেড়া করার চেষ্টার পর আমরা পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আলাপ যখন পদ্ধতিগতভাবে ক্যাসেট বন্দী হচ্ছিলো তখন নিবিড়ভাবে স্যারের কথাগুলোর তাৎপর্য বোঝা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে যখন ক্যাসেট থেকে তাঁর কথাগুলো তুলে এনে সাদা পৃষ্ঠায় লিখতে বসেছি তখন মনে হচ্ছিলো, আমরা যে পদ্ধতিতে তাঁকে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলাম, অর্থাৎ আপনি কেন এরকম করলেন অথচ ওরকম করলেন না। অথবা আপনার কাছে প্রত্যাশা ছিলো এরকম অথচ আপনি ওরকম করলেন—এটা একজন ব্যক্তিকে মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং মানুষ বলেই মানুষের মধ্যে যে সব সীমাবদ্ধতা থাকে সেগুলোকে সক্রিয় বিবেচনায় রেখেই মূল্যায়নের চেষ্টা করা উচিত। আজকের আলোচনার এক পর্যায়ে এসে স্যার পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায়, আমরা যারা পাকিস্তান ভাঙছি তাঁরা পাকিস্তানত্ব বাদ দেই নাই। পাকিস্তান ভেঙে ফেললেও একটা সম্মিলিত সমাজের আকাঙ্খা আমাদের মধ্যে নাই। কামরুদ্দীন আহমেদ, তাজউদ্দীন আহমেদের মত লোকেরা যারা পাকিস্তান আমলে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের বেস ছিলেন তাদের লক্ষ্য পূরণ হয় নাই। অতপর আমরা আবারো প্রথম প্রশ্নটি উত্থাপন করলাম। প্রশ্নটি ছিলো এরকমের : একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে আপনি আমাদের বলুন, যুদ্ধের দিনগুলোতে আপনার কি মনে হচ্ছিলো? দেশ স্বাধীন হওয়ার দিকে এগুচ্ছিলো এমনটা কি মনে হচ্ছিলো, না কি আপনার মনে হচ্ছিলো যে যুদ্ধ প্রলম্বিত হবে? অথবা এমনটা কি কখনো মনে হয়েছে যে স্বাধীনতা আদৌ সম্ভব নয়?

—তোমরা পোলাপান মানুষ তোমাদের কি করে বোঝাই! তোমাদের সাথে আসলে আলোচনা করা উচিত না। কারণ তোমরা সময়টাকে সেভাবে ধরতে পারবা না। আরে আমরা অফিস করেছি। তা অফিসের মধ্যে আমরা কি করেছি সেটা তুমি কেমন করে জানবা! আমরা অফিসের মধ্যে প্ল্যানচেট করেছি। প্ল্যানচেট করে জিন্নাহ, এ. কে ফজলুল হক সাহেবের কাছ থেকে স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। এগুলোর হয়তো কোন মানে নেই। এগুলো করেছি মনের আকুতি থেকে। স্বাধীন বাংলা বেতার কানের কাছে ধরে রেখেছি, রাতে শহরে কোথাও বোমা ফাটার শব্দে ভীত নয় সুখী হয়েছি। আবার বাড়ির সামনে দিয়ে মিলিটারীর গাড়ি আসলে ভয়ে কম্পিত হয়েছি। ভয় এবং সাহস উভয়ই একজন ব্যক্তির মধ্যে যুগপৎ অবস্থান করে। পর্যবেক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি ছিলো এ প্রশ্নের উত্তরে আমার আর কি বলার থাকতে পারে! আমি তোমাদের মত অত পয়েন্ট ধরে ধরে কথা বলতে পারবো না। যা বোঝার তোমাকেই বুঝে নিতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে এই উপমহাদেশে একটা বিশাল ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। শহীদ মিনার ভেঙে ফেলা হয়েছে। রমনার কালী মন্দির গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলা একাডেমীতে গোলা ফেলা হয়েছে। আমার বড় ভাইয়ের ছেলে যুদ্ধে গেলো আর এলো না, বোনের ছেলে লঞ্চে বাড়ি থেকে আসার পথে বিমান আক্রমণের শিকার হলো এবং মারা গেলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দিচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী আমাদের পক্ষে সারা বিশ্বে কূটনীতি চালাচ্ছেন। এসব দেখার পর আমার ভাবনাটা কি দাঁড়াতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

আজকের অর্থাৎ ৮ এপ্রিল ২০০৩ তারিখের আলোচনার ইতি ঘটলো স্যারের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে :

—একাত্তর সালের বড় ঘটনাই হচ্ছে একাত্তর সাল। কথাটা এজন্যই আসে যখন কেউ প্রশ্ন করে যে মুক্তিযুদ্ধ করে কি লাভ হয়েছে? আমি বলি যে মুক্তিযুদ্ধটাই তো লাভ করলাম। এই যে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, এটাই তো লাভ। যেমন ধরো, খন্দকার মুশতাকের অন্তবর্তীকালীন সরকারে অন্ত র্ভুক্তি, তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা—এসবই তো অভিজ্ঞতা। মুক্তিযুদ্ধের পরে যা ঘটেছে এখনো যা ঘটছে সবই তো মুক্তিযুদ্ধের ফল। শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এদের সবারই নিহত হওয়ার কারণও মুক্তিযুদ্ধ। ইলেকশানে কারো জেতা না জেতা, কারসাজী, বুশের দালালী বা আমেরিকানিজম সব কিছুর মূলে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ। এই ব্যাপারগুলো অনেক সময় বোধের অগম্য মনে হলেও মিথ্যা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা কি পাকিস্তানিজম পরিত্যাগ করেছো!

১২ এপ্রিল ২০০৩

একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। যা ছিলো দীর্ঘ দু'যুগের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী সংগ্রামের সফল রাজনৈতিক পরিণতি। স্বাধীন রাষ্ট্রটির জনগণের মধ্যে এই প্রত্যাশা জন্ম নেয় যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার হাত ধরাধরি করে মুক্তি সংগ্রামের অন্য লক্ষ্যটিও, অর্থাৎ অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নও এবার পূর্ণ হবে। জাতির সে প্রত্যাশা, সে স্বপ্ন তৎকালীন সিভিল শাসকরা অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত যারা ক্ষমতায় ছিলেন, কতটা পূরণ করতে পেরেছেন—এই ছিলো আজকের আলোচনার জন্য স্যারের প্রতি মোটাদাগে প্রথম প্রশ্ন।

—তুমি যে প্রত্যাশার কথা বললা, মানুষগুলোর প্রত্যাশার কথা বললা—এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। এই মানুষগুলার ভেতরে একজন সরদার ফজলুল করিমও ছিলো। আমি শুধু সরদার ফজলুল করিমের বিষয়েই কিছু কথা বলতে পারি। বটেই আমার কিছু প্রত্যাশা ছিলো। তবে একথাও বলবো যে, তেমন সাংঘাতিক কোন প্রত্যাশা ছিলো না। আমি তোমাকে আগেও বলেছি যে আমি তেমন কোন সাংঘাতিক ব্যক্তি বা রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম না। প্রত্যাশা থাকবে তাদের যারা পুরো ব্যাপারটাকে সফল রূপ দিয়েছিলেন। ধরো শেখ মুজিবের। ধরো তাজউদ্দিনের। প্রত্যাশা থাকবে তাদের দলের। এখন প্রত্যাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এসব বিষয়ে তোমাকে একটা ব্যাপার বুঝতে হবে। সন্দেহ নেই যে শেখ মুজিব সবচেয়ে বড় ব্যক্তি ছিলেন। এখন মুজিব বলে কথা নয় সব বড় ব্যক্তিরই পোলাপান থাকে বউ থাকে আত্মীয়-পরিজন বন্ধু থাকে। তাদের আদর-আবদার থাকে। রুঁশোর ঐ বাক্যটা যদি তুমি মুখস্থ রাখ তাহলে ভালো হবে—man is born free and every where he is in chain অর্থাৎ মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সে সর্বত্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ। খেয়াল করো, রুঁশো 'এবং' শব্দটা ব্যবহার করছেন 'কিন্তু' শব্দ নয়। কথাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম এই জন্য যে, শেখ মুজিবের তো সীমাবদ্ধতা আছে। তাঁরও শৃঙ্খল আছে। কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে, যত শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ সবগুলো ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। মুজিবের পক্ষেও সম্ভব নয়। সুতরাং আমি যখন আমার প্রত্যাশা তৈরি করি তখন আমাকে মনে রাখতে হবে যে, যারা আমার প্রত্যাশা পূরণ করবে তাদেরও শৃঙ্খল আছে। আমি এভাবেই দেখি।

এ পর্যায়ে এসে স্যারের কাছে জানতে চাওয়া হলো : স্বাভাবিক যে, মানুষ যে মাত্রায় প্রত্যাশা পূরণ চেয়েছিলো সেভাবে হবার নয়। প্রত্যাশা পূরণকারীদের সীমাবদ্ধতার কথাটা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমরা জানতে চাই প্রত্যাশা পুরণের দায়িত্ব যে কর্তৃপক্ষের তাদের ঝোঁকটা কোনদিকে ছিলো? একাত্তর সালে একটা ট্রেন্ড-সেট হয়েছিলো। ট্রেন্ডটা হলো পাকিস্তানতন্ত্রের বিপরীত একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। যে রাষ্ট্র নিজ জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে সদা-সচেষ্ট থাকবে। সে ঝোঁকটা কতটা বেগবান হয়েছিলো সে সম্পর্কে আপনি আমাদের বলুন।

প্রশ্ন শুনে স্যার অনেকটাই রেগে উঠলেন এবং বললেন :

—কি বলো এসব কথাবার্তা! তোমরা কি পাকিস্তানিজম রিজেক্ট করেছো! Do you understand what is Pakistanism? মোটা দাগে বুঝলে হবে না। সূক্ষ্মভাবে বুঝতে হবে। পাকিস্তানিজমের যে আঘাতটা সেটা ইনক্লুডিং শেখ মুজিব বেশিরভাগই বুঝতে পারে নাই। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন এর মধ্যে খারাপ কিছু নাই। অধিকাংশ লোক ভোট দিয়েছে, তাহলে কেন তিনি এই ন্যায্য দাবিটা করবেন না! সেটা ঠিকই আছে। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়া হবে কি হবে না, শুধু এটুকুর মধ্যেই পাকিস্তানিজম ব্যাপারটা সীমিত নয়। এটা সুদীর্ঘকালের পরিকল্পনা প্রসূত। ব্লু-প্রিন্ট। ভারতীয় উপমহাদেশে যাতে করে একটা মানবিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে না পারে, যাতে মানুষ কখনো মানুষ হতে না পারে, যাতে মানুষ মানুষকে মারে—এসব লক্ষ্য থেকেই পাকিস্তানিজম তৈরি হয়েছে। এটা একদিনে হয়নি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করার পর তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এই বলে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে entire East Bengal has gone red.

আপনার এসব কথার সাথে দ্বিমত নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। আপনি কি মনে করেন না যে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানতন্ত্র নামক ধারণাটা পরিশোধিত হয়েছিলো বা পরিত্যাজ্য হয়েছিলো—স্যারের সামনে প্রশ্ন রাখা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—পরিশোধন হয় নাই তো। পরিশোধনটা তো আপনা-আপনি হয় না। কাউকে করতে হয়। এই উপমহাদেশকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের যে নীল-নকশা, সেটা মুক্তিযুদ্ধের ফলেও শেষ হয়নি। ব্রিটিশ আমলে এবং পাকিস্তান আমলে বেছে বেছে সেই লোকগুলোকেই নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হয়েছে যারা মানুষে মানুষে সৌহার্দ্র চায়, সম্প্রীতি চায়। যারা একটা মানবিক সমাজ চায়। পাকিস্তান হওয়ার পর যখন ইন্টিলিজেন্স ব্রাঞ্চের হিন্দু অফিসাররা চলে যাচ্ছিলো তখন সরকার আরো কিছুদিন থেকে যাওয়ার জন্য তাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিলো। কি কারণে এমন অনুরোধ করেছিলো? উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের ভেতরের প্রগতিশীল ইলিমেন্টগুলোকে চিনে নেয়া। তারপরে ধরো পার্টিশানের সময়ের কথা, তখন আমি কে? আমি তো কেউ না। টার্গেট হওয়ার মত কিছু না। কিন্তু ইন্টিলিজেন্স ব্রাঞ্চ মনে করেছে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই লোকটার মধ্যে কিছু একটা আছে। অতএব তারা আমাকে ধরেছে। এর অনেক পরে অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে আগে যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফিরে আসার চেষ্টা করছি তখন প্রভাবশালী একজন আমাকে বলেছিলো, আপনি তো কম্যুনিস্ট। আমি জানালাম যে আমি কোন রাজনীতি করি না। ঐ লোকের ভাষ্য ছিলো, আমি তা মনে করি না। যে বীজ আপনার মধ্যে ঢুকেছে, সে বীজ কোনদিন বেরুবে না। আবার ধরো, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কেউ একজন আমাকে বলেছে, আপনি ইসলামের উপর একটা আর্টিকেল লেখেন। আমি বলেছি, আমি যা পারি তাই তো লিখবো! ইসলামের উপর আমাকে লিখতে বলছেন, ঠিক আছে। ইসলাম তো খারাপ কিছু না। কিন্তু আমাকে তো সময় দিতে হবে—আমি এভাবে উত্তর দিয়েছি। জিসি দেবের কাছে অনুরোধ করে বলেছি যে স্যার আমি একটু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে চাই। তিনি বলেছেন, দ্যাখো আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি তো হিন্দু লোক। তুমি যদি মন্ত্রী সাহেবকে একটু বলতে পার তাহলে আমার সুবিধা হয়। আমি তখন বলেছি, মন্ত্রীর কাছেই যদি যাবো তাহলে আপনার কাছে কেন এসেছি! এত কথা বলছি পাকিস্তানিজমের প্রগাঢ়তা বোঝানোর জন্য।

তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে স্বাধীনতার পরও সেই ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে?

—রয়ে গেছে মানে? সাংঘাতিকভাবে রয়ে গেছে। এজন্যই একটু আগেই বলেছি যে পাকিস্তানিজম জিনিসটা কত ভয়ংকর সেটা বড়-বড় সব লোকেরাও বুঝতে পারেনি। তাহলে কিভাবে আশা করবো যে স্বাধীনতার তিন-চার বছরের মধ্যেই সব একেবারে পাল্টে যাবে! এ হয় না। একটা সমাজকে পরিবর্তন করাটা কত বড় একটা ব্যাপার তা অনেকেই বুঝতে পারে না। পাকিস্তানিজম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকমত বুঝতে না পারার কারণে শেখ মুজিব এমনকি নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থাটাও সেভাবে করেন নি। অবশ্য ঠিকঠাক নিরাপত্তা নিলেই মুজিব বেঁচে যেতেন তা নয়। নানান ফোর্স সর্বক্ষণই কাজ করে।

এরকমই যদি হয় তাহলে পাকিস্তান পর্ব থেকে বাংলাদেশ পর্ব কিভাবে আলাদা?

—সন্দেহ নেই যে একটা অতি বড় ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু স্পষ্ট করে জেনে রাখো যে সে সময় যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকতো তাহলে তোমার সাধের বাংলাদেশ আসতো না। প্রায় এক লাখ সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানীরা সারেন্ডার করবে? অ্যাবসার্ড! আরেকটা ব্যাপার ইন্দিরা গান্ধীর সাপোর্ট। পাকিস্তানিজম ব্যাপারটা ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলো কম্যুনিস্ট পার্টি। সেজন্যই এক সময় তারা আবুল হাশিমের পাশে থেকেছে। পরে মুজিবের পাশে এসেছে। কিন্তু মুজিবের কি ঘটেছিলো? স্বাধীনতার পরে তো শেখ মুজিব ধর্মপ্রাণ হতে থাকলেন। কম্যুনিস্ট পার্টি কি করবে? তাদের তো অত শক্তি নাই যে মুজিবকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে। এত শক্তি নাই যে ক্ষমতা দখল করে একটা সরকার গঠন করতে পারে। এত শক্তি নাই যে লেনিনের মত বলতে পারে, now or never. এত শক্তি নাই যে সমস্ত বিভাজনের দেয়াল তুলে দিয়ে বলতে পারে যে, হিন্দু-মুসলমান এসব কোন প্রশ্ন নাই। একমাত্র ব্যাপার হচ্ছে মানুষ। মানুষের বাংলাদেশ। সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মবাদ তো কোন তুচ্ছ ব্যাপার না। তাদের শক্তি আছে। ব্যাপক শক্তি। আমার কথা হচ্ছে, শিকড়ে পৌঁছার চেষ্টা না করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে শর্ট-কাট পথে বুঝতে পারবে না।

কিন্তু আপোষ করেও মুজিব বাঁচতে পারলেন না। আপনি কি মনে করেন যে তাঁর ব্যর্থতার মধ্যেই পরবর্তী সমস্যাগুলোর বীজ নিহিত?

—আপোষ না করে কি করবে! যা করা উচিত সেটা মুজিব করেন নি বা করার কথাও নয়। কিন্তু আপোষ করলে বাঁচতে পারবেন এমন কোন কথা নেই। বাংলাদেশটাকে মানুষের বাংলাদেশ বানানোর প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদ মেনে নিতে পারে না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে—এমন তো কোন সামাজিক শক্তি ছিলো না যারা মানুষের বাংলাদেশ বানানোর ব্যাপারে মুজিবকে বাধ্য করতে পারে।

আজকের আলোচনা শেষে মূল প্রশ্নটির ব্যাপারে স্যারের মূল্যায়নকে আমরা বুঝে নিলাম এভাবে : মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকারের জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন-সাধ পূরণের ব্যাপারটা অত সহজ ব্যাপার ছিলো না। এক্ষেত্রে সামর্থের অভাববোধের অভাব ইচ্ছার অভাব সবকিছুই কাজ করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার শেখ মুজিবকে মেরে ফেলা হয়েছে

৭ মে ২০০৩

স্যারকে জন্মদিনের বিলম্বিত শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করা হয়। ১ মে স্যারের উনআশিতম জন্মদিন উপলক্ষে শুভানুধ্যায়ীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষজনের উপস্থিতিতে সেদিন তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলেন—মানুষ, মানুষের সমাজ, বর্তমান বাংলাদেশ পরিস্থিতিসহ সভ্যতার উপরে সাম্রাজ্যবাদের চলমান আগ্রাসন সম্পর্কে। শ্রোতা হিসাবে সেদিন আমরাও উপস্থিত ছিলাম। আজকের আলোচনার ক্ষেত্রেও আমরা অন্যান্য দিনের মতই পূর্ববর্তী আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চাইলাম। গতদিন স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম গণতান্ত্রিক শাসনামল সম্পর্কে স্যার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু মূল্যায়ন হাজির করেছিলেন। আজকে আমরা প্রথম গণতান্ত্রিক শাসনামলের যে রক্তাক্ত অবসান ঘটেছিলো এই বাংলাদেশে সে সম্পর্কে কিছু শোনার আকাঙ্খা করি। আমাদের প্রথম প্রশ্নটি ছিলো : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা আপনি যখন প্রথম শুনলেন সে মুহূর্তে আপনার কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো?

—এই প্রশ্নটা করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কারণ সেদিনের ঘটনার অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আছে। এবং এ কথাগুলো বলা দরকার কেননা আমি মরে গেলে পরে তো আর কাউকে জানাতে পারবো না। কোন সন্দেহ নেই যে সেদিনের ঘটনাটা সাংঘাতিক। সে সাথে একথাও বলছি যে ঘটনার সংবাদটা যখন আমার কাছে এলো, তোমাকে মনে রাখতে হবে যে সংবাদটা কোন অসচেতন লোকের কাছে এলো না। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের টীচার। কয়েক বছর আগে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন আমার গুরু অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এবং তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী। বুঝতে পারছি যে, তোমরা এসব পূর্বকথনে বিরক্ত হচ্ছো। তোমরা এত মেকানিক্যাল যে যা চাও টু দি পয়েন্ট তাই দিতে হবে! কিন্তু আমার তো উপায় নাই। আগের কথাগুলো না বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না। যা হোক। আমাকে জয়েন করানোর সিদ্ধান্ত হলো কিন্তু প্রফেসর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এটাও ভাবলেন যে একটু ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আসাটা দরকার। অর্থাৎ শেখ মুজিবের ক্লিয়ারেন্স। তিনি আমাকে সাথে করে মুজিবের কাছে নিয়ে গেলেন। আমার খবর পেয়েই তিনি আসলেন এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, এই সরদার আপনি কই আছেন? আমিও নিজস্ব ভঙ্গিতে উত্তর দিলাম, আমি তো রাস্তায় আছি। তিনি বললেন, রাস্তায় ক্যান! আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে থাকবেন। কথাটা শুনে মুজাফফর চৌধুরী নিশ্চিত হলেন। আমি জয়েন করলাম। আর বিস্তারিত না বলি। কিন্তু পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত মুজিবের সাথে আমার আরো স্মৃতি আছে। এখন ১৫ আগস্টের কথায় আসি। এর কয়েক দিন আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে সম্বর্ধনা দেয়ার জোর প্রস্তুতি চলছে। আমি তখন বিশ্ববদ্যিালয়ের ফুলার রোডের আবাসিক এলাকায় একেবারে রাস্তার ধারের একটা ফ্ল্যাটের নিচতলায় থাকি। বেডরুম থেকে পুরো রাস্তাটা দেখা যায়। ভোর বেলায় আমি মাইকের আওয়াজ শুনলাম। মাইক লাগানো একটা গাড়ি থেকে আমি একটা আওয়াজই শুনতে পেলামঃ খুনী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘোষণা দিতে দিতে গাড়িটা চলে গেলো। আমি সে সময়ে অন্য যে কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকলেও এরকম ঘোষণা শোনার জন্য কোনভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না। বঙ্গবন্ধু সকালবেলা কখন ক্যাম্পাসে আসবেন কখন যাবেন—এসব নিউজের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, এ নিউজের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। সেই সকালেরই আরো একটা ঘটনা আমার মনে দাগ কেটে আছে। ঘোষণা শোনার কিছু পরেই দেখলাম যে মার্কিন পতাকা ওড়ানো একটা গাড়ি নিউ মার্কেটের ওদিক থেকে এসে কলাভবনের পাশ ঘেঁষে ইন্টারন্যাশনাল হলের দিকে গেলো। কিছু সময় পরেই আবার আগের রাস্তা ধরে ফিরে গেলো। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার কাছে। এগুলো সবই মুজিব হত্যার প্ল্যানিংয়ের অংশ। বিনা প্ল্যানিংয়ে তো কিছু হয় না। এই পর্যন্তই আমি বলতে পারি। এটুকুই আমার মনে আছে।

আপনি এসব দেখলেন, মুজিব হত্যার ঘোষণাও শুনলেন। তখন আপনার প্রতিক্রিয়াটা কেমন হয়েছিলো?

—আরে সাংঘাতিক! এর পরেও পোলা তুমি আমার অনুভূতির কথা জানতে চাও! আমার শেখ মুজিবকে মেরে ফেলা হয়েছে একথা জানার পরও তুমি কি মনে কর যে আমার খুব আনন্দের অনুভূতি হয়েছিলো! তুমি কি এরকম অনুভূতির কথা শুনতে চাও! মাইকের ঘোষণায় কারা ছিলো, গাড়ি করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে এসেছিলো সেসব আমি জানি না। তবে কথা হলো, আমি যেহেতু রাজনীতি করা লোক, আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অনুভূতি হয় নাই। আকাশ তো ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবারের মাথায়। পরিবারই বা কোথায়? তাদেরকেও তো হত্যা করা হয়েছে। ওয়াইফ, বাচ্চা, আত্মীয় সবাইকে। শেখ মুজিব তো কাউকে ভয় পায় নাই জীবনে। ঘাতকদের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ কথা ছিলো, তোরা কি করছিস! ঘাতকের ব্রাশফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার আগে সে শুধু বিস্ময়ের সাথে বলেছে, তোরা কি করছিস! গান্ধীজি যেমন বলেছিলেন, হে রাম। আর কি বলবো? বলতে পারি যে মুজিবকে হত্যার মধ্যেই ঘটনা শেষ হয়ে যায় নি। পরবর্তী ঘটনাগুলোর সাথে এই হত্যার যোগসূত্র আছে। যেমন ধরো খন্দকার মোশতাক আসলো। সে রাজত্ব শুরু করলো। আওয়ামী লীগের অনেকে তার সাথে যোগ দিলো বা দিতে বাধ্য হলো। কেন এমন হলো আমি জানি না।

পঁচাত্তরের পরবর্তীতে যে ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করলো সে সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? একাত্তরের পরে যেটুকু গণতন্ত্র পাওয়া গেলো সেটুকু নাই হয়ে গেলো—আমাদের এরকমই মনে হয়। আপনার কি মনে হয়?

—আমার কিছুই মনে হয় না। কি আবার মনে হবে? দেশে সামরিক শাসন আসছে তাতে কি হইছে? আমি আমার পরিবার নিয়ে থাকছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইছি। বাংলাদেশে সামরিক শাসন আসছে দেখে আমার মন কাঁদছে। তাতে কি হইছে? এগুলো বলার কিছু আছে নাকি? মুজিবকে শেষ করে ফেলার পর কখন কার ভাগ্যে কি ঘটবে তা কেউ জানতো না। মুজিবকেই যদি এই বাংলাদেশের মাটিতে শেষ করে ফেলা যায় তাহলে অন্যরা নিজের সম্পর্কে আর কিইবা ভাবতে পারে? এই বাস্তবতার মধ্যে আমাকেও বাঁচতে হয়েছে। ভয়ে এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করিনি পর্যন্ত। ক্লাশে সক্রেটিস, প্লেটো, মুভমেন্ট অফ সোসাইটি পড়িয়েছি। বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে সমাজ কখনো অপরিবর্তিত থাকে না। ছেলেমেয়েদেরকে এভাবে জেনারেল টার্মে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছি। তাদের বলেছি যে, you have to enjoy your won death. কেউ একা তার জীবনটাকে পাল্টে ফেলতে পারে না। এটা সম্ভব না। আবার জীবন অপরিবর্তিত থাকে না এটাও সত্য। তাহলে মানুষ যা করতে পারে তাহলো পরিবর্তনটাকে বোঝার চেষ্টা করা। এটা একটু হেগেলিয়ান ব্যাপার। এই মতে মানুষ ইতিহাসের অসহায় দর্শক মাত্র।

আপনিও কি একই মত পোষণ করেন?

—না। আমি আবার একটু মার্কসবাদে বিশ্বাসী।

তাহলে হেগেলকে সাক্ষী মানছেন কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—দেখো, মার্কসও হেগেলকে ফেরে দেন নি। মার্কস হচ্ছেন নিউ-হেগেলিয়ান। মার্কস একমত যে একজন ব্যক্তি একজন শ্রমজীবী মানুষ ইতিহাসকে বদলে দিতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস বলে যদি একটা ব্যাপার থাকে এবং তার যদি একটা মুভমেন্ট থাকে তাহলে এই মুভমেন্টের পেছনে একটা ফোর্সও থাকে। এই ফোর্স হচ্ছে মেহনতী মানুষ, নির্যাতিত মানুষ।

আমরা দেখলাম যে স্যার পুরো বিষয়টাকে দার্শনিকভাবে দেখতে সমর্থ। সেজন্যই তিনি ১৫ আগস্টের পরের জেল হত্যা, খালেদ মোশাররফ, কর্ণেল তাহের ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলাদা করে কিছু বলতে চাইলেন না। ঐ সমস্ত ঘটনার তথ্য-প্রদায়ক হিসাবে তিনি কিছু বলতে অপারগতা জানালেন। কারণ হিসাবে এটুকুই উল্লেখ করলেন যে তিনি ঐ ঘটনাগুলোর ভেতরটা ভালো জানেন না। আমাদেরও মনে হলো যে সরদার ফজলুল করিমের কাছ থেকে নিছক ঘটনার বর্ণনা শুনতে চেয়ে লাভ নেই। বরং পুরো একটা প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তাঁর পর্যবেক্ষণমূলক মন্তব্যগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। তেমন লাভ নেই জেনেও আমরা দিনের শেষ প্রশ্ন উত্থাপন করলাম : আপনি ঘটনাবলীকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সমগ্রের আলোকে দেখেছেন এটুকু বুঝতে পারছি। তবু আপনি বলুন লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যে জাতি স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে সামরিক শাসন কেন তাদের জীবনে আবারো ফিরে এলো?

—এসব মাস্টারি প্রশ্ন করে লাভ নেই। যে লোক নিজেকে বাংলাদেশ মনে করার মত মন ছিলো, যে লোক নিজের প্রটেকশানের ব্যবস্থাও সেভাবে নেয় নাই সেই শেখ মুজিব পর্যন্ত খুন হয়ে যায়—এরকম ঘটনাকে তুমি জাতি, লক্ষ প্রাণ, সামরিক শাসন এরকম শব্দ ব্যবহার করে বুঝতে পারবা না। সমগ্রের মধ্যেই কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে। আর একটা কথা, তুমি বললে যে বাঙালি জাতি দীর্ঘ দিন আন্দোলন—সংগ্রাম করেছে তারা কেন আবার সামরিক শাসনের যাতাকলে পড়বে। এ কথার অর্থ আমি বুঝলাম না। তোমাদের মত লোকের কাছে পনের বছরের সামরিক শাসন অনেক ভয়ংকর ব্যাপার হতে পারে, আমার কাছে তেমন কিছু না। মানুষের সমাজে উপনীত হওয়ার সংগ্রাম শেষ হতে পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ বা একশ লক্ষ বছরও লাগতে পারে। তাতে কি? ব্যক্তি যতক্ষণ না জনতায় পরিণত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ঘটে না। সেদিক থেকে দেখলে বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে মাত্র পনেরো বছরেই জনতার সংগ্রাম তৈরি হয়েছিলো। এবং সামরিক শাসনের পতন ঘটেছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কারবার আরো কতবার ঘটবে

২১ মে ২০০৩

আজকের আলোচনার শুরুতে স্যারকে জানানো হলো যে, গতদিনের আলোচনার দ্বিতীয়াংশে এসে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলোতে আমরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। কেননা বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূচনা এবং এর অভিঘাত সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় নি। আমরা এও বললাম যে কিছু কথাবার্তা আমাদের মাথার উপর দিয়ে গেছে। স্যার এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আজও কথা বলতে রাজী হলেন। আমরা অনুরোধ করলাম যে, শুধু সামরিক শাসনের সূচনা এবং অভিঘাত নয় বরং অবসান পর্ব সম্পর্কেও কিছু বলুন। কেননা '৯০ সালের ঘটনা যাকে আমরা গণঅভ্যুত্থান বলতে অভ্যস্ত অথবা স্যারের ভাষা অনুসরণে বলতে পারি ব্যক্তির জনতায় রূপান্তর পর্ব—সে সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন জানাটা জরুরি।

—তুমি চাচ্ছ মূল্যায়ন। মূল্যায়ন কিইবা করি। যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো প্রার্থিত নয়। তবু ঘটেছে। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় চাকুরি জীবনের শেষপ্রান্তে। তুমি বোধ হয় ঠিক সে সময়েরই ছাত্র হবে—ঠিক মনে করতে পারছি না। যাই হোক, তখন ছাত্ররা বোমা ফাটাচ্ছে। বোমার কারণে ক্লাশে কথা বলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বোমা বন্ধ হলে আবার ক্লাশ শুরু হচ্ছে। ছাত্ররা মাঠে শুয়ে পড়ে একদল আরেক দলের সাথে বন্দুক যুদ্ধ করছে। এসব ঘটনার কোনটিই উত্তম ব্যাপার নয়। একথা সবাই বলবে। তথাপি কেন ঘটেছে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ না। তবে এগুলো জীবনেরই অংশ। মানুষের খুনাখুনি, মারামারি ছিলো না এমন কোন কাল পাওয়া যায় না। তাহলে কি হবসের কথাই সত্য? হবস বলেছেন যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই এরকম, সে অন্যকে মারতে চায় সে সন্দেহপরায়ণ, ঈর্ষাকাতর ইত্যাদি। হবস একেবারে অসত্য বলেন নি। প্রাচীনকালেও মানুষ এরকম ছিলো। পরবর্তীতে এসব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষই আবার পরস্পর চুক্তি করলো। সামাজিক চুক্তি—যা রাষ্ট্র উদ্ভবের শর্ত। চুক্তি হলো এই মর্মে যে তারা পরস্পর মারামারি করবে না। চুক্তি হলে কি হবে? ব্যাপারটা কি এতই সোজা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মার্কসীয় ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে আদিম সাম্যবাদী সমাজে হানাহানি, মারামারির ব্যাপার ছিলো না।

—মনে রাখতে হবে যে তখন রাষ্ট্রের মত নিপীড়নকারী কোন সংগঠন বিকশিত হয়নি। আজকের অর্থে ধর্মও বিস্তার লাভ করেনি। অর্থাৎ হানাহানি, মারামারির মূল কারণগুলো বিকশিত হয়নি। অবশ্য এরকম ভাবাটা পুরোপুরি সঠিক হবে না যে আদিম মানুষ শুধুই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন-যাপন করতো। তাদের মধ্যে কোনই দ্বন্দ্ব ছিলো না—এরকম ভাবাটা ঠিক হবে না। তবে ইতিহাসের পর্ব হিসাবে ভাগ করে, আজকের সময়ের সাথে তুলনা করে বলা যায় যে, আদিম মানব সমাজে বিরোধিতার ধরনটা ছিলো আপোষমূলক বিরোধিতা। আর বর্তমান মানব সমাজের বিরোধিতার ধরনটা হচ্ছে অনাপোষমূলক বিরোধিতা। এখনকার বিরোধিতায় কেউ কাউকে ছাড় দেয় না। আদিম মানুষের যৌথ জীবন-যাপন করার বিকল্পও ছিলো না।

বর্তমান যুগে মানুষে মানুষে সংঘাতের কারণ সম্পর্কে স্যারের দার্শনিক ব্যাখ্যা শোনার পরে আমরা '৯০ সালে ফিরে আসতে চাইলাম। প্রশ্ন করলাম : '৯০ সালে বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটেছিলো, তাকে সচরাচর গণঅভ্যুত্থান বলা হয়ে থাকে। আপনি কি ঐ সময়ের ঘটনাবলীকে গণঅভ্যুত্থান হিসাবে আখ্যায়িত করতে চান?

—এসব শব্দ ব্যবহারে সুবিধা আছে আবার অসুবিধা আছে। '৯০ সালের আগেও ঘটনা ঘটেছে। জিয়াউর রহমানকে যে মারা হলো সেটাও একটা বড় ঘটনা—যার মাধ্যমে এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। তারপরেও অনেক ঘটনা। নূর হোসেনকে মারা হলো ইত্যাদি নানা ঘটনা। অর্থাৎ '৯০-র সামরিক শাসনের পতনটা একবারের চেষ্টায় হয়নি। এখানে একটা কথা বলি, এরশাদ অত্যন্ত চালাক লোক। এবং সে একটা পলিটিক্যাল লোক। এরকম পলিটিক্যাল লোক কম পাওয়া যায়। ক্ষমতায় থাকার জন্য সে কত রকমের ফন্দী-ফিকির করলো! সে বিদায় নেবে অথচ নিচ্ছে না। বিভিন্ন কৌশল করছে। বলছে কার কাছে রিজাইন দেবো? তারপরে আবার একটা ভাইস প্রেসিডেন্ট বানালো। ইত্যাদি অনেক কিছু সে করেছে। অত্যন্ত চালাক লোক। তবু শেষমেশ তার পতন হলো। এই ঘটনাটা ঘটার কারণ হলো মানুষের মোর্চা। মানুষের মোর্চা ক্রমান্বয়ে ছোট থেকে বড় হয়েছে। মানুষ এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন হয়ে অসংখ্য মানুষের মোর্চা যখন গড়ে উঠেছে তখনই ৯০'র ঘটনাটা ঘটেছে। এটাকে অভ্যুত্থান বলতে চাইলে বলতে পার। গণঅভ্যুত্থান আমি '৬৯ সালেও দেখেছি। সে সময় একদিন আমি শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি একদল লোক জেলখানা থেকে থেকে বেরিয়ে লাঠি-সোঁটা হাতে চলে আসছে। সেই দলটার সামনে একটা লোককে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দেখতে পেলাম। তিনি আমার সত্যেন সেন। সত্যেন সেনও একটা লাঠি কাঁধে করে জেলখানা থেকে চলে আসছেন। এটা একটা সিম্বলিক ব্যাপার। তাঁর মত একটা লোকও লাঠি কাঁধে করে চলে আসছেন! এই হচ্ছে গণঅভ্যুত্থান। নব্বইতেও একই রকম ব্যাপার। গণঅভ্যুত্থান যাকে বলছো তার মধ্যে কিন্তু গোলেমালে হরিবোল বলে একটা ব্যাপার থাকে। এর কোন ছকবাঁধা থাকে না। ঐ অবস্থাটার সুযোগ যে যেমন নিতে চায় এবং যে যেমন নিতে পারে সেটাই পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। '৯০ সালের ঘটনার সময় আমিও প্রেস ক্লাবের সামনে এসেছি। এরশাদ পতনের পর বন্ধুদের সাথে হাত মিলিয়েছি। পরস্পরকে বলেছি, দেখছেন কত বড় কারবার! আবার এ কথাও বলেছি, এই কারবার আরো কতবার ঘটবে তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

আমরা একটু কথা বললাম। বললাম যে, ঐ কারবার অর্থাৎ '৯০-র ঘটনার পর এক যুগেরও বেশি সময় কেটে গেছে। বলা হয় যে এটা হলো গণতন্ত্রে পুনঃপ্রবর্তনের কাল। আপনার কি মনে হয় '৯০-র ঘটনা থেকে লাভের লাভ কিছু কি হয়েছে?

—প্রথম কথা হলো, একটা পরিবর্তন তো আসছে। এক ধরনের সরকার ছিলো। তার পরিবর্তে আরেক ধরনের সরকার এলো। যারা সরকার বানালো তারা বললো, এটা ভালো। তুমি হয়তো বললা যে না পুরা ভালো না। ঠিকই আছে। পর্যবেক্ষণ করলে দেখবে, যে পরিবর্তনই হোক না কেন তার পজিটিভ নেগেটিভ উভয় দিকই থাকবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই। পজেটিভ দিক অনেকই আছে। পরপর দুইজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী—এরকম আর কোথায় পাইবা আদৌ কিছু লাভ হইছে কিনা এরকম প্রশ্ন তোলা সোজা। কিন্তু একটা নষ্ট সিস্টেমের মধ্যেও ভালো পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করে সামনে তুলে ধরাটা জরুরি। কোন একটা সিস্টেম একেবারে নষ্ট এটা বলা সোজা। কিন্তু ঐ নষ্টের মধ্যেও আলো খুঁজে বের করার কঠিন কাজটা করতে হবে। এ্যাবসলিউট নষ্ট বলে কোন ব্যাপার নাই।

তাহলে তো সামরিক শাসনকেও নষ্ট বলার কোন কারণ নাই—আমাদের মন্তব্য।

—এভাবে দেখো না। খালি সামরিক শাসনকে দোষ দিয়েই পার পাওয়া যাবে না। অন্যদের মধ্যে কি ক্ষমতার বাসনা নেই? তবে এভাবে বলা যায় যে, বেসামরিক শাসন তুলনামূলকভাবে সামরিক শাসন অপেক্ষা ভালো। কেননা সামরিক শাসনে বহুসংখ্যক লোকের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। কিন্তু বেসামরিক শাসনেও যে জনগণের আশা-ভঙ্গ হয় সে ব্যাপারটা ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে। শেষ বাক্যটিকে ধরে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন উত্থাপন করি : আমরা যাদের কাছ থেকে শাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি ধার করেছি, যাদের মত করে গণতন্ত্র বা ইত্যকার বিষয়গুলোর মডেল খাড়া করেছি, তারা কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মত শাসন পদ্ধতির ঝামেলায় ভুগছে না। আর যাই হোক, সেসব দেশগুলোতে স্বৈরাচারী শাসনের কথা চিন্তা করা যায় না। আপনি কি বলেন?

—আমি বলি যে সবাইকেই পর্যায়গুলো অতিক্রম করে আসতে হয়। আজ আমাদের এখানে যে সমস্যাগুলো দেখছো সে রকম সমস্যা সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডে ও পাওয়া যাবে। রাজা বনাম পার্লামেন্ট দ্বন্দ্ব, একজন আরেকজনের মাথা কেটে ফেলা—এসবই পাওয়া যাবে। আমেরিকায় কি কালো মানুষদের হত্যা করা হয়নি? এসব পর্যায় তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে। তবুও কি সব সমস্যার অবসান হয়েছে। বুশ প্রশাসনকে কোন চোখে দেখবো? এটা কি গণতান্ত্রিক না স্বৈরাচারী? নির্ভর করছে তোমার বলার উপর। আমি তো মনে করি যে বুশ প্রশাসন স্বৈরাচারেরও স্বৈরাচার। তুমি কি মনে কর সেটা তোমার ব্যাপার। আসল ব্যাপার হলো গন্তব্য নির্দিষ্ট করা, কোথায় যেতে চাই তা ঠিক করা। গন্তব্য নির্দিষ্ট করার অর্থই হলো বর্তমানের সমস্যাগুলোকে যে তুমি অতিক্রম করতে চাও সে ব্যাপারটা স্পষ্ট হওয়া। চলতি অর্থে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় সে গণতন্ত্রের ব্যাপারে আমার অনেকখানি উদাসীনতা আছে। গণতন্ত্র অর্থ যদি নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হয় সে গণতন্ত্র কতটুকুই বা কল্যাণকর হতে পারে? আদর্শটা যদি কল্যাণমূলক না হয়, ভালো কিছু করার যদি স্পৃহা না থাকে তাহলে এ ধরনের গণতন্ত্র আসলেই বা কি হয়? এত কথা বলার পরে আমি আবারো বলবো যে সমাজটা কিন্তু ধীরে হলেও এগিয়ে যাচ্ছে। প্রক্রিয়াটার ভেতরে আছ বলে বুঝতে পারছো না। এজন্য দূর থেকে দেখার একটা ব্যাপার আছে। বইয়ের ভেতর দিয়ে যাওয়া কোন যাওয়া না। আমি দেখি যে ১৯২৫ সাল থেকে, যখন আমার জন্ম, ধরলে সমাজ অনেকটাই পাল্টেছে। সামরিক শাসনের কথা বললে। সামরিক শাসন এসেছে কি হয়েছে? বরং লাভ হয়েছে। সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা থাকার ফলেই ভবিষ্যতে বলতে পারা যাবে যে আমরা সামরিক শাসন চাই না।

কথাগুলো শোনার পরও আমরা মন্তব্য করি : আমাদের কাছে মনে হয় যে আমাদের সমাজ ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বৈষম্য, প্রান্তিকীকরণ, হিংসা-হানাহানি, হত্যা সবই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। মানুষের শরীরী টিকে থাকার সম্ভাবনাও যেন উবে যাচ্ছে। সরদার ফজলুল করিম আমাদের মন্তব্য উড়িয়ে দিলেন না। তবে জানতে চাইলেন, পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে কিনা সেখানে এই সমস্যাগুলো একেবারেই নেই। অবশ্য মেনে নিলেন যে মাত্রাগত পার্থক্যের ব্যাপারটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য সমস্যাগুলোকে অন্যদের সাথে তুলনা করে রিলেটেভলি দেখার পরামর্শ দিলেন। যে সাথে এটাও যুক্ত করলেন যে, প্রত্যেকটি বর্তমানের ক্ষেত্রেই existance is stake. প্রত্যেকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানেরই সমস্যা থাকে এবং প্রত্যেকটা বর্তমানই সে সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে চায়। এর বিকল্প নেই। বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য মানুষের মহৎ ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত দরকারি। সমস্যার উপাদানগুলো কেন টিকে থাকছে—এ প্রশ্নের উত্তরে স্যার বলেন :

—মানুষের জীবনের কোন উপাদানই একেবারে outdated হয়ে যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে উপাদানের একটা বস্তুগত ভিত্তি থাকে। শোষক শ্রেণী, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সামরিকতন্ত্র যাই হোক না কেন, যতদিন পর্যন্ত এসবের একটা বস্তুগত ভিত্তি আছে এতদিন পর্যন্ত এগুলো outdated হবে না। এমনকি কোন একটা পর্যায়ে এসে অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলেও বস্তুগত ভিত্তির কারণে দীর্ঘদিন পূর্ববর্তী ব্যবস্থার রেশ থেকে যেতে পারে।

—তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝবো? মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন হয়েছে তবু প্রার্থিত অবস্থা তৈরি হয়নি। তবে কি এরকম বলা যায়, যে সব শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ বা '৯০-র গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে সে সব শক্তির বস্তুগত ভিত্তি এখনো রয়ে গেছে? উত্তর যদি হ্যাঁ বোধক হয় তাহলে করণীয় কি? সরদার ফজলুল করিম মনে করেন, অমুক মুর্দাবাদ—তমুক মুর্দাবাদে কাজ হবে না। মনে রাখতে হবে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোও একটা ডিমান্ডকেই সার্ভ করে। এক্ষেত্রে প্রগতিশীল শক্তির করণীয় হচ্ছে সমাজ দেহে প্রতিক্রিয়াশীলতার যে চাহিদা সে চাহিদাকে নষ্ট করে দেয়া। আপনার এসব ব্যাখ্যাকে যদি কেউ যান্ত্রিক বলতে চায় তাহলে কেমন হবে? একদিকে লক্ষ-কোটি মানুষ নিয়তই নিপীড়িত হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে অন্যদিকে আপনি বলতেও পারছেন না কবে এসবের অবসান ঘটবে? অথবা আদৌ ঘটবে কি না? নিপীড়নের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাটাই কি মূল ব্যাপার? তাহলে তো নিত্য-নতুন নিপীড়ক বা নিপীড়ন পদ্ধতি আসতে থাকবে আর আমাদেরকে সে সবের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ (!) হওয়া ছাড়া আর কিছু বাকি থাকলো না। আমাদের মন্তব্য।

—তুমি পারলে এর চেয়ে ভালো কোন নিদান দাও। আমার আপত্তি নেই। চলমান যে নিপীড়ন প্রক্রিয়া তার শিকার আমি নিজেও। তথাপি আমি কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। যদি পেতাম তাহলে অবশ্যই জানাতাম। তোমাকে খুশি করতে পারতাম। আমি যেভাবে দেখি সেভাবেই দেখে যেতে চাই। আমার কাছে কত হাজার বছর লাগলো সেটা বড় ব্যাপার না। time is timeless. তুমি অন্যভাবে দেখতে পার। তুমি হয়ত বলবে, না স্যার আমি অত বছর বাঁচতে পারবো না। আমার যা হওয়ার এই দশ বছরের মধ্যে হতে হবে। আমার এর চেয়ে বেশি ধৈর্য্য নাই। এরকম বলতে চাইলে কোন মানা নেই এটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভয়ার্ত

২ জুলাই ২০০৩

আজকের আলোচনাসহ পরবর্তী আলোচনাগুলোর ক্ষেত্রে সময়ের ধারবাহিকতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়নি। কেননা দীর্ঘদিন আলোচনা থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে, সরদার ফজলুল করিম ব্যক্তিগত অথবা সমাজ জীবনের উত্থান-পতন, কিংবা বাঁক পরিবর্তনকে এক বছর দু'বছরের ফ্রেমে ধরতে চান না। সে জন্যই এখন থেকে সাল-বছর ধরে মন্তব্য শোনার পরিবর্তে বিষয়ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ শোনানোর জন্য স্যারের বরাবরে প্রস্তাব রাখি।

কেন আপনাকে কনসটিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে পাঠানো হয়েছিলো?

—এটা এখনো আমার কাছে একটা ধাঁধা। এখনো একটা রহস্য। কম্যুনিস্ট পার্টি কেন তখন আমাকে পছন্দ করেছিলো এটা আমি আজো বুঝে উঠতে পারিনি। তখন তো আমি জেলখানায় খুব সম্ভবত ন্যাপের মোজাফফর আহমেদ জেলখানায় এসে আমার সাথে দেখা করে স্বভাব-সিদ্ধভাবে ধমক-টমক মেরে নমিনেশন পেপার সাইন করিয়ে নিয়ে যায়। আমাকে মনোনীত করার পেছনে নিশ্চয় পার্টির কোন টেকনিক্যাল কারণ থাকতে পারে যা আমি জানি না। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমাকে এখনো ভাবায়। বিস্তারিত জানবার ইচ্ছা থেকেই আমি কিছুদিন আগে সৌভিক রেজাকে মোজাফফর আহমেদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। চেয়েছিলাম সৌভিক পারলে কিছু তথ্য বের করে আনুক। খুব একটা কাজ হয়নি। তাঁর কাছ থেকে কথা বের করা অত সহজ না। এই একটা মানুষ এত মহৎ এত উদার। সৌভিকের প্রশ্ন শুনে বলেছে, তোমরা চ্যাংড়া মানুষ সরদাররে চিনতে পার নাই। সেজন্যই এমন প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে আসছ। সরদার কি পাশ জানো? সৌভিক বলেছে, এমএ পাশ। উত্তরে মোজাফফর আহমেদ বলেছেন, সরদার এমএ না সে হচ্ছে বিএ পাশ। বিএ মানে হচ্ছে বিনয়ের অবতার। শুধু এটুকু বলেছেন যে, আমরা সরদাররে পাঠাবো না তো কি মোজাফফররে পাঠাবো! নিজের নাম উল্লেখ করেই বলেছেন। এই হচ্ছে অধ্যাপক মোজাফফর। সে যাই হোক। কেন আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনসটিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে পাঠানো হয়েছিলো তা এখনো আমার জানা নাই। মনে হয় তাঁরা আমার সম্পর্কে এরকম ভেবেছিলেন যে সরদার একটা ভালো পোলা, জেল খাটতেছে, পড়ালেখাও খানিকটা জানে। এসব হতে পারে। নয়তো আর কি কারণ থাকতে পারে! তবে একটা কথা বলতে পারি যে আমি সরদার ফজলুল করিম নিজেকে যত ছোট মনে করি না কেন ব্যাপারটার কিন্তু বড় ধরনের গুরুত্ব ছিলো। ব্যাপারটা প্রমাণ করে যে তখন কম্যুনিস্টদের বড় ধরনের প্রভাব ছিলো। আমি তোমাদের অনুরোধ করবো যে, মোজাফফর আহমেদের মত যে দু'একজন ব্যক্তিত্ব এখনো আছেন তাদের কাছে যাও। তাঁদের কথা ধরে রাখার চেষ্টা কর। এ মুর্হূতে এরকম কয়েকজনের নাম মনে হচ্ছে—আহমেদুল কবির (২০ নভেম্বর ২০০৩-এ প্রয়াত), কেজি মুস্তাফা, সন্তোষ গুপ্ত, প্রাণেশ সমাদ্দার, ফয়েজ আহমদ আরো নাম এখন মনে করতে পারছি না। এদের কাছে যাও। অনেক ইতিহাস জানতে পারবে। হয়তো সহজে কথা বলতে চাইবে না। তবু চেষ্টা কর।

সেক্যুলারিজমের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

আজকের আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার আগেই কলাভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে আরো কয়েকজন সহকর্মীর উপস্থিতিতে স্যারের সঙ্গে উপমহাদেশে সেক্যুলারিজমের ভবিষ্যত প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিলো। কয়েকদিন আগে জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হোসেনূর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় সেক্যুলারিজম প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। সাক্ষাৎকারটিতে হোসেনূর রহমান ভারতীয় উপমহাদেশে সেক্যুলারজিমের আদর্শ দুর্বল হয়ে পড়া, সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ'র রাজনীতির রমরমা অবস্থার কারণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো এই যে, ভারতবর্ষে সেকুল্যার ফোর্স ক্ষমতার ভেতর বা বাইরে যেখানেই থাক না কেন অন্যরা একে সমঝে চলতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় বাংলাদেশের সেক্যুলার ফোর্স অতটা শক্তিশালী নয় বলেই হোসেনূর মনে করেন। সাক্ষাৎকারটি স্যারেরও চোখে পড়েছে বলে জানালেন। আমাদের সুবিধা হলো আমরা তাঁর মন্তব্য শুনতে চাইলাম।

—হোসেনূর রহমানকে আমি চিনি না। কিন্তু তার বক্তব্য পড়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে he is a thoughful personality. তার এই সাক্ষাৎকারটি আলোচনার দাবি রাখে। তোমরা সেমিনার আয়োজন কর। আমি অংশগ্রহণ করবো। হোসেনূরের সাথে আমি একটা বিষয়ে একমত যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের মুসলমানসহ সংখ্যালঘুদের মনোবল টিকে থাকার অন্তত একটা জায়গা আছে। এই জায়গাটা হলো ভারতের সেক্যুলার সংবিধান। কাজ হোক না হোক, এই সংবিধানকে ধরে সে কথা বলতে পারে, মামলা করতে পারে, বলতে পারে যে সংখ্যালঘুরা সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থাটা কি? এখানে সংবিধানকে বারবার পদদলিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে। এখানকার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি সংখ্যালঘুরা কোথায় fallback করবে? আমি বলবো না যে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ কোন সমস্যা নয়। অবশ্যই সমস্যা। কিন্তু বাংলাদেশে কি হচ্ছে? ইন্ডিয়াতে মুসলিম নিপীড়নের অজুহাত দেখিয়ে এখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। আর কিছুদিন এভাবে চলতে থাকলে এই শক্তিটি পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশান করার দাবি তুলবে। এদেশের নাম হবে বঙ্গ-পাকিস্তান।

-সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তির এজেন্ডাটা স্পষ্ট। তারা ভারতে হোক বাংলাদেশে হোক ধর্মবাদ কায়েম করতে চায়। কিন্তু নিছক ভোটবাজির জন্য যে সব সেক্যুলার পার্টি মৌলবাদের আস্ফালনকে বাধা না দিয়ে বরং নীরব থাকার পলিসি নেয় তাদের সম্পর্কে কি বলবেন? ভারতবর্ষে বাবরী মসজিদ যখন ভাঙ্গা হয় তখন ক্ষমতায় ছিলো একটি সেক্যুলার পার্টি। আমরা স্যারকে মনে করিয়ে দিলাম।

—বাদ দ্যাও তোমার সেক্যুলার পার্টি। কে সেক্যুলার? সেক্যুল্যারিজম কি জিনিস আমরা আদৌ কি এখনো বুঝতে পারছি। তুমি প্রশ্ন তুলেছ সেক্যুলার পার্টির ভূমিকা নিয়ে আর আমি প্রশ্ন তুলছি কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর ভূমিকা নিয়ে। সেক্যুলারিজমই যদি আমরা বুঝতাম তা হলে একটা পত্রিকা কি করে এই মর্মে শিরোনাম করে যে আমেরিকা মুসলমানদের আক্রমণ করছে। কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকার যদি এই দশা হয় তাহলে বাকিদের কথা আর কিইবা বলা যায়। বিজেপি-শিবসেনা-জামাতের সাথে যদি ফাইট করতে হয় সেটা কি ভাবে করতে হবে? আমরা কি মৌলবাদ রোখার জন্য নিজেরাই মৌলবাদের ভেক ধরবো! আপোস করবো? এভাবে কখনো সাফল্য আসবে না। বুঝতে হবে সারা পৃথিবীকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার একটা ব্লু-প্রিন্ট চলছে। সেক্যুলার পার্টি বলো আর কম্যুনিস্ট পার্টি বলো—এরা বুঝতেই পারছে না সামনের বিপদটা কত ভয়াবহ হবে। এরা মুখে অনেক কিছু বলে কিন্তু সামনে এগিয়ে এসে ফেস করছে না। স্যাক্রিফাইস না করলে তো মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ঠেকানো যাবে না। এই যে বাংলাদেশে তথা পুরো উপমহাদেশে মৌলবাদীরা যথেচ্ছভাবে সংখ্যালঘু নিপীড়ন করছে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে তথাকথিত সেক্যুলার ফোর্স কোন সংগঠিত প্রতিরোধ তৈরি করছে না।

কেন প্রতিরোধ করছে না? আমাদের প্রশ্ন।

—কিভাবে করবে? এটাই তো বোধের ব্যাপার। সেক্যুলারিজম ধারনাটাকে যদি তারা নিছক রাজনৈতিক টার্ম মনে না করে অন্তর অন্তঃস্থলে স্থান দিতে পারতো তাহলে কাজ হতো। সেটা হয় নি। উপমহাদেশজুড়ে হিন্দু-মুসলিম—খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে আর সেক্যুলাররা তাকিয়ে দেখছে। বৃক্ততা, মিছিল, মানববন্ধন করেই দায়িত্ব শেষ করছে। জীবন বাজি রেখে রুখে না দাঁড়ালে মৌলবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। আমাদের সময়ে একটা সেন্টিমেন্ট ছিলো। একটা যৌথ সমাজ দাঁড় করাবার সেন্টিমেন্ট। আমি যখন একজন হিন্দু কমরেডের নাম নিয়ে বলি সে আমার ভাই, কিংবা যখন বলি সন্তোষের (সন্তোষ গুপ্ত) মা আমার মাসিমা তখন আমার মধ্যে ইউনাইটেড হিউম্যান কমিউনিটির বোধটা কাজ করে। এখনকার সময়ে এসে দেখছি যে, চামড়ায় একটু আঁচড় কাটলে ধর্মগত পরিচয়টা ফুটে বেরিয়ে আসে। এটা খুবই দুঃখজনক। তবে এটাও ঠিক যে, হতাশা, ব্যর্থতা, বিফলতার অভিজ্ঞতা ছাড়া সমাজ রূপান্তর সম্ভব নয়।

আমাদের শেষ প্রশ্ন : সেক্যুলারিজমের কোন ভবিষ্যৎ কি আছে? দশ লক্ষ বছর লাগতে পারে এরকম না বলে দয়া করে অন্যভাবে বলুন।

—তোমাদের ইয়াং জেনারেশনের ভাষা আমি বুঝতে পারি না। তোমাদের ভাষা তো আমাদের ভাষা না। আমি জানি না, সেক্যুলারিজমের বিকল্প কি হতে পারে। আমি এটুকু জানি যে, রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কি করা যায় আমি জানি না। পাশের ঘরে অন্য ধর্মাবলম্বী কন্যাটি যখন ধর্ষিত হয় তখন তার পাশে না দাঁড়ানো কিভাবে সম্ভব? এর কোন বিকল্প নাই। আজকে অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যে নিজের মনের কথা নিজের কাছে বলতে ভয় নাই। কেবলই মনে হয় দেয়ালেরও কান আছে। আমি ভয়ার্ত। না হয়ে উপায়ও নেই। কেননা আমি দেখছি যে আমার তরুণ প্রজন্ম ভয়ে গুটিয়ে আছে। তাহলে আমি ভীত না হয়ে কি করবো। বর্তমান প্রজন্ম আর কিছু না করে শুধুই পূর্ববর্তী প্রজন্মকে দোষারোপ করেই পার পেতে চাচ্ছে। তবে এটাই কিন্তু আমার শেষ করা নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এত হতাশার মধ্যেও একটা তরুণ প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে যারা আশার ভিত্তিতে বাঁচতে চায়। সেজন্যই যতই চিৎকার করি না কেন শেষ বিচারে আমি হতাশাবাদী নই। আশাবাদী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুশ অপরাজেয় নয়

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

বেশ কিছুদিন বিরতির পর আজ আবার স্যারের কথা শোনার সুযোগ হলো। মাঝখানে বিভিন্ন কারণে স্যারের সাথে বসা হয়ে ওঠেনি। আজ সুযোগ মিলে গেলো অকস্মাৎ। সকালে ফোন আলাপের সময়ই উনি ক্যাম্পাসে আসার প্রয়োজন উল্লেখ করেন। সুযোগটা নিয়ে নেই এবং ঘণ্টা দুয়েক পরে রেজিস্টার বিল্ডিংস্থ সোনালী ব্যাংক থেকে স্যারকে কলাভবন লাউঞ্জে নিয়ে আসি। এক পর্যায়ে চতুর্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ক্লাশে স্যারকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি সম্মতি দেন। ভাবছিলাম যে স্যারকে ক্লাশে হাজির করতে পারলে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত ও উপকৃত হবে। পরে দেখা গেলো, ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজন গুণগ্রাহী হাজির হয়েছেন। চতুর্থ বর্ষের সিলেবাসে নির্ধারিত জাতিকতা, ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত কোর্সটি পড়ানোর জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসাবে আগের দুটো ক্লাশ থেকেই আমরা হান্টিংটনের clash of civlizations তত্ত্বটি আলোচনা করছিলাম। আজকের ক্লাশে তত্ত্বটির পর্যালোচনা-সমালোচনা উপস্থাপনা করার কথা ছিলো। আমরা ভাবলাম স্যার যদি এই তত্ত্বটির সম্পর্কে মন্তব্য করেন তাহলে এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না। এই লক্ষ্য থেকেই আমরা স্যারকে প্রশ্ন করলাম, এই যে হান্টিংটনরা বলছেন, আগামী দিনগুলোতে ধর্মই হবে সংস্কৃতির প্রধান উপাদান বা মানুষের প্রধান স্মারক এবং ধর্মের ভিত্তিতেই কয়েকটি সভ্যতার তৈরি হয়ে একটি আরেকটির বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়াবে-এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? প্রশ্ন শুনেই স্যার প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং পরের এক ঘণ্টা বক্তৃতা করলেন। সারসংক্ষেপ এরকম :

—হান্টিংটন কে আমি জানি না। আমারে চেনাও। তোমরা এ সমস্ত জিনিসপত্র হাজির করে পোলাপানের মাথা খাওয়ার জোগাড় করছ। তোমরা Knowledge impose করতেছ। ছাত্র-ছাত্রীদের মনের ভেতর কি আছে সেসব তোমরা শুনতেই চাও না। শুনলেও পাত্তা দেও না। খালি ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করে সবকিছু জটিল করে তোল। এই যে তুমি কতগুলো শব্দ ব্যবহার করলা এর জন্য তো আজকে আমারে বাসায় ফিরে ডিকশনারী ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে। পারলে বিকল্প সিলেবাস তৈরি কর। নিজেদের ইতিহাস না জেনে তোমরা খালি বাইরের জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাও। আমি বুঝি ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। মধ্যবিত্তের ভূমিকা। আমি বুঝবার চেষ্টা করি হিন্দু মধ্যবিত্ত, মুসলিম মধ্যবিত্ত এই অঞ্চলে ধর্ম নিয়ে কে কি করেছে সেসব জিনিস। আর তুমি আমারে আমার পোলপানদের সামনে খাড়া করাইয়া দিছ হান্টিংটন না কে তার এক শয়তানীভরা তত্ত্ব সে সব নিয়ে কথা বলার জন্য।

এসব বলার পর স্যার কিছু সময় ব্যয় করেন তাঁর প্রিয় আলাপের বিষয় অর্থাৎ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সংক্রান্ত আলোচনায়। একটা পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা স্যারকে মৌলবাদ কি বঙ্গভঙ্গের কারণ এবং এর জন্য কোন সম্প্রদায়ের কতখানি ভূমিকা, এ ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। স্যার কোন প্রশ্নেরই চটজলদি উত্তর দেন নি। শুধু মনে করিয়ে দিলেন যে এসব বিষয়ে ভালোভাবে জানার জন্য বেশি বেশি করে বই পড়ার দরকার। কেননা এসব বিষয়ে দারুণ মতভেদ রয়েছে। যত বেশি পড়া হবে ততই চিন্তার স্বচ্ছতা আসবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে বই পড়া হয় না সে বই কোন বই নয়। সেটা একটা বস্তু মাত্র। ক্লাশ শেষেও দীর্ঘ সময় ধরে বারান্দায় সবাই স্যারকে ঘিরে রেখে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে। বিকেলের দিকে ফাঁকা লাউঞ্জে বসে আলাপকালে তিনি বলেন :

—তোমাদের প্রজন্মের কেউই মূল সমস্যাটা ধরতে পারছো না। অথবা ইচ্ছে করেই ধরছো না। যদি কোন বিপদে পড়ে যাও এই ভয়ে। যদি ক্যারিয়ারের ক্ষতি হয়। কিন্তু ভুলেও মনে কোরো না যে এভাবে করে শেষরক্ষা পাবে। সারা পৃথিবীটা একটা ঘোরতর বিপদের মধ্যে আছে। একমেরু বিশিষ্ট একটা বৈশ্বিক ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। আর এ ব্যবস্থায়, একজন ব্যক্তি অর্থাৎ বুশ সাহেবের কথা মতই সবকিছু হচ্ছে। এগুলো কিভাবে মেনে নাও তোমরা! আমি এই বুড়ো মানুষটা তো একথা মানতে পারি না যে সে একলা যা বলে তাই ঠিক আর সবাই ভুল। তোমরা নিজেরা বুঝবার চেষ্টা কর এবং অন্যদেরকেও বোঝাও, আমেরিকা এখন যে অরাজকতা চালাচ্ছে তা কখনোই চিরকালের ব্যাপারে হতে পারে না। শুধু শক্তি ধারণ করার চেষ্টা কর এই ভেবে যে বুশ অপরাজেয় না। সম্মিলিত প্রয়াসে বুশকে অর্থাৎ আমেরিকার এসব অনাচার হঠিয়ে দেয়া সম্ভব। তোমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কিছু করে বেড়াও। এটা ভালো। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে তো কিছু হবে না। আর যাদের জন্য করছ তারা যদি সাধারণ মানুষজন হয়, তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সব লোকগুলোর মধ্যে বিশ্বজনীনতার বোধ তৈরি করা। এই বোধ তৈরি করা না গেলে কোন লাভ হবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু বাপের ঋণ শোধ করতে চাই

৭ নভেম্বর ২০০৩

আজকের আলোচনাটি এক অর্থে ব্যতিক্রমী। ২০০১ সালের শেষের দিকে প্রান্তিক-সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে স্যারের 'সেই সে কাল' গ্রন্থের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আশি জনের মত ছাত্র-ছাত্রী মাসখানেক আগে থেকে বাজার থেকে বইটি সংগ্রহ করে অনুষ্ঠানের দিন স্যারকে প্রশ্ন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুষ্ঠানটি মূলতঃ একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে পরিণত হয়। বইটির পাঠ সমাপ্তকারীরা ছাড়াও উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতারা মিলে সরদার ফজলুল করিমের বরাবরে কয়েক ডজন প্রশ্ন লিখিত আকারে উপস্থাপন করে। বলাই বাহুল্য যে, সেদিনের আলোচনায় স্যার সবগুলো প্রশ্নের মীমাংসার হাজির করেন নি। তবে তিনি প্রশ্নগুলো সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। দু'বছরের বেশি সময় পরে আজ কিছু প্রশ্ন বাছাই করে স্যারের সামনে নিয়ে আসি। প্রথম প্রশ্নটি এরকমের—আপনাদের এত ত্যাগ তিতিক্ষার পরে ও আমাদের দেশে বাম রাজনীতি ব্যর্থ কেন? এই রাজনীতি কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হলো? উল্লেখ্য যে, বেশ কয়েকজন প্রশ্নকারীই এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন।

—তোমাদের এবং নিজেকেও বলছি যে জীবনের কোন সমস্যারই সহজ জবাব নাই। অথচ মানুষের প্রবৃত্তি হচ্ছে সে সহজ জবাব চায়। খেয়াল করলে দেখবে যে বাগানের চারপাশ দিয়ে না হেঁটে মানুষ বাগান মাড়িয়ে কোনাকুনি হাঁটে। উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে বলছি যে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হলো কোথায়? সমাজতন্ত্র সবে সফল হতে শুরু করেছে। অথচ তোমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে যে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবকে আমি বলি দ্বিতীয় প্যারি কমিউন। পুঁজিবাদ শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং যেহেতু তাদের শক্তি বেশি সেহেতু ১৯৯০ সালে এসে দ্বিতীয় প্যারি কমিউনের রাজনৈতিক পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য তারা ক্রুশ্চেভ, গর্বাচেভ ইত্যাদি তৈরি করেছে। তথাপি সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে বলে আমি মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি না। আজ সারা বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিবাদের মধ্যে আমি নতুন এক প্যারি কমিউনের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। সমাজতন্ত্রের সুদিন দেখতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্থাপন করলাম তবে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সাথে যুক্ত করে। তাহলে আপনি মনে করছেন যে পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় বাম রাজনীতির ভবিষ্যৎ আছে?

—নিশ্চয় আমার কাছে জানতে চাইছো না যে বাম রাজনীতি সফল হতে কয় বছর লাগবে? এত অধৈর্য তোমরা! অমানুষের সমাজ মানুষের সমাজে রূপান্তরিত হওয়া কি চট করে সম্ভব? আমি এটুকু বুঝি যে মানুষকে অবশ্যই মানুষ হতে হবে, এর কোন গত্যন্তর নাই। এবং মানুষ হতে চাইলে বাম রাজনীতির বিকল্প নাই।

তৃতীয় প্রশ্ন : আপনার বিভিন্ন লেখালেখিতে বিপ্লব সম্পর্কে দু'ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায়। প্রথম মন্তব্যটি আত্মজিজ্ঞাসামূলক-বিপ্লব কি আসবে? দ্বিতীয় মন্ত ব্যটি একটি বোধের পরিচায়ক-আমরা বিপ্লবের মধ্যে বাস করছি। কোনটি সত্য? আজকে আপনার সামনে বসে এ প্রশ্ন উত্থাপন করছি। দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনার সামনে বিছিয়ে রাখা সেদিনের অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে শ্রোতাদের এ প্রশ্নটিও রয়েছে।

—তরুণরা আমাকে প্রশ্ন করছে এই বলে যে আপনার ঘোড়ার ডিমের বিপ্লব কবে আসবে? এই কথাটা জিজ্ঞেস করাই তো একটা বিপ্লবাত্মক ব্যাপার। একদিন দেখলাম এক মেয়ে এক ছেলেকে চড় মেরেছে। আমার চোখে এটা বিশাল এক বিপ্লব। তুমি জিজ্ঞেস করছো এর আদৌ কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে কি না। আমি বলবো অবশ্যই আছে। বিশাল রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। বাম রাজনীতির লোকেরা যদি এটা বুঝতে না পারে তাহলে বলার কিছু নাই।

তাহলে আপনি কেন আহাজারি করেন, বিপ্লব কি আসবে? বিপ্লব কি আসবে? আপনি তাহলে প্রতিক্রিয়াশীলতার আস্ফালনে ভড়কে যেয়ে বিপ্লবকে ডাকছেন।

—বিপ্লবকে যথাযথ বোঝা অত সোজা না। মেয়ে ছেলেকে চড় মেরেছে। এটা বললাম আবার আমাদের মেয়েরাই আত্মহত্যা করছে। এর মধ্যে বিপ্লবাত্মক উপাদান নয় এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি প্রদর্শন রয়েছে। এজন্যই বোধ হয় আমি বিপ্লব সম্পর্কে দু'ধরনের কথা বলি।

চতুর্থ প্রশ্ন : এখনকার প্রশ্নটি নিয়ে আপনার সাথে দীর্ঘ আলাপ করতে হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি যে অনুষ্ঠানের শ্রোতারাও একই বিষয়ে আপনার ভাষ্য শুনতে আগ্রহী ছিলেন। প্রশ্নটা হচ্ছে এক সময় ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সে পরিচয় লুপ্ত। এখন আপনার পরিচয় বুদ্ধিজীবী। কেন আপনাকে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পাওয়া গেলো না?

—আমার পরিচয় আমি তৈরি করি নাই। রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী এসব পরিচয় আমার দেয়া নয়। আমি কৃষকের পোলা। আমি শুধু বাপের ঋণ শোধ করতে চাই।

আলোচনার এ অংশটি বেশ দীর্ঘ হয়েছিলো। পূর্বের একটি আলোচনাতেও স্যার বিস্তারিতভাবে তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন। আশা করা যায় পাঠকবৃন্দ এবং প্রশ্ন উত্থাপনকারীরা সে আলোচনা থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের কিছু জবাব পেয়ে যাবেন। শেষের দিকে শুধু জানতে চাওয়া হয়েছিলো, আপনি সবসময় বিকাশ, বিবর্তনের কথা বলেন। আপনার কি এরকম মনে হয় যে যদি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকতেন তাহলে বিকাশ এবং বিবর্তনের পক্ষের শক্তিকে আরো বেগবান করতেন পারতেন? স্যার এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু এটুকু বললেন যে, যদি দিয়ে কোন বাক্য তৈরি নিরর্থক। বলা বাহুল্য যে এ ধরনের উত্তরে আমরা তৃপ্ত হতে পারিনি। মনে হয়েছে যে সরদার ফজলুল করিমও কখনো কখনো মানুষী সীমাবদ্ধতায় আটক হতে পারেন। এটা ভালো লাগার কারণও বটে। স্যার কখনো নিজের উপর দেবত্ব আরোপ করেন না।

একটি মজার প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে আজকের আলোচনার ইতি হয়। একজন শ্রোতা সরদার ফজলুল করিমের কাছেই প্রশ্ন রেখেছেন এই মর্মে যে সরদার ফজলুল করিমকে কি কম্যুনিস্ট মৌলবাদী বলা যায়?

—শব্দগতভাবে দেখলে মৌলবাদী খারাপ কিছু না। মূলে যাওয়ার চেষ্টাই তো মৌলবাদ। তবে কথা হলো কম্যুনিস্ট মৌলবাদী হওয়া সহজ না। বুকে একটা কম্যুনিস্ট প্ল্যাকার্ড ঝোলালেই কম্যুনিস্ট হওয়া যায় না। মার্কসবাদের মূলে যাওয়া সহজ না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মৃত্যুর জিকির করি না

১৫ জানুয়ারি ২০০৪

শেষদিনের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি ছিলো নিম্নরূপ :

জীবন সম্পর্কে আপনার দর্শন কি?

—তুমি কি আমাকে চেনো? কিভাবে? আমার জীবন-দর্শন জানার আগে তোমাদের জানতে হবে কেন আমি আড়াই হাজার বছরের পুরোনো বই অনুবাদ করলাম। তোমাদের জানতে হবে একথাটা যে, আমি জানি যে তোমরা আমাকে ভালোবাসো। নিজগুণেই ভালোবাসো। কিন্তু আমাকে বলো, কেন তোমরা আমাকে ভালোবাসো? লাইফকে শব্দগতভাবে বুঝতে চাইলে আর কতটুকুই বা বোঝা যায়। জীবনকে বোঝার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে জীবন বাঁচিয়ে রাখা, জীবন যাপন করা। জন্ম কখনোই আজন্ম পাপ হতে পারে না। দাউদ হায়দার ভালো ছেলে। ওর কবিতার লাইনটাকে মন দিয়ে বুঝতে হবে। সোজা মানে করলে হবে না। ওর কবিতার প্রতীকী অর্থ বুঝতে হবে। তবে কথা হলো আমার জীবন দর্শন কি বলবো? এতদিন কথা বলে যা বোঝার বুঝে নাও। শুধু বলবো যে Unless you enjoy your death you cannot enjoy your life.

কিন্তু একটু আগেই আপনি বললেন যে জীবনকে বোঝার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে জীবন বাঁচিয়ে রাখা।

—জীবন এবং মৃত্যু এ দু'টো related word. সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডের ক্ষণপূর্বে যখন তাঁকে বন্ধনমুক্ত করা হয় তখন তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন বন্ধন না থাকলে আমি বন্ধন মুক্তির আনন্দ বুঝতে পারতাম না। জীবনকে বুঝতে হলে মৃত্যুকেও বোঝার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

গত কিছুদিন থেকে আপনি বারবারই মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন, বলছেন যে আপনি অপেক্ষা করছেন। কেন বলছেন? নিয়তই জীবনকে উপভোগ করার পরামর্শ আপনি দিয়ে থাকেন। আপনার ক্ষেত্রে এমন কি ঘটছে? বারবার মৃত্যুর আলোচনা হাজির করার কারণ কি এই যে আপনি জীবনকে উপভোগ করছেন না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমি সর্বদা গোর্কীকে স্মরণে রাখি। জীবন কখনো মরে না। সময়হীন সময় ধরে জীবন অগ্রসর হচ্ছে। life is endless. মৃত্যুভাবনা নিয়ে কথা বলছি জীবনের আনন্দ উপভোগ অব্যাহত রাখার জন্য। একটা জীবন যখন মৃত্যুর হাত থেকে উঠে আসে সে আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমার সে অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের নাই। আমার মত করে জীবনকে তোমরা বুঝতে পারবে না। আগে অভিজ্ঞতা নাও। এ সমস্ত প্রশ্ন না করে পারলে আমার মত এগারো বছর জেলখানায় থেকে আস। তারপর বুঝতে পারবা প্রতিটা অভিজ্ঞতা কতই না মূল্যবান। জীবন কতই না মূল্যবান। আমি ব্যক্তিগত মৃত্যুর প্রসঙ্গটিকে ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি না। আমি কোন একলা আমি নই। আমার পরিবার, বন্ধুজনা, পারিপার্শ্বিক, তোমরা সব মিলিয়ে আমি। আমি হচ্ছি সমাজের আমি। আমি শুধু মানুষের সমাজের স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি।

আমরা এ পর্যায়ে এসে তাঁর বক্তব্যগুলো আরেকটু ভালোভাবে বুঝে নিতে চাইলাম। তাঁর উচ্চারিত লাইনগুলোই আবার তাঁকে শোনাতে চাইলাম। তিনি রাজি হলেন না। বরং বলেন :

—যেভাবে খুশি ছাপো আমার কিছু আসে যায় না। তোমরা এখন শেখ মুজিবের মুখে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বসাইছো তাতে শেখ মুজিবের কি আসে যায়। আমার কথাও তুমি যেমনে খুশি লিখতে পার আমার কিছু যায় আসে না। এখন cannibalism চলছে। man is eating man.

AMARBOI.COM

আপনি বলছেন যে cannibalism চলছে, মানুষ মানুষকে খাচ্ছে। তবুও কি আপনি জীবনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন?

—জীবনের অর্থই জীবন। জীবন জীবিত থাকে আর মৃত্যু মারা যায়। বাচ্চা মারা গেলে মা কাঁদে এটা একটা বায়োলজিক্যাল ব্যাপার। তথাপি এই বাচ্চা মারা যাওয়াটা একজন ব্যক্তির extinction, এটা মানুষের extinction নয়। এরকম ভাবনা নিয়েই আমি বেঁচে আছি। আমি মৃত্যুর জিকির করি না। এত অস্ত্র নাকি বানানো হয়েছে যা দিয়ে পৃথিবীকে হাজার বার ধ্বংস করা যায়, এখন টুইন টাওয়ার ভেঙ্গে ফেলার কাল চলছে, এখন বাগদাদের লাইব্রেরি পোড়ানোর সময় চলছে—এখন বিশ্বজুড়ে অমানুষের রাজত্ব চলছে। তাই বলে কি আমি স্বপ্ন দেখবো না?

২০০২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর স্যারের সাথে আনুষ্ঠানিক আলাপ শুরু হয়েছিলো। আজ এক বছর তিন মাসের মাথায় এসে আনুষ্ঠানিক আলাপ পর্বের আপাতত সমাপ্তি হচ্ছে। আপাতত সমাপ্ত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, সরদার ফজলুল করিম পাঠ এত সহজে শেষ হবার নয়। চেষ্টা ছিলো যতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভব সময়ানুক্রম ধরে রেখে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির অতীত-বর্তমান ভবিষ্যতকে উপজীব্য করে মানুষ-সমাজ-সভ্যতা, সমাজ পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিকতা, মানুষী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিঘ্ন ও সম্ভাবনাসহ নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে সরদার ফজলুল করিমের মন্তব্যগুলোকে ধরে রাখা। বলাই বাহুল্য যে বাংলাদেশকে মূল উপজীব্য ধরা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্যারের মন্তব্য/ পর্যবেক্ষণগুলো দেশ-কালের গণ্ডীতে আটকে না থেকে সব সমাজের সব কালের হয়ে উঠেছে। আরো একটি লক্ষ্য ছিলো: আমাদের মহত্তম ঐতিহ্যের অগ্রগণ্য স্মারক সরদার ফজলুল করিমের জীবন সম্পর্কে সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তি। সুখী এই কারণে যে তিনি নিজের উপরে দেবত্ব আরোপের কোন প্রকার চেষ্টা না করে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন মানুষ হিসেবে। অতি অবলীলায় বলতে পেরেছেন নিজের সীমাবদ্ধতার কথা যা মানুষের জন্য স্বাভাবিক। দীর্ঘদিনের আলাপের অংশজুড়ে অনেকটা রয়েছে ব্যক্তি সরদার ফজলুল করিমের সীমাবদ্ধতার কৈফিয়ৎ। কারু সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নয়। নিজের কাছে স্পষ্ট থাকার জন্য—এমনটাই মনে হয়েছে শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত। প্রতিটি আলোচনা পর্বে বারবার এ কথাটিই মনে হয়েছে যে, সরদার ফজলুল করিম হতাশার পূজারী নন—আশার কাণ্ডারী। আশা ফেরিওয়ালা।

AMARBOI.COM